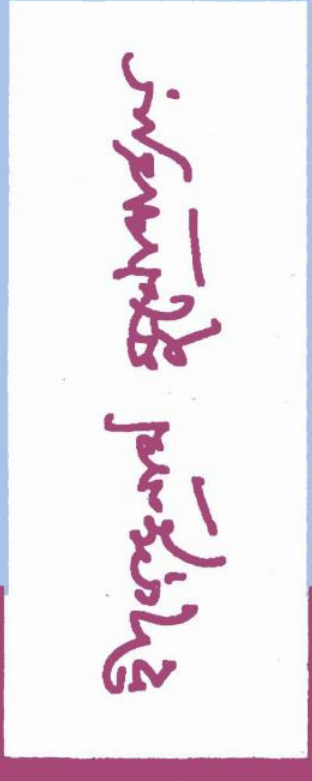
পরিচয়



সম্মান সংখ্যা

ইবাদাতে ইসলাম

১০০ টাকা

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষাব্রতী ও প্রাবন্ধিক
ভূদেব চৌধুরী

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও প্রাবন্ধিক
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ
কল্পতরু সেনগুপ্ত

লোকসংস্কৃতিচর্চার বিরল ব্যক্তিত্ব
তারাপদ সাঁতরা

বিজ্ঞানী ও প্রাবন্ধিক
অমর ভাদুড়ি

সংসদের স্মরণীয় রচনাবলী

বঙ্কিম রচনাবলী-১ (সমগ্র উপন্যাস)	১৪০.০০
বঙ্কিম রচনাবলী-২ (সমগ্র প্রবন্ধ ও রচনা)	১৪০.০০
বঙ্কিম রচনাবলী-৩ (সমগ্র ইংরেজি রচনা)	১০০.০০
মধুসূদন রচনাবলী	১২০.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী-১	১৩৫.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী-২	১৫০.০০
গিরিশ রচনাবলী-১	৭৫.০০
গিরিশ রচনাবলী-৩	৮০.০০
গিরিশ রচনাবলী-৪	১৩০.০০
দীনবন্ধু রচনাবলী	১০০.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ-১, ২, ৩ (প্রতিটি)	১৬০.০০
ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকসমগ্র-১, ২ (প্রতিটি)	১৫০.০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র-১	১৫০.০০
রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ	১০০.০০
সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ	১২৫.০০

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

মনীষা'র নতুন সংযোজনা

দুঃসময়ের গল্প

চিত্ত ঘোষাল

বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের নবতম গল্প সংকলন। ৭০.০০

ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে

ফিদেল কাস্ত্রোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তৃতা।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। ৭০.০০

সংগ্রামী কিউবা

ভানুদেব দত্ত

কিউবার মানুষের সংগ্রাম গাথা। ৫০.০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

।। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।।

আই. সি. এ ২০০৬ (৩) ২০০৩

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে

গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ২০০৬ (৩) ২০০৩

মুহূর্তের অসতর্কতা
মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড

গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে চলুন।

- বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগস্থলগুলি ত্রুটিমুক্ত রাখুন।
- অন্যায়ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না।
- তেল, পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ আগুন থেকে দূরে রাখুন।
- আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে দমকলকে খবর দিন।
- অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের কাজে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ২০০৬ (৩) ২০০৩

Space Donated By

BISHNU
COTTON MILLS LTD.

কারুকথা-র বই

সুদর্শন সেনশর্মা-র **আতারাণী সর্দার ও অন্যান্য গল্প** ৫০.০০

●

সমীর চৌধুরী-র **রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অথবা বিন্দুমাধব ভট্টাচার্যের লণ্ঠন** ৫০.০০

কালো রুটি ৫০.০০

●

অজয় চট্টোপাধ্যায়-এর **কথকতা** ৩৫.০০

●

অনাদি আচার্য-র **অনাদি আচার্যর কবিতা** ২৫.০০

●

দুলাল ঘোষ-এর **আমার অমীমাংসিত** ২৫.০০

●

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু-র **মানচিত্রের লোকজন** ৩৫.০০

কারুকথা

৫ অরুণাচল ইস্ট, সোদপুর, ২৪ পরগনা (উত্তর)

কারুকথার বই দি স্টার বুক হাউস

৬৫/এ এম. জি. রোড, কলকাতা-৯ ও **পাতিরাম**-এ পাওয়া যাবে।

কামারহাটি পৌরাঞ্চলের উন্নয়নে নবদিগন্ত উন্মোচনের সারণী

১। বেলঘরিয়া স্টেশনের উপর উড়ালপুল।

২। ৩০ মিলিয়ন জল প্রকল্প স্থায়ী জল সমস্যা সমাধানে বিরাট পদক্ষেপ।

৩। নজরুল মঞ্চ, সমাজসদন ও পুরসভার ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'পুরপথিক' প্রকাশ—সাংস্কৃতিক চর্চায় এনেছে অনবদ্য গতিবেগ।

৪। বেলঘরিয়া বাজার প্রকল্প নাগরিকদের গর্ব।

৫। আড়িয়াদহের 'সপ্তপর্ণা' আত্মনির্ভরতার প্রতীক।

৬। দক্ষিণেশ্বর পৌরবাজার প্রকল্পটি এলাকার পরিবেশ পরিবর্তনে নিয়ে আসবে নতুন দিন।

৭। বাড়ি বাড়ি জঞ্জাল সংগ্রহের অভিযান সকল মানুষের কর্মসূচীতে পরিণত।

আগামী দিনের আরও উজ্জ্বলতর পরিকল্পনা পরিষেবার ক্ষেত্রে নিয়ে আসুক নতুন প্রাণ।

প্রবীর মিত্র
উপ-পৌরপ্রধান

গোবিন্দ গাঙ্গুলী
পৌরপ্রধান

Bengali Fiction in English Translation

Arogyaniketan *Tarasankar Bondyopadhyay* *Tr. Enakshi Chatterjee*	110.00
The Puppets' Tale *Manik Bandyopadhyay* *Tr. Sachindralal Ghosh*	60.00
The White Envelope *Moti Nandy* *Tr. Suchandra Chakraborty*	60.00
The Belated Spring *Bimal Kar* *Tr. Neeta Sen Samarth*	75.00
East-West/Purbo-Paschim, Part One *Sunil Gangopadhyay* *Tr. Enakshi Chatterjee*	400.00
Selected Short Stories *Narendranath Mitra* Compiled and translated by Amitava Ray Introduction *Sibnarayan Ray*	65.00
Mindscape *Premendra Mitra* *Tr. Tutun Mukherjee*	65.00
Anandibai and Other Stories *Parashuram* *Tr. Swapna Dutta*	40.00
Rajnagar *Amiya Bhushan Majumdar* *Tr. Kalpana Bardhan*	150.00
Binodini *Rabindranath Tagore* *Tr. Krishna Kripalani*	90.00
Chaturanga *Rabindranath Tagore* *Tr. Ashok Mitra*	45.00
Gora *Rabindranath Tagore* *Tr. Sujit Mukherjee*	185.00

SAHITYA AKADEMI

Head Office
Rabindra Bhawan
35 Ferozeshah Road
New Delhi 110001

Regional Office
Jeevan Tara
23A/44X, D.H. Road
Kolkata 700053

পরিচয়

মাঘ ১৪০৯-আষাঢ় ১৪১০
ফেব্রুয়ারী-জুলাই '০৩
৭-১২ সংখ্যা ৭২ বর্ষ

এক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ—রণেন সেন ৩
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক প্রত্যয়ী পথিকের জীবনবৃত্ত—গৌতম নিয়োগী ৮
HNM—আমি যতটুকু জেনেছি—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
'নাল্পে সুখমস্তি', সদ্য-প্রগতিতে—সিদ্ধেশ্বর সেন ৩৫
আমার প্রণাম—রাম বসু ৩৮

দুই মূল্যায়ন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—নরহরি কবিরাজ ৪১
তরী হতে তীর—সত্যপ্রিয় ঘোষ ৪৩
হীরেন্দ্রনাথের গান্ধী-ভাবনা—শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯
সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ—সত্যব্রত দত্ত ৬৬
'এ্যাণ্ড দিস ওয়াজ এ ম্যান' জহরলাল—বাসব সরকার ৭৬
হৃদয়ের রক্ত—শঙ্খ ঘোষ ৯২
লিখেছেন অন্তরস্থিত মূলগত মার্কসবাদী প্রত্যয় নিয়ে—কুমার রায় ৯৮
আদর্শবাদের অতন্দ্র সৈনিক—নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ১০৪
হীরেন্দ্রনাথ সাহিত্যভাবনা—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ১১০
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ-সাহিত্য—নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১১৮
দলিত-সমস্যা ও হীরেন্দ্রনাথের ভাবনা—জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ১২৫
হীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ববোধ গঠনবিন্যাস ও স্তালিন—অজয় চট্টোপাধ্যায় ১৩৮
সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ—শোভনলাল দত্তগুপ্ত ১৬০
মার্কসবাদ, হীরেন্দ্রনাথ ও মুক্তমতি—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৬৪
লক্ষ্যের পবিত্রতা—পার্থপ্রতিম কুণ্ডু ১৭৫
সংসদ প্রথম পঁচিশ বছর এবং তারও পর—অজেয়া সরকার ১৮১
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি—জ্যোতিভূষণ চাকী ১৯৭

তিন হীরেন্দ্রনাথ সৃষ্টি

কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি ২০১
"হিন্দু-মুসলমান-কী জয়" ২১৩

"প্রাণের ভুবন করো পূর্ণ" ২১৮
তরী হতে তীর গ্রন্থের তৃতীয় মুদ্রণের মুখবন্ধ ২২২
কেন লিখি ২২৯
বঙ্কিম-গরিমার উত্তরাধিকার ২৩৬
'শের-য়ে-বঙ্গাল' ফজলুল হক ২৪৬
ফিরে দেখা, সামনে তাকানো ২৫৩
ইতিহাসের চাবুক খণ্ডিত 'স্বাধীনতা'র বিড়ম্বনা ২৬০
সাহিত্য সমাজ ও সাংবাদিকতা ২৬৩
রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ২৭৩
জগৎ জুড়ে লাল ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে ২৮৭
Dire Damage to our Civilisation Entity ৩০৩
Remembering Tees January 1948 ৩১০
Time To Recall Words of Martin Luther King ৩১৪
Let us Proceed with Civilised Humility ৩১৭
Remembering Jawaharlal and Indira ৩২০

চার অনুবাদ কবিতা
The Fountain Awakes ৩২৭
Two Birds ৩২৯
Brahman ৩৩১
Bad Times ৩৩৩
The Lord's Debt ৩৩৫
Beholden ৩৩৯
Question ৩৪১
They work ৩৪২

পাঁচ : চিঠিপত্র ৩৪৫

ছয় গ্রন্থপঞ্জি
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থপঞ্জি—গৌতম নিয়োগী ৩৭৭

সাত বিয়োগপঞ্জি
শিশিরকুমার দাস—অমিতাভ দাশগুপ্ত ৪০৭
স্মৃতির সূত্রে ধনঞ্জয় দাস—মিহির সেন ৪১০

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয় ধর

সম্পাদনা সহায়তা
অজয় চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর সচিব
দুলাল ঘোষ

উপদেশকমণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় রাম বসু

অতিথি-সম্পাদক
গৌতম নিয়োগী প্রণব বিশ্বাস

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর ঃ ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

'আমি নিজে ১৯৩৫ নাগাদ সময়ে পরিচয়-এর সঙ্গে পরিচিত হই। আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী আর বিষ্ণু দে-র মতো বন্ধু সমভিব্যাহারেই বোধ হয় প্রথম যাই। প্রধানত সুধীনবাবুর বাড়িতেই যেতাম। ডক্টর প্রবোধ বাগ্‌চী কিংবা গিরিজাবাবুর বাড়িতে যে বৈঠক হত, সেখানে খুব কমই গিয়েছি।...বেশ মনে আছে আমার প্রথম যে লেখা 'পরিচয়'-এ প্রকাশ পায় সেটা হল এঙ্গেলস্-এর Anti Duhring গ্রন্থটির সমালোচনা। প্রসঙ্গত, সমালোচনা-বিভাগের জন্যই 'পরিচয়'-এর খ্যাতি বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাই হোক, তখন থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত পরিচয়-এ অজস্র লেখা (কয়েকটি অন্য নামে) লিখেছি। আজও রয়েছি বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর একজন 'উপদেশক' (শব্দটি নিয়ে আমার মনে খটকা আছে) হিসাবে।'

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের 'পরিচয়-এর আড্ডা' গ্রন্থের ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ এইভাবেই পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন ঘনিষ্ঠতার কথা জানিয়েছিলেন। ভূমিকাটি লেখা হয়েছিল ১৯৯০-এর ২৫ জানুয়ারি। আজ ২০০৩ সালেও সে ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত। তিনি এখনও পরিচয়-এর প্রধান উপদেশক এবং লেখকও। তবু ভূমিকাতেই তিনি পরিহাসসিক্ত মৃদু অনুযোগও জানিয়েছিলেন যে, 'উপদেশক' হলেও "উপদেশ" দেবার বা নেবার উদ্যোগ কোনো পক্ষে নেই।' এর প্রথমটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রুচি ও বিনয়। কারণ, উপদেশ বা পরামর্শ নিয়মিতই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়, অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ভাবেও তাঁর স্নেহশীল নির্দেশ আসে। কিন্তু আমাদের অক্ষমতায় অনেক সময় তা পালিত হয় না। এই অক্ষমতার মার্জনাও তাঁর কাছে পাওয়া যায়।

তাঁরই হিসেবে দীর্ঘ আটষট্টি বছর ধরে পরিচয়-এর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ-এর সংযোগ। তিনি তখন থেকেই এর লেখক, পাঠক এবং দীর্ঘকালের নির্দেশক। তাই আমাদেরই দায়িত্ব ছিল তাঁর যথাযোগ্য একটি 'সম্মান-সংখ্যা' প্রকাশ করার। এই কাজে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেই অপরাধ নতমস্তকে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বর্তমান সংখ্যাটি সেই আরব্ধ দায়িত্ব পালনের প্রয়াস। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ফারাক থাকেই, এখানেও তা আছে। সঙ্কলনটির অসম্পূর্ণতার জন্য স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেও এটুকু বলা যায় যে, এই প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি সেটুকু গ্রহণ করে নিলেই আমরা কৃতার্থ বোধ করি।

শ্রীগৌতম নিয়োগী এবং **শ্রীপ্রণব বিশ্বাস** যুগ্মভাবে এই সংখ্যার সম্পাদনা করেছেন। হীরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণেই তাঁরা স্বেচ্ছায় এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ

রণেন সেন

১

হীরেনবাবু সম্পর্কে কিছু লেখার অনুরোধে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও পাচ্ছি। ভীত হওয়ার কারণ হীরেনবাবুর মতো কমিউনিস্ট ভারতবর্ষে তো কমই পাওয়া যায়, এমনকী বিদেশেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যাঁরা ইংলন্ডে থেকেছেন, কিন্তু ইংলন্ডের কমিউনিস্ট পার্টির বা রজনীপাম দত্তের (আর-পি-ডি) সংস্পর্শে না এসেও নিজের চেষ্টায় মার্কসবাদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে নিজে কমিউনিস্ট হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন হীরেন মুখার্জি। এই প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম করতে হয়—তিনি অধ্যাপক সুশোভন সরকার। তিনিও নিজের চেষ্টায় কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। এই দুজনই পরবর্তী যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও আন্দোলনের দুই প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমার মুস্কিল, এসব কথা বলতে গেলে নিজেকে টেনে আনতে হয়। তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কেন্দ্র ছিল কলকাতাতে। কমরেড পি সি যোশি সাধারণ সম্পাদক আর ড. গঙ্গাধর অধিকারী পলিটব্যুরো সদস্য। ১৯৩৬ সালে দুজনই কলকাতায় আত্মগোপন করেছিলেন। তখন কলকাতায় পার্টির সদর দপ্তর ওঁরাই চালাতেন। আমার হাত দিয়েই সে সময় গোপন চিঠিপত্র যেত। এমন একটি চিঠিতে লেখা ছিল 'যোগেশ'। আমি যোশিকে জিজ্ঞেস করলাম—'এ কে রে বাবা!' যোশি জবাব দিলেন—'জালে বড় এক কাতলা পড়েছে।' আমিও সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য। পার্টিতে প্রতিষ্ঠা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপ্যার?' যোশি বললেন, 'অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির প্রফেসার হীরেন মুখার্জি শিগ্‌গিরই কলকাতায় আসছেন। আমাদের সঙ্গে কাজে যোগ দিচ্ছেন।' অধ্যাপক সুশোভন সরকারও তখন ছাত্রদের নিয়ে ও বাইরের কিছু ছেলেকে নিয়ে স্টাডি ক্লাস করতেন এবং বিভিন্ন নামে মার্কসবাদের ওপর সহজ বাংলায় বই লিখেছেন। যেমন—ইতিহাসের ধারা (অমিত সেনের নামে)।

১৯৩৭ সালে পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করতে আরম্ভ করল কারণ বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিতে এলো যে তারা কংগ্রেসকে ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত ও তাদের অহেতুক বাধা দেবে না। কংগ্রেস অলিখিতভাবে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে কাজ করার সুযোগ করে দিল। এর ফলে পার্টির সদর দপ্তর মুম্বাইতে স্থানান্তরিত হল। পার্টির মুখপত্র 'ন্যাশানাল ফ্রন্ট' ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে মুম্বাই থেকে বের হল। এই সময় হীরেনবাবু কলকাতায় এলে আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

আমরা দেখলাম হীরেন্দ্রনাথ অতি অমায়িক ভদ্রলোক। তিনি যে শুধু মার্কসবাদে পণ্ডিত তা নয়, নানান বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নিয়ে ছাত্রদের যে বক্তৃতা দেন সেটা পরে অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য একটা সভায় হীরেনবাবুর সামনে বলছিলেন,

'খুব সহজে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বুঝিয়েছিলেন হীরেন মুখার্জিই।' বস্তুত অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন হীরেনবাবুকে নিয়ে সে সময় ভারতের নানান জায়গায় ক্লাস, মিটিং করেছেন। হীরেনবাবুর প্রভাবে বহু তরুণ পার্টিতে যোগদান করেন। হীরেনবাবু পরবর্তী যুগে একটা লেখায় বলেছিলেন, 'আমি যখন পাঞ্জাবে ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছিলাম, সেই ক্লাসে ছিলেন ইন্দ্রকুমার গুজরাল (পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী)।' প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক নুরুল হাসান (বর্তমানে প্রয়াত) শিক্ষার ওপর পার্লামেন্টে একটি ভাষণ দেন। তাঁকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন হীরেন মুখার্জি। জবাবে অধ্যাপক হাসান একটু হেসে বললেন, 'আমার একটু দুর্বলতা আছে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি সম্পর্কে। ফলে আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি না।'

২

হীরেনবাবু সম্পর্কে গৌতম নিয়োগী একবার লিখেছিলেন, হীরেনবাবু বাংলার মেধা। আমি বলি, তার ওপরেও যদি কিছু থাকে তাকে বলে মনীষা। আর যার সেই মনীষা থাকে সেই ব্যক্তিকে বলে মনীষী। হীরেনবাবু মনীষী।

ভারতে প্রথম প্রগেসিভ রাইটার্স কনফারেন্স করেছিলেন হীরেনবাবুই—১৯৩৬ সালে। সেই সম্মেলনে বাংলার সে সময়কার বিখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক যাঁরা ছিলেন তাঁদের সবাইকে জড়ো করেছিলেন। যেমন কবি বিষ্ণু দে, হিরণ সান্যাল, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের শুধু জড়ো করেছিলেন তা নয়, প্রগতিশীল লেখক সংঘের কাজে তাঁদের লাগিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (Friends of the Soviet Union) গঠন করেন। কম-বেশি যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের সাফল্য কামনা করেছিলেন তাঁদের সবাইকে সমবেত করেন এতে। প্রগতি লেখক সংঘ ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির জন্য প্রচারে তিনি সারাভারত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। আই পি টি এ-র জন্মের সময় প্রথম সম্মেলনে তিনি সংস্কৃতি জগতকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা তুলে ধরছি—Writers, artists, actors and dramatists of the Country ! Unite. Endeavour to bring out the best in yourselves and dedicate the same for the benefit of the country.

তাঁর পার্টিজীবনের কথা খুব কম লোকই জানেন। আমার দুর্ভাগ্য কী সৌভাগ্য জানি না—সি পি আইয়ের জন্মকাল থেকে বেঁচে আছি। কে কী করেছে, না করেছে তার একটা হিসাব আছে। ১৯৪৮ সালে সি পি আইয়ের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আগে (১৯৪৭-এর অক্টোবরে) অবিভক্ত বাংলার শেষ যুক্ত প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডেকার্স লেনে পার্টি দপ্তরের ছাদে ম্যারাপ বেঁধে। পূর্ব পাকিস্তানের মণি সিং, খোকা রায়, কৃষ্ণবিনোদ রায়, নেপাল নাগ প্রমুখ যোগ দেন। কিন্তু নতুন যে কমিটি হল তা থেকে তাঁদের বাদ রাখা হল কারণ তখন ভারত ভাগ হয়েছে। নতুন কমিটিতে যাঁদের নেওয়া হল তাঁরা হচ্ছেন সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, নৃপেন চক্রবর্তী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি, রণেন সেন, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, স্নেহাংশু আচার্য, জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত, মুজাফ্ফর আহমদ, আব্দুল হালিম, আব্দুর রেজ্জাক খান, আব্দুল্লা রসুল, বঙ্কিম মুখার্জি, মণিকুন্তলা সেন, জলি কল, মনসুর হবিবুল্লাহ,

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ। সম্পাদক নির্বাচিত হই আমি।

হীরেনবাবু সেই প্রথম পার্টি নেতৃত্বে যুক্ত হলেন। তার আগে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তার আগে তিনি ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিটে (লেনিন) একটা বাড়ি নিয়ে রীতিমতো একটা জমজমাট আড্ডা বসিয়েছিলেন। সেখানে ড. ভূপেন দত্ত থেকে শুরু করে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্প ও কলারসিকরা নিয়মিত আসতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক দেশ আক্রান্ত হল বা আক্রমণের মুখে এসে দাঁড়াল তিনি anti-fascist writers Conference গড়লেন। তার সভাপতি করলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে, এই ছিল হীরেনবাবুর সাংগঠনিক কায়দা—যাকে দিয়ে যতটুকু করানো যায় তাকে সেভাবে কাজে লাগাতেন।

হীরেনবাবু সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলা যায়। ১৯৪৮-এ যখন পার্টি বেআইনি হল, তখন গোপনে পার্টি কেন্দ্র ও প্রকাশ্যে পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করতেন হীরেনবাবু ও চিন্মোহন সেহানবীশ। এরকম একজন মনীষী কমিউনিস্ট প্রকাশ্য পার্টিকর্মীদের খবরাখবর গোপন কেন্দ্রে পৌঁছে দিতেন এবং গোপন কেন্দ্রের নির্দেশ তিনি প্রকাশ্যে কর্মরত কর্মীদের কাছে নিয়ে আসতেন। প্রকাশ্য কর্মীদের মধ্যে ছিলেন গোপাল হালদার, অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত প্রমুখ। এই যোগসূত্র রক্ষা কত কঠিন কাজ ছিল তা এখনকার কমরেডদের বোঝা সম্ভব নয়। তবে ঐ কঠিন কাজ নিষ্ঠা সহকারে করেছেন হীরেনবাবু। আর এই কাজের জন্য হীরেনবাবু ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন এবং এগারো মাস প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। তিনি হেবিয়াস কর্পাসে ছাড়া পান। ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের জজরা মন্তব্য করেন—এত বড় একটা পণ্ডিত লোক ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকবেন বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা ওকে মুক্ত করার আদেশ দিচ্ছি।

১৯৫২ সালে লোকসভা নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী হলেন হীরেন মুখার্জি। হীরেনবাবু সে সময় প্রকাশ্য জনসভায় যে ভাষণ দিতেন তাও ছিল রীতিমতো আকর্ষক। আরও কয়েকটা কথা বলি। হীরেনবাবু যতদিন দিল্লি ছিলেন তিনি বহু ইংরেজি বই লিখেছেন। তাঁর বই ছাপবার জন্য পিপলস্ পাবলিশিং হাউস উন্মুখ হয়ে থাকত। হীরেনবাবুর আশি বছর বয়সে নিউ এজ পত্রিকা সংবর্ধনা জানিয়ে লিখেছিল—কমরেড হীরেন বাবু আরো দীর্ঘজীবী হোন। এতে নিউ এজ তাঁর লেখায় সমৃদ্ধ হবে। তার মাত্র একটি বই উল্লেখ করছি রবীন্দ্রজীবনী—'Himself a True Poem'। এই বইটি পড়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ বি ডি কেশকার বলেছিলেন—হীরেন মুখার্জির বই পড়েই আমরা রবীন্দ্রনাথকে জানতে ও চিনতে পারলাম। ষাটের দশকে অমল হোম সম্পাদিত Golden book of Tagore উদ্বোধন করেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই সভায় পণ্ডিতজীর অনুরোধে হীরেনবাবু রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো কবিতার ইংরেজি করে শোনান। তাঁর রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি সমবেত সবাইকে চমকে দিয়েছিল।

১৯৪৮-এ সি পি আইয়ের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পার্টির সাধারণ সম্পাদক লরেন্স সার্কি। তিনি গ্রেট বৃটেন কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিযুক্ত করে বলেন—They all behaving like imperialists. হীরেনবাবু একটু

আবেগপ্রবণ। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন—We are contemplating the posterior of a party, known as. the CPGB. হীরেনবাবু ওই কথার অর্থ তখন অনেকেই বুঝতে পারেননি। আমিও পারিনি। পরে হীরেনবাবুকে বলি, 'আপনি যা বললেন তার মানে তো বুঝলাম না।' হীরেনবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'আসলে আমি সি. পি. আইকে, সি পি জি বি-র লেজ্‌ড় বলেছিলাম।' আমি বললাম, 'আপনি রজনীপাম দত্তের অবদান ভুলে গেলেন!' হীরেনবাবু বললেন, 'উত্তেজনার মাথায় ওসব বলে ফেলেছি।'

কেউ কেউ অভিযোগ করেন হীরেনবাবুর মতের স্থিরতা নেই। তিনি মার্শাল টিটো, মাও-সে-তুঙয়েরও ভক্ত ছিলেন। আমার বক্তব্য, তখন তো তাঁরা কমিউনিস্ট দুনিয়ায় খুবই সমাদৃত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সে সময় কমিউনিস্ট ও মুক্তিকামী মানুষদের কাছে নায়ক। অতএব হীরেনবাবু কি তার চাইতে বেশি তাঁদের সমাদর করেছেন? হীরেনবাবু কি কোনোদিনও ট্রটস্কির ভক্ত ছিলেন? কখনোই না। তাঁর জীবন মার্কসবাদ ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিল। যেদিন ওয়ারশ্‌ প্যাক্ট বাহিনী ১৯৬৮-তে চেকোশ্লোভাকিয়ায় নেমে পড়ে, তখন ভারতের বহু কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী প্রকাশ্যে তার নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হীরেনবাবুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করে বলেছিলেন—'সোভিয়েত তার ট্যাংক না নামালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হীরেনবাবুর অবস্থান সর্বদাই স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন।

৩

আমি একটানা তিন তিনবার এম পি (লোকসভার সদস্য) ছিলাম। সেই সুবাদে পার্লামেন্টে হীরেনবাবুর বাগ্মিতা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে পারি। ১৯৭০ সাল। তখন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সেই সংগ্রামের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তখন সর্দার শরণ সিং ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি একটা বক্তৃতায় বললেন, 'ওরা বাঙলাদেশি। আমাদের সঙ্গে বাঙলাদেশিদের পার্থক্য আছে।' তখন হীরেন মুখার্জি স্মরণীয় বক্তৃতা দেন। তিনি বলেছিলেন, They belong to our flesh, they belong to our flesh, they belong to our heart. We are the same people we call Punjabis–not east Punjabi or West Punjabis. We do not call them East Bengalees, West Bengalees—we are Bengalees. সেই ভাষণ সারা দেশে ঢেউ তুলল। কাগজে কাগজে ফলাও প্রচার পেল। দিল্লিতে বাঙলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা আহ্বায়ক সমিতির মিটিং ডাকা হল। বক্তা হীরেন মুখার্জি। সেন্ট্রাল পার্কে থিক থিক করছে লোক। হীরেনবাবু বললেন, সেদিন লোকসভায় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। এখন আমার কোনো উত্তেজনা নেই। তবে এটা ঠিক আমরা দু বাঙলার মানুষই বাঙালি।'

প্রসঙ্গত আরেকটা কথা বলি—লোকসভায় যেদিন হীরেনবাবু বক্তৃতা দিতেন সেদিন প্রেস গ্যালারি, ভিসির্টস গ্যালারি ভর্তি হয়ে উপছে পড়ত। ইংরেজিতে ও-রকম ভাষণ জওহরলাল নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ছাড়া আর কেউ দিতে পারেতেন না। তখন ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ চলছিল। হীরেনবাবু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তিকামী জনগণের লড়াইয়ের বিবরণ দিচ্ছিলেন। স্তব্ধ হয়ে হাউস শুনছিল, 'তোমরা জান

কিনা জানি না—অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ওরা মাটির তলায় চলে যায়। সেখানে চলে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ। অস্ত্রনির্মাণ। ওদের শত চেষ্টা করেও মার্কিনরা হারাতে পারবে না। দেখে নিও ওরা জয়ী হবেই।' হীরেনবাবুর সে প্রত্যয় অভ্রান্ত ছিল—১৯৭৫-এ ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধে জয়ী হয়। পর্যুদস্ত হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

ষাটের দশকের আরেকটা ঘটনা উল্লেখ করছি। তখন সাংবাদিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য সাংসদ ছিলেন। তিনি ছিলেন নৈহাটি ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ। সংস্কৃতে জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর এক গরিমা ছিল। একবার অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে চপলাকান্ত ও হীরেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে বাগযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হীরেনবাবুর সুললিত সংস্কৃতে উচ্চারণ সভাকে চমকে দেয়। মহারাষ্ট্রের এক সাংসদ এসে হীরেনবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—'আমাদের পরিবারে সংস্কৃতের চল আছে। খাটি সংস্কৃত আপনিই জানেন।'

আমরা পার্লামেন্টে যখন একসঙ্গে ছিলাম তখন হীরেনবাবুর সঙ্গে অতটা খাতির ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হীরেনবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে হীরেনবাবুকে লিখতাম। উনি 'বন্ধুপ্রতীম রণেনবাবু' বলে সম্বোধন করে জবাব দিতেন ও এখনও দেন। যে সব জায়গায় তিনি আর আমি মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে যেতাম তিনি পরিচয় করিয়ে দিতেন, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কমরেড সেন তাঁদেরই একজন। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল একবার সিনেমা কর্মীদের এক সম্মেলনে। আমি তখন ভবানীপুরে থাকি। তিনি বি এম পি ইউ-র সভাপতি (এখনও আছেন)। সিনেমা কর্মীরা হীরেনবাবুকে বলেন, আপনি রণেনবাবুকে বক্তৃতা দিতে বলুন। তাঁর কথায় আমি তাঁদের সভায় এসেছিলাম। হীরেনবাবু যেভাবে আমাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করালেন আমি একটু সংকুচিত বোধ করছিলাম।

আজ হীরেনবাবু পার্টির কাজে ততটা সক্রিয় নন শারীরিক কারণেই। আমারও একই দশা। কিন্তু দুর্বল হাতেও তিনি শক্তভাবে লালঝাণ্ডা কিন্তু আঁকড়ে আছেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মার্কসবাদী চিন্তনকে একসূত্রে বাঁধতে পেরেছেন। এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। পূর্বতন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গর্বাচভের ওপর আমাদের পার্টির বিশ্বাস ছিল। প্রথম দিকে আমারও কিছুটা দ্বিধা ছিল। কিন্তু হীরেনবাবুর একদিন এক মুহূর্তের জন্য গর্বাচভের প্রতি মোহ ছিল না। গর্বাচভের হাতেই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সি পি এস ইউ-র পতন ঘটল। অনেকেরই মোহভঙ্গ হল। আমিও বুঝলাম কী সর্বনাশ হয়ে গেল। এটা চোখে আঙুল দিয়ে সবার আগে দেখিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কয়েকবছর আগে—১৯৯৫-এ—ন্যাশানাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয় একখানি বই 'The Stalin legacy Ivory 'flawed but Ivory Still' আমাকে উপহার দেন। তাতে স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন—বহুদিন বহু বিচিত্র সহচর সহকর্মী সুহৃৎ পার্টি বিভাগের বেদনায় গর্ভবতী প্রতিবিপ্লবের যন্ত্রণায় সব্যসাচী কমরেড রণেন সেনকে।

আমি মাঝে মাঝে বইয়ের ওই পাতাটা উল্টে ওই কথাগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিই। এক কমরেড আরেক কমরেডকে এর চেয়ে বড় উপহার আর কী দিতে পারে

(পবিত্রকুমার সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচনাটি তৈরি করা হয়েছে।)

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক প্রত্যয়ী পথিকের জীবনবৃত্ত

গৌতম নিয়োগী

আগামী নভেম্বর মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার জন্মাবধি সুহৃদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছিয়ানব্বই বছর পূর্ণ হবে এবং এমন একজন দীর্ঘায়ু মানুষের জীবনবৃত্ত স্বাভাবিক কারণেই সুদীর্ঘ, অন্তত একটি প্রবন্ধের পরিসরে সেই জীবনবৃত্ত রচনা করার দায়িত্ব পালন কঠিন, তবু কঠিন জেনেও সেই কাজে হাত দিতে সম্মত হয়েছি দুটি কারণে। একদিকে 'পরিচয়' পত্রিকাগোষ্ঠীর স্বজনদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং অন্যদিকে স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, স্নেহ ও প্রশ্রয়। অকৃপণভাবে ও দরাজ মনে সব সময়েই যে-কোনও জিজ্ঞাসায় তাঁর উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা আমার কাছে সম্পদ। মনে পড়ছে, আমরা যারা তাঁর অনুরাগী ও গুণগ্রাহী তারা এই সুদীর্ঘকালেও সন্তুষ্ট নই এবং সে কথা ভেবেই, বিগত ৯৫তম জন্মজয়ন্তীতে, 'কালান্তর' পত্রিকায়, ২০০২-এর ২৩ নভেম্বর লিখেছিলাম এক গদ্য, যার শিরোনাম " 'অল্পে সুখ নেই', হীরেন্দ্রনাথ শতায়ু হোন।" কিঞ্চিৎ ভাবাবেগ থাকলেও হয়তো কিছু প্রয়োজনীয় কথাও ছিলো, যে-কারণে, ঐ 'কালান্তর' দৈনিকের পৃষ্ঠাতেই ৩০ নভেম্বর—১ ডিসেম্বর এক লেখায় হীরেন্দ্রনাথ নিজেই আমার লেখাটির উল্লেখ করেছিলেন, 'ভালোবাসার অত্যাচারের' নিদর্শন হিসেবে। আজও, এই জীবনী লিখতে গিয়েও চাইব তিনি শতায়ু হোন, কারণ এমন মননের মধ্যে বেঁচে থাকা সর্ব অর্থেই বিরল। নিজের আত্মকথা হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'তরী হতে তীর' বইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত, যদিচ এটিকে আত্মজীবনী বলতে তিনি নারাজ, এটি 'পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত,' তবু আমি তা বাড়িয়ে ২০০৩ পর্যন্ত আনলাম, পরে না হয় ২০০৭ পর্যন্ত করা যাবে।

মধ্য কলকাতার ওয়েলিংটন (অধুনা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)-এর কাছে তালতলা অঞ্চলে এক বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারে, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্লনলিনী মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ সন্তান হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর। ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্য তাঁর জন্মগত; পাণ্ডিত্য, রসবোধ আর বিশুদ্ধি তাঁর সহজাত; তবে জীবনপথে অনেক স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের পর্যায়কে অতিক্রম ক'রে, প্রত্যক্ষভাবে পরিবেশ-পথ পার হয়ে আজও এক প্রত্যয়ী পথিক তিনি। এই দৃঢ় প্রত্যয়ে অবিচল আস্থা রাখার কারণে জাগতিক দুর্দশা আর চিত্তের নৈরাশ্যকে অপরাজেয় আশাবাদের আলোকে দূরে সরিয়ে রাখার দৃষ্টান্তে, নতুন চিন্তা-ভাবনায় মনকে এখানেও তীক্ষ্ণ ও সঞ্চরমান রাখার দীপ্তিতে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আজও দেদীপ্যমান। তাঁর জীবনবৃত্ত আমাদের মতন অজস্র মানুষকে প্রাণিত করেছে, করছে করবে।

আদি বাড়ি ছিলো উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরে, মাতুলালয় হুগলি জেলার উত্তর-

পাড়ায়। পিতামহ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং মাতামহ রাধিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়। শচীন্দ্রনাথ-প্রফুল্লনলিনীর দশ পুত্রকন্যা। যথাক্রমে সোমেন্দ্রনাথ, মল্লিনাথ, রেণুকা, হীরেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, অমিয়নাথ, নীলিমা, শান্তিনাথ এবং বলেন্দ্রনাথ। সাত ভাই তিনবোনের মধ্যে চতুর্থ হীরেন্দ্রনাথ। উনিশ শতকের ষাটের দশকে তাঁর পিতৃব্যের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন পিতামহ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনিই কর্মজীবনে হালিশহর ছেড়ে কলকাতায় বাড়ি করেন মট লেন-এ, যে রাস্তার পরে নাম হয় 'ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট'। এখানে জন্ম হীরেন্দ্রনাথের। তাঁর নিজের ভাষায় 'কলকাতায় জন্মেছি, মানুষ হয়েছি'।

হ্যাঁ, মানুষ তো বটেই। মানুষের মতো মানুষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এক মেধাবী ছাত্র, জমকালো তাঁর রেজাল্ট, যার ফলে সহজেই বিলেত যাত্রা, অথচ উচ্চ শিক্ষালাভ করে দেশে ফিরে মামুলি আইনজীবীর অর্থ ও খ্যাতিলাভের পথে না গিয়ে অধ্যাপনা বৃত্তি গ্রহণ, উত্তরকালে যশস্বী অধ্যাপক, ১৯৩৬-তেই বেআইনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান, ক্রমে বামপন্থী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী এবং নেতা হয়ে ওঠা, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় অসাধারণ বাগ্মিতা অর্জন, স্বাধীন ভারতে লোকসভায় নির্বাচনে পর পর পাঁচবার বিজয়ী হওয়া এবং সাংসদ হিসেবে প্রত্যেকের শ্রদ্ধা ও সম্মানলাভ, অজস্র প্রবন্ধ ও বহু সুলিখিত গ্রন্থ রচনা (বাংলা-ইরেংজিতে) মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষায় দীক্ষিত হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল থাকায় হীরেন্দ্রনাথ অনন্য। মেধা ও মননে তাঁর বিশিষ্ট আসন আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে। তবে তিনি আদ্যন্ত কলকাতার। সেই পুরোনো কলকাতার এক নিজস্ব মেজাজে আঁকা ছবি দেখতে দেখতে আমরা মুগ্ধ হই 'তরী হত তীর' পড়তে পড়তে।

মট লেন হল ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, যে পত্রিকার নামে, তা একদা বের করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা। কেশবচন্দ্রের এক ভাই নরেন্দ্রনাথ সেন দীর্ঘদিন ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাঁদের বাড়ি ঐ পাড়ায়। ঐ পাড়ায় আর এক বিখ্যাত মানুষ পূরণচাঁদ নাহার, যাঁর পূর্বপুরুষরা সিরাজউদ্‌দৌলার আমল থেকেই যথেষ্ট ধনী ছিলেন মুর্শিদাবাদে, অথচ কলকাতায় এসে তালতলায় এই জৈন পরিবারের পূরণচাঁদ ছিলেন যথার্থ সংস্কৃতিমান, তাঁর পুত্র উত্তরকালের কংগ্রেস নেতা বিজয়সিং নাহার। হীরেন্দ্রনাথের পিতা শচীন্দ্রনাথ ছিলেন কৃতবিদ্য। অল্পকাল শিক্ষকতা করলেও, আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও আজীবন সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতা করে কাটিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গ লী' কাগজে যুক্ত ছিলেন, পরে 'ইন্ডিয়ান মিরর' কাগজেও।

বাবা শচীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ হীরেন্দ্রনাথের। আর মা-কে তাঁরা সব ভাই-বোন মিলে ডাকতেন 'মামী' বলে। আসলে তিন পিসতুতো দাদা ও এক দিদি তাঁদের মামিমাকে মামী ডাকতেন একই বাড়িতে থেকে, হীরেন্দ্রনাথও তাই। বাড়ির কর্ত্রী ঠাকুমা। তাঁকে সবাই 'মা' বলে ডাকে। ঠাকুরদা তিনকড়ির বিদ্বান বলে খ্যাতি ছিল। পাড়ায় তাঁরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার। তবে ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন পরিবেশে ব্রাহ্মণত্বের অহংকার ছিলো না। ছিলো পড়াশুনোর পরিবেশ। সে কথা স্মরণ করে স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি

আমাদের বাড়ি বোঝাই বই—এমন ঘর ছিল না যেখানে বই থাকত না, এমন ফাঁকা কোণ ছিল না যেখানে বই আর কাগজের ডাঁই মিলে তাকে ভরাট করে রাখত না। নানান রকম পত্রিকা, দৈনিক থেকে মাসিক বা অন্যকিছু থাকত চারিদিকে—কিছু কাগজ যত্ন করে 'ফাইলে' বেঁধে রাখা, আর অজস্র কাটিং। সাংবাদিকতায় আমাদের ঊর্ধ্বতন দুই পুরুষ বহু বৎসর ডুবে ছিলেন বলে শুধু নয়—বইকে আপদ না ভেবে তার সম্পর্কে একরকম মায়া আর লেখাপড়ার আমেজ যেন বাড়ির আলোবাতাসে মিলিয়ে থাকত।"

তবে এই তো সব নয় বাড়িতে বাস করতেন অনেকেই। উড়িষ্যাবাসী বংশী ঠাকুর থেকে সপরিবারে বিহারের রামধারী; পাড়াতেও বাস ছিল মালকাজান নামে এক বিখ্যাত বাঈজি আর কয়েকঘর ফিরিঙ্গীর। শৈশব আর কৈশোর কাটিয়ে দেবার স্মৃতি নিজেই লিখেছেন তিনি সুতরাং বাড়তি কথা বাগাড়ম্বর হবে। কিন্তু দু'একটি কথা বলতেই হবে। যেমন মামা-বাড়ি উত্তরপাড়ার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়নি। মায়ের মামা-বাড়িও উত্তরপাড়াতেই। বড়ো মামা উত্তরপাড়ার লোক, থাকতেন মেদিনীপুরের তমলুকে, ওকালতি করতেন। তাঁরই পুত্রদ্বয় পরে অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নামে স্ব-নামখ্যাত হয়েছেন। সম্পর্কে আর এক মামা ছিলেন উত্তরপাড়ার আর এক জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। হীরেন্দ্রনাথের পিসির বাড়ি ছিলো টালা অঞ্চলে।

হীরেন্দ্রনাথের বাবা ঊনষাট বছর পূর্ণ হবার আগে মারা যান (১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে) মাকে হারান আরো পঁচিশ বছর পর ১৯৬৩-তে। ছোটবেলায় ছিলেন ঠাকুরমা আর ঠাকুরদার প্রিয় পাত্র। বাড়ির আবহাওয়ায় ধর্ম ছিলো, গোঁড়ামি ছিলো না। তাঁর উপনয়নও হয়েছিল এবং তাঁকে এসে ব্রতভিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ। বারো বছর বয়স থেকেই চোখে চশমা। বাড়ির কাছাকাছি যে দুটো স্কুলের সঙ্গে মুখোপাধ্যায় পরিবারের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিলো, তা হলো শাঁখারিতলা পাড়ায় নেবুতলা স্ট্রিটে (= শশিভূষণ দে স্ট্রিট) নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ক্যালকাটা হাইস্কুল, যে স্কুলে হীরেন্দ্রনাথের পিতা কিছুদিন হেডমাস্টারি করেছেন আর ছিলো ডাক্তার লেনে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের তালতলা হাইস্কুল, যে স্কুলে হীরেন্দ্রনাথ ভর্তি হন ১৯১৫-তে, তখনকার 'সেভেন্থ ক্লাসে' (= এখনকার ক্লাস ফোর)। এই স্কুলের শিক্ষক হরিপদবাবু, নিরাপদবাবু, হেডপণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, জিতেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখকে তাঁর মনে পড়ে পরিণত জীবনেও।

তালতলা স্কুলে পড়েছিলেন ১৯১৫ থেকে ১৯২১ এবং ১৯২২-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন। পাঁচটি বিষয়ে লেটার পেয়ে প্রথম ডিভিশনে পাস করলেন, দশ টাকা 'স্কলারশিপ্'ও পেলেন। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "স্কুলে কিন্তু আমার দুর্নাম ছিল অঙ্ক পারি না। অথচ ইতিহাসের ক্লাসেই পরদিনের পড়া মুখস্থ হয়ে যায়। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়েও বেশ সড়গড়।" বিদ্যালয় জীবন থেকে সাহিত্য সংগীত আর খেলাধূলায় তাঁর অনুরাগ। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁর হাতে-খড়ি হয়নি ঠিকই কিন্তু দেশের পরিবেশটাই তো যে-কোনও সচেতন ছাত্রকে তখন দেশাভিমানী করে তুলত। স্কুলেই তাঁর দুজন মুসলমান সহপাঠী ছিলো বলেই নয়, তালতলার স্কুলজীবন থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে তিনি সহজ হয়ে উঠতে পেয়েছিলেন চেতনার গুণেই।

আর একটি লেখার অংশ "আমার যখন দশ বছর বয়স, তখন আমাদের বাড়ির খুব কাছে ওয়েলিংটন স্কোয়ার (বর্তমানে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কংগ্রেসের অধিবেশন হয় (ডিসেম্বর ১৯১৭)। সভানেত্রী ছিলেন অ্যানি বেসান্ত। মনে আছে, মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে আসতে তাঁর দেরি হয়েছিল। হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁকে আনা হয়েছিল যে মিছিলে তা আমি দেখেছিলাম, আর কংগ্রেসের গেটের সামনে ভিড় থেকে চাক্ষুষ প্রথম দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে. চারিদিকে রব উঠল 'রবি ঠাকুর! রবি ঠাকুর'।"

তাঁর নিজের সাক্ষ্য অনুসারে '১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে আলোড়নের কথা খুব স্পষ্ট দাগ মনে কেটেছিল কিনা জানি না'। তবে 'গান্ধীজীর কল্যাণে মনের দিক থেকে নতুন দিগন্ত খুলে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল ১৯২০ সালে।' তাঁর বাড়ির কাছেই আবার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হলো ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, ১৯২০-র সেপ্টেম্বর মাসে। সভাপতি লালা লাজপত রায়। যখন নাইনে পড়েন তখন বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু। ১৯২১-এ বিলেত থেকে ফিরেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র বসু। তবে সর্বোপরি ছিল 'গান্ধী জাদু'। যেমন রাজনীতি নয়, সাহিত্য আর সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়েই মনের জানালা খুলে নিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। তাঁর দাদুর হাত ধরে 'বসুমতী' অফিসে যেতে যেতেই, বিদ্যালয় পর্বেই।

অসহযোগ হলো, গান্ধীজী তা প্রত্যাহারও করলেন অথচ স্বরাজ এলো না। তারই মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশনের পালা সেরে হীরেন্দ্রনাথ ঢুকলেন কলকাতার সেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে। বছরটা ১৯২২। তিনি কলেজে ঢুকেছিলেন ৭০০-র মধ্যে ৫৮৫ নম্বর পেয়ে তবে আই. এ (=ইন্টার মিডিয়েট অফ আর্টস্) পড়তে গিয়ে তাঁর যার সঙ্গে খুব ভাব হলো সে পনেরো টাকার জলপানি পেয়ে এসেছে। পেয়েছে ৭০০-র মধ্যে ৬০১, তাঁর নাম হুমায়ুন জহীরউদ্দীন কবির। পরে আরও অনেকের সঙ্গে, যেমন ঢাকা থেকে থেকে আসা পঞ্চানন চক্রবর্তী বা অরুণকুমার সেনের সঙ্গে ভাব হয়। আড্ডা চলত শচীন বসু মল্লিক, রবি গুপ্ত, তুষারকুমার রায় প্রমুখের সঙ্গে। প্রিন্সিপাল জন ব্যারো যাঁর সম্পর্কে সকলের একটা সমীহ করার ভাব ছিলো। সাহেব অধ্যাপকদের মধ্যে ইংরিজি পড়িয়েছেন অধ্যাপক স্টার্লিং। তবে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন "সাহেবদের চেয়ে স্বদেশী অধ্যাপকদেরই তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে নাম ডাক ছিল বেশি। ইতিহাসে কুরুভিলা জ্যাকারিয়া, দর্শনে আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রভুদত্ত শাস্ত্রী, ইংরিজীতে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থনীতিতে জাহাঙ্গীর কয়াজী ও পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান বিভাগে সুবোধচন্দ্র ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—আরো বহু কৃতবিদ্য যাঁদের তালিকা দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই ১৯২৪ সনে আই. এ। ১৯২৬-এ হিস্ট্রি অনার্স সহ বি. এ এবং ১৯২৮-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে যুক্ত থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ (ইতিহাস) পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন হীরেন্দ্রনাথ। এ বার সেই ছাত্রজীবনের কাহিনি অল্প-কথায় বলি। হীরেন্দ্রনাথ যাঁদের কাছে আই. এ ক্লাসে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে অল্প দিন হলেও ছিলেন কুরুভিলা জ্যাকারিয়া (ইতিহাস) আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় (লজিক), নীলমণি শাস্ত্রী, হরিহর

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সংস্কৃত) বীরেন্দ্রবিনোদ রায় (ইংরিজি) প্রমুখ অধ্যাপক ছিলেন। কলেজ বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়াও নিশীথ ঘোষ, নন্দ কুণ্ডু, মৃগাঙ্ক চৌধুরীর মতো স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গেও আড্ডা চলত।

ঐ সময় হীরেন্দ্রনাথ নিরামিষাশী হয়েছিলেন। বছর পাঁচেক খদ্দরের জামা-কাপড় পড়তেন। হয়তো গান্ধীর প্রভাব কিন্তু বিড়ম্বনাও বাড়িতে কম হত না। বন্ধুরা দল বেঁধে মোহনবাগানের ফুটবল খেলা দেখতে যেতেন, যে অভ্যাস বহু পরেও বজায় রেখেছিলেন। তাঁর মনে গান্ধীজী কতখানি প্রভাব ফেলেছিল, তা বোঝা যায় আমেরিকান পাদরি John Haynes Holmes-এর উক্তি খাতায় টুকে রাখার মধ্যে। তখন, ১৯২৩ কী ২৪ হবে, তাঁদের কলেজে যেদিন এলেন 'বিদ্রোহী' কবি নজরুল, তখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে আপ্লুত হয়ে গেলেন হীরেন্দ্রনাথ।

আই. এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে হলেন প্রথম। ইংরিজিতে তিনশোর মধ্যে দুশো পঁচিশ পেয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন তিনজন, হুমায়ুন কবির, পঞ্চানন চক্রবর্তী আর হীরেন্দ্রনাথ; ইতিহাস ও লজিকে হীরেন্দ্রনাথই প্রথম, সংস্কৃতে কলেজ সর্বোচ্চ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়। হীরেন্দ্রনাথের আরও দুই সতীর্থ ছিলেন আতাউর রহমান এবং শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আই. এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যে প্রথম হওয়ায় হরিশচন্দ্র কবিরত্ন 'প্রাইজ' পান; সেই টাকায় কেনা বইয়ের মধ্যে ছিলো প্রায় সদ্য-প্রকাশিত ইতিহাসবিদ কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের লেখা Hindu Polity আর ম্যাকডনেল-কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। এছাড়া পেয়েছিলেন ডাফ পদক, অন্য স্বর্ণপদক।

বি.এ-তে অনার্স নিলেন ইতিহাসে। আমরা চারযুগ পরে ইতিহাস পড়েছি তবু তাঁর ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে খ্যাতি অপরিম্লান দেখেছি। তিনি অবশ্য স্বভাবসুলভ বিনয়ে 'এ-আর কি, দ্রুত কণ্ঠস্থ করতে পারতাম, জায়গা বুঝে মোক্ষম উদ্ধৃতি দিতাম আর ইংরিজি লেখার হাত ভালো ছিলো' বলে হাসেন কিন্তু আমরা জানি তাঁর কৃতিত্বের কথা।

'নিজের প্রতি অবিচার করব না বলেই সঙ্গে সঙ্গে বলব যে ইতিহাস বিষয়ে একটা গভীর অনুরাগ যথাসাধ্য মনে জেগেছিল', স্বীকারোক্তি তাঁর। নইলে এত বিষয় থাকতে 'হিস্ট্রি' কেন বেছে নেবেন। বি.এ অনার্স ক্লাসে তাঁদের পড়াতেন কুরুভিলা জ্যাকারিয়া। কেরল দেশীয় যে সিরিয়ান খ্রিস্টান পণ্ডিতের কথা অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের মুখে আমরা অনেক শুনেছি। আরও ছিলেন বিনয়কুমার সেন, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। চরিত্র মাধুর্যে ও পাণ্ডিত্যে সকলেই শ্রুতকীর্তি। তবে জ্যাকারিয়ার 'ভক্ত' বনে গিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। ইতিহাস ছাড়া অন্য বিষয়ের মধ্যে অর্থনীতিতে দুর্গাপতি চট্টরাজ, ইংরিজিতে প্রবাদ-প্রতিম প্রফুল্ল ঘোষ ও বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। মন কেড়ে নিয়েছিলেন প্রফুল্লবাবু আর অবশ্যই জ্যাকারিয়া যাঁর সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথের নৈবেদ্য "আমাদের এই মৃদুবাক্ ঋজুচিত্ত অধ্যাপকের সান্নিধ্য আমার জীবনে এক মহার্ঘ অভিজ্ঞতা। এত ভালো ইংরিজী বলতে এবং লিখতে অন্য কোনো ভারতীয়কে আমি দেখেছি মনে হয় না। অতি অল্প যে কজন ভারতীয় অক্সফোর্ডে ইতিহাসে 'ফার্স্ট ক্লাস্' পেয়েছেন, তিনি তাদের অন্যতম।"

ইতিহাস অনার্স পরীক্ষা দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সি কলেজের

ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে শুধু ইতিহাস নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে গণিত সমেত সবকটা বিষয়ে যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে বহু-ঈপ্সিত 'ঈশান স্কলারশিপ' পেলেন তিনি। ইতিহাসের মতো বিষয়ের পক্ষে গণিত বা সংস্কৃতকে টেক্কা দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। পরে অবশ্য শুধু অনার্স সাবজেক্টগুলির মধ্যে এই বৃত্তি পাওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে ইতিহাস অনার্স নিয়ে পড়েও প্রবাদ-প্রতিম বিদ্বান হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বা উত্তরকালে শিপ্রা সরকার বা অশীন দাশগুপ্ত এমন গৌরব অর্জন করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিলেন শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন।

বি. এ পরীক্ষায় শুধু ঈশান বৃত্তি নয়, বর্ধমান স্কলারশিপ, ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ (স্বর্ণপদকসহ) পান তিনি। ১৯২৬-এ বি. এ পাস করে ইতিহাসে এম. এ পড়া শুরু করলেন। এম. এ পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম (১৯২৮ খ্রি.)। বলার মতো হলো আটটি পেপারে প্রতিটি পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া। এম. এ ক্লাস হত ইউনিভার্সিটির দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে তবে 'টিউটোরিয়াল' হত কলেজে। বলতে ভুলে গেছি, ঈশান বৃত্তির টাকা পেয়েছিলেন চারশো আশি, তাতে অনেক বই কিনেও বেড়াবার টাকা ছিলো। বন্ধু হুমায়ুন কবিরকে সঙ্গে নিয়ে উড়িষ্যা ভ্রমণের অনেক গল্প তাঁর মুখে শুনেছি, তার মধ্যে নাম গোপন করে হুমায়ুন কবিরের পুরীর মন্দির দর্শনের গল্পও। পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপকদের মধ্যে পেলেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হেমচন্দ্র রায়, আই জে এস তারপুরওয়ালা, কালিদাস নাগ, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খুব অল্প সময়ের জন্য সদ্য বিলেতফেরত সুশোভনচন্দ্র সরকারকে। এঁদের কথা বিস্তারিত লিখতে গেলে রচনার আয়তন বেড়ে যাবে তাই বিরত থাকলাম।

১৯২৭ সনেই প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিনিধিরূপে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পান। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচিত সেক্রেটারি (১৯২৬-২৭); কলেজ 'ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদক (১৯২৭-২৮), যে পত্রিকায় তিনটি ইংরিজি ও একটি বাংলা অনুবাদ ছাড়া ম্যাগাজিন সম্পাদকরূপে তিনটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ হলো হীরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা।

এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক, পুস্তক পারিতোষিক ইত্যাদি তো পেয়েছিলেন, পেলেন ১৯২৮-২৯-এ বাংলা সরকারের 'স্টেট স্কলারশিপ'। পড়তে যান 'ইংল্যান্ডে। হীরেন্দ্রনাথ রওনা হন ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে, যাকে বলে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা। সেবার স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ড যান তাঁর আরও এক সতীর্থ হুমায়ুন কবির। এখানে একটা কথা বলে নিই—এম. এ পাশ করার পর হাতে কিছুদিন সময় ছিলো। সেই ফাঁকে দু-জন অনার্স ছাত্রকে মাস তিনেক পড়িয়ে কিছু রোজগারও করে নিয়েছিলেন। এই দুজনের একজনকে সবাই চেনেন। উত্তরকালে মারাঠা ইতিহাসের একজন অগ্রণী গবেষক ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। এম. এ পাস করে বিদেশ যাওয়ার আগে মনে লেগেছে দেশাত্মবোধের ঢেউ আর মন জুড়ে বসেছেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি তাঁর কাছে 'নিত্যস্মরণীয়'। তাঁদের সময়কার পোস্ট গ্রাজুয়েট দর্শনের ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গেও তাঁর গভীর সখ্যতা জন্মায়। আবার বিলেত যাওয়ার আগেই তাঁর বাবা শচীন্দ্রনাথ মুখোপ্যাধায় কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে রওনা হবার আগেই দেখেছেন কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন; আবার শুনেছেন বিলেতের কমিউনিস্ট নেতা সাপুরজী সাকলাতওয়ালার বক্তৃতা।

অক্সফোর্ডে হীরেন্দ্রনাথ পড়তেন সেন্ট ক্যাথারিন্স কলেজে; সেখানে Honour School of History পরীক্ষা দিলেন ১৯৩১-এর জুন মাসে। ফল বেরুতে দেখা গেল এই প্রথম জীবনে 'ফার্স্ট' ক্লাস অল্পের জন্ম ফস্‌কে গেছে। Lincoln's Inn থেকে ব্যারিস্টারিও পাস করলেন। বৃত্তি থাকতে থাকতে খুব তাড়াতাড়ি D. Phil ডিগ্রি পাওয়ার আশায় কাজ শুরু করলেন গবেষণার। বিষয় ঠিক হলো : English Constitutional History and Political Ideas from the Death of Oliver Cromwell to the Fall of Clarendon (1659-1667)। তত্ত্বাবধায়ক G.N.Clark, তাছাড়া পরে থিসিস তদারকি করেন কীথ ফিলিং। আর হীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন আর এক গবেষক মরিস অ্যাশলি। হীরেন্দ্রনাথ সাহায্য পেলেন ডেভিড অগ-এর। অক্সফোর্ডে নিউ কলেজে তখন ছিলেন ইউরোপের ইতিহাসের নামকরা লেখক হাবার্ট ফিশার। গবেষণার থিসিস আশানুরূপ ভালো করতে গেলে যতটা সময় দেওয়া দরকার মেধাবী হীরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তা না পাওয়াতে, তাঁর থিসিস 'বি-লিট'-এর উপযুক্ত ঘোষিত হলো। ফলে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি আর জীবনে অর্জিত হলো না। দেশে ফিরে আসতে হলো। তাতে অবশ্য তাঁর উত্তরকালের খ্যাতির কোনও হেরফের হয়নি।

ইংল্যান্ড-প্রবাসের সুন্দর বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। লিখেছেন তাঁর নানা ভ্রমণের কথা, ইংল্যান্ডে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় তাদের কথা। অক্সফোর্ড-এর মজ্‌লিস্, নানা পণ্ডিতজন ও বাগ্মীর কথা। তবে বিশেষভাবে মনে গেথে যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের কথা, যে গুণী মানুষের বন্ধুত্ব তিনি আজীবন স্মরণ রেখেছেন। কিংবা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অক্সফোর্ড গিয়ে সুবিখ্যাত হিবার্ট লেকচর্ দেওয়ার কথা। দেশে তখন আইন-অমান্য আন্দোলন তুঙ্গে।

তাঁর মন জুড়ে রয়েছে ভারতবর্ষ, সেখানকার ঘটনা। আর সমাজসত্য অনুধাবনে এবং সমাজব্যবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের ভিত্তি পেলেন বামপন্থী সাহিত্য থেকে। প্রবাসেই তাঁর মার্ক্সবাদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন "ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আমাদের তৎকালীন আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিল এই যে তারা ভিন্ন সেদেশে আর কেউ ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার অকুণ্ঠ সমর্থক ছিল না। অন্য কোনো গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ ঐ বর্ণচেতনার দেশে আমাদের মতো কৃষ্ণাঙ্গকে একেবারে সহজ ও স্বচ্ছ মনে সৌহার্দ্য দিতে প্রস্তুত ছিল বলেও মনে হয় না।" বিস্তারিত কথায় যাবো না শুধু জানাই বিলেত পর্বেই তাঁর যেমন বন্ধুত্ব হয় সজ্জাদ জহীর-এর মতন সজ্জনদের সঙ্গে, যাঁরা ছিলেন CPGB-র সঙ্গে যুক্ত। তেমনি লেখা পড়তেন রজনীপাম দত্তের Labour Monthly-তে। আর দেশে ফিরে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বেশ কিছু বইপত্র।

শেষের দিকে সরকারি বৃত্তির টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। নিজের-পয়সায় খুবই কৃচ্ছসাধন করতে হয়েছে, তবে পান বিড়ি কেন বিখ্যাত বিলিতি হুইস্কি পর্যন্ত যিনি পান করেন না, তাঁর আর কষ্ট কীসের। শুধু বইয়ের দোকানেই যা অল্প-স্বল্প ধার। বিলিতি জামা-কাপড় জুতো কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করেনি। তবু তিনি যে সব নিয়ে এসেছিলেন জাহাজে তার মধ্যে কয়েকটি মহামান্য ইংরেজ বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করে নেয়। বিলেত থাকতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দার্শনিকপ্রবর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের। তাঁরই আগ্রহে তখন প্রায় সদ্য-স্থাপিত ওয়ালটেয়ারের আন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকপদ গ্রহণে সম্মত হন হীরেন্দ্রনাথ।

আন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পড়াতেন ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি। তবে ওয়ালটেয়ারের জীবন খুব বেশিদিনের নয়। তিনি লিখেছেন 'ওয়ালটেয়ারে বসে চিঠি পেলাম ম্যাকিলন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির কাছ থেকে যে আমার গ্রন্থরাজি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তবে কিনা মহামান্য সরকারের হুকুমে চারখানা বই আটকানো হয়েছে। যেগুলি এই 'নেটিভ্' দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে। যতদূর মনে পড়ে তার মধ্যে ছিল *The Condition of India* বলে এক প্রামাণিক বামপন্থী সংকলন। লেনিনের একটা জীবনী (গ্রন্থকারের নাম মনে নেই), *Brusski : A Peasant Novel* (রুশ লেখকের নাম মনে পড়ছে না) আর সম্ভবত *India Under British terror* নামে কমুনিস্ট পার্টি সংগৃহীত কতকগুলো তথ্য।' যার মধ্যে ছিল ১৯৩০ সালে মেদিনীপুর এবং পেশাওয়ারে মুক্তিসংগ্রাম দমন বিষয়ক বহু তথ্য। রুষ্ট হয়ে তিনি একটি প্রতিবাদপত্র পাঠালেন বিলেতের *New Statesman and Nation*-এ। তা ছাপা হওয়াতে সরকারপক্ষের রোষ উদ্রেক চাকরিক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করলেও তখনকার উপাচার্য রাধাকৃষ্ণানের আন্তর্জাতিক খ্যাতি আর ব্যক্তিগত প্রভাব হীরেন্দ্রনাথকে সে যাত্রায় রক্ষা করে।

তবে, আগেই লিখেছি, দীর্ঘদিন সেখানে চাকরি না করে ১৯৩৫-এর শেষাশেষি ওয়ালটেয়ারের পাট চুকিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতায় চলে এলেন, জিনিসপত্র বলতে প্রধানত বই। ব্যারিস্টারের সনদটাকে ঝালিয়ে নেওয়াতে মন সায় দেয়নি। ফলে বার লাইব্রেরির সদস্য হলেও শেষপর্যন্ত রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনার কাজ নিলেন। বিভাগীয় প্রধান কিন্তু মাইনে তেমন কিছু নয়। তবে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলতেই যে তাঁর নামের আগে 'অধ্যাপক' শব্দটি সকলেই ব্যবহার করেন, সেই অভিধা তখন থেকেই। কলেজে পড়িয়েছিলেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত। এই পর্বের কথাই বলি আগে, তবে রাজনৈতিক জীবন যথাস্থানে আলাদাভাবে উল্লেখ করব।

রিপন কলেজে সহকর্মী হিসেবে পেলেন স্বনামখ্যাত বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, অজিত দত্ত, হামফ্রে হাউস, ভবতোষ দত্ত ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে—তাঁর মনে পড়ে যায় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর বিজ্ঞাপনে 'অষ্টবক্র সম্মেলন'-এর কথা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার ঐ কলেজের কর্ণধার। হীরেন্দ্রনাথকে পছন্দ করতেন রাষ্ট্রগুরুর পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জামাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। লোকসভায় ক্রমাগত নির্বাচিত হওয়াতে তাঁর অধ্যাপনা জীবনে ছেদ পড়ে। এই সুরেন্দ্রনাথ কলেজেই তাঁর

প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, উত্তরকালের মন্ত্রী ও হাইকোর্টের চিফ্ জাস্টিস। আর ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত পড়িয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও।

যাই হোক রাজনৈতিক ও অন্যান্য কর্মব্যাপৃতি সত্ত্বেও পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষ ভাষণ দেবার জন্য আহূত হয়েছেন, যেমন কলকাতা (একাধিকবার), পাটনা, কাশী হিন্দু বিদ্যাপীঠ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি, কাশ্মীর, ওসমানিয়া, পুনে, ইন্দোর, মারাঠাওয়াড়া (আওরঙ্গাবাদ) কেরল, ব্যাঙ্গালোর রবীন্দ্রভারতী, নাগার্জুন প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বিদেশের বিদ্যায়তন থেকে আমন্ত্রিত হয়েও যেতে হয়েছে। যেমন, ১৯৬৬ সনে ক্যানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬৭-তে বার্লিনে, মস্কো ও লেনিনগ্রাদে (একাধিকবার)। বুলগেরিয়াতে, উজবেকিস্তানে (১৯৭৪) ইত্যাদি।

১৯৩৯-এর ৩ জুন ময়মনসিংহ জেলার হেমনগর নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কিরণবালা দেবীর কন্যা শ্রীমতী বিভা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। সেই সম্পর্ক অদ্যাপি বিদ্যমান। এই লেখা যখন তৈরি করছি তার কয়েকদিন পরেই তাঁর ৬৪তম বিবাহবার্ষিকী হবে। ১৯৪১-এ কন্যা রিণির জন্ম, ১৯৪৫-এ পুত্র অভিজিৎ (লামা)-এর জন্ম। স্থানাভাবের কথা চিন্তা করে কর্মজীবন বা ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশদ বলা না গেলেও বলতে হবে যে অধ্যাপনায় আসার পরেও বেশ কিছুদিন 'বার'-এর সদস্য হিসেবে আইনের জগতেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ১৯৫২-পরবর্তী জীবন আরও পরে। আগে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে আনুষ্ঠানিক প্রবেশ এবং ১৯৫২ পর্যন্ত পার্টি-জীবন বলে নেওয়া দরকার।

স্বাধীনতা হীনতায় যেমন মানুষ বাঁচতে চায় না, তাই কামনা করে স্বাধীনতা, তেমনি সে চায় সমাজের সর্ববিধ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। কোন্ পথে? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। হীরেন্দ্রনাথ বেছে নিলেন বামপন্থা, সমাজতন্ত্র, মার্ক্সীয় আদর্শ; বিলেত প্রবাসেই অল্প অল্প, দেশে ফিরে প্রবলভাবে। তিনি অবশ্য দেশে ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট্ পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। তাঁর নিজের লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি

"পার্টিকে পুরোপুরি ওদেশে মানতে পারিনি; তার সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কও রাখিনি—কিন্তু মনের মধ্যে গোপনে দানা বেঁধে উঠেছিল কমুনিজম্ সম্বন্ধে প্রত্যয় এবং তারই অপরিহার্য আনুষঙ্গিকরূপে পার্টি আনুগত্যের ঔচিত্য। বেশ কিছুদিন অবশ্য মনে হয়েছে যে কমুনিস্টদের ধরন-ধারণে কেমন যেন একটা বেয়াড়াপনা—আশ্চর্য কী এতে যখন শোষক সমাজের রীতিনীতি ভেঙে চুরে দেওয়াই তাদের কামনা। যাই হোক বিদেশে বাসকালে এ-বিষয়ে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ যা ঘটেছিল, তারই ক্রমান্বিত প্রয়াস আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত পরিবেশে আমার চলতে থাকল। ছাত্রের মতো মার্কসবাদ নিয়ে পড়াশুনা তখন করে চলেছি, খাতার পর খাতা 'নোট'-এ ভরিয়েছি Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky, Bukharin, Radek, Ryazanov, Lozovsky, Preobraözhensky, Luckas, R Palme Dutt প্রভৃতির রচনা থেকে।"

বিলেতে তাঁর বন্ধু সজ্জাদ জহীর (বন্নে)-এর সঙ্গে গিয়েছিলেন CPGB-তে, তেমন কিছু

নয়। কলকাতায় বন্ধু অকালপ্রয়াত দর্শনশাস্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী মনু ছেড়ে মার্ক্স ধরেছেন এবং তাঁর নিজের "চোখ ক্রমশ খুলছিল"।

হীরেন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছিলেন যে জওয়াহরলাল নেহরুর *Whither India?* শীর্ষক রচনা বোধহয় ১৯৩৩-এ প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজবাদ সম্পর্কে আগ্রহ শিক্ষিত মহলে ব্যাপকভাবে উদ্রিক্ত হতে থাকে। এটি আরও বেড়ে যায় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির (প্রতিষ্ঠা১৯৩৪) অন্যতম নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৩৫/৩৬ নাগাদ Why Socialism লেখার পর। আমাদের বাঙালি সমাজেও তখন মার্ক্সবাদ, রুশবিপ্লব বা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে লেখা বই বেরুচ্ছে বাংলাভাষাতেও

১৯৩৬-এর কথা স্মরণ করে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন "কমুনিজম তখন আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, ভারতবর্ষে জন্মে যেন উত্তরাধিকারসূত্রেই যে বিশ্ববীক্ষার তৃষ্ণা মনে জাগে তাকে তুষ্ট করবার শক্তি কমুনিজম্ ভিন্ন অন্যত্র কোথাও নেই এই প্রত্যয় চিন্তায় তখন প্রোথিত, কিন্তু তখন পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।" সেদিনের বেআইনি কমুনিস্ট পার্টি তাঁর সন্ধান জানত এবং যোগাযোগ স্থাপনেও বিলম্ব হলো না। ১৯৩৬-এর জানুয়ারি মাসে 'সারা বাংলা ছাত্র সম্মেলন'-এ সভাপতিত্ব করার আহ্বান এলো; সভায় হাজির সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। ১৯৩৬-এ আলাপ হলো মুজফ্ফর আহমদ-এর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৬-এর মাঝামাঝি প্রিয়বন্ধু সজ্জাদ জহীরই তাঁকে নিয়ে গেলেন কলকাতার টালিগঞ্জে এক এঁদোপুকুরের ধারে মেটে ঘরে, সেখানেই আলাপ হলো পার্টির সেক্রেটারি পূরণচাঁদ যোশীর সঙ্গে। তখনই মনস্থির পার্টিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে। এজন্য যোশীর ব্যক্তিত্ব যে একটি প্রধান কারণ তা তিনি নিজেই বলেছেন। প্রত্যয়ী পথিকের জীবন নতুন বাঁক্ নিলো।

পার্টি সদস্য হওয়ার পর ছাত্র আন্দোলন, সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে সংগঠন, কিছু পরিমাণে ট্রেড ইউনিয়ন। পার্টিনীতির প্রচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন। আর বাংলা ও ইংরিজিতে নানা ধরনের পত্র পত্রিকায় অজস্র লেখা। পরে বই লেখা এবং দু'ভাষাতেই বহু স্থানে বহু বক্তৃতা তখন থেকে চলছে। ক্রমে যোগাযোগ সোমনাথ লাহিড়ী, আবদুল হালিম, কমল সরকার, বঙ্কিম মুখার্জী, বেরতী বর্মণ, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, আবদুল মোমিন, ভবানী সেন, রণেন সেন, নৃপেন চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে। পার্টির পক্ষ থেকেই ও নির্দেশে তৎকালীন 'Popular Front' নীতি অনুসারে কংগ্রেসে যোগদান (১৯৩৬)। সেই সূত্রে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে সক্রিয় হওয়ার পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বঙ্গীয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৩৭, নৃপেন চক্রবর্তী, শিবনাথ ব্যানার্জী, গুণদা মজুমদার সহ), ১৯৩৮-এ অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এ আই সি সি) সদস্যরূপে নির্বাচিত (হরিপুরা, ত্রিপুরী, ১৯৩৮, ১৯৩৯)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য (১৯৩৮-৩৯)।

১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সমসাময়িক ওই শহরে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়, সভাপতি মুন্সি প্রেমচাঁদ, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হীরেন্দ্রনাথ। ১৯৪০-এ নাগপুরে "All India Students' Conference'-এর সভাপতি। ১৯৪০ ও ১৯৪১ সনে গ্রেফ্তারবরণ ও পরে মুক্তিলাভ। পরে ১৯৪৮ ও ১৯৪৯-এ বিনা বিচারে সাতমাস কারাবন্দি। ছাত্র সম্মেলনে

ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন, বক্তৃতা করেছেন। তাঁর লেখকজীবন আলাদা আলোচনা করব। এখানে শুধু উল্লেখ করছি যে ১৯৪৩-এ তাঁর প্রথম বাংলা বই 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ' প্রকাশিত, ইংরেজিতে তাঁর প্রথম বই বেরিয়েছিল *An Introduction to Sociolism* ১৯৩৮-এ।

কম্যুনিস্ট পার্টিতে ১৯৪৭-৫১ পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক কমিটির সদস্য। পার্টির প্রথম কংগ্রেস (বোম্বাই ১৯৪৩) থেকে প্রায় প্রতিটি কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৪১-এ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ট যোগাযোগ। সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘ বা 'Friends of the Soviet Union' (১৯৪১) বা চীন-ভারত মৈত্রী সংস্থার (১৯৪৯) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৩-এ বোম্বাইতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা (I.P.T.A) গঠিত হলো, সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ। শান্তি আন্দোলনে নিয়ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সর্বভারতীয় সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘের যুগ্ম সম্পাদক (১৯৪১, ১৯৪৪)। পার্টির উদ্যোগে এবং সমুচিত ক্ষেত্রে পার্টি বহির্ভুত প্রগতি প্রয়াসীদের মধ্যে সর্বভারতীয় পরিচিত ও সম্মাননার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৪০ থেকেই বন্ধুত্ব জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য, ভূপেশ গুপ্ত এই ত্রয়ী আইনজ্ঞ কমরেডের সঙ্গে। ঘুরে বেড়াতেন বাংলা ও ভারতের নানা জেলায়, শহরে, গ্রামে—কতো যে গ্রুপ মিটিং থেকে বড়ো সভা করেছেন ইয়ত্তা নেই। ১৯৩৮-এ পিতা শচীন্দ্রনাথকে হারালেন,তবে তাঁর ভাষায় 'স্রোত চলে সূর্য জ্বলে'—জীবনের প্রবাহ আবার স্বাভাবিক খাতে বয়ে চলল।

সর্ববিধ প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও পার্টি-নির্দেশিত পথ তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। তাঁর কথায় "কিন্তু জোর করে সঙ্গে সঙ্গে বলব যে কমুনিস্ট মতবাদ—না বলব জীবনদর্শন, বিশ্ববীক্ষা?—গ্রহণ ব্যাপারে আমার মনে কোথাও খাদ থাকেনি।" বক্তৃতা, আলোচনা এবং লেখা এই তিনটি হাতিয়ারই অবশ্য তাঁর হাতে মানিয়েছে বেশি। তবে তাঁর জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে আছে এক ঔদার্যবোধ, সহনশীলতা, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। এটা কি বিপ্লবী চরিত্রের দাঢ্য অর্জনে অসামর্থ্য? নিন্দুকরা বলবেন হ্যাঁ, আমরা বলব না। সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে আমরা কি মানুষ পরিচয়ে চিহ্নিত নই? এ কারণে গান্ধী বা জওয়াহরলালকে, সুভাষচন্দ্র বা বিবেকানন্দের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন হীরেন্দ্রনাথের মতন কম সাম্যবাদীই পেরেছেন।

১৯৪০-এর রামগড় অধিবেশনের পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সি. পি. আই সদস্যদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হীরেন্দ্রনাথেরও। ১৯৪৫-এর শেষদিকে তাঁরা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগও করেন। তবে কংগ্রেসের সংগ্রাম-বিমুখিতা, বামপন্থীদের ভেদাভেদ, মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বার্থান্ধ নীতি সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই তীব্র হয়। জাতীয় ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামে দেশ উত্তাল হয়। যুদ্ধোত্তর গণজাগরণের পর ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হয়। এর মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের কাজ করে গেছেন। আর পি. সি. যোশীর যুগে পার্টি 'সুখী পরিবার' ছিলো। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোশীর উত্তরাধিকারী

বি. টি. রণদিভে এই 'সুখী পরিবার'-এর বদলে 'বিপ্লবী সংগঠন' গড়তে গিয়ে আবার এক বাঁকের মুখে সকলকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। 'পার্টি অফিসে রোজ একবার অন্তত হাজিরা মা দিতে পারলে তখন যেন ভাত হজম হত না', জানান হীরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁর আত্মকথা 'তরী হতে তীর' ১৯৪৭-এর পরে এগোয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত জীবন সেখানে পাই।

কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন তো তার পরেও কম নয়, বরং এক অর্থে বেশি। সাংসদ হীরেন্দ্রনাথই তো সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তাই তাঁর অন্যবিধ জীবনকথা লেখার আগে এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গটি শেষ করে নেওয়া দরকার, পাঠক-পাঠিকাদের কথা মাথায় রেখে।

আমাদের আক্ষেপ কিছু থাকবেই যে স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের কলমে 'পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত' হিসেবে 'তরী হতে তীর'-এর দ্বিতীয় খণ্ড লিখলেন না। তাই ঐ পর্বে আমাদেরই প্রবেশ করতে হবে কুণ্ঠা আর সংশয় নিয়ে। তবে সে-কাজ করার আগে অন্য কিছু কিছু বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রত্যয়ী পাঠকের জীবনবৃত্ত জানতে গেলে লেখক হীরেন্দ্রনাথ, সাংবাদিক হীরেন্দ্রনাথ, অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃতিকর্মী হীরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি কয়েকটি প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে হলেও বলে নিলে ভালো।

লেখক হীরেন্দ্রনাথ সব্যসাচী। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি লিখে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে। অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। লিখেছেন বেশ কিছু বই। প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথ কেমন তার পরিচয় জীবনী লিখতে গিয়ে দেওয়া না গেলেও বলা দরকার যে বহু প্রবন্ধই উত্তরকালে গ্রন্থাকারে দুই মলাটের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর বাংলা বইয়ের সংখ্যা কুড়ি ('পরিচয়' পত্রিকায় বর্তমান সংখ্যায় স্বতন্ত্র গ্রন্থপঞ্জি দ্রষ্টব্য)। প্রথম বাংলা বই বেরিয়েছিল ১৯৪৩-এ কলকাতার সমবায় প্রকাশনী থেকে, নাম 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ'। শেষ বাংলা বই বেরিয়েছে এ বছর ২০০৩ সনে, নাম 'আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে', প্রকাশ করেছেন অনুষ্টুপ প্রকাশনী। বেশ কিছু বই হীরেন্দ্রনাথের স্বহস্তে স্বাক্ষরিত ও উপহার দেওয়া আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে সম্পদের মতো।

তাঁর প্রথম ইংরেজি বই *'An Introduction to Socialism'* প্রকাশ করে কলকাতা থেকে ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ১৯৩৮। সেই থেকে *'India's Ordeal'* (২০০১-এ প্রকাশিত) পর্যন্ত পঁচিশখানি ইংরেজি বই তাঁর বেরিয়েছে। ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কুতুব মহল, পিপলস্ পাবলিশিং হাউস, মনীষা গ্রন্থালয়, এলাইড পাবলিশার্স, স্টার্লিং পাবলিশার্স, বিকাশ পাবলিশিং, বসুমতী কর্পোরেশন, ভিশন বুকশ্, জেইকো, মিত্র ও ঘোষ প্রমুখ প্রকাশকগণ তাঁর ইংরেজি বই প্রকাশ করেছেন।

শুধু বই নয়, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই অনেক পুস্তিকা লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ। বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁর বাগ্মিতা শুধু যে বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রবাদ-প্রতিম তাই নয়, তাঁর বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিদগ্ধ ভাষণ পুস্তিকার আকারে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। বহু বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন ওসমানিয়া পুনে ইত্যাদি) বা সারস্বত প্রতিষ্ঠান (যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি বা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার) এ-কাজে এগিয়ে এসেছেন। আর ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব পুস্তিকা বা পার্টি সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির (যেমন 'সোভিয়েত মৈত্রীসংঘ' ইসকাস ইত্যাদি) উল্লেখ তো বাহুল্যমাত্র।

সংসদে (১৯৫২-৭৭) বহুবিধ বিষয়ে অসংখ্য বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তরকালে ও আলোচনায় অংশগ্রহণের বিবরণে অসংখ্য উল্লেখযোগ্য বস্তু রয়েছে। আকাশবাণীতে প্রদত্ত বেশ কিছু ভাষণকে স্মরণীয় বলা যেতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে নানা পত্র-পত্রিকায়, আর বহু গ্রন্থের বিশেষ মুখবন্ধে কিংবা প্রবন্ধসংগ্রহে দৃষ্টান্তস্বরূপ গান্ধী-বিষয়ক রাধাকৃষ্ণান-সম্পাদিত গ্রন্থে (১৯৪৯) যে সব মূল্যবান রচনা ছড়িয়ে রয়েছে, তার উদ্ধার করার কাজ এখনও শেষ হয়নি। লেখক স্বয়ং নিজের লেখা সুবিন্যস্ত করে রাখার তাগিদ অনুভব করেননি বা নানা ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ও অসুবিধায় এ কাজ হয়নি, ফলে তাঁর প্রবন্ধের সম্পূর্ণ তালিকা করার কাজও অসম্পূর্ণ।

বাংলা ও ইংরেজি বই, পুস্তিকা এবং অজস্র প্রবন্ধ ছাড়াও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা ও ইংরেজিতে সম্পাদনা করেছেন বেশ কিছু বই। কখনও কখনও সুযোগ্য সুহৃদ্‌বর্গের সহযোগে। ১৯৩৭-এ এ ধরনের প্রথম সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, যিনি ছিলেন বাংলায় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক। প্রগতি আন্দোলন সম্পর্কে আমরা একটু পরেই দৃষ্টি দেব। যাই হোক ১৯৪৪-এ সুরেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু এক আশ্চর্য প্রতিভাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন "কয়েক বৎসর নিত্য সাহচর্যের মধ্য দিয়ে জেনেছি তাঁর ক্ষুরধার মেধা, অসামান্য জ্ঞানান্বেষা, মার্কসবাদকে ভারতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল আগ্রহ, পরম সাহিত্যানুরাগ এবং সমাজ বিপ্লবকল্পে ক্লান্তিহীন বক্তৃতা ও রচনায় কৃতিত্বের কথা।" এই বইতে শুধু প্রগতি লেখক সংঘ নয়, হীরেন্দ্রনাথেরও সাহিত্য ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ভূমিকা ছাড়াও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আঁদ্রে জিদ্, ই. এম ফস্টার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কার্ল মার্কস, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিভা বসু, টি. এস. এলিয়ট, মানিক, বিভূতি, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন, অরুণ মিত্র প্রমুখ দেশ-বিদেশের নানা ব্যক্তির লেখা ছিল। বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই শুধু উল্লেখ করব যে বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, তিনি পড়ে মতামত দিয়েছিলেন। আর ১৯৪০-এ বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় বেরুলো 'আধুনিক বাংলা কবিতা', যে বইটি সম্পর্কে সংস্কৃতিমান বাঙালি পাঠকদের নতুন করে বলার নেই।

বলার কথা মাত্র দুটি। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র মতন সংকলন আগে হয়নি। এই বইটিও উৎসর্গ করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। দুটি আলাদা আলাদা ভূমিকা লিখেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ এবং আইয়ুব। দ্বিতীয় কথা সুখের। সম্প্রতি বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন দে'জ পাবলিশিং। এছাড়া উল্লেখ করতে চাই যে বাংলা ও ইরেজি আরও বেশ কয়েকটি বই সম্পাদনা করেছেন হীরেন্দ্রনাথ। কখনও তাঁর সহযোগী গোপাল হালদার, কখনও স্নেহাংশুকান্ত আচার্য।

যে সূত্রটির উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানব তা হলো শুধু বাংলা ও ইংরেজিতে বই লেখা, প্রবন্ধ লেখা, সম্পাদনা করা এসব নয়। হীরেন্দ্রনাথ একজন সিরিয়াস পুস্তক সমালোচকও বটে, যিনি একাধারে রসজ্ঞ ও পণ্ডিত। জীবনবৃত্ত লিখতে গিয়ে তার বিস্তারিত আলোচনা

নিষ্প্রয়োজন। তবু স্বতন্ত্রভাবে বলতেই হবে অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথের কথা। তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর অনুবাদক শুধু এটুকু তথ্য জানিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, কেন তিনি অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ বই বা বইয়ের অংশ, তাও বোঝা দরকার। এর মধ্যেও তাঁর সাহিত্যভাবনার পরিচয় পাই। একদিকে তাঁর অনুবাদে বাংলায় পেয়েছি মার্কস ও স্তালিনের লেখা, অন্যদিকে ইংরেজি ভাষায় উঠে এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর'-এর মতন উপনাস বা 'তারিণী মাঝি'র মতো গল্প, আর অবশ্যই, রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্য। কী অনায়াস দক্ষতায় তিনি তর্জমা করেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'দুই পাখি', 'যেতে নাহি দিব', 'ব্রাহ্মণ', 'দুঃসময়' বা 'দেবতার গ্রাস' ভাবতে অবাক লাগে।

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কের নিবিড়তা একেবারে সূচনাপর্ব থেকেই ; এই পত্রিকাতেই তিরিশের দশকের মাঝামাঝি এঙ্গেলস্-এর 'অ্যান্টি ড্যুরিং' গ্রন্থের সমালোচনা লিখেই তাঁর প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার সূচনা। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের সম্পর্ক সেই থেকে অদ্যাবধি তেমনই ঘনিষ্ঠ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আগেই তাঁর পূর্ণ যৌবনে কতো উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ তা ভাবলে অবাক হতে হয়—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির, নীরেন্দ্রনাথ রায়, রাধারমণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যামিনী রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হিরণকুমার সান্যাল, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সজ্জাদ জহীর, হামফ্রে হাউস, সাহেদ সোহরাবর্দী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কে নয়? হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যত প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন তার মধ্যে সিংহভাগ জুড়ে আছে 'পরিচয়'।

'পরিচয়'-এর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের যোগ অত্যন্ত কাছের, তেমনি প্রগতি লেখক আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপেরও কাছের মানুষ হীরেন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে অল্প কথায় কিছু বলা দরকার। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে একদিকে বিশ্বে-ধনতান্ত্রিক শিবিরে সঙ্কট ও অন্যদিকে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব যেমন বিশ্বকে প্রভাবিত করছিল, তেমনি নানা দেশে চলছিল ঔপনিবেশিকতার ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। আর ছিল রুশ বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রের ভাবনার প্রসার। কবি-সাহিত্যিক-লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরাও ক্রমে জড়ো হচ্ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। বিশ্বে যেমন নেতৃত্ব দেন আঁরি বারবুস, রোম্যা রলাঁ, ম্যাকসিম গোর্কি, র‍্যালফ ফক্স, আঁদ্রে জিদ্; তেমনি ইয়োরোপ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মনেও দোলা লাগলো। সময়ের দাবি অনুযায়ী মানবতাবাদী শিল্পী সাহিত্যিকরা গড়ে তোলেন প্রগতি লেখক সংঘ। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মুলুকরাজ আনন্দ, জহীর, রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, ভবানী ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। লন্ডনেই তাঁরা ভারতে এক প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ভারতীয় ছাত্ররা দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৬-এ যুক্ত প্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে পণ্ডিত

জওয়াহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই ১০ এপ্রিল প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা সমবেত হন। প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ', সভাপতি হন মুন্সি প্রেমচাঁদ। সাধারণ সম্পাদক সজ্জাদ জহীর। হীরেন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর উদ্যোগে কলকাতায় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর বঙ্গীয় শাখার একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয় এবং ঐ বছরই ২৫ জুন কোলকাতার অ্যালবার্ট হলে ম্যাকসিম গোর্কির মৃত্যুতে যে শোকসভা হয়, সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয় 'নিখিলবঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ'। যার পৃষ্ঠপোষক হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিশেষ উদ্যোগী সদস্য হীরেন্দ্রনাথ। যেমন ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সর্বভারতীয় সংঘ যেমন Towards Progressive Literature নামে সংকলন বার করে যাতে লেখেন অনেকের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথও, তেমনি ১৯৩৭-এ ২০/১ হায়াৎ খাঁ লেন-এর বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের দপ্তর থেকে 'প্রগতি' নামে সংকলন গ্রন্থ বেরুলো, যুগ্ম সম্পাদনা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর।

১৯৩৮-এ কলকাতায় হলো প্রগতি লেখক সম্মেলন, তার আগেই ঢাকায় এক শাখা স্থাপিত হয়েছে। এরপর একদিকে ইয়োরোপে ফ্যাসিবাদের প্রসার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পশ্চিমী গণতন্ত্রের সংকট অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উত্তাল স্রোত, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই চলছে। এরই মধ্যে ১৯৪০-এর শেষে কলকাতায় গঠিত হলো 'সোভিয়েত মৈত্রী সংঘ' বা Friends of Soviet Union—যার উদ্যোক্তা হীরেন্দ্রনাথ, বিলেত প্রত্যাগত জ্যোতি বসু, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, গোপাল হালদার প্রমুখ। প্রগতি লেখক সংঘের নাম বদলে হলো 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। শেষে ১৯৪৫-এ আবার নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ নামই ফিরে আসে। এরই মধ্যে ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হলো সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা Indian Peoples Theatre Association। সব কিছুতেই হীরেন্দ্রনাথ। বিস্তারিত লিখতে গেলে সাতকাহন হয়ে যাবে। তাছাড়া অনেকের লেখায় সে যুগের এক চমৎকার ছবিও পাওয়া যাবে। স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও কিছু কিছু লিখেছেন। আমরা বরং ১৯৪৭-পরবর্তী জীবনকথা বলে যাই। যে পর্ব বিস্তারিত কোথাও লেখা হয়নি, এমনকী সদ্য প্রকাশিত 'শঙ্কা সংকট প্রত্যয়' বইতেও নয়।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৮ ও ১৯৪৯-এ বিনা বিচারে সাত মাস কারাবন্দি ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সদস্য হন ১৯৪৭-এ। দেশভাগের মধ্য দিয়ে খণ্ডিত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় তাঁর লেখা বের হয় 'Milistones on Road to Freedom'। বেলেঘাটায় অনশনরত গান্ধীজির সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন। ১৯৪৮-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বি টি রণদিভের নেতৃত্বে পার্টিনীতির

আমূল পরিবর্তন হয়, নেতৃত্বের বদল ঘটে এবং পার্টিও বেআইনি ঘোষিত হয়। সারা দেশে বহু পার্টি নেতা ও কর্মীর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথও গ্রেফতার হন। ১৯৪৯-এ কারামুক্তি। ওই বছর ১ অক্টোবর চীনে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ভারতে 'চীন-ভারত মৈত্রী সমিতি' গঠিত হয়, যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হীরেন্দ্রনাথ। ১৯৫০-এ সি পি আই-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

অমৃতসর শহরে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে (১৯৫৮) জাতীয় পরিষদ বা ন্যাশানাল কাউন্সিল-এর সদস্য নির্বাচিত এবং ছিলেন ১৯৬৮ পর্যন্ত। সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হলো ১৯৫২-তে। কলকাতা উত্তর-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র থেকে সি পি আই প্রার্থী হিসেবে কাস্তে ধানের শিষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন হীরেন্দ্রনাথ। উপর্যুপরি পাঁচবার নির্বাচনে জিতেছেন (১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৭২)। ছিলেন লোকসভায় পার্টির সহকারী নেতা (১৯৫২-৬৪) এবং নেতা (১৯৬৪-৬৭)। ইতোমধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন হয় (১৯৬৪), হীরেন্দ্রনাথ সি পি আই-তে থেকে যান, যদিও নতুন গঠিত সি পি আই (এম)-এর সদস্যরা তাঁর প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। ১৯৭৭-এ সংসদীয় নির্বাচনে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে তৎকালীন জনতা পার্টির প্রার্থী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের কাছে পরাজিত হন। তারপর থেকে পার্টিতে কোনও সাংগঠনিক পদাধিকারী না হয়েও দলের নানাবিধ কর্মে আজও ব্যাপৃত। সি পি আইতে পার্টি প্রবীণ ('Veteran') বলে স্বীকৃত, শ্রদ্ধেয় ও আমন্ত্রিত ; ১৯৮৭-এ মস্কোতে সোভিয়েট ইউনিয়নের ৭০তম বার্ষিকীতে পার্টি প্রতিনিধিরূপে যোগদান।

সাংসদ হিসেবে হীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলেন। সরকার পক্ষ তাঁর মত ও ভাষণ মন দিয়ে শুনতেন। লোকসভায় Privileges, Business Advisory House, Subordinate Legislation, Library, Office of profit, ভারতীয় ভাষান্তরীকরণ ইত্যাদি কমিটির সদস্য। ১৯৫৫-৫৭ সনে প্ল্যানিং কমিশনের শিক্ষা প্যানেল-সদস্য; উভয় কক্ষের Public Accounts Commitee-তে চারবার নির্বাচিত, ১৯৭৫-৭৭-এ সভাপতি। সংসদের প্রতিনিধিরূপে কাশ্মীর (১৯৫৭), নাগাল্যান্ড (১৯৬৫) ইত্যাদি সংকটাক্রান্ত অঞ্চলে গমন; সেইভাবে Emotional Integration Committee (সভাপতি সম্পূর্ণানন্দ), Small News Papers Committee (সভাপতি দিবাকর), Committee on the three Acadamies (সভাপতি খোসলা) ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে কাজ করা ও রিপোর্টে Minute of Dissent দেওয়া; প্রায় চৌদ্দ বছর সংসদের প্রতিনিধিরূপে All India Council of Sprots-এর সদস্য; ১৯৬২-তে National Integration Council-এর সদস্য; গান্ধী, জওয়াহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মৃতিরক্ষা কমিটির কার্যকরী সদস্য; নেহেরু স্মারক নিধির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'ট্রাস্টি' বা অছি; পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে ক্যানবেরায় (অস্ট্রেলিয়া) Commonwealth Parliamentary Conference-এ প্রতিনিধি (১৯৫৮); International Parliamentary Union-এর সভায় সংসদের প্রতিনিধি; yaounde (Cameroons), West Africa (মে ১৯৭২); তেমনই IPU-এর অধিবেশন (Rome, September, 1972) ; বিশ্বভারতী সংসদে

লোকসভার প্রতিনিধি (১৯৬৭-৭৭) ; লোকসভার অধ্যক্ষ K.S. Hegde কর্তৃক ১৯৭৮-এ Bureau of Parliamentary Studies and Training এবং Parliament Library বিষয়ে Honarrary Advisor রূপে নিযুক্ত, ১৯৮২-তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রত্যেকটি দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী মনোনীত হওয়াতে সমস্ত সংসদীয় পদ ত্যাগ করেন হীরেন্দ্রনাথ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

১৯৫৩-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেনেট'-এর সদস্য হন হীরেন্দ্রনাথ, ছিলেন ১৯৬১ পর্যন্ত। ১৯৫২ থেকে আর্কিওলজিকাল সারভে অফ ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন হীরেন্দ্রনাথ, ছিলেন ১৯৭৫ পর্যন্ত। ১৯৫৪-তে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি দলের প্রতিনিধি তথা সহকারী নেতা হয়ে প্রথমবার সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করেন। এখানে বলা যেতে পারে যে ছাত্রাবস্থায় ইয়োরোপে পাঁচ বছর থাকলেও এবং সে বারে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং যাত্রাপথে মিশর ও মাল্টদ্বীপ দেখলেও, ১৯৪৩-এ সোভিয়েত দেশে আমন্ত্রণ পেয়েও যেতে পারেননি, ১৯৫১-তেও রাশিয়া ও চীনে আমন্ত্রণ পেয়েও পাশপোর্ট না থাকায় যাওয়া হয়নি। ১৯৫৪-র পর অবশ্য বহুবার সোভিয়েত দেশে গেছেন। '৫৪ সনে সোভিয়েত দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আফগানিস্তানে কয়েকদিন কাটান। পার্টির প্রতিনিধি হয়ে ১৯৬৫-এ মঙ্গোলিয়ার চল্লিশ বর্ষপূর্তি উৎসবে সস্ত্রীক যোগদান। '৫৮ তে অস্ট্রেলিয়া গমনকালে ইন্দোনেশিয়া ও প্রত্যাবর্তনের সময় সিঙ্গাপুর। বিভিন্ন সময়ে নিমন্ত্রিত হয়ে জি ডি. আর, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়াতে একাধিকবার যাওয়া। সাইবেরিয়া থেকে তাজিকিস্তান, লাটভিয়া থেকে জর্জিয়া ইত্যাদি সোভিয়েতের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। গেছেন লেবানন, ইতালি, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, লিবিয়া। শেষ বিদেশযাত্রা ১৯৮৭-তে সোভিয়েত রাশিয়াতে।

জীবনে অজস্র সম্মান পেয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা, আন্ধ্র, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক D. Litt পেয়েছেন। আরও মনে পড়ে, কল্যাণী, বর্ধমান, যাদবপুর, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধান অতিথির ভাষণ দানের জন্য আহুত হন তিনি (১৯৮৫-১৯৯৫)। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পেয়েছেন পদ্মভূষণ (১৯৯০) এবং পদ্মবিভূষণ (১৯৯১)। পশ্চিমবাংলা সরকারের পক্ষ থেকে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৯২)। কলকাতার মুসলিম সংস্কৃতি সংঘের পক্ষ থেকে 'মওলানা আজাদ পুরস্কার' (১৯৯৪)। সোভিয়েত বিপ্লবের ষাটবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মস্কোস্থিত VOKS-এর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মৈত্রী পুরস্কার। ১৯৭৭-এ হীরেন্দ্রনাথ সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার পান। এছাড়া পেয়েছেন Epic Victory বইয়ের জন্য ১৯৪১-৪৫-এর যুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে ভালো ইংরেজি বই হিসেবে সোভিয়েত পুরস্কার। বুলগেরিয়া থেকে দিমিত্রভ পুরস্কার।

১৯৮৭-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে গণমাধ্যম কেন্দ্রের সভাপতি পদে নিয়োগ করে। ১৯৯৫-তে পশ্চিমবাংলার বিধানসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক Bureau of Parliamentary Studies -এর Honarary Chairman নিযুক্ত হন। সংবর্ধিত হয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বাংলা আকাদেমি, শরৎ সমিতি, সাহিত্যতীর্থ, দক্ষিণদেশ, তালতলা লাইব্রেরি, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ

ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান দ্বারা। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে ১৯ এপ্রিল ১৯৯৫-এ নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর সভাপতি পদে পঞ্চাশ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকার সম্মানে সম্বর্ধিত (এপ্রিল ১৯৯৫)। ১৯৯৯-এ পেয়েছেন নজরুল পুরস্কার। ১৯৮৪-তে দিল্লির বাস তুলে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁকে আজও সক্রিয় দেখি 'সপ্তপর্ণী'র ফ্ল্যাটে। যতদূর জানি, অরুণ মিত্র, অশোক মিত্র, বিষ্ণু দে থেকে অমিতাভ দাশগুপ্ত, সত্যব্রত দত্ত পর্যন্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বই উৎসর্গ করেছেন। তাঁর ভূমিকা সম্বলিত বই তো কতই। এই বছরে ২০০৩-এ অধ্যাপক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থেও তাঁর মূল্যবান সম্পাদনা রয়েছে। আসলে এক প্রত্যয়ী পথিক হিসেবে সাধারণ মানুষের বুকভরা ভালোবাসাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

HNM—আমি যতটুকু জেনেছি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রিপন কলেজে এচ্. এন্. এম্‌কে—অর্থাৎ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে যখন প্রথম দেখি, তখন আমি তাঁর গভীরতর ব্যক্তিত্বের কোনো সংবাদই জানতাম না। তখন আমরা সবে কৈশোর পেরিয়ে যুবকত্বে পৌঁছতে চলেছি। এই সেই সময় যখন বিশ্বগ্রাহী কৌতূহল বহু জিজ্ঞাসাচিহ্নের অনিবার্যতায় দীপ্র হয়ে ওঠে। সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, সরোজ আচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চারের দশকের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় বাত্যা বিক্ষোভের দিনে তরুণ কিশলয়দের সংক্রান্তির গাজনবেলার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একটা নতুন প্রজন্ম তাঁদের কাছে থেকেই গ্রহণ করেছিল ইতিহাস বীক্ষণের ও দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবতা ব্যাখ্যার প্রথম পাঠ। আমি হীরেন্দ্রনাথকে প্রথম চাক্ষুষ করেছিলাম রিপন কলেজের তৃতীয় বর্ষের পাঠকক্ষে। তিনি পাঠকক্ষে প্রবেশের সঙ্গে দণ্ডায়মান সমস্ত ছাত্রদের ইতিপূর্বের অনর্গল বাক্যস্রোত মুহূর্তে স্তব্ধ। আমি তাকিয়ে দেখলাম দীর্ঘ পরিশীলিত বৈদগ্ধ্য আর সমাসন্ন প্রৌঢ়িমার মিশ্রণে সে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাকিয়ে দেখলাম শ্রেণীকক্ষ সেদিন তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত ছাত্রকে জায়গা করে দিয়েছে সানন্দে—অন্য কলেজ থেকেও ছাত্ররা এসেছে এচ্ এন্. এম-এর বক্তৃতা শুনতে। আমি বলেছি 'চাক্ষুষ করেছিলাম'—সত্যই তাই—হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হয়েছিল। তাঁর এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে হীরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অন্যতম মাত্রার পরিচয় পেলাম। সকলেরই মনে আছে শ্রদ্ধেয় আইয়ুব ও শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায় দুজনে দুটি পৃথক ভূমিকা লিখেছিলেন। দুজনের প্রেক্ষণ বিন্দুতে ব্যবধান ছিল প্রত্যাশিত, বাঞ্ছনীয়ও বটে। কিন্তু দুজনের পরোক্ষ মিলটুকুও লক্ষণীয়। আর, দেখা গেল মার্কসবাদী দৃষ্টিতেই তিনি আধুনিক কবিতার জটিলতারও চরিত্র নির্ণয় করেন চমৎকার। এই ব্যক্তিই তো তরী ও তীরের রূপকে জীবনকে দেখতে চাইছেন। চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিই জীবনকে স্বরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

স্মরণে আসবে শ্রীগোপাল হালদারের বইটিরও নাম অনুষঙ্গে ('রূপনারায়ণের কূলে') 'তরী হতে তীর'-এর মতো নদীস্মৃতি জড়িয়ে আছে। স্মরণে আসবে দুটি গ্রন্থের নামকরণে রবীন্দ্রপ্রভাব প্রোজ্জ্বল। নদী চলিষ্ণুতার প্রতীক—চেতনার ক্রমরূপান্তরের সঙ্গে নদীর কোথায় একটা আত্মীয়তা আছে। তাই এই দু'জন পরিণতপ্রাজ্ঞ মনস্বী—যাঁদের কাছে বাংলাদেশের কয়েক প্রজন্মের যুবকেরা নতুন সমাজবোধে দীক্ষা নিয়েছে—তাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ অতীতের কথা বলতে গিয়ে নদীকেই প্রতীক করলেন নামকরণে।

'তরী হতে তীরে' এই গ্রন্থটির নামকরণের আরেকটি তাৎপর্যও স্পষ্ট হয় বইটি পড়তে পড়তে। তীর তরী থেকে যে পার্সপেক্‌টিভ পায়, সেটা লেখকের বর্ণনীয় বিষয়। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যে যে দিনগুলি ছিল নানা প্রশ্নে—সংশয়ে—উৎকণ্ঠায় চঞ্চল, তার এক প্রত্যক্ষ ছবি পাওয়া

যায় এ বইয়ের বহুলাংশে—সেই পরিবর্তমান বাংলাদেশেই লেখকের অভিযাত্রী তরণীর তটভূমি। প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি দিনগুলিতে দাদুর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতার বুকে নানা রসের ভোজ্য আস্বাদনও এই বইয়ে নিছক স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হয়নি—সেও হয়ে উঠেছে বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্ষণস্থায়ী সুখস্বর্গের শেষ আলোকরশ্মির হিসাব নিকাশ। নিজের কথার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে কতটা আমি পালটে গেছি। পাঁচশত তিরিশ পাতার এই বড়ো বইটিতে তিন দশকের বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক আলেখ্য অঙ্কনই ছিল লেখকের লক্ষ্য—সে তাগিদেই বইটি লেখা। 'মহানগর' পত্রিকায় 'তরী হতে তীর'-এর আলোচনাকালে আমি যা লিখেছিলাম তা এবারে একটু আবার বলছি—পুনরাবৃত্তিদোষ মার্জনীয়।

তিনি দেদীপ্যমান বা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। আই. এ. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম হয়ে হরিশচন্দ্র কবিরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্তি, পরে ঈশান স্কলার হীরেন্দ্রনাথ এতকাল ছিলেন ছাত্রদের কাছে সারস্বত সাধনার মূর্ত পুরুষ। তিনি যখন তাঁর আচার্যদের কথা বলেন তখন তা তো শুধু তৎকালীন বাংলার বিদ্যাজগতের বুধমণ্ডলীর বিবরণই হয় না, তা হয়ে ওঠে একটি সংকল্পবান প্রতিশ্রুতিশীল যুবকের হয়ে ওঠারও বিবরণ। স্মৃতির বৈভবে তাঁর প্রজন্মটাই ধন্য। আজ আমাদেরও ভাবতে ভাল লাগে যখন তিনি বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন বেরুলো রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী', যা নিয়ে পরে বুদ্ধদেব বসু কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর স্নাতক পর্যায়ের স্মৃতিকথাটি এই বইয়ের মূল্যবান অংশ। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেনও এই অংশটা সানুপুঙ্খ বিশ্বস্ততায়। মনে হয় তিনিও যেন লিখতে লিখতে নতুন করে সেই জীবনটা আরেকবার যাপন করেছেন। সাংস্কৃতিক আকাশে তখনও রবীন্দ্রনাথ অস্তপূর্ব রংরেজিনীর বর্ণাঢ্য সমারোহ ছড়াচ্ছেন—ভাবনায়, চেতনায় জায়মান তখন আধুনিক বাঙালির একাল। হীরেন্দ্রনাথ অচিরে দ্রষ্টা থেকে উত্তীর্ণ হবেন অন্যতম কুশীলবদের একজনে। শান্ত বিনয়ে তিনি সে পর্ব আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিলাত প্রবাস, ব্যারিস্টারি, অধ্যাপনার নানা অধ্যায় পড়তে পড়তে কিন্তু আমরা কখনই এক নস্টাল্‌জিয়াকোমল বৃদ্ধকে প্রত্যক্ষ করি না। বরঞ্চ পাই এক সপ্রতি অতিক্রান্ত যুবককে, যাঁরও 'জরা কেশাগ্রে স্তব্ধ', যিনি দূর থেকে দেখেছেন নিজেরই কর্মময় অতীতকে—সমালোচনা নিজেকে করতেও ছাড়েন নি। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবার আশঙ্কা নিয়ে পার্টিদরদী নারায়ণবাবুর ছবি বাঁধিয়ে রেখে দেবার মতো রসিকতায়ও তিনি হাসতেই জানেন। সুবোধ ঘোষ সংক্রান্ত উক্তির বিষয়ে তাঁর আত্মসমালোচনা স্মরণীয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঘোট মণ্ডল, কংগ্রেস সোসালিস্টদের বিচিত্র বামপন্থা—ইতিবৃত্তের ভঙ্গিতে অম্লকটু ভাষ্য সমেত রীতিমতো উপভোগ্য—এমনকী সেই জয়প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরিত লেনিনীয় ব্যঙ্গের ঝালমেশানো টেলিগ্রামটিও।

একথা তো ঠিকই যে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা। এবং একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, গণনাট্য সংঘ ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ ও পরে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগ পর্বে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ছিলেন পুরোধাদের একজন। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা

এবং বাংলার বাইরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গেও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সহযোগীর সান্নিধ্য গড়ে উঠেছে। সে তালিকায় সুরেন্দ্র গোস্বামী যেমন আছেন, সজ্জাদ জহীরও তেমনি আছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন আছেন, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও তেমনি আছেন। আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যাঁরা নেতা,—এমনকী সে কর্মকাণ্ডের নেপথ্যেও যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কারো কথাই প্রায় বাদ যায়নি। এইসব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে আমরা অনেক বৃহৎ ব্যক্তির লঘু মুহূর্তের দেখা পাই যাতে তাদের বৃহত্বের হানি ঘটে না কিন্তু মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণানের কথা এখানে উল্লেখ্য।

যতদূর মনে পড়ছে বোধহয় সিডনি লী একবার বলেছিলেন যে, 'ট্রুথফুল ট্রান্সমিশন অব পারসোন্যালিটি'' জীবনী রচনার প্রধান কথা। সে বিচার এ গ্রন্থে অতুলনীয়। গভীর জীবনপ্রীতি, সকৌতুক দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্যনিষ্ঠ মননশীলতা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজের মত ও সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেও তিনি তাঁর সহৃদয় প্রীতি সকল দিকে বিস্তারিত করে দিতে পেরেছিলেন। তিরিশের দশকের উৎকণ্ঠা চঞ্চল বাংলাদেশের একটি দলিলগ্রন্থ হয়েও বইটি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে একটি মনোজ্ঞ সৃষ্টি। এ সূত্রে আলাদা করে উল্লেখযোগ্য তাঁর ভাষা। সে ভাষা পরিচ্ছন্ন, ভাবালুতাবিহীন, ঋজু অথচ তা বেদনায় গাঢ় হতে জানে। প্রসঙ্গত বিশেষ করে মনে পড়ছে, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার দিনগুলির কথা। গ্রন্থমধ্যে জওহরলাল নেহেরু, রাধাকৃষ্ণন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের স্মরণীয় নানা রাজনৈতিক নেতা, কবি, শিল্পীর যে লেখচিত্র রয়েছে তা একই সঙ্গে উজ্জ্বল ও উপভোগ্য। এমনকী তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তখনও তিনি তাঁর ঋজু সৌজন্যকে পরিহার করেননি।

তাঁর সৌজন্য তাঁর পরিশীলিত বৈদগ্ধ্যের ও মানসিক আভিজাত্যের বিভা। দুটি শোনা গল্প এখানে বলছি। তারাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ চলছিল নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তু-সংলগ্ন জমিতে দাঁড়িয়ে। কথা প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের সূত্র ধরে বিষ্ণু দে ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা উঠল। স্মিত প্রসন্নমুখে তারাশঙ্কর এই দুজনের সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতির কথা বললেন। হীরেন্দ্রনাথকে—সুভদ্র সুজন সম্ভব উদার রসগ্রাহিতার জন্য তারাশঙ্কর যে একটা বিশেষ মূল্য দিতেন, তা তাঁর কথা থেকে উপলব্ধি করেছিলাম। দ্বিতীয় গল্পটি আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম। বাবা ছিলেন রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের একজন অফিসার। তাঁর অব্যবহিত ওপরওয়ালা ছিলেন ইংলন্ড থেকে আগত এক আহেলা সাহেব। সেই সাহেব দিল্লি গিয়েছিলেন সম্ভবত রেলওয়ে বোর্ডের আহ্বানে। ফিরে এসে তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বি. কে. (বাবার নাম বিজয়কুমার) হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি সম্বন্ধে কী জান? বাবা আমার কাছে থেকে স্যারের বিষয়ে যেটুকু শুনেছিলেন তা বলে দিলেন। শেষে এটুকুও বললেন, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় পার্লামেন্টে কম্যুনিস্ট ব্লকের নেতা। সাহেব একটুখানি চুপ করে থেকে বলেছিলেন—হতে পারে, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে এক কম্পার্টমেন্টে ফিরলাম—এরকম পারফেক্ট জেন্টলম্যান সচরাচর দেখা যায় না।

অসামান্য তাঁর বাগ্মিতা। সে অনেকদিন আগে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে অধ্যাপক কবির সাহেবের এক তর্কযুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। বিষয়

ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও পরিণাম। সমন্বয় সাধক ছিলেন যতদূর মনে পড়ছে বিজ্ঞান বিভাগের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। আমরা ছাত্ররা শুনতে গিয়েছিলাম স্যারের ইংরাজি। দীর্ঘকাল হয়ে গেল সে বক্তৃতার কথা আমার আজও মনে আছে। বিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল সে ভাষণ। ক্ষুরধার যুক্তি, উপযুক্ত তথ্য, কখনো ঈষৎ ব্যঙ্গরস, কখনো তর্কের সুনিপুণ অসিচালনায় দীপ্ত—আর সর্বোপরি অনর্গলিত সুনির্বাচিত বাক্যবিন্যাস। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় সেদিন যেন বাণীকণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এর কিছুকাল পরে আটচল্লিশ সাল নাগাদ স্যারের সঙ্গে সন্নিহিত হবার আবার একটা সুযোগ পেলাম। 'আবার একটা' এই শব্দবন্ধের একটি তাৎপর্য আছে। রিপন কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র যখন আমি স্যারের কাছে অভিনন্দিত ও তিরস্কৃত হবার মতো দুটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিলাম। 'পরিচয়'-এ গত সংখ্যায় 'ধূলির আখর'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে কথা আমি বলেছি। এখানে তা আবার বললে পুনরুক্তি দোষ হবে। কিন্তু একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়। ময়দানে আহূত হয়েছে পার্টির কেন্দ্রীয় সমাবেশ। নানা দিক থেকে মিছিলের পর মিছিল আসছে। আমি নৈহাটির ছাত্র মিছিলের সঙ্গে গেছি। সমাবেশে ঢোকবার মুখে দেখি একপাশে পূরণচাঁদ জোশি ও স্যার নিভৃত আলাপচারিতে মগ্ন। স্যারের চোখ আমার উপর পড়ামাত্র আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে স্যারকে লাল সেলাম জানালাম। স্যার সহাস্যে এক লহমাও দেরি না করে প্রত্যভিবাদন জানালেন। যে সৌজন্য প্রসঙ্গে এসব কথাগুলো বলছি—এ সেই অভিজাত সৌজন্য যা অকিঞ্চিৎকরকেও উপেক্ষা করে না। এখন আটচল্লিশ সালের অভিজ্ঞতার কথাটি বলছি—কংগ্রেস সরকার তাদের বর্বর গরিষ্ঠতার জোরে বিধানসভায় পাশ করাতে চাইছে 'কালা কানুন'—বিনা বিচারে আটক করার ক্ষমতা চাইছে তারা। তার প্রতিবাদে দিকে দিকে ধিক্কার মিছিল, জনসভা সংগঠিত হচ্ছে। নৈহাটির জনসভায় প্রধান বক্তা স্যার। নৈহাটির গোপাল বসু সভাপতি। আমিও একজন বক্তা। গোপাল বসু বললেন—কংগ্রেস শ্রমিক-শ্রেণীকে বলছে, দাবিদাওয়ার আন্দোলন বন্ধ রাখো, আপাতত শুধু ঘাম ঝরাও, তোমাদের পাওনাগণ্ডার কথা আমরা সময়মতো ভাববো। গোপাল বসু সহসা রবীন্দ্রনাথের গান থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, এ যেন আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসর মতো বাসিয়ো। এই আচমকা উদ্ধৃতির ধাক্কায় সুগম্ভীর স্যার সশব্দে হেসে উঠলেন। আমার মনে হল এই ব্যক্তির কাছে অসঙ্কোচে এগিয়ে যাওয়া যায়। গেলামও। স্যারকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্য স্টেশনে এলাম। নৈহাটি স্টেশনের একনম্বর প্লাটফর্মে নৈহাটি লোকাল ছাড়তে তখন দেরি আছে। ওই ট্রেনটি বেছেছিলাম এই কারণে যে সন্ধ্যার ট্রেন—ডাউন ট্রেন—নৈহাটি থেকেই ছাড়বে—স্যার স্বচ্ছন্দে বসে যেতে পারবেন। গাড়ির দেরি আছে। জনবিরল প্ল্যাটফর্মের একদিকে ঘাসজমির উপর একখানি বেঞ্চ। স্যারকে বসালাম। তিনি আমাকেও নির্দেশ দিলেন, তুমিও বোস। আমি তখন ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র। আমার পড়াশোনা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন। গল্পে গল্পে কথাপ্রসঙ্গে আমি জানালাম একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরি ক্রিস্টোফার কডওয়েলের ইল্যুশন অ্যাণ্ড রিয়্যালিটির কিছু অংশের উল্লেখ করে আমাদের বইটি পড়তে বললেন। এ সংবাদে স্যার খুব আনন্দিত হলেন। ওদিকে গাড়ি এসে গেল।

স্যারের সঙ্গে এরপর আর আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার হয়নি। কিন্তু স্যারকে জানাও

আমার ফুরোয়নি। বরং বলা যায় তাঁকে চেনা ও জানা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকল এরপর থেকেই। তিনি চলিষ্ণু ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আজও মানসিক অবধানতায় তিনি সচল—বহতা নদীতে কখনো শ্যাওলা পড়ে না। আমি আমার সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু তাঁকে বুঝেছি—তিনি যেমন সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে তৎপর, তেমনি তাঁর হৃদয়ের দরজা খোলা আছে সব কিছুর জন্য। তাঁর মধ্যে যে চৈতন্যবিন্দুতে মিলিত হয়েছে মার্কস এঙ্গেলস্-এর তত্ত্বদীপ্ত, রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ এবং বিষ্ণু দের মহানদীকল্প প্রতিমুহূর্তের সমুদ্র অভীপ্সা—সে চৈতন্যবিন্দু অবিভাজ্য। অর্জিত বিদ্যা ও বিশ্ববোধের সমাহারে উপলব্ধ সে চৈতন্য মানবিক কোনো কিছুকেই অস্বীকার করে না। যে বিশ্ববীক্ষা তাঁর সেই চৈতন্যবিন্দুর দান সে বিশ্ববীক্ষা আমাদের জানায়—'বিশ্ববীক্ষা প্রকৃত কর্মীকে বিশ্ববিরাজী করবে না তার পা থাকবে শক্ত মাটির উপর, আর সেই মাটির নীচে গভীর খাতে বয়ে চলবে জীবনের জল, দেশবাসীর শত ত্রুটি সত্ত্বেও তার মনে হবে—We are members of one another, মানবঘৃণা জাতিবৈরী, আত্মম্ভরিতা থেকে সে দূরে থাকবে। যে পথবাসী, যে গৃহহারা, সে গতিহীন হতে বাধ্য'। পায়ের তলায় মাটি পেলে তবে তো মানুষের দৃষ্টি সম্মুখের দিগন্তের দিকে ধাবিত হবে। আজই এই বিকৃত বিশ্বায়নের হুজুগে একথা আমরা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আবার শুনবো—'দেশের প্রতি মমতা এঁদের কাছে নিছক হাস্যকর কাণ্ড ; এঁদের একান্ত উপজীব্য হল আত্মশ্লাঘা—আর এঁদের রচনা ছড়িয়ে দেয় এঁদেরই বিকারগ্রস্ত মনের কদর্য বিষ, এঁদের তূণ থেকে নিক্ষিপ্ত শরের লক্ষ হল মানুষের আত্মসম্মান, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, একযোগে নবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হওয়ার আগ্রহ। শিল্পজগতে এঁরাই হলেন প্রতিক্রিয়ার নির্লজ সৈনিক, 'বিশ্ব' শব্দটি ব্যবহার করে নিজেদের মনের ব্যাপ্তি ও ঔদার্য প্রকাশ করতে চান বটে, কিন্তু এঁদের মুখোশ ভেদ করে আসল চেহারা সহজেই সবার চোখে ধরা পড়ে যাবে।' আজ কথাগুলি আরো সত্য।

তিনি প্রকৃত অর্থে নৈতিক অবধানতাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানেন পুরাগত জ্ঞানের আলোয় সমাগত কালের জটিলতাকে চিনতে হয়—সমাগত কালের সংঘর্ষে পুরাগত জ্ঞান তাঁর কাছে আধুনিক দ্যোতনা পায়। তাঁর কাছে মার্কসবাদ আর জীবনাকৃতি তাই অচ্ছেদ্য। তিনি ভারতীয় মনীষার শাশ্বত বাণীকে ব্যাখ্যা করেন এই ভাবে, 'আদিম স্তর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সমাজ জীবনের শ্রেণী শাসনের গ্লানি দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে গ্লানিকে কখনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যারা তারা মেনে নিতে পারেনি। বৈদিক ঋষি কল্পনা করেছিলেন প্রশান্ত মধুময় পরিবেশ—'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ঋষি শম্বর বলেছেন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি বা পুত্রের মৃত্যুর চেয়ে দারিদ্র্য আরো অসহনীয় দুঃখ, কারণ দারিদ্র পর্যায়মরণ নিয়ে আসে, তিলে তিলে পুড়িয়ে মারে। চিরজীবী বলে বর্ণিত বকঋষিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে তাঁর অতি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে সব চেয়ে বড়ো দুঃখ হল গর্বিত ধনীর হাতে দরিদ্রের লাঞ্ছনা।' হীরেন্দ্রনাথের এই উচ্চারণ শুধুই প্রাচীন ভারতবিদ্যার চর্চা নয়। এ যুগের বাস্তব বিশ্লেষকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছেন যে দারিদ্র্যকে 'পর্যায়মরণ' বলে মহাভারতকার ধিক্কৃত করেছিলেন, সে দারিদ্র্য দূর হল না, সমাজ রয়ে গেল মুষ্টিমেয়ের কর্তৃত্বে, দেশের দৌলতে মেহনতি

মানুষ ভাগ পেল না। জগৎ জীবনের এই কুৎসিত অসামঞ্জস্যকে কেবল ব্যাখ্যা করার জন্যই নয়, সমাজকে পরিবর্তিত করার জন্য মার্কস এঙ্গেলস-এর তত্ত্ববিশ্ব শুধু ব্যাখ্যাসূত্র নয়, কর্মবেদও বটে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সমাজবীক্ষণ অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মননঋদ্ধ সে বীক্ষণ কখনো পাণ্ডিত্যের কচকচি হয়ে ওঠেনি। বস্তুত, রাজনীতি সমাজনীতি আলোচনাকালে তাঁর চিন্তন পদ্ধতি, তাঁর সংবেদিতা ও প্রকাশ বৈশিষ্ট্য পরস্পরের সহযোগী হয়ে গড়ে তুলেছে তাঁর শৈলী। এ শৈলী তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভা। মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ জীবনকে ভালবাসেন। সেই ভালবাসা তাঁর গদ্যকে দিয়েছে একটা শ্রী। এমনকী যখন তিনি প্রধান ব্যক্তিত্বের প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন। তখনো তাঁর রচনা শ্রীভ্রষ্ট হয়নি। 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থের আলোচনায় নেহেরুজীর সম্বন্ধে সৌজন্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে লেখক পরিশেষে যা বললেন তা যেমন চোখা তেমনই রসদিগ্ধ। তিনি বললেন, নেহেরুজীকে 'সোশ্যালিস্ট বলতে যাওয়াই বাতুলতা। অবশ্য অনেক সময় মনে হয় মত স্থির করতে না পারাটাই হল নেহেরুজির বৈশিষ্ট্য। আর সঙ্কোচের এ বিহ্বলতা অনবদ্য ভাষায় তিনি প্রকাশ করতে পারেন বলেই তাঁর লেখা এত লোক আগ্রহ নিয়ে পড়ে।' ডাই হার্ড টোরি মহলে জলচল সোশ্যালিস্ট হিসাবে নেহেরুজি গণ্য হবার সংবাদে আজও আমরা কৌতুক অনুভব করি। বাক্‌শিল্পের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বৈদিক কবির প্রার্থনা—'ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীনিহিতাধিবাচি ডক্টর সুকুমার সেনের গদ্যে তার অর্থ হল—তাদের (জ্ঞানীদের) বচনে ভদ্র লক্ষ্মী নিহিত। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ রজনীতে অভ্যাগত অভ্যর্থনায় এগিয়ে যান নিরভিমান সৌজন্যে স্নিগ্ধ অম্লান হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হীরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্র সংস্রব ঘটে তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, তখন। 'একবার যখন জন চার পাঁচ মাত্র ছিলাম তখন কবি কিছুক্ষণ গল্প করার পর কয়েকটি গান শুনিয়েছিলেন—সেই গানের মধ্যে ছিল তখনকার সদ্য রচিত "একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি"। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একবার কাছে থেকে দেখছিলাম মহাপুরুষের সহজ সরল মহানুভবত্তা। যাঁর সান্নিধ্যে বাক্‌স্ফুট হবে না বলেই আমরা শঙ্কিত ছিলাম, সেখানে একান্ত সদাশয় একটি মানুষকে আমরা দেখলাম।' আমার এই প্রসঙ্গ অবতারণার একটি কারণ আছে। আমি বোধহয় একথা ভেবে খুব ভুল করবো না যে হীরেন্দ্রনাথের চৈতন্য মার্কসীয় দীপনে আলোকিত হবার আগেই তা হয়েছিল রবিরশ্মিতে উদ্ভাসিত। উনিশশো একত্রিশ থেকে তেত্রিশ রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতা ও কমলা বক্তৃতার কাল—উনিশশো ষোলো-য় তিনি ছিলেন 'বলাকা'-র গতিরাগে দীপ্ত। এ সমস্ত কিছু থেকে সেদিনের মনস্বী যুবক সংগ্রহ করেছিলেন এগিয়ে চলার প্রেরণা। এখান থেকে সেদিনের মেধাবী জিজ্ঞাসু যুবকের মার্কস এঙ্গল্‌স-এর বিশ্বতত্ত্বে অভিমুখীতা অনাড়ষ্ট হবারই কথা। হলও তাই। তিনি দেখলেন 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে যে বিশ্বপ্রকৃতি (মানব সমাজ যার অন্তর্ভুক্ত) নিয়ত পরিবর্তনশীল, কখনো বিকাশ পাচ্ছে, কখনো বা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এঙ্গেল্‌স বলেছেন : বালুকণা থেকে সূর্য পর্যন্ত, আদি জীবকোষ থেকে মানুষ পর্যন্ত, সব চেয়ে ছোটো থেকে সব চেয়ে বড়ো জিনিস পর্যন্ত বিশ্ব প্রকৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। 'মানুষের ধর্ম'-এ রবীন্দ্রনাথ বারে বারে যে গতির কথা, পরিবর্তনের কথা বলেছেন তার সঙ্গে অবশ্যই মার্কস্ এঙ্গেল্‌সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের

আত্মীয়তা খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। কিন্তু একথা তো বলতেই পারি, রবীন্দ্রনাথ থেকেই তাঁর এ শিক্ষাগ্রহণ যে মানুষকে এগুতে হয়—ভিতরের দিকে এবং বাইরের দিকে—পরিবর্তনের স্রোতের টানকে স্বীকার করতে করতে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে হীরেন্দ্রনাথ নিশ্চয় জেনে থাকবেন অবতত বিচরণ পরিহার করে মানুষ যেদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠল সেদিন মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সে সকল বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নিয়ত সতত পরিবর্তমানতার পথে নেমে পড়েছে। এভাবে রবীন্দ্রনাথ ও মার্কস-এঙ্গেলস একযোগে সত্য হয়ে ওঠেন হীরেন্দ্রনাথের জীবনে।

তাই সঠিকভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলতে পারেন—'রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তি হল এমন প্রকৃতির যে তাঁর কোনো পরিচ্ছেদকেই বোধহয় কক্ষচ্যুতি বলা চলে না। ক্রমান্বিত উত্তরণ মহিমা তাঁর বৈশিষ্ট্য—মহত্ত্বের অবিচল ভিত্তির উপর তিনি অবিরাম ইমারত বানিয়ে চলেছেন, তাদের শ্রী আর ছন্দে স্তরভেদ আছে, তারতম্য আছে, কোথাও বা বাঁধুনি ভেঙেছে তাল কেটে গেছে, কিন্তু মুহূর্তের নিষ্কৃতি তাঁর সহ্য হয়নি, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাওয়া আসা না করে তাঁর স্বস্তি ছিল না—একদিকে একক অন্যদিকে বহুমুখী তাঁর প্রতিভা।' তিনি আরো বলেন, 'ব্যাপ্তির উত্তরণপর্বের এমন বিপুল ঐশ্বর্য জগতের আর কোনো কবিতে মেলে না, গ্যেটে এবং হুগোতেও না। তাঁর ব্যক্তিত্বেরও তুলনা দেখি না—নিঃসঙ্গ কবির অবিরাম অভিযান ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা'। এই উদ্ধৃতিটির শেষ বাক্যাংশে যে কথা কয়টি বলা হল, তা এমন করে এর আগে এবং পরে আর কেউ বলেননি। বাক্যাংশটির ব্যাখ্যাও তিনি একটু পরে করে দিয়েছেন। খণ্ডিত সমাজ, পরবশ ক্ষুদ্রাশয় গৌণ জীবনচর্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে তাঁকে 'নিজেরই ব্যক্তিস্বরূপে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।' সে ব্যক্তিস্বরূপের মূল প্রেরণা ছিল সবরকম বন্ধন থেকে মুক্তির সাধনা। বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও, একাগ্র মহৎ সাধনা। উনিশশো সাতান্ন সালে হীরেন্দ্রনাথ যখন অটল প্রত্যয়ে বলেছিলেন 'আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি, তাহলে আমায় জবাব দিতে হবে "দুর্ভাগ্যক্রমে 'গোরা'।" আজ এতদিন বাঁদে শতাব্দী বদলের পরেও কথাটি নিয়ে আমি সে দিনের মতোই ভাবিত। সেদিনও যা মনে হয়েছিল আজও তাই মনে হয়—হীরেন্দ্রনাথের উত্তরটি সর্বতোগ্রাহ্য না হলেও অধিকাংশ গ্রাহ্য। আর যখন তিনি বলেন উপন্যাসই পারে বর্ষণের মধ্যে রামধনুর চিত্র অঙ্কন করতে, অথবা বলেন 'উপন্যাসকার যেন কীট্‌স্‌-এর ভাষায় বলতে পারেন 'Knowledge enormous makes a god of me' সর্বোচ্চস্তরের উপন্যাস হল গদ্যে মানুষজীবনের অন্তর্নিহিত কাহিনী, তখন বুঝি ইনি পেশাদার উপন্যাস তার্কিক নন—যথার্থ উপন্যাস রসজ্ঞ। আমি এই মুক্তমতি মহদাশয় আচার্যের কাছে শিখেছি, প্রকৃত ঔপন্যাসিক ব্যক্তি এবং সমাজের ভবিতব্য সম্বন্ধে অনীহাপরায়ণ হতে পারেন না। আমার স্যার যদি অনন্যমনা হয়ে শুধু উপন্যাস সমালোচনাই করতেন তাহলে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর করে খেতে হত না। আজ 'তিন বাঁড়ুজ্জে' এই শব্দবন্ধে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর মানিক এই ত্রিরত্নকে আমরা যথেচ্ছ গ্রথিত করি, তার মধ্যে কজন আমরা স্মরণ করি যে সে শব্দবন্ধের স্রষ্টা হীরেন্দ্রনাথ। তিনি আশ্চর্য বিচার-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই তিনজনের মূল্যায়নে। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'চারিদিকে

যখন অন্ধকার তখন তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ এবং মাণিক এই তিন বাঁড়ুজ্জের লেখা থেকে যে যে আলো বেরোচ্ছে তার দাম দিতে হবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে অনুধাবনযোগ্য হলেন তারাশঙ্কর।' এই উক্তির পরে তিন তিনটি পৃথক অনুচ্ছেদে তিনি বাঁড়ুজ্জের শক্তি এবং দুর্বলতার পরিমাপ করেছেন। দেখিয়েছেন এই তিনজনের জীবন সম্বন্ধীয় অভিনিবেশের বৈশিষ্ট্য কোথায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী হিসেবেই মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কারণ তিনি সবচেয়ে বেশী চেয়েছিলেন যাতে অখণ্ড জীবন-বোধ তাঁর আয়ত্ত হয়, আর তা আয়ত্ত হলে প্রতিফলনে তাঁর রচনা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।' তিনি বলেছেন মানিকের ইন্দ্রিয় সজাগ ছিল, কিন্তু চিত্তবৃত্তিতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব ছিল। 'আর তাছাড়া লেখাই যাঁর জীবিকা, তাঁকে যে হাজার যন্ত্রণার শর প্রতিদিন সইতে হয়, তা তাঁর দেহমনকে পিষে ফেলল। বাঙালির লজ্জার কথা, যখন আমরা এ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হলাম, তখন অতিরিক্ত বিলম্ব ঘটে গেছে। তাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহাবসান হল, জীবনযাপনের যে যন্ত্রণা আমাদের দেশে শিল্পীর সৃষ্টিশক্তিকেও বিকৃত ও ক্ষীণ করে ফেলে তারই যূপকাষ্ঠে তিনি হলেন বলি।' যে লেখক প্রথম ভাবতে বসেছিলেন মানুষের নিজের সঙ্গে তাঁর সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক ও সংঘাতের কথা, তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা স্মরণ করেও কী করুণ এপিটাফ!

এই লেখাটিতেই তারাশঙ্কর অংশে তিনি যে কথাগুলি বললেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য পড়তে পড়তে মনে হয় এই অংশটি যেন বুদ্ধদেব বসুর অ্যান একর অফ গ্রীন গ্র্যাসের তারাশঙ্কর সম্বন্ধীয় ভ্রান্তিবিলাসের সুভদ্র প্রতিবাদ। আরো মনে হয় তারাশঙ্করের দুর্বলতার মধ্যে কোথায় ছিল শক্তির ভাণ্ডার, এই শক্তি ও দুর্বলতার অপ্রতিভ সহাবস্থান সম্বন্ধে তিনিই প্রথম আমাদের সচেতন করেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন বড়ো মাপের লেখক বলেই তারাশঙ্করের সংকটও বড়ো মাপের। বুদ্ধদেব বসু যে ভুলটা করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ সে ভুলটা করলেন না। তিনি বললেন—'নিজের শিল্পীমানসকে পরিতুষ্ট করতে তাঁকে (তারাশঙ্করকে) সমাজের প্রত্যন্তে যেতে হয়েছে, যেখানে বাস করে বেদেনী আর কাহার আর সাপুড়ে—এদের বিষয় তিনি এমন প্রাণভরা মমতা নিয়ে লিখেছেন যে শিল্পগত দোষও প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।' হীরেন্দ্রনাথের কাছে তারাশঙ্করের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সততা আর নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি। হীরেন্দ্রনাথ নির্দ্বিধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যেদিক থেকে দেখি না কেন তিনিই আজ আমাদের সর্বাগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক।'

তিনি সহজাত রসবোধে সমৃদ্ধ। বিলিতি কেতাব থেকে আমদানি করা তত্ত্বে উচ্চকিত অনুবাদক সমালোচক তিনি নন। তাই তাঁর রস বিশ্লেষণ রসজ্ঞের দান। তাই তাঁর বিষ্ণু দে পাঠ আজও দিশারি হয়ে আছে। বর্তমান লেখক যখন মাত্র যুবক তখন সে বিষ্ণু দের কবিতার মন্ত্রকুহকে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সে জটিলতা তার কাছে ততদিন ছিল দুশ্চর; যতদিন না তাকে হীরেন্দ্রনাথের লেখা আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম সম্পাদকীয় ভাষ্যে দেখিয়ে দেয়—'অর্থঘনত্বের প্রয়াস আর সংযমের আতিশয্য বিষ্ণু দের কবিতায় বিশেষ লক্ষ করা যায়। সে প্রয়াসে তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভও করেছেন।' তখনই তিনি অনুধাবন করেছিলেন বিষ্ণু দের ক্রমপরিণামী গতির গূঢ়ার্থ—বলেছিলেন—'সম্প্রতি যে অবিকল্প ভঙ্গি ও প্রসঙ্গ

তাঁর লেখায় দেখা দিয়েছে তাতে ভরসা হয় যে মাত্র কয়েকজনের জন্য ইঙ্গিতবহুল ভাষা বর্জন করতে তাঁর কবি বিবেক আর বাধা দেবে না।' এর কয়েক দশক পরে হীরেন্দ্রনাথ লেখেন 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে'। তখন বিষ্ণু দে সম্বন্ধে তাঁর সর্বৈব অন্তরঙ্গতা গভীরে গিয়ে পৌঁছেচে। বর্তমান লেখকের সঙ্গে বিষ্ণু দে মহাশয়ের যে কয়েকবার আলাপচারি হয়েছে, কোনো না কোনো প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের কথা উঠেছে। বুঝেছিলাম একটা প্রীতি স্নিগ্ধ সৌহার্দ্য এঁদের দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্যার বললেন, 'মনের যে আপাত মধুর তরলতাকে আমরা সহজে অভ্যর্থনা করে এসেছি তার পরিবর্তে ভাবঘনত্ব কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করে তিনি অনেকের কাছে দুর্নাম পেয়েও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আবেগকে প্রকাশ করতে হলে তাকে স্বচ্ছ প্রস্রবণ বা চকিত বিস্ফোরণের আকার দেওয়া কবি যশঃপ্রার্থীদের পক্ষে দুরূহ নয়। কিন্তু গভীর কথা বলতে গেলে যে গভীর সুরেরই প্রয়োজন আর সঙ্গীত তরঙ্গের মধ্যে শ্রুতের চেয়ে অশ্রুতের মহিমা ও মাধুর্য যে কম নয়, এই বোধ সহজ জনপ্রিয়তাকে তুচ্ছ করে বাংলা কবিতায় সঞ্চার করার কাজে রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিষ্ণু দের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে বলতে বলতে উচ্চারিত হয় তাঁর অভ্রান্ত কাব্যভাষ্য—'বর্তমান যুগের জটিলতা দাবি করে—চিন্তার মুক্তি, অনুভূতির ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য, যে ত্রিধারায় পুষ্ট না হলে কাব্য-মন্দাকিনীর লাবণ্যও ম্লান হয়ে যায়।' সেক্ষেত্রে বিষ্ণু দের শ্রদ্ধেয় ভূমিকা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তথাকথিত স্নিগ্ধতার অভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ বিষ্ণুদের কবিতা বিচারে উঠত সে প্রসঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য আজও বরণীয়—'বাঙালি রচনায় স্নিগ্ধতা প্রায়ই কাল হয়েছে। বহুতর অভিযোগ আসবে যে তাঁর রচনাশৈলী স্বচ্ছ নয়, কিন্তু যে স্বচ্ছতা সুপ্রচুর আয়াসসাধ্য নয় তা অন্তত বাংলার কবিকুলের পক্ষে বর্জনীয়—অনায়াস কল্পনার রোমন্থনে আমাদের কাব্য কলঙ্কিত না হলেও ভারাক্রান্ত।' আমরা লক্ষ না করে পারি না হীরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধের বক্তব্যাংশের মধ্যে ব্যবধান কম। তিনি যেভাবে বিষ্ণু দের কবিকৃতিকে অবলোকন করলেন তা থেকে আমাদের মতো নতুন পড়ুয়ার কাছে স্পষ্ট হল বিষ্ণু দে-র দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার অনুধ্যান—হীরেন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেই বলছি :

স্বপ্ন আর মানে না কারাবন্ধ
বাগানে আর বাদায় বোনে ক্রান্তি
ত্রিকালে নাচে মুহূর্তের ছন্দ
মুঠিতে বাঁধে ঝঞ্ঝাময় শান্তি।

নানা নামরূপে বহুধাস্থিত স্যারের সত্তা। দীর্ঘ তাঁর অতীত। তাঁর স্মৃতির বৈভবে সমৃদ্ধ সত্তার যে বিচিত্র ইতিহাস তারই নাম 'তরী হতে তীর'। এ কোনো কম্যুনিস্ট নেতার সংগ্রামের ইতিবৃত্ত নয়—স্বরূপত জীবন-সন্ধ মানবপ্রেমিক, দেশ এবং বিশ্বমনস্ক এক খাঁটি বাঙালির অস্তিত্বের সতত সচলতার প্রমাণ এই বইয়ের পাতায় পাতায়। উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব—মহাকবির এই প্রার্থনা তাঁর প্রার্থনাতেও প্রতিধ্বনিত।

‘নাল্পে সুখমস্তি’, সদ্য-প্রগতিতে

সিদ্ধেশ্বর সেন

(অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু)

মনের-ই আশ্রয়, সে-উন্মেষের কাল,
ছিল সদ্য-প্রগতিতে,
জেনো, শুধু স্মৃতি নয়—

সে-যে বিরাটের সমীপে বিরাট,
অল্পে কিবা সুখ—
চতুর্ভিতে চার দেওয়াল—মনের জরীপ নয়

তাই, বিশ্ব নেমে আসে নীড়ে,
—যত্রং বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম—

আবিশ্বমানবে
মহাকবি-ও উৎসুক, ভূমৈব প্রেমে,
পরিব্রাজনে, আন্তর্জাতিকে

মনের-ই আশ্রয়, উন্মেষেরও কাল—
পা-ওঠানো পা-ফেলার
গতি-যতি ছন্দে

এত চলমান যাত্রার সৌন্দর্যে,
ধ’রে রেখে—
ঐতিহ্য ও সমকাল

এই স্মৃতিতে আকীর্ণ
উৎক্রমণের ইতিহাস,—বিস্ময়, সাহস
নয় ছিন্ন—

হৃদয়ে ধরোনি উত্তাল—সময়ের বিস্তার
তুমি প্রাণপণে—।
—দেশজ আধারে, কর্মে ও মননে মার্কসীয়—

সাহিত্যকৃতিতে, শিল্পিত রেখায়
দেখাওনি অর্জনে স্বকীয়—
প্রকাশের অভিব্যক্তি।

অতি-তারুণ্যে, সে-প্রগতির
পন্থ চিনে—
এই লেখক-ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী

—কবিতারও আধুনিকে, বিষয় ও বিষয়ীর নিরিখে
শিল্পের ফলিত মূল্যে—তুমি মানো শ্রেয়ে
বিবেকী ভূমিকা—

বলেছিও,—
অর্ধ-শতকও আগে কবির-ই 'সভ্যতার সংকটে',
চল্লিশের সে-প্রেরণা ঃ

কবির-শিল্পীর সততায়, এমন কি,
আত্মদানে—

মূল্যবোধ চিনে-জেনে
আঘাতে-সংঘাতে-স্ফূরণে

কলকাতায়ও অনন্য সুকান্ত, কবিবন্ধু,
সোমেন চন্দ ঢাকায়
প্রগতির ইতিহাস—এইসব, এমন ঔজ্জ্বল্যে
প্রাণবন্ত

জানি, 'নাল্পে সুখমস্তি'—তুমি বলো,

সেই তো, স্রষ্টার-শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়
দ্বান্দ্বিকের ঐক্যে পায়—
মানবিকে মুক্তি।

* আজ শতাব্দীস্পর্শী মনীষী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেই ১৯৪০-এর দশকের আমাদের প্রগতি লেখক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-পুরোধা। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ আমার এই কবিতা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর "আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর" প্রবন্ধ-গ্রন্থটি সেই প্রগতি-যুগেরই লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী, শিল্পী সোমনাথ হোর ও আমাকে একত্রে উৎসর্গ করে ধন্য করেন। "নাল্পে সুখমস্তি" তাঁর একটি প্রিয় ঔপনিষদিক সুক্ত কবিতার নামে দিয়েছি।

আমার প্রণাম

রাম বসু

কিছু কিছু মানুষ আছেন
যাঁকে প্রণাম করলে
বুকটাই হয়ে যায় বোশেখী আকাশ।

কিছু কিছু মানুষ আছেন
যাঁকে প্রণাম করলে
চোখ দুটো হয়ে যায় মৌসুমী সাগর।

কিছু কিছু মানুষ আছেন
যাঁকে প্রণাম করলে
দুটো হাত হয়ে যায় ফুলের স্তবক।

হীরেন মুখোপাধ্যায় এমন মানুষ, তাঁকে
বিবেক-বিনীত প্রণাম।

মূল্যায়ন

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম

নরহরি কবিরাজ

মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লেখার, বোধ করি, এটিই প্রথম শীর্ষক প্রচেষ্টা। এই বই পড়লে জানা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস শুধু কংগ্রেসের ইতিহাস নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন স্রোতধারার মিলন ঘটেছিল। এই আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংস সত্যাগ্রহ ছিল মূলস্রোত। কিন্তু তার পাশাপাশি চলেছিল মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের অপর একটি ধারা—যার মুখে মুখে ফিরত the cult of the bomb. তাছাড়া, শ্রমিক, কৃষকের সংগঠিত আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে অপর একটি ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বইখানি মার্কসীয় বিচার পদ্ধতির সৃষ্টিশীল প্রয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসের একটি নিজস্বতা একটি অনন্যতা, একটি মৌলিকত্ব থাকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অনন্যতায় ভরপুর। এই বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা বইখানির পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে।

এই বইয়ে গান্ধীজী পরিচালিত অহিংস সত্যাগ্রহের ধারাটিকে যেমন যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়েছে, তেমনি এই কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে স্বাধীনতা আন্দোলন যদি তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, তাহলে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের যোগাযোগের প্রশ্নটিও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের ব্যাপক যোগদান সুনিশ্চিত করতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল দাবির সঙ্গে মেহনতী মানুষের জীবন জীবিকা সংক্রান্ত দাবিগুলি (যেমন লাঙল যার জমি তার, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রভৃতি), আন্দোলনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতা আন্দোলন জনগণের চোখে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এক সময়ে বামপন্থীদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশেষ করে গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তি বিরাজ করত। গান্ধী আন্দোলন—বিপ্লবকে বানচাল করার আন্দোলন এই রকমের ধারণা পোষণ করা হত। এমন কী নেহেরু-সুভাষচন্দ্রকে শত্রুস্থানীয় বলে ভাবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এই বইয়ে এই সব সংকীর্ণতাবাদী চিন্তাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয়নি। গান্ধীজী পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যে একটি ইতিবাচক দিক আছে, এই আন্দোলনের যে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তাৎপর্য আছে, তা লেখক দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। আবার, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দুর্বলতার দিকটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন উত্তাল গণ-সংগ্রামের চেহারা নিয়ে ফেটে পড়ত, তখন আন্দোলন অহিংসার গণ্ডী অতিক্রম করছে—এই অজুহাতে গান্ধীজী

India's Struggle for freedom—Hiren Mukerjee

তাকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করতেন। গান্ধীজীর এই ধরনের কাজ এই বইয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজী কর্তৃক শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা জাতীয় আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের যোগদানের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল—এই উপলব্ধিও বইখানিতে খুবই স্পষ্ট।

আর একটি কথা। বামপন্থীদের পক্ষ থেকে এক সময়ে কংগ্রেস মঞ্চকে পরিত্যাগ করার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস মঞ্চকে পরিত্যাগ করা নয়, তার সদ্ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর লেখক জোর দিয়েছেন। কীভাবে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বামপন্থী চিন্তাকে তুলে ধরা সম্ভব ছিল, তার দৃষ্টান্তগুলি তিনি তুলে ধরেছেন—যেমন তিনি লিখেছেন—১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের মঞ্চেই 'সারা ভারত কিষাণ সভার' জন্ম হয়েছিল। কংগ্রেস মঞ্চকে গান্ধীবাদী, বামপন্থী—সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির মিলনক্ষেত্রে পরিণত করার আবশ্যকতার ওপর লেখক সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তবে নানা কারণে এই মিলিত উদ্যোগের চেষ্টা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন আপসহীন সংগ্রামের বদলে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার পথ। এই বোঝাপড়ার পথেই ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল এবং তার মূল্যস্বরূপ ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তটি কংগ্রেস নেতৃত্বকে মেনে নিতে হয়েছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা নয়, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের ভূমিকাটিও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে এই বইয়ে বিচার করা হয়েছিল বলেই প্রকাশ হওয়া মাত্র বইখানি পাঠক মহলে বিশেষে আগ্রহ সৃষ্টি করে। তখনকার দিনে তরুণ মার্কসবাদী গবেষকদের কাছে এই বই হয়ে উঠেছিল প্রেরণার উৎস।

ভারতের প্রবীণ ও অগ্রগণ্য ঐতিহাসিকদের অন্যতম অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে জানাই আমার অন্তরের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা।

তরী হতে তীর

সত্যপ্রিয় ঘোষ

স্কুলের অনেক বাধ্যবাধকতাই কলেজে নেই টের পাওয়ার পরে মহানন্দে স্বাধীনতা ভোগের যে-স্বাদটি সবচেয়ে বেশি নিয়েছিলাম সে হচ্ছে অপছন্দের অধ্যাপকদের ক্লাস বর্জন এবং পছন্দের অধ্যাপকদের ক্লাসে ঢুকে তন্ময় হয়ে থাকা। বয়সটা ছিল ষোলো, ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিকুলেট হয়ে কলকাতার রিপন কলেজে, বিজ্ঞান শাখায়, অ্যাটেনডেন্সের পার্সেন্টেজ বেশি খোয়ালে বিপদ আছে জেনেও দু-তিনজন বিজ্ঞানের ছাত্রের সঙ্গে আমিও যে হীরেন মুখার্জীর (এইচ. এন. এম. নয়, পরিষ্কার জানতাম সাদাসিধে ঐ মানুষটির নাম হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ক্লাসে ইতিহাসের কথা শোনার লোভে প্রথম প্রথম পেছনের বেঞ্চিতে ঘাপটি মেরে, শেষে ষাট-বাষট্টি জন ছাত্রের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ ধরার কোনও ব্যাপারই নেই বুঝে বেপরোয়া হয়ে এগিয়ে ওঁর কাছাকাছি বসে থাকতাম—সে যে কোন্ মোহে, কোন্ স্বপ্নে আমরা সেই প্রথম তারুণ্যে মেতেছিলাম তা এখনো আমার মনে এক সুখের অনুভূতি হয়ে আছে।

না, ঐ অধ্যাপক যে আই. এ. থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে কেবল ফার্স্ট হতেন, ইতিহাসের মতো কলাবিদ্যার একটি বিষয়ে অনার্স নিয়েও ঈশান স্কলার, বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেও আইনের ব্যবসায়ে টাকার পাহাড় না খুঁজে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের আহ্বানে চলে গিয়েছিলেন ওয়াল্টেয়ারে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি পড়াতে, বছর দেড়েক সেখানে থাকাকালীন সময়েই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের শরিক হয়ে, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন থেকে শুরু করেই তার সর্বোচ্চ নেতাদেরই একজন, ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতি হয়েছিলেন, সেই বছরেই কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর সদস্যপদ প্রাপ্তি—যা তাঁর নিজস্ব বিচারে ছিল দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি, দ্বিতীয় জন্মস্বরূপ; জানতাম না পারিবারিক চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ ত্যাগ করে যদিও তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ব্যারিস্টারিতে পসার জমাতে উঠে-পড়ে লাগতে, কিন্তু হাইকোর্টে বার লাইব্রেরিতে নামটি নথিভুক্ত করেও তিনি হাতের-পাঁচ যে-চাকরিটি নিয়েছেন তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়—রিপন কলেজে ইতিহাস বিভাগের প্রধান রূপে, সেই পৈঠায় পা রেখে তিনি জানমান সঁপেই চলেছিলেন তৎকালীন বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির প্রসারণকর্মে; জানতাম না ১৯৪০ সালেই 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ' নামে ওঁর একটি প্রবন্ধসংকলন প্রকাশিত হয়েছে; জানতাম না ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত সোভিয়েত সুহৃৎ সম্মেলনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বিশাল যে-সমাবেশটি হল তারও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি; জানতাম না ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রগতি লেখক সম্মেলনের উদ্যোক্তাদেরও অন্যতম তিনি; জানতাম না বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের মুখপত্রস্বরূপ 'প্রগতি' নামে যে-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৭ সালে, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে তার অন্যতর যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি।

প্রকৃতপক্ষে আমরা ক'জন যে ওঁর ক্লাসে ওঁর পাঠন চুপিসারে ভোগ করে চলেছিলাম তার পশ্চাতে ওঁর সম্বন্ধে আমার অন্তত কোনও পূর্ব-ধারণা ছিল না। ওঁর দীপ্ত পশ্চাৎপট এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মতৎপরতায় আমি ওঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম এমন নয়, কলেজে ছাত্রমহলের গুঞ্জনেই বুঝে গিয়েছিলাম ওঁর বাগ্মিতা অসাধারণ, ওঁর সরল ও খোলা মনের আহ্বানই ওঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, তাই খুবই আপসোস হত কেন আর্টসে ভর্তি হইনি, তাহলে ইতিহাস তো নিতেই পারতাম এবং নিশ্চিন্ত মনেই ওঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেতাম। উনি যেমন মিশতেন ছাত্রদের সঙ্গেও তাতে আমার কত লোভ হয়েছে ওঁর কাছে যাই, কিন্তু ভয় ছিল তাহলে তো তিনি জেনে যাবেন আমি বিজ্ঞান শাখার ছাত্র, সেক্ষেত্রে যদি তাঁর ক্লাসে বসা আর না হয়।

১৯৪০ সালে আমরা যারা কলেজে প্রবিষ্ট তখন ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালির তাণ্ডবে ইউরোপ জুড়ে বিশ্বযুদ্ধ এক বছরের পুরানো, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে হিটলারী-জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তির ফলে বামপন্থী ছাত্রসমাজও তখন হিটলারপ্রেমী, ভারত তথা বাংলার জনসাধারণ তো ইংরেজবিদ্বেষের ফলে সেই যুদ্ধে পুরোপুরি তখন অক্ষশক্তির পক্ষে। দেশবিদেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতে কলেজে-কলেজে ছাত্র-ফেডারেশনের মাধ্যমে তখন বামপন্থী সংহতি দানা বেঁধে আছে, ১৯৪১ সাল পর্যন্ত একাধিক ছাত্র-ইউনিয়ন তৈরি হয়নি, তরুণ ছাত্রসমাজ তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের তাপ-উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ও রক্ত চলাচলের ধমনীস্বরূপ। শেয়ালদা অঞ্চলের রিপন ও বঙ্গবাসী কলেজ তখন ভালো 'পড়াশুনার কলেজ' রূপেই স্বীকৃত ছিল, ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড-করা ছেলেরাও এই দুই কলেজেও তখন ভর্তি হত, অধ্যাপক-মণ্ডলীতে সেরা মস্তিষ্কের রত্নভাণ্ডার দুটি কলেজেই তখন ছিল বলে মর্যাদামণ্ডিত, তথাপি সঙ্কোচের সঙ্গে এ-কথা স্বীকার করতেই হয় সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে সে-সময় যাঁরা আমাদের মতো সাহিত্যমনস্ক ছাত্রদের কাছে স্বপ্নলোকের আরাধ্য ছিলেন তাঁদের অনেকেরই ক্লাস সে-সময়ে হট্টগোলে এবং ক্লাস-পালানোর মজায় বিপর্যস্ত ছিল, রোলকলিং-য়ে প্রক্সি, ক্লাসশুরুর আগে থেকেই হট্টমন্দির, রোলকলের পরেই বেঞ্চির তলাগুলো ছিল যেন সুড়ঙ্গপথ, ষাট-পঁয়ষট্টি জন বসতে পারে এমন-সব হলের মতো ক্লাসরুম অধ্যাপকের উপস্থিতিতেই ছাত্র কমতে কমতে যে কালে হতমান হত, এমনকি অধ্যাপককে হেনস্থাসূচক হরেক প্রকার আওয়াজে ও আচরণে ক্লাস ক্লাবের আড্ডাস্থলে পরিণত হত সে-সময়েই বিপরীত দৃশ্য রিপন কলেজে যাঁদের ক্লাসে দেখা যেত—ক্লাসে বেঞ্চিগুলো ছাত্রতে ঠাসা তেমনই ছিল হীরেন মুখার্জীর ক্লাস। চশমার মোটা লেন্সের নিচে প্রখর দৃষ্টির এই অধ্যাপকের ভাষণে তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররাও তন্ময় হয়ে থাকত। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ইতিহাস-ক্লাসে হীরেন্দ্রনাথের সেই জাদুমাখানো বাক্‌শৈলী, স্বদেশের ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্ব-ইতিহাসের তুলনামূলক ধরতাইগুলি আমার মতো মধ্যমানের ছাত্রদেরও উদ্দীপ্ত রাখতে যে পারত, তার এক ভাগ্যবান সাক্ষী ছিলাম আমি। প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে কথাটা মাঝেমধ্যেই যথার্থ বলে মনে হয় কেননা—যতই মাঝারি হই না কেন, ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমিও সাময়িকভাবে যেন বেশ সজীব উচ্চতায় উত্তীর্ণ হওয়ার স্বপ্নে

বিভোর হতে পারতাম। বাস্তবিকই, প্রকৃত বড়ো ক্ষুদ্রদেরও বড়োত্বের স্বাদ দেয়—ফলে এর উলটোটাও সত্য।

আমাদের সময়, ইন্টারমিডিয়েটের দুবছর, মজার কথা শুনে হাস্যমুখর হওয়ার আকর্ষণে ভরাট থাকত দুজন বাংলা-অধ্যাপকের ক্লাস, ইংরেজির এক অধ্যাপকের (সাহিত্যিক খ্যাতি যাঁর ছিল না) ক্লাসেও হট্টগোল হত না, বিজ্ঞানের ক্লাসগুলি তো পড়াশোনা, নোট নেওয়া, পরীক্ষামুখী অভিনিবেশে তৎপর থাকত—এ-সবের পরিপ্রেক্ষিতে হীরেন্দ্রনাথকে আমাদের মনে হত রিপন কলেজের মধ্যমণি।

এ-কথা স্বীকার করতেই হয় ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন সময়ে ছাত্ররাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে আমি ছিলাম এক ঋষ্যশৃঙ্গ, তথাপি 'তরী হতে তীর' গ্রন্থের লেখক হীরেন্দ্রনাথ আমার মতো ছাত্রদের জড়তামুক্তিতে সহায়ক হয়েছিলেন। এ-সব কথা লিখতে হল এইটে প্রতিপন্ন করতে যে এই গ্রন্থে তিনি রিপন কলেজে অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপকদের তুলনায় নিজেকে সাধারণ পর্যায়ে স্থাপন করেছেন। আত্ম-অবলুপ্তির স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে গ্রন্থটির মুখপাতেই তিনি জানিয়েছেন এই বিশাল গ্রন্থটির কেন্দ্রবিন্দু তিনি নন, এ-গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য তাঁর সমকালীন দেশবিদেশের মূল ঘটনাবলীর আলোচনা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির উত্থান-পতন এবং 'পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত'।

আত্মজীবনী বলতে সাধারণত লোকে যেমনটি বোঝে সে-অর্থে 'তরী হতে তীর' সত্যই আত্মকেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু যে-মানুষটি কৈশোর থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত আত্মমুখী জীবনের সম্প্রসারণ ঘটাতে পরাঙ্মুখ ছিলেন এবং আছেন তিনি যে নিজের বীক্ষণ দ্বারা আহ্নিক গতিতে সঙ্কীর্ণ আপন কক্ষপথেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না, তাঁর গতিপথ বিশ্বমুখীই হবে তাই 'তরী হতে তীর' গ্রন্থটি মামুলি কোনও আত্মজীবনী তো নয়ই, এ-গ্রন্থে আমরা পাই বাংলা তথা ভারত তথা বিশ্বের রাজনীতি-সমাজতত্ত্ব-সংস্কৃতি প্রবাহের বাংলাভাষায় লিখিত যুক্তিভিত্তিক এক ইতিবৃত্ত। এর প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে, প্রকাশক কলকাতার মনীষা গ্রন্থালয়, প্রথম সংস্করণে মূল্য ছিল কুড়ি টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫৬।

এই গ্রন্থে নিজের জীবনের নীতি বিষয়ে যা তিনি লিখেছেন এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃত করি 'মেহনতী মানুষের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিশিয়ে দিতে পারার গৌরব ছিটেফোঁটার বেশি দাবি করতে পারি না। সংসারী মনোবৃত্তি জীবনে কখনো সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি; নিজের আখেরের কথা কখনো ভাবিনি; ব্যারিস্টারি পেশায় উন্নতির লোভে পড়িনি; মাস্টারি করি, সুতরাং সেই এলাকায় জমিয়ে বসি, পাঠ্যপুস্তক লিখে কিছু জমাই, হয়তো বা কোথাও জমি কিনে রাখি, আস্তে আস্তে একটা বাড়ি বানাই, এ-ধরনের চিন্তা কখনো মনে আমল পায়নি। এ সবই অবশ্য হল নেতিবাচক ব্যাপার, ইতিবাচক দিকটা তেমন উজ্জ্বল বলতে পারি না। মোটামুটি একটা পরিচিতি আমার হয়েছিল দেশে; তাই কম্যুনিস্ট পার্টিতে স্থান পেয়েছিলাম, তার অমর্যাদা সজ্ঞানে করিনি বলতে পারি—পার্টিতে যোগ দেওয়া এবং যথাসম্ভব কাজ করে যাওয়া, অন্য কোনো ক্ষেত্রে মনোনিবেশ না করে যথাশক্তি একাগ্রতা নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীভূত হয়ে কাজ করে যাওয়া, সমাজের যে স্তরে আমার

অবস্থান সেখানে থেকেই, প্রকাশ্যে, কিছুটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাওয়া, একে কৃতিত্ব বলি না, কিন্তু এটাই ছিল বছরের পর বছর আমার নিত্যকৃত্য।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ.-তে ইতিহাসে প্রথম স্থান পাওয়ার পর ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি বিলেত যাত্রা করেন অক্সফোর্ডে অনার্স স্কুলে পড়তে এবং সেই সঙ্গে ব্যারিস্টারি অর্জন। সেখানে গিয়ে বিশ্ববিদ্যাবীক্ষণে তাঁর মনোজগতে এতটাই বিপ্লব ঘটেছিল যে তা থেকে যে-চারিত্র, যে-মেজাজ, যে-ব্যক্তিত্ব তাঁর আরও পরিণতি পেয়েছে তার মূল লক্ষ্য হল মানবতাকে মর্যাদাদান, অমানবিকতাকে শুধু ঘৃণা নয়, তার বিরুদ্ধে জেহাদী হওয়া এবং অন্নবস্ত্রবাসস্থানে সাধারণ মানুষের সাথী রূপে সাধারণ মানুষদের নিহিত সম্ভাবনাগুলোকে বিকশিত করতে সহায়তা প্রদানে সাধ্যমতো সজাগ থাকা। এই অর্থে হীরেন্দ্রনাথ প্রকৃতই সাম্যবাদী।

জগৎসংসারে প্রকৃতি কিন্তু স্বভাবতই তা নয়, তা অতি নিষ্ঠুর, সেখানে যোগ্যতমের উদ্বর্তন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়। প্রকৃতি তো তা-ই হবে, তোমার করণীয় কী? তার বদল ঘটাতে মদদ দাও—যোগ্যতমের পোঁ ধোরো না, তাদের বগলস্থ হয়ে বগলানন্দে পরিণত হোয়ো না। হীরেন্দ্রনাথ শিক্ষাদীক্ষাসংস্কৃতিতে যোগ্যতমদের পর্যায়ে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গজদন্তমিনারবাসী হয়ে কোনোদিনই থাকলেন না, আমজনতার কাছে আত্মমহিমা স্বেচ্ছায় তিনি অনবরত ছেঁটেছেন সারাটা জীবন। আশ্চর্যই লাগে ভাবতে যে যিনি নিজেকে অনায়াসে বিগ্রহ রূপে অগণিত জনতার অন্ধবিশ্বাসে পূজিত হতে দিতে পারতেন, তিনি জীবন-আচরণের সাধারণত্বে নিজেকে কিছুতেই বিগ্রহ হতে দিলেন না। এই ৯৫ বছর বয়সেও।

ইতিহাস বিষয়ে কেন আকৃষ্ট হলেন এই প্রশ্নে তিনি লিখেছেন 'ইতিহাস বিষয়ে একটা গভীর অনুরাগ যথাসাধ্য মনে জেগেছিল, মানুষের জীবনকথা সাহিত্যরস-সংস্পৃষ্ট এবং মোহময় রূপেই অন্তরকে আকর্ষণ করেছিল।'

'তরী হতে তীর' গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত কাল বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হলেও যেহেতু এটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৪ সালে, তাই স্বাধীনতার পরবর্তী অনেক কথাই এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবিষ্ট। এ-গ্রন্থে ওঁর আত্মচরিত্র-বিশ্লেষণও আছে বহুল পরিমাণে, সুতরাং এমন দুটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করতে চাই যা ওর চরিত্র-পর্যালোচনায় অবান্তর হবে না।

প্রথমটি হল ১৯৫২ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত শান্তি সংস্কৃতি সম্মেলন, ছয়দিন ব্যাপী অত্যন্ত বর্ণাঢ্য এই সম্মেলন ঘটেছিল প্রথম পাঁচ দিন পার্ক সার্কাস ময়দানে, শেষ দিন পার্ক সার্কাস থেকে মনুমেন্ট পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা এবং মনুমেন্টের পাদদেশে সায়াহ্নে বিশাল প্রকাশ্য জনসমাবেশের অধিবেশনে তার পরিসমাপ্তি। যুদ্ধোদ্যমে গোটা বিশ্ব তখনও সন্ত্রস্ত, তার নিরসনে এই সম্মেলনে প্রতিনিধি এসেছিলেন পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, নেপাল ইত্যাদি দেশ থেকেও। সেই সম্মেলনে তো বটেই, ঐ-উপলক্ষে ২ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সাতশো প্রতিনিধি প্রতিদিন সকাল ও দুপুরে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যুদ্ধবিষয়ক সঙ্কটের প্রতিরোধে ছয়টি বিষয়ে আলোচনাচক্রে মিলিত হন; বিষয়গুলি ছিল ১) বর্তমান সংকটে

সংস্কৃতি কর্মীদের জীবনযাপনের মান, ২) ক্রমবর্ধমান যুদ্ধবাদী প্রচারকার্য, ৩) ভারতীয় সংস্কৃতিতে শান্তি-নীতির ঐতিহ্য, ৪) বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী সমাজ-জীবনে ও সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার প্রভাব এবং ৬) শান্তি ও শিক্ষা জগৎ।

এইসব আলোচনাচক্রে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্যে হীরেন্দ্রনাথকে তো বটেই সেই সঙ্গে দেখেছি মুলুকরাজ আনন্দ, আলী সর্দার জাফরি, খাজা আহম্মদ আব্বাস, মকদুম মহীউদ্দীন, ভোগীলাল গান্ধী, পৃথ্বীরাজ কাপুর, গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, সুধী প্রধান, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক প্রমুখ শিল্পীসাহিত্যিকদের। পার্ক সার্কাসের বিশাল প্যান্ডেলে হাজার দশেক মানুষের অবাক দৃষ্টির সামনে পয়লা এপ্রিল থেকে পর পর পাঁচদিন প্রকৃতই এক স্বপ্নলোক বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল—আমেরিকা থেকে হাওয়ার্ড ফাস্ট ছাড়পত্র না পাওয়ায় আসতে পারেননি, কিন্তু তুরস্ক থেকে এসেছেন নাজিম হিকমত; ভারতের নানা প্রান্ত থেকে একত্র হয়েছিলেন মালয়ালাম ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ভাল্লাথোল, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, উদয়শঙ্কর, সুমিত্রানন্দন পন্থ, কৃষণ চন্দর, যামিনী রায়, মামা ওয়াড়েকর, পারভেজ শাহিদি, শেখ গোমানি, রমেশ শীল প্রমুখ শিল্পী ও লেখকেরা। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক সেই সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটল ময়দানের খোলা হাওয়ায়—নবীন মারাঠী লোকসঙ্গীতশিল্পী অমর শেখের লক্ষ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করানো গান 'নয়া তরানা গাওয়েঁ, আও জগ মেঁ ধুম মচায়েঁ'—আর তারপর সৈফুদ্দীন কিচলুর সুদীর্ঘ ভাষণ, ইংরেজি ভাষায়, সাহিত্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত বৃহৎ বৃহৎ বাক্যের সেই তাৎক্ষণিক ভাষণের অনুবাদ স্বচ্ছন্দে বাংলায় করে চলেছেন হীরেন্দ্রনাথ—বিদেশি একটি ভাষা থেকে মাতৃভাষায় সেই অনর্গল অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে জনসমুদ্রে যে জাগরণ সেদিন ঘটেছিল, সেই কৃত্যে হীরেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় এক স্মরণীয় ঘটনা।

অথচ ভাবতে মজা লাগে এই মানুষটিই নাকি একদিন বামপন্থীদের এক মিলনস্থল ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের ঘরটিতে কী একটা বিষয় বাংলায় বোঝাতে পারছিলেন না বলে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাট্টা করে বলেছিলেন : হীরেন, তুমি ইংরেজিতে বলো—কথাটা কবি রাম বসুর কাছে শোনা।

আপাত-বিচারে তুচ্ছ হলেও, ওঁর জ্ঞান ও কর্মের বিশাল পরিধি বোঝাতে ব্যক্তিগত একটি ঘটনার উল্লেখ করি। ম্যাকসিম গোর্কির জন্মশতবর্ষে, ১৯৬৮ সালে, রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত ক্রান্তি নামে এক বাংলা ত্রৈমাসিকপত্রে 'বাংলাসাহিত্যে গোর্কির প্রভাব' নামে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম; সেটি প্রকাশের কিছুদিন পরেই হীরেন্দ্রনাথ দিল্লি থেকে সম্পাদককে চিঠিতে জানালেন প্রবন্ধটি তিনি পড়েছেন, প্রশংসাসূচক কিছু কথার পর ওটির ইংরেজি অনুবাদ চেয়েছিলেন ইন্ডো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্র Amity-তে প্রকাশের জন্য, অনুবাদটি করে দিয়েছিল আমার ভ্রাতা নিত্যপ্রিয়, ১৯৬৮ সালেই তা প্রকাশিত হওয়ার পর হীরেন্দ্রনাথ ক্রান্তি-সম্পাদককে পুনরায় তাঁর ভালো লাগার কথা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন।

বৃহৎ ব্যক্তিত্বরা সকলেই যদি এমনটি হতে পারতেন তাহলে সাম্যবাদকে কার সাধ্যি বলতে পারত ইউটোপিয়ান?

'তরী হতে তীর'—এই মহাগ্রন্থ আমাদের দেশকালের শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির পর্যালোচনায় যেন এক উত্তুঙ্গ আকাশপ্রদীপ। হীরেন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ অস্তিত্বে অন্ধ ভক্তির কোনও স্থান নেই, প্রখর যুক্তিবাদীদের কাছে অলৌকিক কথাটাই হাস্যকর, কিন্তু এই উপলব্ধি আমাদের থাকা দরকার কেন তিনি বলেন 'কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিনি, দর্শনযোগ্য কিছু আছে শুনিনি বলে, অথচ দশাশ্বমেধ ঘাট বা বিশ্বনাথের গলি আমায় মুগ্ধ করেছে। এ হল অবশ্য কিঞ্চিৎ বয়ঃপরিণতির পরবর্তী ঘটনা, কিন্তু একটা ব্যাপার ছেলেবেলায় মনকে কেমন অদ্ভুত নাড়া দিত এবং আজও দেয়—আকাশপ্রদীপ দেখে আমি আজীবন উতলা হয়েছি, আজও হঠাৎ তুচ্ছ এক গৃহশিখরে আকাশপ্রদীপ জ্বলছে দেখতে পেলে অদ্ভুত এক আনন্দের অবধি আমার থাকে না।'

হীরেন্দ্রনাথের গান্ধী-ভাবনা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই নব্বুই উত্তীর্ণ বয়সেও বঙ্গের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য জগতের প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্ব ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মূলত মার্কসবাদী রূপেই আত্মপরিচয় দিয়ে থাকেন। ইচ্ছা করেই আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করিনি। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে অবিভক্ত বঙ্গ এবং সমগ্র ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘকাল তাঁর বিশিষ্ট অবদান থাকলেও বর্তমানে তিনি রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত নন বলা যেতে পারে। তবু মার্কসবাদে তাঁর অনন্য নিষ্ঠা। সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপ অথবা চীন প্রমুখ দেশে একদা মার্কসবাদের ফলিত রূপ আশা ও উদ্দীপনার যে উজ্জ্বল প্লাবন সৃষ্টি করেছিল তা বর্তমানে নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও হীরেন্দ্রনাথের মার্কসবাদে আস্থার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি সৎ মার্কসবাদী। নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী। তাই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও তিনি 'জগৎজোড়া কমিউনিস্ট প্রত্যয়' অবিচলিত চিত্তে ঘোষণা করে এর প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেছেন 'যে বিপ্লবের পরাজয় নেই।'[১]

এমন একজন একনিষ্ঠ মার্কসবাদীর গান্ধী-ভাবনা তাই স্বভাবতই মনে কৌতূহলের উদ্রেক করে। ইচ্ছা করলে আরও অনেক মার্কসবাদীর মতো সোভিয়েট এনসাইক্লোপেডিয়ার প্রথম সংস্করণ অনুসরণে গান্ধীর মূল্যায়ন তিনি করতে পারতেন। অথবা রজনীপাম দত্তের মতো ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির যে নেতার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্লেষণ একদা ভারতের মার্কসবাদীদের কাছে প্রায় বেদবাক্য ছিল তদনুসারে গান্ধীকে This Jonat of revolution this general of unmitigated distress, this mascot of bourgeoise রূপে চিন্তিত করেও দায়মুক্ত হতে পারতেন। অনেক কমিউনিস্ট অতীতে এমন করেছিলেন, কেউ কেউ এখনও এই অভিমতের উচ্চারণকারী। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ তা করেননি। তাঁর মৌলিকতা তাঁকে ওভাবে পরের মুখের ঝালে তৃপ্ত হতে দেয়নি। তিনি নিজের মতো করে গান্ধীর মূল্যায়ন করছেন। কারণ তিনি সৎ মার্কসবাদী। বিবেকশীল মানুষ।

সেই বিবেকের প্রেরণাতেই তাঁর মনে হয়েছে যে গান্ধীরূপী 'phenomenon' (অনুবাদ স্বরূপ অপূর্ব বা অসাধারণ দৃশ্য শব্দবন্ধে তাঁর বক্তব্যের ব্যঞ্জনা যথাযথভাবে ধরা পড়ে না। বলেই মূল শব্দটিই রাখা হল) সম্বন্ধে তাঁর লেখা উচিত। গান্ধীর খুব কাছের মানুষ না হলেও তিনি ছিলেন গান্ধীযুগের মানুষ। আর তাঁর স্বীকারোক্তি অনুসারে[২] প্রথম যৌবনে তিনি 'প্রায় গান্ধী অনুরাগী ছিলেন।' অনেক দিনের দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে তাই তিনি ১৯৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিধিবদ্ধভাবে গান্ধীজীর সম্বন্ধে লিখলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে এটা কোনও ভাবাবেগের ব্যাপার নয়, এটা তাঁর একটা 'অবশ্য কর্তব্যও বটে।'[৩] তবে নিঃসন্দেহেই তাঁকে তলোয়ারের ধারের উপর চলার চেয়েও দুরূহ কৃত্য অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কারণ

গান্ধী সম্বন্ধে প্রথম বিধিবদ্ধভাবে লেখার কালে তিনি কেবল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতের মার্কসবাদী নন, লোকসভায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মসূচির প্রধান প্রবক্তাও বটেন। আর নেহেরুর নেতৃত্বাধীন শাসক কংগ্রেস দল গান্ধীনীতির অনুসারী না হলেও জনসমর্থনের জন্য তখনও গান্ধীর উত্তরাধিকারীরূপে নিজেদের প্রচার করতেন। কমিউনিস্ট বিশ্বাসের জন্য কংগ্রেসী শাসনের বিরূপ সমালোচনা হীরেন্দ্রনাথের নিত্যকর্ম ছিল। তাঁর দ্বিতীয় সমস্য ছিল গান্ধী অনুগামীদের দ্বারা তাঁর গান্ধী-অধ্যয়নকে মার্কসবাদী হবার কারণে নস্যাৎ করার চেষ্টা।

যে 'phenomenon' সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথ না লিখে থাকতে পারেননি, তাঁর সম্বন্ধে লেখার জন্য তিনি অতীব সঙ্গত কারণেই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর সমালোচক—তথাকথিত 'গান্ধীবাদীদের' সমালোচনা অগ্রাহ্য করেছিলেন। কারণ গান্ধী স্বয়ং কোনও 'গান্ধীবাদ' বা 'গান্ধীবাদীর' অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থের উপযুক্ত স্থানে তার উল্লেখও করেছেন। গান্ধী ঐ প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু বলেন যে তিনি কেবল সত্য তাঁর কাছে যখন যে রকম প্রতিভাত হয়েছে তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি পৃথিবীকে কোনও নূতন সত্য দেননি বা কোনও পন্থেরও প্রবর্তন করেননি। এর ফলে এই মূর্তিপূজা ও গুরুবাদের দেশে গান্ধী পরিত্রাণ পেয়েছেন। গান্ধীর কোনও একাধিকার বা পেটেন্ট হবার সর্বনাশা সম্ভাবনা তিনি নিজেই বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে গান্ধী সবার। অর্থাৎ যতটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেহেরু-কৃপালিনী অথবা রাজনীতির বাইরের বিনোবা-জয়প্রকাশের, ঠিক ততটাই হীরেন্দ্রনাথ অথবা নাম্বুদ্রিপাদের। হীরেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে স্বাধিকারের প্রয়োগ করেছিলেন।

নিজেদের মার্কসবাদী সমাজের বিরূপ সমালোচনা পরিহার করার ব্যাপারে বোধহয় তিনি ভরসা পেয়েছিলেন ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কাছ থেকে। তখনও পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেসের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪২ খ্রি. 'ভারতছাড়' আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন কমিউনিস্টরা দ্রুত ভূমিকা পরিবর্তনের পর। তবু গান্ধী ও কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও তখন বিদেশে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর এক দিগন্ত উন্মুক্ত করায় রত সুভাষচন্দ্রই প্রথম গান্ধীকে 'জাতির পিতা'-র স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ভারতের বাস্তব অবস্থার পটভূমিকায় কমিউনিস্টরাও গান্ধীর সেই ভূমিকা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কেবল সোমনাথ লাহিড়ীর মতো স্থিতধী রাজ্যস্তরের নেতাই নন, তাঁর মতো আরও অনেকের সঙ্গে পার্টির তদানীন্তন সম্পাদক পুরণচন্দ যোশীও গান্ধীকে জাতির জনকের স্বীকৃতি দিতেন ঐ কালপর্বে। কিন্তু স্বভাবতই তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রকাশ্যে বাদ-বিবাদে অবতীর্ণ হতে অথবা গান্ধির মত ও পথের কঠোর সমালোচনা করায় বাধা ছিল না।

গান্ধী সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তন-মনন ও মূল্যায়ন পুষ্ট হয়েছিল ভিয়েতনামের সংগ্রামী নেতা হো-চি-মিন-এর মন্তব্যে। গান্ধীর মূল্যায়নের ইংরাজি গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সেকালে (১৯৬৮ খ্রি. ৭ এপ্রিল) ভারতীয় সংবাদপত্রে বহুল প্রচারিত (হীরেন্দ্রনাথ দিল্লির Times of India থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন) সেই বিশ্ব কমিউনিস্ট অন্দোলনের অগ্রণী

নেতার মন্তব্য অন্যান্য ভারতবাসীর মতো স্বভাবতই হীরেন্দ্রনাথকে উদ্দীপিত করেছিল। ভারতে সফররত ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐ অদ্বিতীয় নেতাকে কোনও সাংবাদিক প্রশ্নোত্তর পর্বে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ভূমিকার তুলনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। হো-চি-মিন ত্বরিৎ উত্তর দিয়েছিলেন যে ও এক 'ভুল প্রশ্ন' এবং মহাত্মার সঙ্গে তাঁর তুলনাটা 'বোকামি'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন যে, "আমি বা আরও অনেকে বিপ্লবী হতে পারি, তবে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য। এর বেশিও নয়, কমও নয়।"

তৃতীয় সংস্করণের ঐ সুদীর্ঘ ভূমিকাতে (১৯৭৯ খ্রি.) গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক ও সঙ্গে সঙ্গে সাহসী মূল্যায়নের আরও দুটি উদাহরণের বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। "গান্ধী কদাচ শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিভাষায় চিন্তা করেননি এবং বরাবরই তিনি শ্রেণী-বৈষম্যের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতেন। তবে তিনি যেসব কাজকর্ম নিরন্তর করতেন ও সেই প্রক্রিয়ায় জনগণের কাছে যে বিশেষ আবেদন ও অনুরোধ তিনি জানাতেন তা নিঃসন্দেহে জনসাধারণের চেতনাকে অধিকতর বিকশিত করত। এর ফলে সামাজিক সমস্যাগুলি অত্যন্ত গুরুত্ব পেত এবং জাতীয় আন্দোলনেও এক শক্তিশালী জনমুখী দিগন্তের সংযুক্তি ঘটত।" ভূমিকার উপসংহারপর্বে তিনি কার্ল মার্কসের সঙ্গে গান্ধীর সাযুজ্য আবিষ্কার করেছেন। তবে তার পরিচয় দেবার পূর্বে বর্তমান সমীক্ষকের একটি সীমাবদ্ধতার এজাহার করে নেওয়া প্রয়োজন। হীরেন্দ্রনাথের রচনা কেবল ভাব-গরিষ্ঠই নয়, তাঁর ভাষা ও রচনাশৈলীও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-শিল্প-সুষমামণ্ডিত। তাঁর মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরাজি উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর এই সব্যসাচী-সম অধিকার। সুতরাং তাঁর রস পেতে ইংরাজি রচনায় যথার্থ অনুবাদ দুরূহ। আর কোনও মতে একটা ভাষান্তর যদি বা খাড়া করা যায়, তাতে মূল লেখকের সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা বজায় রাখা কঠিন বলে সে অনুবাদে মূল লেখকের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্ভব হবে না। তাই তাঁর ইংরাজি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেবার বদলে অনেক স্থলেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো ভাবানুবাদে তৃপ্ত থাকতে হবে।

অতঃপর তাঁর দৃষ্টিতে মার্কসের সঙ্গে গান্ধীর সাযুজ্য প্রসঙ্গ। মার্কস ব্যক্তির সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং পরিণামে সমাজের বিকলাঙ্গ পরিণতির কারণ নিয়ে বহু বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন। অর্থের ভূমিকায় মার্কসকৃত বিস্তারিত চিত্রণ এবং মানুষে মানুষে 'যথার্থ মানবিক' সম্বন্ধাবলী সম্বন্ধে তাঁর জোরালো সওয়ালের কথা আমরা জানি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিকশিত দেশগুলিতে সাম্প্রতিককালে জীবনের মানবিকতার মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বাদ-বিচার করার যে তীব্র অভীপ্সা লক্ষিত হয় তা দেখা মাত্র গান্ধীর কথা মনে আসে। কারণ একমাত্র এই মানবিকতা অশ্রিত জীবনই পারে সভ্যতা ও ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে দেবার উপভোক্তাবাদী মানসিকতার জোয়ারের গতিরোধ করতে।... অনাগত যে যুগের পটোন্মোচন পর্ব আমাদের চক্ষের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে যদি যথার্থ স্বাধীনতা প্রেমীদের এক সমাজের অবির্ভাব ঘটে, তাতে যদি মানুষে মানুষে সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আশানুরূপ জনহিতৈষিতা বৃত্তির বিকাশ সম্ভব হয় এবং সেখানে যদি ভেদাভেদ ঈর্ষা-অসূয়া ও সর্ববিধ সংকীর্ণতা পরিহার করে চলা মোটামুটি

সম্ভবপর হয় তাহলে তাকে ভারতের সেই মহৎ ব্যক্তির আদর্শের পরিপূর্তিও আখ্যা দেওয়া যাবে যিনি তাঁর স্বদেশের জরাপীড়িত নর-নারীর জীবনের সঙ্গে একক অথচ গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যিনি তাঁর নিজস্ব দৃশ্যত অসম্ভব অথচ সত্য পদ্ধতিতে এমন এক যুগের সৃষ্টি করেছিলেন, আমরা যাতে বাস করছি।

।। ২ ।।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান্ধী-ভাবনার এই চালচিত্রের পটভূমিকায় তাঁর গান্ধীর মূল্যায়ন প্রয়াসকে স্থাপিত করা হবে। আর এ কার্য সাধিত হবে দুটি পর্যায়ে যার প্রথম চরণ হল গান্ধীজীর যেসব ভূমিকার জন্য হীরেন্দ্রনাথের মতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অদ্বিতীয়। "....ইতিহাসে কখনও এমনভাবে একজন ব্যক্তি এত বিপুল সংখ্যক মানুষের এত দীর্ঘকালীন সংগ্রামে এমন নিরন্তরভাবে এই পরিব্রজি সেবা ও পথপ্রদর্শন করেননি। আর এ এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের জীবনে স্বাধীনতার আবির্ভাব তার প্রারম্ভিক ভার বা চাপ থেকে উত্তরিত হয়ে বিশ্বের নৈতিক পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে বাধ্য।"[৪] গান্ধী সম্বন্ধে এ জাতীয় আরও দুটি মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর প্রথমটি হল, "মুক্তির সন্ধানে সংগ্রামরত ভারতের ইতিহাসে অপর কোন ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীর মত এমন বিপুল ভূমিকা পালন করেননি, আর তিনি একাকীও ছিলেন না।"[৫] একক ব্যক্তির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। পুনরপি "যে কোনো ও নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করার জন্য নাড়া দিয়েছিলেন বেশী। হিন্দু পুরাণের ভগীরথ যেমন তপস্যায় দেবতাদের সন্তুষ্ট করে ধরাতলকে সজীব করতে গঙ্গাবতরণ ঘটিয়েছিলেন, গান্ধীও তেমনি তৃষিত-তাপিত ও বহু শতাব্দীর ধূলি-অবর্জনায় মলিন এক দেশে নিয়ে এসেছিলেন সঞ্জবনী-বারি। তাঁর সাধনায় আবির্ভূত এই প্রাণদায়ী জলধারা ছিল গঙ্গারই মত হিমালয়-জাত, সর্বতোভাবে ভারতীয়।"[৬]

যে-কোনও মহৎ সৃষ্টির বীজকে স্রষ্টা বহু দিন চিত্তের ক্ষেত্রে লালন-পালন বা ধারণ করে রাখার পরই লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হন। মায়ের গর্ভস্থ ভ্রূণকে সর্বতোভাবে পুষ্টি সরবরাহ করার মতোই ইতিমধ্যে তাঁকে তার পরিপোষণ করতে হয়। গান্ধী সম্বন্ধে লেখার ইচ্ছা মনে জাগলেও অবিলম্বে লিখতে না বসায় হীরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্বে তাঁর সৃষ্টিকে সার্থক পূর্ণাঙ্গ করেই পাঠকদের দরবারে হাজির করেছিলেন। গান্ধী জীবনীর রচনাকাল তাঁর রাজনৈতিক ও জনসেবামূলক জীবনের চরম ব্যস্ততার পর্ব। তারই মধ্যে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা অতুলনীয় না হলে এ সম্ভব হত না। প্রতিটি সংস্করণেই তিনি এর কেবল পরিমার্জনাই করেননি, নূতন তথ্যের সংযোজনও করেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ২০০ পৃষ্ঠার কিঞ্চিৎ অধিক হলেও তা বহু অধ্যয়ন এবং চিন্তন-মননের স্বাক্ষরবাহী। আর এই কারণে যে-কোনও গান্ধী-গবেষকের কাছে এ গ্রন্থ অপরিহার্য। গান্ধী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি উপস্থাপনের সঙ্গে তার পটভূমিকায় গান্ধী মত ও পথের উপর নিজস্ব মৌলিক বিচার বিশ্লেষণের আলোকসম্পাত করেছেন বলেই এ রচনার গুরুত্ব। এই একই কারণে গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে মার্কসবাদী আলোচনা সভায় উপস্থাপিত তাঁর গান্ধী-ভাবনার গুরুত্ব। উভয় রচনাতেই একাধিকবার তিনি স্বীকার করেছেন

যে গান্ধীর সঙ্গে মার্কসবাদী হবার কারণে তাঁদের মৌলিক বিরোধ সত্ত্বেও "তাঁর সম্বন্ধে আমরা অধ্যয়ন করে থাকি গুণ দোষ বিচারপূর্বক। তবে এ অধ্যয়ন একই সঙ্গে শ্রদ্ধাযুক্তও বটে। আর এই প্রক্রিয়ায় যেমন তাঁর এবং তাঁর কৃতি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যেসব ভক্তি-গদ্গদ চাটুবাক্য উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তার সঙ্গে আমরা সহমত নই তেমনি আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি এমন একজন মানুষ হিসাবে যিনি অপর যে কোন ব্যক্তির তুলনায় তাঁর স্বদেশের জনগণের জীবনের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করেছিলেন এবং যিনি—যতটা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব—ভারতের রাজনীতির বায়ুমণ্ডলকেই পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন।"[৭]

স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাস ও ভারতের জনগণের পুনর্জীবনের প্রক্রিয়ায় হীরেন্দ্রনাথের মতে গান্ধির অন্যতম প্রধান অবদান হল দেশবাসীকে অভীঃ মন্ত্রের দীক্ষাদান। অর্থাৎ বহুযুগ যাবত যে ভারতবাসী কেবল শাসন-শোষণের শৃঙ্খলেই নয়, ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে সব নানা ধরনের নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকার জন্য প্রাণশক্তিকে প্রায় কুণ্ঠিত করে ফেলেছিল, তার অবসান ঘটানোর অগ্রনায়ক ছিলেন গান্ধী। গান্ধী-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা স্বদেশের পুঁজিপতি-জমিদার-মহাজনদের শোষণ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বা সরাসরি প্রতিবাদ করার বদলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বা প্রকারান্তরে মন্তব্য করা ও বড় বেশি হলে গোপনে আন্দোলন করাই প্রচলিত প্রথা ছিল। হীরেন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনকে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে 'শয়তানী' আখ্যা দিয়ে গান্ধীই সর্বাগ্রে জনগণকে স্পষ্টবক্তা হবার সাহস জুগিয়েছিলেন। আদালতে অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ড থেকে বাঁচার কোনও করার প্রয়াস না করে বিচারকের সামনে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন "জানি যে আমি আগুন নিয়ে খেলা করছি। আমি ঝুঁকি নিয়েছি এবং আমি যদি মুক্তি পাই আবার এই কাজ করব।" হীরেন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ করেছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে একদিকে অশিক্ষিত শ্রমিক সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ এবং অপর দিকে সাধারণত সংঘর্ষবিমুখ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দমন পীড়ন ও কারাভয় থেকে তাদের মুক্ত করার প্রক্রিয়া ভারতেও গান্ধীযুগের রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। যে-কোনও প্রচলিত ক্ষমতার অবলুপ্তির পূর্বে তার প্রতিষ্ঠা বা ইজ্জত প্রথমে চলে যায়। ভারতেও ব্রিটিশ ক্ষমতার দৃশ্যরূপ পুলিশ, থানা, আদালত, হাকিম এবং কারাগার ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনের সম্ভ্রম সমীহ ও ভীতি দূর করে গান্ধী সাম্রাজ্যবাদের দুর্গে প্রথম প্রবল আঘাত হানেন।

একই ভূমিকা ছিল তাঁর চম্পারণে নীলচাষিদের নীলকর ইংরেজদের অথবা আহমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকদের স্বদেশি (এবং তাঁদের মধ্যে একজন উপকারী বন্ধুস্থানীয়) মিল মালিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ে। চম্পারণে জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ তিনি অমান্য করলে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করলে এ যাবতকাল নীলকর বা যে-কোনও শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়াতে অক্ষম চাষিরাই হাজারে হাজারে আদালতে সমবেত হয়ে আদালতের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীকে মুক্তি দিতে বাধ্য করে। একই ধরনের জনসংগঠন ও জনপ্রতিরোধের পরিচয় পাওয়া যায় 'এক টেক' শ্রমিকদের কাছ থেকে গান্ধী নেতৃত্বে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে।

গান্ধী-জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে জনগণকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করার সংগঠন ও আন্দোলনের সমীক্ষা করার পর হীরেন্দ্রনাথ সঙ্গতভাবেই তার উৎস খুঁজে পেয়েছেন গান্ধীর নিজের জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতায়। তেইশ বছরের এক যুবক অন্নসমস্যার সমাধানে স্বদেশ থেকে বহু দূরে দক্ষিণ আফ্রিকার পিটার মারিৎস্‌বার্গ রেলস্টেশনে (বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার ও প্রথম শ্রেণীর টিকিটধারী যাত্রীর প্রচ্ছন্ন অহংকার হজম করে) রেলগাড়ি থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং প্রচণ্ড শীতের রাতে রেলওয়ের প্রতীক্ষালয়ে কাঁপতে কাঁপতে ইতিকর্তব্য স্থির করছে। মহাত্মার জন্মের সেই সর্বজনবিদিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এর হীরেন্দ্রনাথকৃত ভাষ্যই আমাদের আলোচনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি লিখছেন সত্তার মূল ধরে নাড়িয়ে দেবার এই অভিজ্ঞতা গান্ধীকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে এবং তাঁকে ভয়বন্ধন থেকে মুক্ত করে আমাদের অতীতকালের মনীষীরা যাকে অভয় আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে পরিচিত করে। এই অভয় কেবল দৈহিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এ হল মনোরাজ্য থেকে ভয়কে সদা নির্বাসন দেবার স্থিতি। নিজের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন বেগোচ্ছল পর্যায়ে গান্ধী যে কোন একক ব্যক্তির তুলনায় তাঁর স্বদেশবাসীদের নির্ভীকতায় উত্তরিত করতে সর্বাধিক সহায়তা দান করেছিলেন। প্রশাসনীয় দমননীতি ও সামাজিক নিন্দা-ভর্ৎসনার পটভূমিকায় নির্ভীকতা, কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের সহস্রবিধ দমন-পীড়নের সামনে নির্ভয় থাকা নয়, তাবৎ কায়েমী স্বার্থ এবং এমনকী অনশন ও শোক-দুঃখের মুখোমুখী হয়েও ভীতিহীন থাকা। একথা সত্য যে-কোনও একক ব্যক্তির উপদেশের যাদু-শক্তিতে ভয়ের কৃষ্ণচ্ছায়াকে নিমেষের মধ্যে দূর করা যায় না। তবুও পুনরুক্তি হলেও বলতে হবে যে অহিংসার তুলনায় অভয়ই ছিল তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি গান্ধীর শ্রেষ্ঠতম অবদান।[৮]

সমভাবে ভাবিত না হলে গান্ধীর যে অহিংসা নিষ্ঠা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক ভুল বোঝার সম্ভাবনা, সেখানেও হীরেন্দ্রনাথ তন্নিষ্ঠ, বিষয়মুখ। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন তাঁর অহিংসা ছিল সাহসীর আয়ুধ, ভীরু সম্মতি নয়। গান্ধী যদি কোন কিছু ঘৃণা করতেন তবে তাহলে হীনতার শ্বাস ও সাহসহীন নীচাশয়তার কানাকানি।[৯] গান্ধীর সমাজ-পরিবর্তনের উপায় কেবল ব্যক্তির নৈতিক উত্থান বা বিরোধীর হৃদয়-পরিবর্তন প্রক্রিয়া ছিল—এ জাতীয় বহুল প্রচারিত ভ্রান্তি দ্বারা হীরেন্দ্রনাথ প্রভাবিত হননি। তিনি তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : অতীব মহান ব্যক্তি হওয়ায় গান্ধী জানতেন যে কেবল নৈতিক প্রবর্তনা মূলগত সমাজ-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী উপাদান নয়। এর জন্য জনগণের সক্রিয় আন্দোলন আবশ্যক। একদা তিনি তাই লিখেছিলেন যে জনগণের যেদিকে আগ্রহ নেই, সেই খাতে তাদের উদ্যমকে প্রবাহিত করার প্রভাব আমার নেই। এই প্রায় মার্কসবাদের মতো শ্রুত প্রতিজ্ঞার সঙ্গে পাল্লা দিতেই যেন ছিল নিজ আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর এই জ্ঞান যে তার আন্দোলনের সব খুঁটি বা আশ্রয় কিন্তু পূর্বোক্ত ধারণার অনুরূপ নয়। তাই সেই ১৯২৮ খ্রি. ১ এপ্রিলেই তিনি জওহরলাল নেহেরুকে লিখেছিলেন, "আমি তোমার এই অভিমতের পূর্ণ সমর্থক যে কোন না কোন দিন আমাদের এমন এক ব্যাপক জনআন্দোলনের সূত্রপাত করতে হবে যাতে ধনীবর্গ

ও মুখর শিক্ষিত সমাজের কোনো ভূমিকা থাকবে না।"[১০]

আলোচনা-সূত্রকে সংহত করার জন্য আমরা অতঃপর গান্ধী-জীবন ও কর্মের একাধারে সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল এবং অন্ধকার পর্ব—রক্তস্নান ও ভারত বিভাজনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে হীরেন্দ্রনাথকৃত গান্ধীর মূল্যায়নের প্রতি দৃষ্টি দেব। এ প্রসঙ্গেও হীরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাতে হয় এইজন্য যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে কম্বু-কণ্ঠে তিনি এই সত্য ঘোষণা করেছেন যে, "গান্ধী কদাচ ভারতের এই জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ ক্রিয়ার দায়ভাগী ছিলেন না। যতক্ষণ না তাঁর ভাষায় তাঁকে সেই তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হতে হয়, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগে লড়াই করেছিলেন।"[১১]

গান্ধী-জীবনের সেই কালপর্ব—তাঁর বিষাদ-সিন্ধুর মন্থন করেছেন হীরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক ইতিহাসের গভীর জ্ঞানরূপ মন্থনদণ্ড ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য ব্যর্থতার প্রধান নায়ক মহাত্মার প্রতি সংবেদী মনের মন্থন-রজ্জুর সাহায্যে। আর মন্থনের পর প্রাপ্ত সরল-অমৃতের পরিচয় হচ্ছে তাঁর গান্ধী-জীবনীর একাদশ অর্থাৎ The Last Phase অধ্যায়টি যা গান্ধী-সাহিত্যে হীরেন্দ্রনাথের অনবদ্য অবদান। স্বাধীনতার ঊষার সূচনায় ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণ আবিষ্কার প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ ঠিকই দেখেছেন যে কেবল গান্ধী ও কংগ্রেসই নয়, কিন্তু আমাদের জনগণের আরও জঙ্গি অংশের সংগঠন ও নেতৃত্বকেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ার ফলে জাতির নৈতিকতার যে অপহ্নব ঘটেছিল, তার দায়িত্ব নিতেই হবে। আর গান্ধীর শাশ্বত সম্মানের খাতিরে একথা বলতেই হবে যে তাঁর অস্তিত্বের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজস্ব আয়ুধের সহায়তায় সেই গরল-প্রবাহকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রি. ১৫ আগস্টের আগে-পরে যখন দেশের উপর কৃষ্ণান্ধকারের ঘন যবনিকা নেমে এল এবং এক ধরনের উন্মত্ততা-প্রবাহ যখন আমাদের স্বদেশবাসীকে গ্রাস করল অনন্তকালের অবিনাশী প্রস্তরশিলার মতো গান্ধীই মানবতার প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখার নিদর্শন ছিলেন এবং সেই বিশ্বাস-শিখাকে চিরদেদীপ্যমান রাখার জন্য অবিরাম কাজ করে গেছেন।[১২]

সেই সুপরিচিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করে হীরেন্দ্রনাথকৃত গান্ধী-জীবনের ঐ পর্বের মূল্যায়নের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি করা যেতে পারে। ইতিহাসের কোন্ নায়কই বা প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্তি করতে পেরেছেন? আর গান্ধীর কাছে থেকে আমরা এত বেশি পরিমাণে পেয়েছি যে আমাদের তাবৎ অনুযোগ-অভিযোগ সত্ত্বেও আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে। বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে অপর যে-কোনও মানুষের তুলনায় যাঁর নামে ভারত অধিক প্রতিধ্বনিত হয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে মেহনতি মানুষদের ভালবাসতেন, যদিচ কখনও তিনি তাঁদের সামাজিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবার মতো সাবালক বিবেচনা করেননি।[১৩]

।। ৩।।

অতঃপর হীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গান্ধীর ব্যর্থতার পশরার বিশ্লেষণ।

গান্ধীজীবনের মূল্যায়নের উপসংহার হীরেন্দ্রনাথ প্রশংসাচ্ছলে নাম্বুদ্রিপাদের (The

Mahatma and the Ism) একটি অভিমত দিয়ে করেছেন—জীবনের অন্তিমপর্বে একদা তিনি বলেছিলেন যে 'আমার জীবনই আমার বাণী' এবং সত্য সত্যই গান্ধী গান্ধীবাদের থেকে নিঃসন্দেহে অনেক বড়।[১৪] 'গান্ধীবাদ' শীর্ষক গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি মহাত্মার মত ও পথ সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথের ধারণার বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার অনেকগুলির খণ্ডনও বটে।

তবে সে প্রসঙ্গে যাবার পূর্বে নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর নিজেরও ধারণার সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হবে। 'গান্ধীবাদ' অর্থাৎ গান্ধীর মত ও পথ যদি অপক্ষোকৃত ন্যূন হয়, তবে তার পরিণতি—গান্ধীর জীবন লাঘনীয় হয় কী করে? গান্ধী-জীবন কি বীজাকার তাঁর মত ও পথের পুষ্পিত-পল্লবিত পরিণাম নয়! দুই প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদী নেতার চিন্তা-শৈলীর হেত্বাভাসের নিদর্শন না কি পূর্বোদ্ধত অভিমত?

প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা আপাত মুলতুবি রেখে আমরা হীরেন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য খতিয়ে দেখব। কিন্তু তার পূর্বে একটি কথা। সঙ্গত কারণেই হীরেন্দ্রনাথ 'গান্ধীবাদ' শব্দটিকে তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রেখেছেন। কারণ পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে যে গান্ধী কখনও 'গান্ধীবাদ' বা 'গান্ধীবাদী' শব্দগুলির স্বীকৃতি দেননি। সেই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেই তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, "পৃথিবীকে নূতন কিছু শেখাবার মত আমার কাছে নেই। সত্য ও অহিংসা পাহাড়-পর্বতের মতই প্রাচীন। আমি যা করেছি তা হল কেবল ঐ দুটি নিয়ে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর এই প্রক্রিয়ায় কখনও কখনও আমার ভুল হয়েছে এবং সেই সব ভ্রান্তি থেকে আমি নূতন শিক্ষা পেয়েছি। সুতরাং জীবন ও তার সমস্যাবলী এইভাবে আমার কাছে সত্য ও অহিংসার আচরণে অনেকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে উঠেছে।"[১৫] গান্ধীজী যে তাই নিজ আত্মকথার নাম My Experiments with Truth বা সত্যের প্রয়োগ রাখবেন এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

কোনও বিধিবদ্ধ 'ইজম' বা শাস্ত্র প্রবর্তন করে তদুনযায়ী চলার বদলে বিজ্ঞানীরা যাকে trial and error অথবা 'প্রাগমাটিক' পদ্ধতি বলেন তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সমালোচকেরা কোনও কোনও সময়ে গান্ধীর জীবন ও বচনে অসঙ্গতিও খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর নিবেদন : "আমার রচনার অভিনিবিষ্ট পাঠক ও এর প্রতি আগ্রহশীল ব্যক্তিদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে আমার বক্তব্য সঙ্গতিপূর্ণ মনে হোক—এ নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। সত্যের সন্ধানে আমার যাত্রাপথে আমি বহু ভাবধারা বর্জন করেছি এবং নূতন অনেক কিছু শিখেছি। আমি বয়োবৃদ্ধ হলেও আমার এমন মনে হয় না যে আমার আভ্যন্তরীণ বিকাশ বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা আমার এই দেহের বিনষ্টি হলেই বিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমি যে বিষয়ে মাথা ঘামাই তা হল প্রতি মুহূর্তে সত্য—আমার ঈশ্বরের আদেশ পালনে আমার প্রস্তুতি। তাই আমার দুটি রচনায় কেউ যদি কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পান আর তারপরও যদি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতায় তাঁর আস্থা থাকে তাহলে তাঁর কর্তব্য হবে একই বিষয়ের দুটি রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিকটিকে বেছে নেওয়া।"[১৬]

গান্ধীর মত-পথ, জীবন-কর্মে মার্কসবাদী হিসাবে যে আপাত অসঙ্গতি হীরেন্দ্রনাথ বা

তাঁর মতো সমভাবে ভাবিতদের চোখে পড়ে তার মূলে রয়েছে বিধিবদ্ধ শাস্ত্রে পণ্ডিতদের পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান-উদাসীন এক মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারের ভূমিকার পার্থক্য। কথাটাকে ভিন্নভাবেও বলা যায়। ইতিহাসের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের পক্ষে নূতন ইতিহাসস্রষ্টার কার্য-কলাপকে বোঝা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না।

এই উপক্রমণিকার পর হীরেন্দ্রনাথের অনুসারে গান্ধীর মূল ব্যর্থতাগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে তার বিচার-বিবেচনা করা হবে। ব্যর্থতার মূল আবিষ্কার করেছেন হীরেন্দ্রনাথ গান্ধীর পথের দর্শনে। স্পষ্টই বলেছেন : "এ জাতীয় আন্দোলনের বুনিয়াদী অপূর্ণতা ও (কিছু কিছু চাঞ্চল্যকর গান্ধীবাদী গৌরবের নিদর্শন সত্ত্বেও) মৌলিক আধ্যাত্মিক দীনতা গান্ধির জীবনের অন্তিমপর্বের বিয়োগান্তক পরিস্থিতির মূলে।"[১৭] এই নিদানকে গান্ধী-জীবনের নানা পর্বের উত্থান-পতনের মধ্যে চিহ্নিত করেছেন হীরেন্দ্রনাথ সময়োচিত ভাষায় ও ভাবে।

প্রধান ব্যর্থতাগুলি হল : মাত্রাতিরিক্ত সাধন বা উপায়ের শুদ্ধতার উপর জোর দেওয়া (means) যার পরিণামে বৈপ্লবিক লক্ষ্য (Ends) অলব্ধ রয়ে গেছে, ১৯২১-২২, ১৯৩০-৩১ ও ১৯৪৪-৪৬ খ্রিস্টাব্দের মতো বিপ্লবী মুহূর্ত সৃষ্টি হলেও তাকে কাজে লাগিয়ে সার্থক করে তোলার অসামার্থ্য, ব্যক্তির আত্মশুদ্ধিকেই সমাজ পরিবর্তনের একমেব উপায় জ্ঞান করে চলা, গান্ধীর পদ্ধতি কিছু সীমিত ক্ষেত্রে আদর্শে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার নমুনা তুলে ধরলেও তা "না শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের সমাধান করতে পেরেছে, না পেরেছে উৎপাদনের সমস্যা সমাধান করতে এবং না আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের জন্য জনগণ দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পেরেছে",[১৮] আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার কিছুটা সমস্যা থাকলেও জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে তার সহায়তা নেবার বদলে গান্ধীর প্রাচীন উৎপাদনপদ্ধতিই আঁকড়ে থাকা "ধনীদের ট্রাস্টিশিল্প বা ন্যাসবাদ", জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণ অস্বীকার না করা ইত্যাদি। প্রশ্নগুলি নিয়ে আরও আলোচনার পূর্বে সত্যের খাতিরে একথা পূর্বেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে হীরেন্দ্রনাথ কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গান্ধীর মত-পথ বা কৃতীর সঙ্গে যে অসহমতি ব্যক্ত করেছেন, তা absolute বা নিরঙ্কুশ নয়, গান্ধীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার জন্য তা Conditional অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষ। এই পূর্বস্বীকৃতির অভাবে এক পণ্ডিত মনীষীর দরদী গান্ধী-ভাবনার প্রতি অবিচার করার প্রত্যবায়ভাগীর সঙ্গত অভিযোগ উঠতে পারে।

যে দুটি বিষয়ে গান্ধীর বিবাদিত ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়াসে স্পষ্ট করা যাবে সেই জাতিভেদ প্রথা ও ট্রাস্টিশিপ সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা এ প্রসঙ্গের সূত্রপাত করা হবে।

অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য গান্ধী ও তাঁর নেতৃত্বের আন্দোলনের যথোচিত প্রশংসা করলেও হীরেন্দ্রনাথের মতে গান্ধী জাতিভেদপ্রথা সম্পূর্ণ দূর করতে চাননি। তাঁর এই ধারণার পিছনে সম্ভবত জীবনের প্রথমভাগে গান্ধীর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রকাশ্য সমর্থনের ঘটনা ক্রিয়াশীল। হিন্দু সমাজের বিকশিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, যাতে মানুষ পিতৃ-পিতামহের পেশার অনুসরণ করে বৃত্তির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তালাভের সঙ্গে সঙ্গে চার বর্ণের মধ্যে থেকে সামাজিক সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে, তাকে গান্ধী একদা সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ব্যবস্থা

বলেছেন—একথা ঠিক। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এই সত্য বুঝেছেন যে "শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমের আজ বাস্তবে অস্তিত্ব নেই। বর্তমানের জাত-পাত বিচার বর্ণাশ্রমের একেবারে বিপরীত। জনমত যত শীঘ্র এর অবসান ঘটায় ততই মঙ্গল।" "জাতের বিচারের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। আধ্যাত্মিক ও জাতীয় বিকাশ—উভয়ের ক্ষেত্রেই এ ক্ষতিকারক।" পুনরপি "বর্ণাশ্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ বা একত্র খাওয়া দাওয়ায় না নিষেধ ছিল, না থাকা উচিত। পারস্পরিক বিবাহ এবং সহভোজে নিষেধ না থাকলেও এ ক্ষেত্রে কোনো রকম জোর-জবরদস্তি করা অনুচিত। জাতের বাইরে বিবাহ করবে কি করবে না অথবা খাবে কি খাবে না—এটা সংশ্লিষ্ট পুরুষ বা নারীর স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।"[১৯]

জীবনের শেষ ভাগে গান্ধীজী যে 'রোটি ঔর বেটি'-এর সম্বন্ধ ভারতের সংহতির জন্য অপরিহার্য বার বার এই কথা বলতেন, তার মূলেও কারণ ছিল এই। শুধু তাই-ই নয়। তাঁর আশ্রমে তখনই কোনও বিবাহ অনুষ্ঠিত হত এবং তিনি স্বয়ং নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতেন যখন তাদের উভয়ের একজন অন্তত হত তথাকথিত নিম্নবর্ণের।

আসলে ভারতীয় সমাজের এই জাতিভেদ-প্রথা এমন দৃঢ়মূল যে কেবল হিন্দু অথবা অর্ধ-সহস্র বর্ষ পূর্বে তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া শিখ সমাজেই নয়, ভারতীয় মুসলমান ও খ্রিস্টান সমাজের ভিতরও এই প্রথা অনুপ্রবেশ করেছে। গান্ধী তাঁর আন্দোলনসমূহের দ্বারা সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে এ প্রথার প্রতি আঘাত হানলেও যেমন একে নির্মূল করতে পারেন নি, তাঁর পূর্বে-পরে জ্যোতিবা ফুলে অথবা ভীমরাও আম্বেদকরেরাও এই মানবতাবিরোধী প্রথার সম্পূর্ণ নিরাকরণে সমর্থ হননি। তবে অবশ্যই তাঁরা এ আন্দোলনকে এক এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ভারতীয় সংবিধানে একে দণ্ডার্হ অপরাধ ঘোষণা করা হলেও এবং ডান-বাম সব রকমের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেও নির্বাচন ও সংরক্ষণের রাজনীতির প্রসাদে তাঁরাই এই কুপ্রথার ভিত্তি ভারতীয় সমাজে সম্প্রসারিত করে চলেছেন। নিষ্ঠাবান সামাজিক কর্মীদের দ্বারা দীর্ঘকালীন নিরন্তর জনশিক্ষা (জন-আন্দোলনও এর অন্তর্ভুক্ত) এ সমস্যার সমাধানের কোনও ত্বরিৎ পন্থা নেই।

গান্ধীজী ধনীদের নিজ নিজ ধনসম্পত্তির ট্রাস্টি বা ন্যাসী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করতেন, মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্ব অনুযায়ী সর্বহারার স্বার্থে ধনীর কাছে পুঞ্জিভূত পুঁজি (যা আসলে শ্রমের শোষণ দ্বারা সঞ্চিত উদ্বৃত্তমূল্য) সমাজের হিতে বাজেয়াপ্ত করার পক্ষধর ছিলেন না—হীরেন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় অনুযোগ। দুর্ভাগ্যক্রমে হীরেন্দ্রনাথ কর্তৃক উক্ত তথ্য আংশিক সত্য। কারণ গান্ধী কেবল ধনীকেই (যিনি পুঁজি সংগ্রহ করার ও তাকে আরও বাড়াবার কলায় কুশল) সামাজিক হিতে ধনের ন্যাসীতে রূপান্তরিত করার আগ্রহী ছিলেন না, জমিদার বা জমির মালিক, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, লেখক, চিত্রশিল্পী—এক কথায় যাঁদের ভিতর বিশেষ কোনও প্রতিভার সার্থক বিকাশ ঘটেছে, তাদের সবার বিশিষ্ট প্রতিভার সামাজিক মালিকানায় বিশ্বাস করতেন। নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রতিভার আর্থিক প্রতিদান কেবল তাঁরা ভোগ করবেন না, সমাজের ন্যাসী বা ট্রাস্টিস্বরূপ তার ব্যবহার করে তার দ্বারা সমগ্র সমাজকে লাভান্বিত করবেন এবং নিজের জন্য নেবেন কেবল ততটুকুই যতটুকু প্রয়োজন—

এই মানসিক বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব গান্ধী তাঁর ন্যাসবাদের মাধ্যমে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

কারণ মার্কসীয় expropriating the expropriaters নীত একে তো ব্যবস্থাকুশলী, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী ইত্যাদির ক্ষেত্রে অচল। কারণ তাঁদের expropriator বলা চলে না। দ্বিতীয়ত expropriation-এর পন্থায় তাঁদের নবরূপে পুনর্জন্ম ঘটে এই কারণে যে সমাজে তাঁদের বিশিষ্ট কার্যের প্রয়োজন থেকেই যায়। যুগোশ্লাভিয়ার সমাজবাদী বুদ্ধিজীবী মিথোভাল জিলাস তাঁর 'The New Class'-এর মাধ্যমে এই সত্যের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আর সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে সেই নূতন শ্রেণীর প্রাসাদ ভেঙে পড়ার সময়ে কেবল ব্রেজনভের 'দাচা' ও রুমানিয়ার চেসেস্কুর প্রাসাদে ভোগ-বিলাসের যে রাজকীয় আয়োজনের প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে কবীরের একটি উক্তির সত্যতা নূতন করে প্রমাণিত হয়—মন না রাঙ্গায়ে কী ভুল করিয়ে কাপড় রাঙ্গালে যোগী! সমাজবাদী চীনেও মাও-এর মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধির নেতাকে শেষজীবনে শিখণ্ডীস্বরূপ ব্যবহার করে চক্রী-চতুষ্টয় বা 'গ্যাং অফ ফোর' যেসব ক্রিয়া-কলাপ করতে পেরেছিল, তা-ও এই সত্যের দ্যোতক।

গান্ধী সেই মন রাঙাবার পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ন্যাসবাদের মাধ্যমে। কারণ কেবল কাঠামো বদলে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায় না যদি না সেই কাঠামোর সদস্য ও বিশেষ করে সঞ্চালকদের মনে নূতন মূল্যবোধ গভীরভাবে প্রোথিত না হয়। পুঁজিপতি ও জমিদার ইত্যাদিরা যে উৎপাদকবর্গকে শোষণ করে নিজেদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন এবং সেটা যে অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত এবং মানুষের বিশিষ্ট প্রতিভাকে সমাজ-হিতে বজায় রেখে আয়ের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই যে তাঁর ন্যাসবাদের পরিকল্পনা এ সম্বন্ধে গান্ধীর অনেকের মধ্যে কোনও একটি লেখার উল্লেখ করতে হলে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ২৬ নভেম্বর ১৯৩১ খ্রি. (পৃ. ৩৬৮) প্রকাশিত রচনাটির কথা বলা হবে।

অতঃপর হীরেন্দ্রনাথ কর্তৃক চিহ্নিত গান্ধীর মত ও পথের প্রধান ত্রুটিগুলির প্রসঙ্গ। এর মধ্যে মুখ্য হল ন্যায়শাস্ত্রের এক বহু প্রাচীন বিবাদ—উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তবে তার প্রাপ্তির জন্য সাময়িকভাবে হলেও নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করা চলে কি না? এর নৈতিক দিক ও উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেও আপাতত তা ছেড়ে দিয়ে একান্ত প্রায়োগিক বা বাস্তববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ নিন্দনীয় উপায়ে আদৌ মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় কি না?

এ বিষয়ে গান্ধীর ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য হল "ওঁরা বলেন, উপায় তো কেবল উপায়ই'। আমি বলব 'উপায়ই সব কিছু।' উপায় যেমন, লক্ষ্যও তদনুরূপ হবে। উপায়ও লক্ষ্যের মধ্যে কোনও বিভেদের প্রাচীর নেই। বাস্তব পক্ষে স্রষ্টা আমাদের উপায়ের উপর (আর তা-ও খুব সীমিত) নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়েছেন, লক্ষ্যের উপর নয়। যেমন উপায় অবলম্বন করা হবে লক্ষ্যের পরিপূর্তিও ঘটবে ঠিক তদনুরূপ বা সেই মাত্রায়। এ নীতির কোনো ব্যতিক্রম নেই।" পুনরপি, "উপায় হচ্ছে বীজের মত এবং লক্ষ্য হল সেই বীজের সৃষ্টি বৃক্ষ। বীজ ও বৃক্ষের যে অপরিহার্য সম্পর্ক, উপায় ও লক্ষ্যেরও তাই।"[২০]

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রের যে-কোনও লক্ষ্য জ্যামিতির বিন্দু বা রেখার মতো,

কোনও মানুষের পক্ষে যা নিখুঁতভাবে আঁকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে বিন্দু বা রেখার জ্যামিতিক পরিভাষার কোনও মূল্য নেই এমন কথা নয়। বাস্তবিজ্ঞান বা যন্ত্রবিজ্ঞানের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ঐ পরিভাষার উপরে। লক্ষ্য কোনওদিন পূর্ণতর উপলব্ধ হয় না। তার অনুকূল পথে যতটা চলা যায় মনুষ্যসমাজের ততটাই নগদ লাভ। অ-ধ্রুব লক্ষ্যের লোভে ধ্রুব উপায়কে উপেক্ষা করা কোনও মতেই বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সমাজবাদী লক্ষ্যের আদর্শ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উপনীত হবার জন্য আপাতত জোর-জবরদস্তি ও হিংসা-ষড়যন্ত্রের পরিণামে কী হয় তার পরিণাম সোভিয়েট দেশ, পূর্ব ইউরোপের সমাজবাদী দেশসমূহ ও চীনের সমাজতন্ত্রের এত দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসে রয়েছে।[২১]

অতঃপর ঠিক বিপ্লবের সফলতার পূর্ব মুহূর্তে গান্ধীর হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রসঙ্গ। প্রথমেই স্বীকার করে রাখা ভাল যে মার্কসবাদীরা যাকে শ্রমিক-কৃষকদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব বলেন, গান্ধীর অভীষ্ট তেমন কিছু ছিল না। এমনকী নিছক ভারতের স্বাধীনতা বা বিদেশি-শাসন মুক্তিও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বোদয় সমাজ স্থাপন। এর সূত্রপাত অন্ত্যোদয় অর্থাৎ সবার নীচে সবার পিছে সর্বহারাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা হলেও সত্য ও অহিংসার স্থান সেই সমাজের চালকশক্তি একথা বলতে গান্ধী কখনও ক্লান্ত হননি। আর উপায় হিসাবে সত্য ও অহিংসার সঙ্গে সাময়িক ভাবে হলেও আপস করে যে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না তা আমরা একটু আগেই দেখেছি। এই কারণে গান্ধীর কাছে বিপ্লবের বিশেষ একটি মুহূর্তের কোনও মূল্য ছিল না। তাঁর পথ নিরন্তর এক পা এক পা করে এগোনোর। চরৈবেতি চরৈবেতি।

দ্বিতীয়ত গান্ধী যদি আন্দোলনের নেতা হন তবে কোন্ মুহূর্তে কোন্ পদক্ষেপ নিতে হবে তা তো তাঁকেই স্থির করতে হবে। অপর কারও সিদ্ধান্ত বা নিদান অনুসারে তো তাঁর কাজ করা সম্ভব নয়। অপর সব কৃষক-শ্রমিকশ্রেণী ও তাঁদের বিপ্লবের প্রবক্তাদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী বিপ্লবকে মূর্ত করার অধিকার অবশ্যই আছে। সফল হলে তাঁরা বাহবা পাবেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীর বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের যে বিপ্লবী মুহূর্তগুলির কথা হীরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সে সময়ে গান্ধী-নিরপেক্ষভাবে তাঁরা বিপ্লবকে সফল করে তুললেন না কেন? নিদান তাঁরা দেবেন আর যে-কোনও কারণেই হোক গান্ধীর আহ্বানে জনগণ সাড়া দেয় বলে সেই নিদান বা নির্দেশ অনুসারে গান্ধী কাজ করবেন—এটা নিশ্চয়ই হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য নয়। সর্বশেষে হীরেন্দ্রনাথ উল্লিখিত একটি বৈপ্লবিক মুহূর্তের উদাহরণ নেওয়া যাক। যখন গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতারা কারান্তরালে এবং মার্কসবাদী বিপ্লবে বিশ্বাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে একছত্র আধিপত্য। তেরোশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ কৃষকের মৃত্যু ও দীর্ঘকালীন দুর্দশায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতির কিছু খামতি ছিল না নিশ্চয়ই। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের প্রবক্তাদের কেবল লঙ্গরখানা চালানো 'নিরন্নের অন্ন চাই' দেওয়াল লিখনে অথবা খুব বেশি হলে 'জনযুদ্ধের' রণকৌশল আলোচনাতেই আবদ্ধ থাকতে দেখা গেল কেন? বিপ্লবের আয়োজনে বাধা কোথায় ছিল? ১৯৪৫ খ্রি. আজাদ হিন্দ ফৌজের চমৎকারিত্বের সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে যে আপাত

উদ্বেল স্থিতি দেশে দেখা দিয়েছিল তার অন্তরালে যে ১৯৪৬ খ্রি. ১৬ আগস্টের ছিন্নমস্তাবৃত্তির গোপন প্রস্তুতি চলছিল, একথা না হয় না-ই বলা হল।

গান্ধীর সমাজ-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ। সর্বাগ্রে পরিবর্তনের হোতা বা অনুঘটক ব্যক্তির বিচার বা মানসিকতায় পরিবর্তন। অতঃপর সেই পরিবর্তিত মানসিকতার প্রতিফলন বা রূপায়ণ তাঁদের নিজ জীবনে। সমাজ-পরিবর্তন বা দই জমানোর সাজা হল বাঞ্ছিত পরিবর্তিত মূল্যবোধে জীবনকে দীক্ষিতকারী দই-এর সাজা বা পরিবর্তনের অগ্রদূতের দল। উপযুক্ত সংখ্যায় এবং সুসংগঠিত ভাবে অগ্রদূতদের ক্রিয়াশীলতা না থাকলে সমাজ-পরিবর্তন-প্রয়াস যে অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়, তার নিদর্শন ফলিত মার্কসবাদের বর্তমান পরিণতি। মূল কথা হল—পরিবর্তনের 'এজেন্টের' মধ্যে ফাঁকি বা অপূর্ণতা থাকলে পরিবর্তন-প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির উপর গান্ধী জোর দিতেন এইজন্য। তবে হীরেন্দ্রনাথের এ ধারণা যথার্থ নয় যে একেই গান্ধী সমাজ-পরিবর্তনের একমেব উপায় মনে করতেন। প্রস্তুতি হয়েছে বুঝলে তাঁর নিজের ধরনে ব্যাপক জনআন্দোলনও শুরু করতেন তিনি যাতে একলাফে অনেকটা এগোনো যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসহযোগ, আইন অমান্য, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২ খ্রি. আগস্ট আন্দোলনের ডাক (আন্দোলন শুরু হবার পূর্বেই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা বন্দি হন), সমাজ-পরিবর্তনের জন্য হরিজন যাত্রা, ভাইকম ও অন্যান্য মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহ ও সহভোজের কর্মসূচি, আর্থিক ক্ষেত্রে চম্পারণ, খেড়া ও বারদৌলি প্রমুখ এলাকায় তাঁর বা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত জননায়কদের নেতৃত্বে কৃষকদের সত্যাগ্রহ ইত্যাদি এই সত্যেরই দ্যোতক। জনগণের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল (বা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নেওয়া) গান্ধীজিরও কাম্য ছিল। তাঁর পল্লী পুনর্গঠন কর্মসূচির অন্তিম লক্ষ্যই ছিল এ জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ বা স্বাবলম্বী স্বয়ম্ভর গ্রামীণ সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলা। তবে তা জনগণেরই প্রত্যক্ষ রাজত্ব হতে হবে, জনগণের পক্ষে জনপ্রতিনিধি বা তথাকথিত বিপ্লবী পার্টির মুষ্টিমেয় কয়েকজন বা 'কোটারির' নয়।

সর্বশেষে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি গান্ধীর অনীহা ও সনাতন উৎপাদন-পদ্ধতি আঁকড়ে থাকার বহু উচ্চারিত ভিত্তিহীন অভিযোগ। বিজ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞান-সাধনায় কোনও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের অনীহা থাকতে পারে না। গান্ধীরও ছিল না। গান্ধীর মতপার্থক্য ছিল এর ফলিত রূপ—বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে। তাঁর স্পষ্ট ভূমিকা ছিল—কৃৎকৌশল মানুষের সর্বাঙ্গীন হিতের জন্য, মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার অধীন নয়। এ সম্বন্ধে গান্ধীর নিজের উক্তি ও ভূমিকা বিচার করা যেতে পারে

"আমি যার বিরোধী তা হল যন্ত্র সম্বন্ধে উন্মত্ততা নিছক যন্ত্রটির নয়। উন্মত্ততা হল যাকে শ্রম-সাশ্রয়ের যন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়, তা-ই নিয়ে। মানুষ শ্রম-সাশ্রয় করে চলে যতদিন না হাজার হাজার লোককে বেকার করে দিয়ে পথে-ঘাটে উপবাসে মরার পরিস্থিতিতে ফেলা হয়। আমিও শ্রম এবং সময় বাঁচাতে চাই, তবে মানব-সমাজের একাংশের জন্য নয়, সবার জন্য। অল্প কয়েকজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হোক, এ আমি চাই না—আমি চাই সবার হাতে তা যাক। যন্ত্র আজকে কিছু সংখ্যক মানুষকে কেবল লক্ষ লক্ষ নর-নারীর স্কন্ধোপরি

অধিরূঢ় হতে সাহায্য করে। এই পরিস্থিতির প্রেরণা কেবল শ্রমের সাশ্রয় করার জনহিত চিন্তা নয়, লোভ। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আমি সর্বশক্তি প্রয়োগে যুদ্ধ করছি।" তথাকথিত বিশ্বায়ন বা বাজারের অর্থনীতি-উত্তর ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেও গান্ধীর পূর্বোক্ত ভূমিকা বিচারণীয়।

নিজের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার জন্য গান্ধী যোগ করেন "...বিজ্ঞানের সত্য ও আবিষ্কারসমূহকে প্রথমত কেবল লোভের উপাদান হবার ভূমিকা ছাড়তে হবে। আর তাহলেই শ্রমিকদের উপর সাধ্যাতিরিক্ত শ্রমের চাপ পড়বে না ও যন্ত্রপাতি বাধক হবার বদলে সহায়ক হবে। আমি যন্ত্রপাতির সমাপ্তি নয়, তার সীমা নির্ধারণের জন্য কাজ করছি। ...একটি বিষয় আমি স্পষ্ট করতে চাই। আমার একমেব বিবেচ্য হল মানুষ। যন্ত্র যেন মানুষের হাত-পায়ে মরচে না ধরিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমি বুদ্ধিযুক্ত ব্যতিক্রম করব। সিঙ্গার সেলাইকলের কথা ধরুন। এ যাবত যে কয়টি উপকারী যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে এ একটি।" সঙ্গত প্রশ্ন উঠবে ঐ জাতীয় যন্ত্রপাতি তৈরির কী ব্যবস্থা হবে? গান্ধী মেনে নিয়েছিলেন যে তার জন্য বড় কল-কারখানা থাকবে। সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, "...তবে আমি যথেষ্ট পরিমাণে সমাজবাদী বলে বলব যে ঐ জাতীয় কল-কারখানার জাতীয়করণ হবে, বা সেগুলি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হবে। সেইসব কল-কারখানায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও আদর্শ পরিবেশে কাজ হবে। লাভের জন্য নয়, মানব জাতির কল্যাণের প্রেরণায় সেখানে কাজ হবে। শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন আমার কাম্য। সম্পদের জন্য এই উন্মত্ত দৌড় বন্ধ করতে হবে এবং শ্রমিকদের কেবল বেঁচে থাকার মতো (living) মজুরির নিশ্চয় তাই নয়, তাদের দৈনন্দিন কাজের পরিবেশেও এমন পরিবর্তন ঘটাতে হবে যাতে তা আর নিছক নীরস গতানুগতিকতা (drudgery) না থাকে।"

গান্ধী ভারতের শিল্পায়নও চাইতেন, তবে নিজ পরিভাষা অনুযায়ী "গ্রামীণ-সমাজে পুনর্জীবন আনতে হবে। ভারতের গ্রামগুলি শহর-নগরের যাবতীয় প্রয়োজনের পরিপূর্তি করত। আমাদের শহরগুলি বিদেশী পণ্যের বাজারে রূপান্তরিত হয়ে বিদেশের সস্তা ও খেলো মাল নিয়ে গ্রামগুলিতে স্তূপীকৃত করে তাদের সম্পদ নিয়মিত বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করার পর ভারত নিঃস্ব হয়ে পড়ল।"

যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীর উক্তির পর সংক্ষেপে এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা। কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ ভারতে শহরে ভিড় বাড়িয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবার বদলে গ্রামেই থেকে কৃষির পর বাধ্যতামূলক অবসর সময়ে স্বল্প পুঁজিতে খাদি-গ্রামোদ্যোগের মতো নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদনের মাধ্যমে আংশিক রোজগার পাবার ব্যাপক কর্মসূচি গান্ধী প্রবর্তন করেছিলেন—একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু যে কথাটি বহুল প্রচারিত নয় তাহলে চরকা-তাঁত এবং কুটিরশিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যায় ক্রমাগত উন্নতি সাধনের জন্য গান্ধী ও ঐ কর্মসূচিতে তাঁর সহায়কদের অক্লান্ত প্রয়াস। তারই ফলস্বরূপ ১৯০২-২১ খ্রি. গান্ধী চরকা-তাঁত এবং অন্যান্য কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে যেসব যন্ত্র দিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর জীবিতকালেই (ও তারপরও নিরন্তর গতিতে) সে সবের কৃৎকৌশলের উন্নতি ঘটেছিল। এর শর্ত ছিল কেবল একটাই

প্রযুক্তির উন্নতি বেকারত্ব বাড়াবে না এবং স্বনির্ভর শিল্পী-কারিগরের স্বাধীনতা খর্ব করবে না। আরও দুটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে গান্ধীর মানবীয় প্রযুক্তিনিষ্ঠা সম্বন্ধে। উন্নত ধরনের চরকা আবিষ্কার করার জন্য সেকালে গান্ধী এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রি. অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ স্থাপনার পর কুটিরশিল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শদানের উদ্দেশ্যে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের এক উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেছিলেন গান্ধী যার সদস্য ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, স্যার বিশ্বেশরাইয়ার মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি বিদ্যাবিশারদগণ।

গান্ধী ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উপসংহার প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান—যার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী সহ মহামনীষী মার্কসের সমাজ ও তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণাসমূহ গড়ে ওঠে—তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা হবে। সে সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সত্যাবলীর মধ্যে একটি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) মূল কথা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বিভিন্ন প্রজাতির (species) মধ্যে এবং একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে। এর ফলে প্রাণীদের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতা বিদ্যমান এবং যার কথা ক্রপট্‌কিন Mutual Aid-এ বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরেন, তার প্রতি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও রাজনীতি-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়েনি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ থেকে পরিবেশ-বিজ্ঞানের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তাতে কেবল জীব বা প্রাণীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় টিকে থাকার তত্ত্ব ও তথ্যই প্রমাণিত হয়নি, বৃক্ষ-লতা-উদ্ভিদ তো বটেই, জল-বায়ু-সূর্যালোক প্রমুখ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয়ে এক সামগ্রিক বিজ্ঞানের (holistic science) প্রবর্তন হয়েছে। কিংবা শতাব্দীর শেষ পাদ ও একবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞান প্রমাণ করছে ধাতু-আকরিক (minerals) ও কয়লা, পেট্রোল ও ডিজেলের মতো জীবাশ্ম-জ্বালানী (fossil full) নির্ভর উৎপাদন-ব্যবস্থা খুব বাড়ানো কিংবা রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও ভূগর্ভস্থ জল মাত্রারিক্ত টেনে তুলে তার সাহায্যে কৃষির উৎপাদন বেশি বাড়ানোর চেষ্টা বা ঐসবের ভরসায় জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও সভ্যতা গড়ে তুলতে গেলে মানুষসহ সমস্ত প্রাণীরই অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হবে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ করে তাকে পরাভূত করে তার 'অফুরন্ত সম্পদের' (?) দ্বারা নূতন সভ্যতা-জীবনশৈলী গড়ে তোলার কল্পনা এ যুগে অচল। যা চলবে তা হল আধুনিকতম বিজ্ঞানের সত্যসমূহ উপলব্ধি করে প্রকৃতির পোষণ ও তার সহযোগিতার দ্বারা কেবল মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণীর বেঁচে থাকা ও বিকাশ। তাই গান্ধী যদি ভোগকে সীমার মধ্যে রাখার পরামর্শ দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার পথে চলার কথা বলে থাকেন, এবং এর জন্য তিনি যদি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উপর জোর দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি আধুনিকতম (পরিবেশ) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন দূরদ্রষ্টা—একথা মেনে নিতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

।। ৪ ।।

বিশ্ববীক্ষা, জীবন-দর্শন ও মানসিকতায় গান্ধী ও তাঁর মত-পথ-কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মার্কসবাদী হীরেন্দ্রনাথের পার্থক্য দুস্তর। এছাড়া উভয়েই এমন যুগের সন্তান যখন সক্রিয় রাজনৈতিক

কর্মী হবার জন্য উভয়ের পথ কেবল ভিন্ন ছিল না, মাঝে মাঝেই তাদের একটি অপরটির উপর এসে পড়ায় সংঘাতেরও অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথের প্রথম বিধিবদ্ধ গান্ধীর মূল্যায়নের প্রয়াসের মধ্যে অপর একটি অসুবিধাও ছিল—রচনার পাত্র ও রচনাকারের মধ্যে সামীপ্য। কেবল নিজের সৃষ্টিশীল প্রতিভার বলেই নয়, বিষয়মুখীনতা তথ্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি গান্ধীর প্রতি উচ্চাঙ্গের সংবেদী শ্রদ্ধার বলে তাবৎ বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে হীরেন্দ্রনাথ গান্ধীর যে মূল্যায়ন করেছেন, পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে—গান্ধী সাহিত্যে তা চিরস্থায়ী অবদান। ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে হীরেন্দ্রনাথের মৌলিক সততা ও যুক্তিবাদী মানসিকতা—যা অপর শিবিরের সত্যকে দেখার দৃষ্টি দেয়—তাঁর গান্ধী-ভাবনা বা গান্ধী-সমীক্ষাকে এমন মূল্য দিয়েছে। আর এই মৌলিক সততার জন্যই সমসাময়িক কাল ও রাজনীতির আপাত দ্বন্দ্ব-বিরোধের অন্তরালে একজন সৎ ও আদর্শবাদী মার্কসবাদী গান্ধীকে কতটা শ্রদ্ধাসহকারে বোঝার চেষ্টা করতে পারেন তার উজ্জ্বল নিদর্শন হীরেন্দ্রনাথের গান্ধী-ভাবনা। বর্তমান কালে আমরা ব্যক্তি গান্ধীর যুগকে বেশ কিছুটা ছাড়িয়ে এসেছি। বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের গান্ধীর মত ও পথের একচেটিয়া উত্তরাধিকারের এক সময়ের দাবি সঙ্গত কারণেই আজ নীরব। দলের প্রভাবমুক্ত গান্ধী আজ সর্বজনের উত্তরাধিকার। ফলিত মার্কসবাদেও ১৯১৭ খ্রি. পর বহু বিবর্তন-পরিবর্তন ঘটে গেছে, বিদেশে এবং এদেশেও। সুতরাং উভয় শিবিরের সৎ ও আদর্শবাদী সদস্যরাই ইচ্ছা করলে হীরেন্দ্রনাথের গান্ধী-ভাবনা থেকে ভবিষ্যতের দিশা-নির্দেশ পেতে পারেন। ভাল মানুষেরা এক হতে পারেন না—এই অনুযোগের তাহলে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। কারণ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে রাত্রির তপস্যার সমাপ্তিলগ্ন এখনও উপনীত হয়নি।

সুতরাং মরমী মনীষী দ্রষ্টার গান্ধী-ভাবনা প্রসঙ্গের উপসংহার করা হবে বর্তমান প্রতিবেদকের অক্ষম অনুবাদে নয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উপর ও যাঁর সব্যসাচী সদৃশ অধিকার সেই হীরেন্দ্রনাথের মূল বাংলায় রচিত গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বার্তালাপের অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি দিয়ে গান্ধী-ব্যক্তিত্বের উপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করে।

"...গান্ধীর সঙ্গে দুটো সাক্ষাৎকারেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছে অদ্ভুত শক্তি মানুষটির, তিনি বুঝি পারেন অপরের মনের ঝড়কে অন্তত স্তব্ধ করে দিতে—জীবনে অনন্ত কয়েকজনকে কাছে থেকে দেখেছি যারা প্রকৃতই মহৎ মাপের মানুষ, কিন্তু আর কারো সান্নিধ্যে ভাবিনি যে তিনি যে অন্য গ্রহবাসী, ভিন্ন পর্যায়ের একজন, মুখে সরল হাসি ও সহজ কথা কিন্তু কোথায় আত্মার অতলে তিনি স্বতন্ত্র।" ১৯৪৭ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতার পর কলকাতায় আবার খুনোখুনি শুরু হলে জ্যোতি বসু প্রমুখের সঙ্গে দাঙ্গাপীড়িত বেলেঘাটায় গান্ধীর সাময়িক নিবাসে তিনি গিয়েছিলেন। "সেবারও দেখেছি স্থিতপ্রাজ্ঞ আনন গম্ভীর কিন্তু প্রসন্ন, মন আহত কিন্তু একেবারে অপরাস্ত, বাক্যে জ্ঞানী অথচ সরস, সকলের চিন্তার গুমোট যেন কাটাবেন কিন্তু কোথায় যেন একক তাঁর সত্তা, যার গভীরে মগ্ন থেকেই তাঁর শক্তি।"[২৩]

পাদটীকা

১. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে; কলকাতা (২০০২)
২. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; A Unique Leader, *The Mahatma; A Marxist Seminar*; সম্পাদক এম. বি. রাও, নতুন দিল্লি (১৯৬৯) পৃ. ৭৩।
৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; *Gandhiji : A Study* ; নতুন দিল্লি; চতুর্থ সং (১৯৯১); পৃ. ১।
৪. সমগ্রন্থ; পৃ. ২।
৫. সমগ্রন্থ; পৃ. ১৯৪।
৬. সমগ্রন্থ; পৃ. ১৯৮-৯৯।
৭. A Unique Leader, পৃ. ৭৪।
৮. সমগ্রন্থ; পৃ. ৮১। এছাড়া Ganghiji A study গ্রন্থের পৃ. XII ও অন্যত্র দ্রষ্টব্য।
৯. সমগ্রন্থ; পৃ. ৮১।
১০. সমগ্রন্থ; পৃ. ৮৫।
১১. Gandhiji A study; পৃ. VI এবং ১৭৮-৭৯।
১২. সমগ্রন্থ; পৃ. ১৭৬।
১৩. A Unique Leader, পৃ. ৮৬।
১৪. Gandhiji A study; পৃ. ২০২।
১৫. Harijan; ২৮ মার্চ ১৯৩৬। প্রবন্ধে ব্যবহৃত গান্ধীজীর উক্তিগুলির সূত্র অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সম্পাদিত Selections form Gandhi।
১৬. Harijan; ২১ এপ্রিল, ১৯৩৩।
১৭. Gandhiji A study; পৃ IX।
১৮. সমগ্রন্থ; পৃ. ২০০
১৯. Harijan; ১৬. ১১. ১৯৩৫।
২০. যথাক্রমে Young India; ১৭.৭.১৯২৪, পৃ ২৩৬ ও Indian Home Rule; পৃ. ৩৯।
২১. এ প্রসঙ্গে আধুনিক মানসের উপযুক্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন অম্লান দত্ত তাঁর Ends and Means প্রবন্ধে। দ্র. In Defence of Freedom , নতুন দিল্লি (২০০১)।
২২. যথাক্রমে Young India; ১৩. ১১. ১৯২৪, পৃ. ৩৭৮ ও Harijan; ২৭.২.১৯৩৭, পৃ. ১৮।
২৩. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; তরী হতে তীর; কলকাতা (১৯৯৫); পৃ. ৩৮৭।

সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ

সত্যব্রত দত্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংসদ জীবনের ব্যাপ্তি পঁচিশ বছর, ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কলকাতার উত্তর-পূর্ব কেন্দ্র থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে হীরেন্দ্রনাথ ১৯৫২ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্র থেকে আরও চারবার ১৯৫৭, '৬২, '৬৭ ও '৭১-এ তিনি হন এম পি। একই কেন্দ্র থেকে লোকসভার পাঁচ পাঁচবার নির্বাচিত হওয়ার নজির বিরল। লোকসভায় প্রথমদিকে কমিউনিস্ট দলের সহকারী নেতা এবং ১৯৬৪-৬৭-তে নেতার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সাংসদ হীরেন্দ্রনাথের কর্মধারা ছিল বহুধা বিস্তৃত। বিতর্কে অংশ নেওয়া তো ছিলই, লোকসভার এমন অধিবেশন খুব কমই হয়েছে যেখানে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপ্যাধায় চোস্ত সংসদীয় কায়দাকানুন প্রয়োগ করে, যুক্তিবিন্যাস ও শব্দবাণে সরকারি দলকে নাস্তানাবুদ না করেছেন, তা সে মোটা কাপড়ের ওপর ট্যাক্স বসানো হোক বা আণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের মতো গুরুগম্ভীর বিষয়েই হোক। তাছাড়া লোকসভার বিভিন্ন কমিটিতেও হীরেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় লোকসভার প্রকাশ্য অধিবেশন (যা আমরা আজকাল দূরদর্শনে দেখি এবং ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ দেখে) ছাড়াও বেশ কিছু ভাল কাজ হয় লোকসভা নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রিভিলেজ কমিটি, বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি, সাব-অর্ডিনেট লেজিস্লশন কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, পাবলিক একাউন্টস কমিটির মতো বিভিন্ন কমিটির সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। কমিটিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক একাউন্টস কমিটি। চারবার এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন তিনি এবং ১৯৭৫-৭৭-এ সভাপতি। কমিটির প্রতিবেদনে চোখ বুলালে বুঝতে পারা যায় কী পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য। সাহিত্য 'অকাদেমি', সঙ্গীত নাটক এবং ললিতকলা অকাদেমির সংসদ-মনোনীত সদস্য ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। সংসদ থেকে মনোনীত হয়ে আরও বেশ কিছু সংস্থায় সদস্যরূপে তিনি সক্রিয় ছিলেন। সংসদীয় চর্চা ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সাম্মানিক উপদেষ্টা হিসাবে কিছু কর্মসূচির উদ্যোগ তাঁর নেতৃত্বে নেওয়া হয়। বিদেশে অনুষ্ঠিত ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন একাধিকবার।

পার্লামেন্ট ও সংসদ ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে অনেক লেখা-জোখা আছে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইন্ডিয়া অ্যান্ড পার্লামেন্ট (১৯৫৯), পোরট্রেট অব্ পার্লামেন্ট (১৯৭৭, ১৯৯২)-এর মতো উচ্চমানের পুস্তক এবং কমিউনিস্ট নেতা এ. কে গোপালনের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত কমিউনিস্ট ইন পার্লামেন্ট (১৯৫৭) নামক পুস্তিকা।

তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সংসদীয় ব্যবস্থার অবমূল্যায়নের কারণ নির্দেশ করে তাঁর কিছু মূল্যবান লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

তবে সংসদে হীরেন্দ্রনাথের ভূমিকা আলোচনায় উপরে উল্লেখিত তথ্য সিকিভাগ সূত্রেরও নির্দেশ দিতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত লোকসভা ডিবেটের ২৯০ খণ্ডের (এর মধ্যে বেশ কিছু ঢাউশ আকারের) খুঁটিয়ে দেখা। লোকসভার এইসব কার্যবিবরণী ও অন্যান্য দলিলপত্রের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের পঁচিশ বছরের সংসদ জীবনের বিবরণ। এর পর্যালোচনা। এক দুরূহ কাজ এবং একক প্রচেষ্টায় প্রায় অসম্ভব। আলোচ্য নিবন্ধকে সেজন্যই খণ্ডিত, আংশিক ও প্রাথমিক হিসাবে গণ্য করা উচিত।

দুই

১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি যখন বে-আইনি সেই সময় থেকে এবং আজও হীরেন্দ্রনাথ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তিনি বলেছেন এবং লিখেছেনও। পার্লামেন্টে একজন কমিউনিস্ট হিসাবেই তিনি নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বভাবতই প্রয়োজন দেখা দেয়, পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পরিবেশে গঠিত আইনসভার (লোকসভা/রাজ্য বিধানসভা) প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বক্তব্যের খানিকটা আলোচনা। মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখায় 'পার্লামেন্টারি ক্রেটিনিজম' বা সংসদীয় স্থূলতা ও রুগ্নতার উল্লেখ পাওয়া যায়। লেনিন তাঁর বিভিন্ন লেখায় বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের বক্তব্যের সমালোচনা করে ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় গণতন্ত্র তথা সংসদের অসম্মতি ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মান নেত্রী রোজা লুক্সেমবুর্গ মনে করেন আইনসভা কর্তৃত্বকারী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি জানানোর রাবার স্ট্যাম্প মাত্র। আবার মার্কসবাদীদের মধ্যে যারা অতি বাম বলে পরিচিত তারা সংসদকে 'শুয়োরের খোয়াড়' বলে আখ্যায়িত করেন। সাম্প্রতিককালে রালফ মিলিব্যাণ্ড, প্যারি এণ্ডারসন, নিকোস পুলানৎজাস প্রমুখ পশ্চিমীদেশের বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা গণতান্ত্রিক সংসদ কাঠামোর প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে এর নেতিবাচক দিকগুলো সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এদের কেউ কেউ মনে করেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ-কাঠামো মার্কসবাদীদের মানসিকতাকে আবিষ্ট করে রাখে, পার্লামেন্ট সম্বন্ধে মোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায়। লেনিনও মনে করেন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য আইনসভা এক বিশেষ ভূমিকা নেয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে হিতকর মৌলিক কোনো পরিবর্তন পার্লামেন্টের পক্ষে আনা সম্ভব হয় না। বরঞ্চ মিলিটারি, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের দমনমূলক কাজকর্মের বৈধতা এনে দিয়ে কর্তৃত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করে পার্লামেন্ট।

তবে আইনসভার এবম্বিধ মূল্যায়ন সত্ত্বেও মার্কস থেকে শুরু করে কোনো কমিউনিস্ট নেতাই বুর্জোয়া আইনসভার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করেননি। লেনিন নিজেও বামপন্থী

সংকীর্ণতাবাদের সংসদ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতিসরলীকরণ বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। আইনসভায় অংশগ্রহণ নিয়ে ১৯১৮ সালে জার্মান কমিউনিস্টদের মধ্যে যখন খুব বিতর্ক দেখা দেয়, লেনিন তখন স্পষ্ট ভাষায় বলেন, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থেই আইনসভায় অংশ নেওয়া কমিউনিস্টদের আবশ্যিক কর্তব্য। মার্কসবাদীরা অবশ্য সংসদীয় সংগ্রামকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার বিরোধী। শ্রমিক আন্দোলনের পরীক্ষিত নেতারা সংসদ ব্যবস্থার মোহে সংস্কারবাদের শিকার হয়েছেন, এ নজিরের তো অভাব নেই। তত্ত্বগতভাবে মার্কসবাদীরা সেজন্য সংসদ-সর্বস্বতায় বিশ্বাসী নন, সংসদ বহির্ভূত সংগ্রামকেই তাঁরা গুরুত্ব দেন।

স্বভাবতই ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে এইসব বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়, কর্মসূচি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৭-৫১ পর্বে কমিউনিস্ট পার্টি যেমন তেলেঙ্গনার সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছে, কাকদ্বীপের কৃষক সংগ্রামে অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে। তেমনি 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' নীতির জন্য রাজনৈতিক খেসারতও দিতে হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫১ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনী ইশতেহার প্রচার করে কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত দল ও গোষ্ঠীর ব্যাপকতম ঐক্য গড়ার আহ্বান জানায়। ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ৩১ জন কমিউনিস্ট নির্বাচিত হন। লোকসভা আসনে সারা ভারতে সর্বাধিক ভোট পান নালগোন্ডা সংসদীয় কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের নেতা কমিউনিস্ট রবিনারায়ণ রেড্ডি এবং ঐ একই কেন্দ্রের সংরক্ষিত আসন থেকে ভারতে দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন হরিজন প্রার্থী সুনকম আচালু। পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন পাঁচজন— রেণু চক্রবর্তী, কমল বসু, নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী, তুষার চ্যাটার্জি এবং হীরেন মুখার্জী। কমিউনিস্টরা লোকসভায় প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি পান।

তিন

কেমন হবেন কমিউনিস্টরা সংসদে? কী হবে তাঁদের সংসদীয় আচরণ? একে তো পার্লামেন্ট সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের বে-ছক, বেয়াড়া ধারণা, তার ওপর সদ্য প্রত্যাহৃত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রলেপ ছিল তাঁদের মানসিকতায়, ছিল ওয়েস্টমিনস্টার বা ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রশ্ন। স্বভাবতই রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা ভীতিমিশ্রিত উদ্বেগ ও শঙ্কা ছিল কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে। তাছাড়া সদ্য নির্বাচিত পার্লামেন্টের অনেক সদস্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল ঔপনিবেশিক আমলে আইনসভার সদস্য হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা, বেশ কয়েকজন ছিলেন সংবিধান রচনার জন্য গঠিত পরিষদের সদস্য। কিন্তু লোকসভার কমিউনিস্ট সদস্যদের মধ্যে একমাত্র আনন্দ নাম্বিয়ার (মাদ্রাজ থেকে নির্বাচিত) ছাড়া আর কারও সংসদ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই (মে-আগস্ট ১৯৫২) কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। সংসদে যাদের প্রবেশ একটা প্রাথমিক অনীহা নিয়ে সেই কমিউনিস্টরা কী করে এমন দক্ষ সাংসদ হিসাবে নিজেদের প্রমাণিত করতে পারে,

এ নিয়ে অনেকের মতো ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রখ্যাত গবেষক এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক মরিস জোনসকেও বিস্ময় প্রকাশ করতে হয়। আর অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়ের পরিশীলিত শব্দ প্রয়োগ, ঋজু-স্পষ্ট বক্তব্য, মার্জিত কায়দা কানুনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন একাধিক সংসদ বিশেষজ্ঞ এবং বিদেশি লেখক। অবশ্য এর জন্য কমিউনিস্ট সদস্যদের প্রস্তুতি নিতে হয়েছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রচুর। হীরেন্দ্রনাথ নিজে সেই আমলের শ্রেষ্ঠ পার্লামেন্টারিয়ান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য নিয়েছেন। কমিউনিস্টরা তাড়াতাড়ি সংসদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন, এ প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছেন শ্যামাপ্রসাদ। লোকসভার একাধিক স্পীকার এবং রাধাকৃষ্ণান ও জাকির হোসেনের মতো রাজ্যসভার সভাপতিরা কমিউনিস্টদের সংসদীয় দক্ষতার তারিফ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে নয়, ইদানীং একটা তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা হয় যে কমিউনিস্টরা সফল সাংসদ কারণ তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন হীরেন মুখার্জী, রেণু চক্রবর্তী, পার্বতী কৃষ্ণান, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রজিত গুপ্ত এবং বাংলায় জ্যোতি বসু—এঁরা সবাই 'বিলেত ফেরত' কমিউনিস্ট, প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, ভারতীয় বংশোদ্ভব রজনীপাম দত্তের কাছে বিলেতে এঁদের পাঠ নেওয়া। কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ লিবারেল সংস্কৃতি এঁদের পুষ্ট করেছে এবং সেজন্যই সংসদীয় কায়দাকানুন এত ভালভাবে এঁরা রপ্ত করে নিতে পেরেছেন; সংখ্যার দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও পার্লামেন্টে এরা অনেক বেশি গুরুত্ব আদায় করে নিয়েছেন, সমীহ পেয়েছেন। সমালোচকরা অবশ্য ভুলে যান যে "বিলেত ফেরত" কমিউনিস্ট এম-পি-দের সঙ্গে যুক্ত ছিল গণ আন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, ত্যাগ স্বীকার,কারাবাস এবং সর্বোপরি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। আর তাছাড়া কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা বিলেত যাননি, বিদেশে পড়াশুনা করেননি অথচ দক্ষ সাংসদ বা বিধায়ক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী প্রাক-স্বাধীনতা আমলে সংবিধান রচনার জন্য গঠিত গণপরিষদের মাত্র দুটি অধিবেশনে যোগ দিতে পেরেছিলেন (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর সদস্যপদ রীতি অনুযায়ী খারিজ হয়ে যায়) কিন্তু ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য অনেক কমিউনিস্ট বিরোধীদের বিস্মিত করেছিল। ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় প্রথম কমিউনিস্ট সদস্য নির্বাচিত হন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। গুরুগম্ভীর গলায় কখনও উচ্চগ্রামে আবার মাত্রাবোধে স্বর নামিয়ে যখন তিনি বলতে উঠতেন সারা কক্ষের সমীহ তিনি পেতেন। মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস সহ সব রাজনৈতিক দলের সদস্যরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর বক্তব্য শুনতেন। বঙ্কিম মুখার্জী বিলেত ফেরত ছিলেন না। ১৯৪৫-এর নির্বাচনে জ্যোতি বসুর সঙ্গে দার্জিলিংয়ের রতনলাল ব্রাহ্মণ ও তেভাগা আন্দোলনখ্যাত কৃষক নেতা রূপনারায়ণ রায় বিধানসভায় নির্বাচিত হন। সোজা-সাপটা বক্তব্য রাখতেন রূপনারায়ণ, বাক্যবাণে সরকারকে দংশন করতে তিনি ছিলেন দক্ষ। একবার তিনি বলেন, "এই সভায় মন্ত্রীরা যে ভাষায় কথা বলেন, সে ভাষা আমি বুঝি না, বাইরে যে কোটি কোটি মানুষ আছেন তারাও বুঝেন না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সভার কত তফাৎ"। সুতরাং কমিউনিস্টরা আদর্শ ও নিষ্ঠার জন্যই সংসদ বা বিধানসভায়

নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিলেত থেকে খেতাব নিয়ে এসেছেন বলে নয়। আর এখন তো বিলেত ফেরত কমিউনিস্ট সাংসদদের সংখ্যা এক আঙুলেই গোনা যায়।

চার

লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব, প্রস্তাব পেশ, বাজেট আলোচনা, অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত বিতর্ক, রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নিজস্ব ঢং-এ বক্তব্য রাখার মধ্যে হীরেন্দ্রনাথের সংসদীয় পারঙ্গমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যে পঁচিশ বছর সাংসদ ছিলেন তার মধ্যে প্রথম দেড় দশক ভারতীয় পার্লামেন্ট স্বমহিমায় সক্রিয় ছিল। সাংসদদের গুণগত উৎকর্ষ ছিল উচ্চমানের, বাঘা বাঘা পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন সংসদে। ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সংসদের ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত; জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উৎস ছিল পার্লামেন্ট। লোকসভার সিদ্ধান্তের ফলেই হিন্দু বিবাহ, হিন্দু উত্তরাধিকার, দশমিক মুদ্রা, ম্যাট্রিক মাপ ও ওজন, জীবনবিমা, ব্যাঙ্ক ও কয়লাশিল্পের জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ ইত্যাদি আইন প্রণীত হয়। লোকসভার আলোচনা সূত্র ধরেই অন্ধ্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি আলাদা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৬৩ সালে সংসদের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে সরকারকে ভয়েস অব আমেরিকা চুক্তি বাতিল করতে হয়। সংসদে উত্থাপিত এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাতেই হীরেন্দ্রনাথের উদ্যোগ ছিল তবে তিনি বিশেষভাবে উজ্জ্বল ছিলেন পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের আলোচনায়। বলা যায়, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি আলোচিত হয়েছে এমন অধিবেশনের সংখ্যা খুবই কম যেখানে হীরেন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেননি। অন্তত ভারতীয় লোকসভার প্রথম দিকে এটা প্রায় রেওয়াজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পর অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কেই বলতে দেওয়া হত। পররাষ্ট্র সংক্রান্ত সব অধিবেশনের আলোচনা সম্ভব নয়, কয়েকটি মাত্র বিতর্কের মধ্যেই আমরা এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

প্রথম লোকসভার (১৯৫২-১৯৫৭) শুরুর দিকে ভারতের আন্তর্জাতিক নীতির মধ্যে অস্পষ্টতা, বহুবিধ দুর্বলতা ও দোদুল্যমানতা ছিল। নির্জোট আন্দোলন তখনও সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেনি। আমেরিকার ছায়া ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী দেশগুলিকে সমর্থন করাই ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রবণতা। কোরিয়ার যুদ্ধে (১৯৫০-৫৩) উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে আমেরিকা রাষ্ট্রসংঘে যে প্রস্তাব আনে ভারত সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়। মালয়ে মুক্তি আন্দোলন দমন করার জন্য গোর্খা সৈন্যের ট্রেনিং দেওয়ার প্রধান কেন্দ্র ভারতে অবস্থিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশ থেকে ভারত যে আর্থিক সাহায্য পেত তার সঙ্গে যুক্ত ছিল অপমানজনক নানা শর্ত। ১৯৫৪ সালে কোরিয়া, ইন্দোচীন নিয়ে জেনেভায় যখন সম্মেলন চলছিল সেই সময় লোকসভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৫ মে পার্লামেন্টে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন (লোকসভা ডিবেট, ভল্যুম ৫ নং ১৬-৭৪)। জওহরলালের পরই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে বলতে দেন স্পীকার। শুরুতেই হীরেন্দ্রনাথ সভাকে স্মরণ করিয়ে দেন ১৫

মে বৈশাখী পুর্ণিমার দিন শান্তির প্রতীক গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের যে প্রয়াস চলছে তার প্রধান অন্তরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ। জেনেভা সম্মেলনে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেসের ভূমিকার প্রচণ্ড সমালোচনা করে আমেরিকা আগামী দিনে সারা বিশ্বের সর্বনাশ নিয়ে আসতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে এবং সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হীরেন্দ্রনাথ ভার্সাই সম্মেলনের (১৯১৯) একটি প্রসঙ্গ টেনে আনেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) শেষে ভার্সাই শান্তি সম্মেলনে বিরাট ভূমিকা নেন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন। কিন্তু ফ্রান্স ছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রচণ্ড সমালোচক, উইলসনের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় ফ্রান্স ক্ষুব্ধ ছিল। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লেমকোঁ ও ব্রিটিশ রাজদূত একদিন গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। প্যারিসে ঐদিনই এক রেল দুর্ঘটনা হয়। সংবাদপত্রের হোর্ডিং-এর এক জায়গায় লেখা হয় রেল দুর্ঘটনা বা 'একসিডেন্ট' অন্যত্র লেখা হয় রেলে সর্বনাশ বা 'ডিসাস্টার'। ব্রিটিশ রাজদূত সবিনয়ে ক্লেমকোঁকে জিজ্ঞেস করেন, ফরাসিরা কি 'একসিডেন্ট ও ডিসাস্টার' একই অর্থে ব্যবহার করেন? ক্লেমকোঁ চটে গিয়ে জবাব দেন, না, এই দুই শব্দ সমার্থক নয় এবং ব্যাখ্যা করে বোঝান যদি রাষ্ট্রপতি উইলসন হঠাৎ করে কুয়োয় পড়ে যান তবে সেটা হবে একসিডেন্ট। আর কুয়ো থেকে তিনি যদি উঠে আসতে পারেন তবে সেটা হবে ভার্সাই চুক্তির পক্ষে ডিসাস্টার বা সর্বনাশ। জেনেভা সম্মেলনে ডালেসের ভূমিকাও সারা বিশ্বের সর্বনাশ নিয়ে আসতে পারে, এটাই ছিল হীরেন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য।

পররাষ্ট্রনীতি বিতর্কে নেহরুর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খটা-খটি হত হীরেন্দ্রনাথ ও কমিউনিস্ট সদস্যদের। তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ কিন্তু চোখাচোখা বক্তব্য রাখতেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়। নেহরু আঘাত সহ্য করতেন কিন্তু মচকাতেন না, পরে অবশ্য অনেক সময়ই স্বীকার করতেন কমিউনিস্ট সদস্যদের সমালোচনার নায্যতা। হীরেন্দ্রনাথ প্রায়শই আফ্রো-এশীয় সংহতি, বিশ্বশান্তি রক্ষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশের প্রয়াস এবং জোট নিরপেক্ষ নীতিকে শক্তিশালী করার বিষয় উল্লেখ করতেন। বস্তুত ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতির সফল রূপায়ণের জন্য কমিউনিস্ট সদস্যরা যথার্থ কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন।

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ নিয়ে লোকসভায় যে বিতর্ক হয় তাতেও জওহরলাল নেহরু, ড. মেঘনাদ সাহা এবং অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের আলোচিত বিষয়ের ওপর দখল এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। (লোকসভা ডিবেট ভল্যুম ৫ পৃ. ৭০০১-৭০১৮) নেহরু তাঁর বক্তৃতায় আণবিক শক্তির সম্ভাবনা এবং এর শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ সম্বন্ধে বৃহৎ শক্তির নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা সভাকে স্মরণ করিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর পর অধ্যক্ষ সাহা তাঁর আধঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় বলেন, আগামী দিনে আণবিক শক্তি মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনধারাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে চলেছে। যদি সঠিকভাবে আণবিক শক্তির প্রয়োগ হয় তবে যে ভাবে অগ্নির আবিষ্কার মনুষ্য জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল ঠিক সেইভাবে শিল্পকলা বিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে আণবিক শক্তি, এক উন্নত স্তরে পৌঁছবে মানব সভ্যতা। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ

সভায় (ভারতীয় প্রতিনিধি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন এই সভার সভানেত্রী) মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ারের বক্তৃতার উল্লেখ করে ড. সাহা বলেন, এর ইতিবাচক দিক হল আণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্বন্ধে আমেরিকার নিশ্চয়তা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ড. সাহার অধিকাংশ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও জানান মার্কিন রাষ্ট্রপতির সদিচ্ছার যে উল্লেখ ড. সাহা করেছেন তার সঙ্গে তিনি একমত হতে পারছেন না। অধ্যাপক Blackett লিখিত Policitcal and Military consequence of Atomic Energy থেকে তিনি উদ্ধৃতি দেন এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা বাজেটের দিকে ড. সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আইজেনহাওয়ারের বক্তব্যের মধ্যে আন্তরিকতা নেই। উল্লেখ করতে হয় হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন ডক্টর সাহার স্নেহধন্য; তাঁর বহুব্যাপ্ত মনীষা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজ সচেতন ও জনসেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রয়াসে গুণমুগ্ধ কিন্তু লোকসভায় ড. সাহার রাজনৈতিক অস্পষ্টতার সমালোচনা করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি।

উপসংহারে ভিশিনিস্কি, ম্যালেনকভ প্রমুখ নেতার উক্তির ভিত্তিতে আণবিক অস্ত্রের শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সদর্থক ভূমিকারও উল্লেখ করেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় পার্লামেন্টের যে অধিবেশনগুলি হয় তার সব ক'টিতেই হীরেন্দ্রনাথ ও কমিউনিস্ট সদস্যরা সোচ্চার ছিলেন। বস্তুত ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১), সেদিন ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান এ কে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেন। এই কালপর্বে সংসদের অধিবেশনগুলিতে কমিউনিস্ট সদস্যরা ছাঁটাই প্রস্তাব ও অন্যান্য সংসদীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে পররাষ্ট্র দপ্তর তথা সরকারের ঢিলেমির সমালোচনা করেন, মুক্তি সংগ্রামে আরও সদর্থক ও ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। ১৯৭১ সালের কার্যবিবরণীর কয়েক হাজার পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বাংলাদেশ নিয়ে সংসদের আলোচনা। কোনো কোনো সময় সংসদ ছিল উত্তাল, কোনো সময় বিক্ষুব্ধ কিন্তু সংযত, আবার ১৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন ঘোষণা করেন "Dacca is now the free capital of a free country" সারা সংসদ তখন হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে। কাঁথি থেকে নির্বাচিত ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য সমর গুহ ঘোষণা করেন, "The name of the Prime Minister will go down in history as the golden sword of liberation of Bangaladesh."

২৭ মার্চ ১৯৭১ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলী নিয়ে সংসদে বিবৃতি দেন। মন্ত্রীর বক্তব্য ছিল নিস্তেজ, ভাসাভাসা, কর্মসূচিহীন, দিশাহীন; মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার কোনো নির্দেশ, এমনকী ইঙ্গিতও ছিল না। সদস্যরা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তাঁদের ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ পায় যখন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জানতে চান, "If the Statement was the last word on the Subject."। সমগ্র লোকসভা হীরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে

সায় দেয়। ফলে বাধ্য হয়েই প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চয়তা দিতে হয় সরকার বিরোধীদের সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে যোগাযোগ রেখে চলবেন, সক্রিয় সাহায্যের বিষয়েও বিবেচনা করা হবে।

এই পর্যায়ে হীরেন্দ্রনাথ সব অধিবেশনেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে সুচিন্তিত ও দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন এবং কার্যবিবরণীতে তা ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অনুবাদ নিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের একটা খুঁতখুঁতানি আছে; তিনি মনে করেন অনুবাদ যথার্থ না হলে ভাষার সৌন্দর্যের লাঘব ঘটে। সেজন্য তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মূল ইংরেজিতেই দেওয়া হল।

পাক বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারে পূর্ববঙ্গ থেকে এককোটির মতো শরণার্থী যখন ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়, সেই সময় মে মাসে পার্লামেন্টের অধিবেশনে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, মূল সমস্যা রয়েই গিয়েছে ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ায়। স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সমন্বিত তাঁর বক্তৃতার একাংশ

International law did not prevent France, monarchical France, Pre-revolutionary France, recognising the United Staes in 1778, When Britain Which was fighting its American colonies, did not recongnise them till 1783. The United States in 1837 did not hesitate to recognise Texas which was a part of Mexico. Mexico Jumped about it but nothing happened. The United States did not hesitate to recognise Panama straightway when Columbia used to be there on the scene and was very angry about it. The United States and so many other governments did not hesitate to recognise in 1943 De gaulle's Liberation Committee, even though they had no footing in France and they were operating from North Africa. So many instances could be given."

বক্তব্যের উপসংহারে হীরেন্দ্রনাথ বলেন, 'The recognition of Bangladesh is a must and it is the primary responsibility of the government of India to do that.

পাকসেনাদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করে তিনি বলেন, একটা নয়, অনেক অনেক 'মাই ল্যাই' ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে। Except for embattled Vietnam, I do not think there has been and other instance of an unequal and harrowing contest in history like the one that is going on in Bangla Desh. (Lok Sabha Debate vol II No 2 pp 228-235)

পরবর্তী অধিবেশনগুলিতেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য সাংসদদের ভাবিয়েছে, পার্লামেন্টের সমর্থন পেয়েছে এবং সরকারের সক্রিয় করেছে! পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং একাধিকবার সংসদে তা স্বীকারও করেছেন।

পাঁচ

১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন অনেকের মতো হীরেন্দ্রনাথকেও আহত করে। লোকসভায় তিনি হন সি পি আই-এর নেতা, এ কে গোপাল হন সি পি এম-এর নেতা। দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় সংসদে কমিউনিস্টদের ভূমিকা অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। ১৯৬৭ সালে স্বতন্ত্র দল প্রধান বিরোধী গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পায়, সংসদে এই দলের সদস্যরাই সোচ্চার হন। বস্তুত বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই পার্লামেন্টে কমিউনিস্ট দলের মান্যতারও অবসান শুরু হয়।

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন সারা ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর পার্লামেন্টকেও কার্যত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। তিরিশ জন এম পি গ্রেপ্তার হন। প্রশ্নোত্তর, দৃষ্টি আকর্ষণী ইত্যাদি সংসদীয় পদ্ধতির প্রয়োগ বাতিল হয়। সংসদ সদস্যদের বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। মন্ত্রীদের বক্তৃতা ছাড়া বিরোধী পক্ষের সদস্য এমনকী কংগ্রেস সদস্যদের বিরূপ মন্তব্য সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় না সেন্সারের জন্য। ২১ জুলাই (১৯৭৫) সংসদের অধিবেশন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ধরনের সরকারি নিষেধাত্মক ফরমানের জন্য সংসদ কার্যত অকেজো হয়েই থাকবে এবং এর পরিণতিও ভাল হবে না। জরুরি অবস্থাকালীন পার্লামেন্টকে তিনি 'ক্যাপটিভ বডি' বা শৃঙ্খলিত সংস্থা বলে অভিহিত করেন।

১৯৭৫-৭৭ পর্বে হীরেন মুখার্জী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, চন্দ্রাপ্পন প্রমুখ সি পি আই সদস্য লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্ত ও তাঁর সহকর্মীরা জরুরি অবস্থার অপব্যবহার এবং সরকারের জনবিরোধী নীতির আলোচনায় মুখর ছিলেন। কয়েকবার সরকারকে পার্লামেন্টের জন্য হেনস্থাও হতে হয়। সি পি আই সদস্যরাই 'সংবিধান অতিরিক্ত' কেন্দ্র দ্বারা সরকারি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা বাড়ছে ইত্যাদি অভিযোগ আনেন। কিন্তু জনসমক্ষে এইসব প্রচারের কোনো সুযোগ ছিল না নিষেধাজ্ঞার দরুন। বরঞ্চ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে কুৎসা প্রচারিত হতে থাকে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে সেজন্য আক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, জরুরি অবস্থার সমর্থন ছিল সি পি আই-র আদি পাপ ('অরিজিনল সিন') যার রাজনৈতিক মূল্য সি পি আই-কে দিতে হয়েছে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে।

পঁচিশ বছরের সংসদ জীবনে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অনেক সময় লোকসভার রকম-সকম দেখে অস্বস্তি বোধ করেছেন, হাঁপিয়ে উঠেছেন এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে হাল্কা মেজাজে সংসদকে 'গ্যাস চেম্বার'-ও বলেছেন কিন্তু স্বীয় ভূমিকা পালনে কখনও পরান্মুখ হননি। এই দীর্ঘ সময়ে স্বীয় দলকে (কমিউনিস্ট হিসাবে তিনি কখনও অনুতপ্তবোধ করেননি), সমাজ ও দেশকে এবং নিঃস্ব নির্ধন মানুষকে যা দিয়েছেন তা তুলনাহীন। যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন সংসদকক্ষের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, মানুষের অধিকারের প্রশ্নে শাসকদের প্রতি রূঢ়, অতি রূঢ় ব্যবহার করেছেন (রেল ধর্মঘট নিয়ে ৯ মে ১৯৭৪ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ), আবার অজন্তা গুহার ফ্রেস্‌কোর লয়প্রাপ্তির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন দেওয়াল চিত্রগুলোর সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয় (ডিবেট, ভল্যুম XLIII পৃ. ১৩০৫৫-৫৬)। তাঁর প্রবাদ-প্রতিম বাগ্মিতা সংসদ ও সংসদের বাইরের অগণিত মানুষকে মুগ্ধ করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর বাকচাতুর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বৈদগ্ধ্য, সুভদ্র মার্জিত আচরণ ও বিভিন্ন সংসদীয় অস্ত্রের প্রায়োগিক পারদর্শিতা ইত্যাদি গুণাবলীর নজির ভারতের সংসদ ইতিহাসে বিরল।

ভারতের সংসদব্যবস্থা আজ এক পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত, এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এতে শঙ্কিত কিন্তু ৯৬ বছর বয়সে আজও তিনি সক্রিয়। ভারতের সংসদ কাঠামোর অবমূল্যায়নের কারণ নির্দেশ করে তাঁর ক্ষুরধার ও বিশ্লেষণাত্মক লেখনী আজও সচল। দেশবাসীর এ কম প্রাপ্তি নয়।

এ্যান্ড 'দিস ওয়াজ এ ম্যান' জহরলাল

বাসব সরকার

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'The Gentle Colossus a study of Jawaharlal Nehru' প্রকাশিত হয় নেহরু প্রয়াত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে, ১৪ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে, জহরলালের ৭৫তম বর্ষপূর্তির দিনে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের মূল্যায়নে তাঁর 'Gandhiji : a Study' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে মহাত্মার অপমৃত্যুর দশ বছর পরে। আর সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর গ্রন্থ 'Bow of Burning Gold' প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে, নেতাজীর অন্তর্ধানের বত্রিশ বছর পরে। তিনটি গ্রন্থই চরিত্র মূল্যায়ন। তথ্য হিসেবে একথাও উল্লেখ্য গ্রন্থ তিনটি রচনার কালগত ব্যবধান বিশ বছর। ভারত ইতিহাসে বিশ শতকের তিন প্রধান পুরুষের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল। তিনি গান্ধী আন্দোলনের Participant observer ছিলেন, আকৈশোর পরিচিত ছিলেন গান্ধীর পিতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। বঙ্গদেশের রাজনীতি ও মুক্তি আন্দোলনের সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে হীরেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ আর সেই ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়েছিল লেখকের সাংসদ জীবনের প্রথম বারো বছরে শরৎ বসুর সঙ্গে। আর জহরলালের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশি, রাজনৈতিক মতামতের প্রভূত বৈপরীত্য সত্ত্বেও।

মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন হীরেন্দ্রনাথ করেছেন রাজনৈতিক দিক থেকে। তাঁদের পিতৃত্বের শক্তি ও দুর্বলতা, জনগণের সঙ্গে তাঁদের জটিল সম্পর্কের দিক থেকে। নিজের বক্তব্য, কর্মসূচি আর লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে অটল প্রত্যয় সেই লক্ষ্যপূরণে অবিচল থাকার মতো সংকল্পের দৃঢ়তা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের সবচেয়ে শক্তির দিক। সেখানে তাঁরা ছিলেন আপসহীন। তার জন্যে যে-কোনো মূল্য দিতেও তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাব যে অভূতপূর্ব গণরাজনীতির সূচনা করে তা গোড়া থেকেই প্রমাণ করে দেয় গান্ধীর সমতুল্য কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এদেশে তাঁর আগে আর আসেনি। নিজের রাজনৈতিক ভূমিকার অপরিহার্যতার ধারণা গান্ধীর মনে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল। তাই নিজের শর্তে তিনি গড়ে তুলতে পারতেন রাজনৈতিক আন্দোলন। যেখানে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। ক্ষমতা হস্তান্তরের কয়েক মাস আগে পর্যন্ত দেশের রাজনীতির চালচিত্রে এর কোনো হেরফের ঘটেনি।

জহরলালের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ঘটেছে কার্যত গান্ধীর হাত ধরে। প্রাক্ গান্ধী যুগের ভারতীয় রাজনীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। পিতা মোতিলালের প্রভাবে আইনজীবীর ভূমিকা কিম্বা কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে মাঝে মধ্যে যোগদান, জহরলালের জীবনে

কিম্বা মনে কোনো স্থায়ী ছাপ ফেলেনি। আত্মজীবনীর পাতায় সেকথার অকপট বিবৃতি দিয়েছেন নেহরু স্বয়ং। হীরেন্দ্রনাথ তার বিস্তারিত উল্লেখও করেছেন এই গ্রন্থে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে জহরলালের প্রবেশ যখন ও যেভাবে ঘটে যায় দেশে গান্ধীর ডাকে গণরাজনীতির বোধনপর্ব। জহরলালেরও ঘটে যায় দেশে গান্ধীর পরেই, অবশ্যই সুভাষ-উত্তরপর্বে, দ্বিতীয় জননেতার জীবনচরিতে প্রবেশপর্ব। হীরেন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন গান্ধীর সম্মোহিনী শক্তি জহরলালকে তাঁর সমগ্র সত্তা নিয়ে জাতীয় রাজনীতির বৃত্তে টেনে না আনলে "with his kind of gift and sensitivity, he might have gone his lovely way, with 'some unborn protest, some unformed idea', inconsequentially to society and in virtual oblivion" (পৃ. ২১৩)।

বিলাতে ছাত্রজীবনের যে অভিজ্ঞতার কথা আত্মজীবনীতে জহরলাল লিখেছেন সেখানে তাঁর দুটি আত্মসমীক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯০৯ সাল মদনলাল ধিঙ্গরা এক জনসভায় কার্জন ওয়াইলিকে গুলি করে হত্যা করার পর যখন বিলাতের সংবাপত্রেও ধিঙ্গ্রার সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের সপ্রশংস উল্লেখ হতে থাকে, তখন জহরলালের প্রতিক্রিয়ার তার বিশেষ কোনো ছাপ পড়েনি। অথচ সেই সময়েই তিনি চিঠিপত্রে দেশে তিলকের চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণের উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় ঘটনা হলো কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য বিশিষ্ট কিছু মানুষকে সাম্মানিক উপাধিদানের সভায় যখন সমস্ত অতিথির হাতে মানপত্র তুলে দেওয়ার সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবারেই, সেই তিনি ব্যতিক্রমী আচরণ করলেন আগা খান ও বিকানীরের মহারাজার ক্ষেত্রে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ জহরলাল বিষয়টি কখনো ভুলতে পারেননি। উপনিবেশের মানুষদের প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান প্রদান যে আমলে রাজনীতির খেলা, তাতে শাসক-শাসিতের সম্পর্কে সামান্য হেরফের ঘটে না, সেই উপলব্ধি অস্পষ্টভাবে হলেও তখনই হয়েছিল।

জহরলালের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে এই ঘটনার অভিঘাত কেমন হয়েছিল তার ব্যাখ্যায় হীরেন্দ্রনাথ, এরিক এরিকসনের 'Young Man Luther' গ্রন্থ থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এরিকসনের লেখায় ইতিহাস ও মানব মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ আছে। হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে গান্ধীর চরিত্র বিশ্লেষণে তার প্রযোজ্যতা খুব বেশি। লুথার প্রসঙ্গে এরিকসন যখন বলেন তাঁর চরিত্রে সাধারণভাবে তরুণ বয়সেই একটা "inarticulate stubornness, a secret furious inviolacy, a gathering of impressions for eventual use within some as yet dormant new configuration of thought" ছিল, জহরলাল প্রসঙ্গে লেখক মনে করেন সেই কথাটা খুবই সঠিক (পৃ. ১৫)। আরো পরে সুভাষচন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণেও হীরেন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন (পৃ. ১১৫), যার থেকে বোঝা যায় ভারত ইতিহাসে বিশ শতকের তিন প্রধান পুরুষের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্বে চেতনা বৃত্তে প্রায় একই ধরনের রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক মিথষ্ক্রিয়া চলেছিল। হয়তো সেই জন্যই গান্ধীর ডাক জহরলালকে ভিতর থেকে যেভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁর জীবনে তার সমতুল্য কোনো কিছু এর আগে আর ঘটেনি। পিতা মোতিলালের প্রতি গভীর স্নেহাসক্ত এবং অনুগত

জহরলাল রাজনৈতিক জীবনে গান্ধীর 'পিতৃত্ব' (জাতীয় আন্দোলনে গান্ধী, বয়ঃকনিষ্ঠ সমস্ত অনুগামীদের প্রায় সকলের কাছেই 'বাপু' ডাকে অভ্যস্ত ছিলেন) তাঁকে একইভাবে স্নেহাসক্ত ও অনুগত করেছিল। মোতিলালের রাজনৈতিক জীবনে মাঝে মাঝে পুত্র জহরলালের বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে, যদিও শেষ পর্যন্ত তার মীমাংসা হয়েছে বোঝাপড়ায়। জহরলালের সঙ্গে গান্ধীর রাজনৈতিক মতবিরোধে শেষ পর্যন্ত তার মীমাংসা হয়েছে বোঝাপড়ায়। জহরলালের সঙ্গে গান্ধীর রাজনৈতিক মতবিরোধে শেষ পর্যন্ত যে জহরলাল বাসু'র প্রতি আনুগত্য থেকে সরে যেতে পারবে না, সেই বিশ্বাস গান্ধীরও ছিল। তাই জহরলালের র‍্যাডিকাল চিন্তাধারায় গান্ধীর আর্থ-সামাজিক মতাদর্শের প্রতি যাঁদের আনুগত্য ছিল একশো শতাংশ তাঁরা গভীরভাবে বিচলিত বোধ কললেও গান্ধী বলতে পেরেছিলেন তাঁর অবর্তমানে জহরলাল 'shall be speaking my language' জহরলালকে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী মনোনীত করার পিছনে এই গভীর বিশ্বাস কাজ করা ছাড়াও গান্ধী হয়তো এটাও বুঝেছিলেন যে বল্লভভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী কিম্বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে এই বিরাট দেশের বহু বিচিত্র জনমানসের টানাপোড়েনে গোটা দেশকে সমভাবনায় ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে না।

গান্ধীর রাজনৈতিক ডাকে জহরলাল শুনেছিলেন 'some kind of direct defiance fo anthority on a mass scale' (পৃ. ১৯) যা রাজনৈতিক গতানুগতিকতার অর্থহীনতার মধ্যে এমন এক সাড়া জাগায় যাকে জহরলাল স্বয়ং বলেছেন, tremendous relif', যখন তাঁর মতো অনেকেই 'afire with enthusiasm' হয়ে পড়ে 'gaol going'-কেই সেই সময়ের অবশ্য রাজনৈতিক কর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে জহরলাল তখন এবং পরে বহু সময়েই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেছেন কিন্তু কোনো সময়েই খুব সাধারণভাবে ছাড়া সঠিক কোনো পরিবর্তন দরকার মে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেননি। জহরলাল জীবনের কোনো পর্বেই 'was not cast in a very positive political mould', যার জন্য যে-কোনো বিষয়ের নানা দিক ভেবে তাঁর মন সিদ্ধান্ত গ্রহণে 'could not overcome, hesitancies and scruples and take a downright stand.' জহরলাল সেই ধরনের বিপ্লবী ছিলেন না, হতেও পারেননি যেহেতু তিনি 'was not made of the stuff of revolutionaries who have to be determind and doubt-free, even at the cost of certain crudities and a readiness to be ruthless' তাই জহরলাল তাঁর নেতা গান্ধীর পথ ধরেই চলেছেন মনে করে থাকলেও 'his foot-steps left very diffenent imprints' এর থেকে হীরেন্দ্রনাথ যে সিদ্ধান্তে এসেছেন জহরলালের চরিত্র আলোচনায় সেটা একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ করে 'Jawaharlal's distiuctive quality, in politics and in life, was his sensitivity, his quickand acute response to impressions, a peculiar delicacy of perceplion and an inhate fashidiousness, whichl, often in his public an private life, gave him a kind of anguish as well as ecstasy that others differently endowed were insensibly spard' (পৃ. ২৩)।

সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে উঠে আসা গান্ধী ও তাঁর নেতৃত্বে প্রাণিত হয়ে জহরলাল যখন এলাহাবাদের বাইরে প্রতাপগড় জেলার কৃষকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে যাতায়াত শুরু করেন। যখন অল্প দিনের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করেন জনগণের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আর থাকছে না। সেই আত্ম আর ভারত আবিষ্কারের প্রাথমিক শিহরণের ঘোর জহরলালের সমগ্র জীবনে কখনোই কাটেনি। জনগণের সঙ্গে কেবল নয়, তাদের নিবিড় সান্নিধ্যে জহরলালের প্রাণশক্তি যেভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠতো। এদেশে অন্য কোনো জননেতার জীবনে তা আর দেখা যায়নি। পিতা মোতিলাল প্রতাপগড় জেলার কৃষকদের সঙ্গে জহরলালের মেলামেশাকে দেখেছিলেন নির্বাচনী রাজনীতির গণসংযোগের কর্মসূচি হিসেবে। তাঁর মনে আশা জেগেছিল। জহরের জনপ্রিয়তা ব্যবস্থাপক সভার পরবর্তী নির্বাচনে প্রতাপগড়ের রাজার পরাজয়কে সুনিশ্চিত করতে পারে।

গান্ধীর শিষ্য হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু হওয়ায় কারাবাস যখন প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়, তখনও জহরলাল বলেছেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাশুল হিসেবে জেলে যেতে হলে অভ্যস্ত জীবনের যেটুকু পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে তার বেশি কিছু তিনি সচেতনভাবে ছাড়েননি। সন্ন্যাসীর মতো, ত্যাগীর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখার প্রতি তাঁর কোনো নৈতিক আকর্ষণ ছিল না। সেই ধরনের মূল্যবোধ তিনি সমর্থন করেননি। তবে জীবনযাপন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক বৃত্তে প্রবেশের সূত্রে যেহেতু অনিবার্যভাবেই বদলে যায়। নেহরুর জীবনে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। তার ফলেই ঘটেছিল মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন, যা পরিবেশ ও পরিস্থিতি তখন সব রাজনৈতিক কর্মীর কাছেই দাবি করেছিল। জনগণের সান্নিধ্য, জহরলাল নিজেই বলেছেন, তাঁর জীবনের এমন কিছু 'inner need' পূরণ করে, যার থেকে কর্তৃত্বের প্রাথমিক স্বাদ তাঁর 'will to power' কিছু পরিমাণে তৃপ্ত করে। নেহরুর নিজের কথায় তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল একটা সংগ্রামের ক্ষেত্র। যেখানে পরস্পরবিরোধী নানা শক্তি, প্রবণতা প্রাধান্য বিস্তরের চেষ্টা করে যেত অবিরাম। তাই নিরন্তর সক্রিয়তার মধ্যে তিনি খুঁজে পেতেন জীবনের সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য অবস্থা, যা তাঁর ব্যক্তিত্বে চরিত্রে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে। ঘন ঘন এবং নানা দৈর্ঘ্যের কারাবাসের মধ্য দিয়েই জহরলাল সেই চরম উপলব্ধির স্তরে উপনীত হন যে পরাধীন দেশের মানুষদের রাজনৈতিক সংগ্রামে বোধহয় 'একলা চলো রে'-এর শিক্ষার চেয়ে বেশি মূল্যবান কিছু নেই।

জহরলালের এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার তৎকালীন উপলক্ষ গান্ধীর কিছু নীতি ও সিদ্ধান্ত হলেও, একটা গভীর যন্ত্রণাবোধ থেকে তিনি গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্কছেদ হয়ে গেছে বলে মনে করলেও, আত্মজীবনীতে একথাও না লিখে পারেননি যে সব রকমের অদ্ভুতত্ত্বের সমাহার গান্ধীর মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও এই মানুষটির এমন এক 'amazing and almost irresistible charm and subtle power over people' রয়েছে যার জন্যে গান্ধী অপরিহার্য। ফলে মানুষ যদি আর জননেতা গান্ধীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জহরলালের গান্ধী বিচারের মাঝে মধ্যে গভীর ছাপ ফেললেও, জহরলাল শেষ পর্যন্ত গান্ধীর এই দুই সত্তার কাছেই আনুগত্য প্রকাশ্যে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে গান্ধীর উপরে তাঁর একটা বিশেষ ধরনের নির্ভরতার

সম্পর্ক গড়ে ওঠে যেটা জহরলালের চরিত্রের একটা বিশেষ ঘাটতি পূরণ করে, যার সঙ্গে তুলনীয় আর কিছু জহরলালের সমগ্র কর্মজীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯২০-র দশকে গান্ধীর অনেক রাজনৈতিক কাজ ও সিদ্ধান্ত জহরলাল যেমন মনের দিক থেকে মানতে না পেরেও শেষ পর্যন্ত সমর্থন করেছিলেন, তেমনই গান্ধীর আরেকটি কাজ, বিড়লা প্রমুখ শিল্পপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পিতা মোতিলালের মতো তিনিও না মেনে এই আশংকাও প্রকাশ করেছিলেন যে, গান্ধীকে কংগ্রেসের কাছে অর্থ সাহায্য করার পাশাপাশি লাজপত্ রায় ও মদনমোহন মালব্যকে অর্থ দিয়ে বিড়লা কংগ্রেস সংগঠন দখল করার উদ্যোগ নিয়েছে। বিড়লার অর্থে পুষ্ট হয়ে তখন হিন্দু মহাসভা এই দুই পিতাকে সামনে রেখে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে যেভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তার জন্যে দেশকে অবশ্যই একদিন মূল্য দিতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে গান্ধীর মতো জনজীবনের মাঝখান থেকে উঠে আসা নেতা না হয়েও মোতিলাল ও জহরলাল ধর্মীয় চেতনার প্রসার, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ সম্পর্কে যে সব আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, একই চেতনা গান্ধী-মানসে কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি কেন? হয়তো এই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে তাঁদের বিচারের মাপকাঠিটাই আলাদা ছিল।

গান্ধী জহরলালের উপর যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তাঁর চৈতন্যকে একটা বিশেষ খাতে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন, সেটা আগাগোড়া একইভাবে কাজ করেনি, এটাও যেমন সত্য, তেমনই এটাও ঠিক যে জহরলাল বিদ্রোহী হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও গান্ধীর সম্মোহনী প্রভাবের বাইরে কখনোই যেতে পারেননি। মানব চরিত্রের শক্তি ও দুর্বলতা গান্ধী তাঁর নিজের মতো করে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই জাতীয় আন্দোলনে, তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী, সমস্ত সংকটকালে জহরলালকে নানা কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। এই সূত্রেই বলা দরকার ভারতীয় রাজনীতির গান্ধী পর্বে মহাত্মার পক্ষে জহরলালকে নানাভাবে ব্যবহার করার যে বিশেষ তাগিদ অনুভূত হয়, তাঁর অনুগামী অন্য কোনো কংগ্রেস নেতাকে নিয়ে গান্ধী সেই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তাগিদ কখনো অনুভব করেননি। এটা যেমন গান্ধী নেহরু সম্পর্কের একটা বিশেষ দিক তুলে ধরে তেমনই গান্ধীর উত্তরসূরী হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা যে জহরলাল ছাড়া আর কারো নেই, ১৯২০ দশকের শেষ থেকে সেটাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তোলে। বস্তুত 'nation is safe in his hand' বলার মতো অবস্থায় গান্ধী এসেছিলেন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই। জহরলাল আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে তিনি সম্মানিত বোধ করার চেয়ে আহত বোধ করেছিলেন অনেক বেশি। এই সম্মান, এইভাবে নেতৃত্বে মনোনয়নে, জনগণের তাঁর প্রতি আস্থা আছে কিনা যাচাই হওয়ার বদলে, গান্ধীর প্রতি গভীর আস্থা থেকেই যে জনগণ গান্ধীর মনোনয়ন মেনে নিচ্ছে, এই চিন্তাটাই নেহরুর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। তৎসত্ত্বেও গান্ধীর সিদ্ধান্তই সর্ব সম্পতিতে অনুমোদিত হয়। জহরলাল নিজেই লিখেছেন, তাঁর নেতৃত্বের স্তরে পদোন্নতি ঘটলো। সামনের খোলা দরজা দিয়ে সকলের আলাপ আলোচনা ও সম্পত্তির ভিত্তিতে নয়। তিনি মঞ্চের মাঝখানে এসে হাজির হলেন 'trapdoor'

দিয়ে। কিন্তু গান্ধী এ কাজ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব বিচারের ভিত্তিতে, যেহেতু তিনি নিজেই বলেছেন, জহরলাল রাজনৈতিক চিন্তায় চরমপন্থী হয়েও তার মধ্যে সেই বিনয় ও বাস্তববুদ্ধি রয়েছে যার জন্য সে কখনো কোনো সম্পর্ককে ভাঙনের মুখে নিয়ে যাবে না। তাই খিড়কির দরজা দিয়ে নেতৃত্বের পদে উন্নীত হয়ে জহরলালের অহমিকায় যে আঘাতই লাগুক না কেন, সে এই মনোনয়ন কখনোই অস্বীকার করবে না, এই বিশ্বাস গান্ধীর ছিল। শুধু তাই নয় অন্যান্য সম্ভাব্য সমালোচকদের নিরস্ত করার জন্যে গান্ধী এটাও বলেছিলেন যে জহরলাল 'rash and impetuous' ঠিকই, কিন্তু দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই দুটোই জহরের নেতৃত্বের বাড়তি গুণ বলেই প্রমাণিত হবে।

এই সময় থেকে শুরু করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মুহূর্ত পর্যন্ত গান্ধী নেহরু সম্পর্ক দু'জনের দিক থেকে মোটামুটি সহনশীলতার সেই পরিসরেই আবর্তিত হয়। যেখানে মতান্তর মাঝে মাঝে ঘটে থাকলেও মনান্তরের সম্ভবনা দেখা দেয়নি কখনো। এই সম্পর্কে অবশ্যই নিয়ামকের আসনে ছিলেন গান্ধী। জহরলালের ক্ষোভ, সমালোচনা বিদ্রোহের পর্যায়ে যায়নি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে গান্ধী যখন তাঁর ধারণা অনুযায়ী আন্দোলনের কর্মসূচিতে অটল, তখন জহরলালসহ কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে ছিলেন ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধে মতাদর্শগত অবস্থান নেওয়ার তাগিদে। গান্ধী তাঁদের জানিয়ে দিতে ভোলেননি যে, আন্দোলনের ডাক দেওয়া হলে জনগণকে সুনিশ্চিতভাবেই তিনি সঙ্গে পাবেন। তাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক যে কর্মসূচিতে গান্ধীর অনুমোদন আছে, অন্য কারা তার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে, সেই তথ্য নির্বিশেষে জনসমর্থন থাকবে গান্ধীর সঙ্গে। তাই ভারতছাড়ো আন্দোলনের কর্মসূচিতে হয়তো কিছু পরিমাণে অনিচ্ছুক জহরলালকে সামিল হতে হয়েছিল নিজের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে। বলা যায় রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকে বিয়াল্লিশের আন্দোলন পর্যন্ত এই প্রায় আড়াই দশকে জহরলাল গান্ধীর ছায়াবৃত হয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের স্বতন্ত্র, স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণের অবস্থায় কখনও আসতে পারেননি। এখানে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জহরলালের পার্থক্য। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য গান্ধীর নেতৃত্ব, কর্মসূচি, পথ যতোদিন তাঁর বিচারে অনন্য মনে হয়েছে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর নেতৃত্বকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নিজের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ভিন্নপথ গ্রহণেও প্রয়োজনে ইতস্তত করেননি একদিনও। এই মানসিক দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় নেহরুর ছিল না। নেহরু বিবেকদংশনে জর্জর হয়েছেন, গান্ধীর কথায় মত পরিবর্তন করে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীর সঙ্গেই থেকেছেন। এই আনুগত্যকে জহরলালের গান্ধীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হওয়ার কৌশল, একটা স্বার্থবুদ্ধি বলে মনে হতে পারে, তেমন সমালোচনাও আছে যথেষ্ট; কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ বিষয়টির ব্যাখ্যায় জহরলালের মনের গঠন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। জহরলাল গান্ধী প্রসঙ্গে নিজেই লিখেছেন, মনস্তাত্ত্বিক সংকটের মুহূর্তে গান্ধীর একটা সঠিক পদক্ষেপটি যথাসময়েই গ্রহণ করার ক্ষমতা। তখন কেবল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে নয়, জাতীয় সংগ্রামের বৃহত্তর প্রেক্ষিতেও তার যুক্তিযুক্ততা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে (উদ্ধৃত পৃ. ৬৩)। ফলে জহরলালের মনে এই ধারণা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে

ওঠে যে গান্ধী কেবল জাতীয় আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা নন, তিনি 'almost synonymous with the causl' (পৃ. ৬৫) হয়ে পড়েছেন, যা এদেশের অন্য কোনো নেতা বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নেহরু বলতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই সূত্রেই হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, আন্দোলনে, সংগ্রামে জহরলাল উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন, তাঁর চিন্তাধারায় আসতো বিশেষ ধরনের ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু তার পাশাপাশি দেখা যেত একটা সংশয়ী ধারা, যা তাঁকে ইতস্তত করতে, দৃঢ়পদক্ষেপে লক্ষ্যপূরণে অগ্রসর হতে বাধা দিত। হয়তো চরম সংগ্রামের জন্য যে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হবে, তার চিন্তাই তাঁর কর্মতৎপরতার, সংকল্পের রাশ টেনে ধরতো। ব্যক্তিগতভাবে নিজের যে-কোনো কাজের জন্যে চূড়ান্ত মূল্য দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু সমগ্র জনগণের কাছে ততোটা প্রত্যাশা করা সঙ্গত কিনা, উচিত হবে কিনা, এটা নিয়েই তিনি সংশয়ে দীর্ণ হতেন (পৃ. ৬৫)।

জাতীয় জীবনের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর্বে গান্ধীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল একটি বিষয় যথা সম্ভব সুনিশ্চিত করা যে, জহরলাল আন্তরিকভাবেই তাঁর পাশে আছেন। কারণ মধ্য তিরিশের দশক থেকে জহরলাল বিশ্বপ্রেক্ষিতে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের কথা বলার সময় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি যে সমর্থন খোলাখুলি প্রকাশ করতে থাকেন, তার ফলে দেশের সচেতন জনমতের একাংশের মধ্যে তাঁর একটা স্বতন্ত্র সামাজিক ভিত্তি ধীরে হলেও গড়ে উঠতে শুরু করে। জনমানসের গতিপ্রকৃতি বোঝায় গান্ধীর যে দুর্লভ ক্ষমতা ছিল, তার ভিত্তিতেই তিনি বুঝেছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি দেশের একাংশের মানুষের এই আকর্ষণ যদি জহরলাল প্রমুখদের নেতৃত্বে ভিন্ন পথ ধরে, তাহলে গান্ধীর ধারণা অনুযায়ী আন্দোলন পরিচালনায় বাধা আসতে পারে। তিনি সেই ঝুঁকি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। মনে করা যেতে পারে গান্ধী সুভাষচন্দ্র কিম্বা অন্যদের বিরোধিতার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু জহরলালের ক্ষেত্রে, বিশেষত যদি দেশের তরুণ সমাজ নেহরু সুভাষের যৌথ নেতৃত্বে ভিন্ন পথ ধরে, সেই ঝুঁকি নিতে গান্ধী অরাজি ছিলেন আগাগোড়া। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, গান্ধী তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে সচেতনভাবেই একের পর এক সেইসব পদক্ষেপ নিতে থাকেন, যাতে জনগণের ক্রমবর্ধমান জঙ্গিয়ানা সংযত করা যাবে এবং তাঁর চিন্তা অনুসারে ভারতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। অথচ জনগণের এই জঙ্গি চেতনায় জহরলাল উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন (পৃ. ৭৬)। জহরলালের ওপর নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব এই কাজে যথাসাধ্য ব্যবহার করতে গান্ধী কখনোই দ্বিধা করেননি। আর জহরলালের পক্ষে গান্ধীর সম্মোহনী ক্ষমতা এড়িয়ে চলা সাধ্য ছিল না। তাই নেহরু-সুভাষের যৌথ অবস্থান সমকালের পরিস্থিতিতে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারতো তা সম্ভবনাতেই বিনষ্ট হয়। হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন জহরলালের মনে, 'indecision and peculiar scruples and a sord of fixation about Gandhi's incontestable indispensibility, remains a major blemish on Jawaharlal's record' (পৃ. ৮০)। এই সূত্রেই হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন নেহরু ও সুভাষ এক জোট হয়ে দাঁড়াক, গান্ধী কোনোদিনই সেটা চাননি। তাদের মধ্যে দূরত্ব গান্ধীর রাজনীতির অনুকূল বলে মনে হতো।

জাতীয় আন্দোলনের যে-কোনো সংকটে যখনই সাম্প্রদায়িকতাবাদের কোনো ছায়াপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মোতিলাল ও জহরলাল, পিতা-পুত্র একযোগে তার বিরোধিতা করে সেকুলারত্বের ধারণাটি আগাগোড়া তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মনোভাব ছিল আপসহীন। ফলে মুসলিম লীগ কিম্বা হিন্দু মহাসভা, কোনো সংগঠনকেই তাঁরা সহ্য করতে পারেননি। আর তাদের নেতৃত্বের সঙ্গে সমকক্ষতার ভিত্তিতে কোনো আলাপ আলোচনাতেও তাঁরা নারাজ ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন যখন ১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি থেকে মাথাচাড়া দিতে থাকে তখন জহরলালের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল অসহিষ্ণু। অথচ দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠী যে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন থেকে ক্রমাগত: সরে গিয়ে একটা বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণের দিকে চলেছে, সেটা জহরলালের চেয়ে বেশি আর কেউ জানতেন না। কারণ তখনকার যুক্তপ্রদেশে, যার বর্তমান নাম উত্তরপ্রদেশ, মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নেহরুদের পারিবারিক ও সামাজিক স্তরে ঘনিষ্ঠতার জন্যে এটা জানা খুবই সহজ ছিল যে, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের মানসিক দূরত্ব ক্রমশ অ-সেতুসম্ভব হয়ে উঠছে। এহেন অবস্থায় মুসলিম লীগকে অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসই কেবল সারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবি করা হতে থাকলে যে মুসলিম মনস্তত্বকে এক কথায় নাকচ করে দেওয়া হয়, জহরলাল সেই বিষয়টি আলাদা করে ভাবেননি, কিম্বা ভাবতে চাননওনি। ঘটনাচক্র তার মাশুল দিতে হয়েছে দেশভাগে। সব রকমের সাম্প্রদায়িক সংস্থা সম্পর্কে নেহরুর মনে একটা 'insuperable psychological barriers' গড়ে উঠেছিল, যাকে উপেক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। ১৮ অক্টোবর ১৯৩৯ জিন্নাকে একটি চিঠিতে নেহরু লিখেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কিছু করতে না পারার জন্য তিনি লজ্জিতবোধ করেন। কারণ মনের দিক থেকে এ বিষয়টির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে তিনি অপারগ। তাই 'though I have given much thought to the problem and understand most of its implications, I feel as if I was an outsider, an alien in spirit.' (উদ্ধৃত, পৃ. ১০২)

শুধু তখন নয়, লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে, যখন স্পষ্টতই বোঝা যেতে থাকে যে ইংরাজরা কংগ্রেস লীগ বিরোধকে হাতিয়ার করে এদেশে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করতে চাইছে তখন নিজস্ব উদ্যোগে লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু, কিম্বা ১৯৪৫-৪৬ সালের সেই উত্তাল গণ আন্দোলনের পর্বে যখন হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত শক্তিকে মুক্তির সংগ্রামে ব্যবহার করার মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল তখনও কোনো উদ্যোগ নেহরু গ্রহণ করতে পারেননি কিম্বা চাননি। গান্ধীর অহিংসা আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে এটা সম্ভব হতো না। নিজের অসাম্প্রদায়িকত্ব অটুট রাখার জন্য হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংঘাত থেকে সরে থাকা সেকুলারত্বের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করা যায় না। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা কাজ করতে দেওয়া গেলে দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে পারতো, কংগ্রেসের সভাপতিপদের সদ্য দায়িত্ব নিয়ে জহরলাল একটা মারাত্মক কৌশলগত ভুল করে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি বানচাল করে দেন। জহরলালের অকৃত্রি সুহৃদ মৌলানা আজাদেরও মনে হয়েছিল কংগ্রেস সভাপতিপদের দায়িত্বটা ছেড়ে না দিলে ঘটনা

অন্যদিকে মোড় নিতে পারতো। হীরেন্দ্রনাথ পরে এই দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যে ঠিক হয়নি, আজাদের সেই মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন (পৃ. ১০৬)। যে জিন্না মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এইজন্য, যে মিশন তাঁকে ম্যানুভার করার সুযোগ দিতে চায়নি, সেই জিন্নাই নেহেরু মন্তব্যে মিশনের কাছে দেওয়া তাঁর সম্মতি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নিয়ে পাকিস্তান আদায়ের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি ঘোষণা করে দেন।

হীরেন্দ্রনাথ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের এই ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করে দেখাতে চেয়েছেন যে জহরলালের চিন্তাধারায় জিন্না লীগ ও পকিস্তান দাবি সম্বর্কে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরেই গড়ে উঠেছিল সেখানে কূটকৌশলে লক্ষ্যপূরণের প্রতি একটা প্রবল অনীহা থেকেই নেহেরু তাঁর পছন্দ, অপছন্দ, বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধান্বিত হননি বলেই মনে করেছেন। ভারতকে অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ রাখতে তখন বিকল্প ছিল আর একটাই, শেষ পর্যায়ের গণসংগ্রাম শুরু করে ক্ষমতা দখল করা। সাম্রাজ্যরক্ষায় ইংরেজদের ক্ষমতা যে প্রায় অবসিত। সেটা নেহেরু নেতাদের মধ্যে জহরলালের অজানা ছিল না। সেই সংগ্রাম ভয়াবহ কিম্বা দীর্ঘস্থায়ী কোনোটাই হওয়ার সম্ভাবনা তখন আর ছিল না। তবে সেই লড়াই যে-কোনো মূল্যে চালিয়ে যেতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে কমিউনিস্ট কিছু নানা মতের বামপন্থী আর প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পন্ন মানুষ ছাড়া অন্যরা প্রস্তুত ছিল না। জহরলালের সরকারিভাবে অনুমোদিত জীবনীকার মাইকেল ব্রেচারও মনে করেন 'one positive indecement for acceptance of Pakistan was, even for where, the tempting prize of power' (পৃ. ১১১, উদ্ধৃত)। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে রণক্লান্ত জহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতারা শেষ জীবনে ক্ষমতার স্বাদ পেতে একটু বেশি মাত্রায় আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাতে আশ্চর্যের বিশেষ কারণ নেই। বেদনার সঙ্গে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ার পেছনে তাঁদের যে রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক একটা পরাজয় ঘটে গিয়েছিল, সেটা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সেই পরাজয়ের গ্লানিকে সহ্যনীয় করে তোলার জন্যেই তাই এমন কিছু রাজনৈতিক ঘটনা কিম্বা পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল যা ঘটনা প্রবাহের এই কুটিল আবর্তকে কাজ চালনোর মতো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষের চোখে বিশ্বাস্যতা ফিরে পেয়ে যাবে। তাই জওহরলালের মিশনের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পরেও ভেতর থেকে তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যেই এই মন্তব্য করেছিলেন। হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, "This suggests a peculiar variety of pragmatison, rather unlike Nehru, but there it is." (পৃ. ১১১)।

ক্ষমতা হস্তান্তর বিশেষত তার দিন ঘোষণার মধ্যে বিকাশমান পরিস্থিতিতে জনমানসে দেশভাগের ক্ষোভ সাম্প্রদায়িক হানাহানির তীব্রতা বাড়িয়ে তোলার বদলে আশাপূরণের যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে সেই ধরনের হিসেবনিকেশ সচেতনভাবে করা হয়েছিল কিনা বলা যাবে না। হীরেন্দ্রনাথ মৌলানা আজাদের মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, একটা 'charm' প্রায় জাদু প্রভাবের মতো মানুষের মনে জমে থাকা উত্তেজনা একটা প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের আকারে সেই ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ কেটে বের হয়ে এসেছিল (পৃ. ১১৪)। অথচ চিন্তাশীল

মানুষদের অনেকেই তখন সঠিকভাবেই মনে করেছিলেন "দেশের মানুষ এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে ethically counterfeit মুদ্রায় কিনেছে, যার জন্যে স্বাধীনতার এতো বছর পরেও তারা "feel sufficiently the glow of that freedom" অনুভব করতে পারে না। হীরেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের একমত না হয়ে পারা যায় না। (পৃ. ১১২)।

এরিক এরিক্সন 'তরুণ লুথার' সম্পর্কে আলোচনায় যখন লেখেন "the trauma of rear-defeat fallows a great man through life" হীরেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে একমত হয়েই ভারতে সেকুলার গণতন্ত্র কায়েম করার সমস্ত উদ্যোগ জওহরলালের ভূমিকার বিশ্লেষণেও সেকথা বলতে চেয়েছেন (পৃ. ১১৩)। ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রিতে নেহেরুর ঐতিহাসক 'Trust with destiny' বক্তৃতায় 'redeeming our pledge' বলার সময় সম্ভবত সেই একই ধরনের আশংকা থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল। যে বিপর্যয় ও রক্তস্নানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্বন্তর সূচিত হয় সেখানে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলানো ছিল ভীষণ কঠিন কাজ। অথচ জনগণের উচ্ছ্বাস যে বাঁধভাঙা ছিল, এই সামান্য আলোকে তার প্রথম যৌবনের অসাধারণ অভিজ্ঞতা বলে আজো তা স্মরণ করতে পারে। মৌলানা তাঁর শেষ জীবনে বারবার বলেছেন ইংরাজ সরকার এবং তাঁর প্রতিনিধি বড়লাট মাউন্টব্যাটেন সেই সাম্প্রদায়িক রক্তস্নান কোনো মতে ঘটতে দেবেন না বলে প্রতিশ্রুত হয়েও দ্বিচারিতা করে গেছেন শেষ পর্যন্ত।

উত্তর উপনিবেশ পর্বে দেশে সেকুলারত্ব কায়েম করায় জওহরলালের নিরলস প্রচেষ্টার বিস্তারিত আলোচনা করে হীরেন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন বিদেশিরা যাকে জওহরলালের 'holier-than-thou' মনোভাব বলে অনেক তির্যক মন্তব্য করেছেন, আসলে সেটা ছিল তাদের একধরনের মনগড়া ধারণা। নেহেরু বারবার একটা কথা বলে এসেছেন, যতোদিন তিনি ক্ষমতার শীর্ষে আছেন, ততোদিন ভারত কোনো মতেই 'হিন্দুরাষ্ট্র' হবে না। (পৃ. ১১৬)। বস্তুত সাম্প্রদায়িক হানাহানির সেই দিনগুলিতে মহাত্মার শরীরী উপস্থিতি দেশের যে প্রান্তেই তিনি থাকুন কেন, আর পরস্পরের নেতৃত্বে জওহরলাল দেশের সংখ্যালঘুসহ সমস্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষের কাছে একটা বড়ো আশ্বাস ছিল যে দেশটা কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না। সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসের মর্যাদা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল আজীবন রক্ষা করে এসেছেন প্রভূত প্ররোচনার মধ্যে এবং অত্যন্ত দক্ষ হাতে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যেখানে ঘোষিত নীতি ছিল ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের, অর্থাৎ দেশভাগের পর যারা পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কথা চিন্তাও করেনি কোনোদিন, তাদের কেবল 'territorially Indians' বলে গণ্য করা, পাকিস্তানী রাষ্ট্রনেতা ও জঙ্গি দলগুলির একটানা ভারতবিরোধী প্রচার যা হিন্দুত্ব চেতনাকে পুষ্ট করতো, তাদের যৌথ চাপ যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে প্রতিফলন না হয় তার উপর জওহরলালের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। জীবনের শেষ বছরেও হজরতবাল প্রসঙ্গে যে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়। তার মোকাবিলা করার সময়ও জওহরলাল এক মুহূর্তের জন্যে রাজনীতি ও ধর্মের গাঁটছড়া বাঁধার কোনো প্রলোভন, সমস্যা সমাধানের সহজ পথ নেওয়ার প্রতি কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি। অলক্ষ্যণীয় বাস্তবতার দোহাই দিয়ে নেহেরুর রাজনৈতিক সহকর্মী কিম্বা সরকারি আমলারা নানা যুক্তি হাজির করার

চেষ্টা করলেও জওহরলাল মাঝে মাঝে দোটানায় পড়ে হয়তো কিছুটা ইতস্তত করেছেন, কিন্তু সেকুলারত্বের প্রশ্নে কোনো আপস করেননি কখনও।

কিন্তু জনজীবনকে প্রকৃত সেকুলারত্বের পথে পরিচালিত করতে গেলে নিপীড়িত জাতপাতের ও সংখ্যালঘু নানা সাম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনযাপনে বাস্তব যে পরিবর্তনগুলি জরুরি, জওহরলালের নেতৃত্বকালে মৌলিকভাবে এইসব পদক্ষেপ নিয়ে কোনো পরিবর্তন করা যায়নি, কিম্বা হয়নি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই কেবল শ্লোগানসর্বস্ব হতে পারে না। সব সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাপনের মৌল প্রয়োজন মেটাতে সহযোগী হয়ে উঠতে পারলেই সমাজের সেকুলার বনিয়াদ গড়ে উঠতে পারে। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে মজবুত একটা বনিয়াদের উপর গড়তে পারলেই যে দেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সমস্যার একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে, সেই বিশ্বাসে প্রাণিত হয়েও সমাজের বুনিয়াদ রূপান্তর ঘটাতে যে ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করা দরকার ছিল, জওহরলাল সেই কাজটি শুরু করতে পারেননি। দেশের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন নেহেরুকে প্রভূত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখেও কাজের সময় তাদের অভ্যাস ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই কাজ করেছে। হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন 'Here is inability which, in a man so crucial to history, has cast a shadow on the steps of our advence and makes us farther rather show stride ahead.' (পৃ. ১৩৬)। লেখকের দ্বিধাহীন মন্তব্য, সমাজ পরিবর্তনের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ, যে প্রক্রিয়ায় দেশের এই দুর্গতি ঘটেছে, তার পরিবর্তনের জন্যে সমাজে এবং মানুষের মনে বিপ্লবের অপরিহার্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট থাকলেও 'Jawaharlal Nehru had an almost incradicable allergy towards action that obviously was required if his goals were to be achieved" (পৃ. ১৩৭)।

দেশে প্রকৃত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ঘটাতে যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের নৈরাজ্য থেকে সুচিন্তিত, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি দরকার প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বেই সেই ধারণা অন্তত দেশের দুজন প্রথম সারির নেতার চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল, সেকথা ইতিহাস স্বীকৃত। তাঁরা হলেন সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে প্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন সেটা ছিল জওহরলালের সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটা নীল নক্সা রচনার ব্যবস্থা করা। পরাধীন দেশে প্রাদেশিক সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যে কাজ যতটা করা সম্ভব তার কথাই বলা হয়েছিল কমিটির সুপারিশে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নেহেরু কংগ্রেসের একটি অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম কমিটি গঠন করেন তাঁরই সভাপতিত্বে। কমিটিতে পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন অধ্যাপক কে. টি. শাহ। অধ্যাপক শাহ কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি পদে হস্তক্ষেপ ও আপত্তিতে বিরক্ত হয়ে সদস্যপদে ইস্তফা দেন। দেশকে সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করতে জওহরলালের উচিত হবে সরকার থেকে বেরিয়ে এসে দেশকে এই কাজে ব্রতী করার জন্যে আত্মনিয়োগ করা। এটাই ছিল তাঁর বিশেষ পরামর্শ। নেহেরু কেবল তখন নয়, পরেও প্রশাসনিক অকর্মণ্যতায় বহু কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে না বলে খোলাখুলি

মত প্রকাশ করেও কেন সে কাজ করতে পারেননি, সেটাই মস্ত বড়ো একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে রয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ের সুখ্যাত 'ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি'র বিশিষ্ট সম্পাদক শচীন চৌধুরীর মন্তব্য প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করে লিখেছেন "his love of good form, his weakness for outward show and lofty disregard of unpreasant necessities" ছিল তার প্রধান কারণ (পৃ. ১৪৪)।

হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তর ও পরবর্তী বছরগুলিতে দেশে যে ধরনের অস্থিরতা ব্যাপক হয়ে উঠেছিল, তার জন্য নেহেরুর মনে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সবচেয়ে জরুরি কাজ বলে মনে হয়েছিল। তাই আর্থ-সামাজিক রূপান্তর কর্মসূচি দেশে বিরাট সামাজিক ওলটপালট ঘটাতে পারে ভেবে তিনি শংকিত হয়ে উঠতেন। পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টিকোণ তাই মধ্যপন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল, যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সংমিশ্রণে যতোটা দ্রুত পরিবর্তন আনা যায়, সেটাই ছিল লক্ষ্য। বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান ১৯৫৯ সালে ভারত সফরে এসে লিখেছিলেন তৃতীয় পরিকল্পনার বৈপ্লবিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে চীনে যে কাজ করা হয়েছে জোর জবরদস্তির ভিত্তিতে ভারত সেটাই করতে হবে দরকার হবে "organized pressure of a popular movement under government leadership so dynamic and so purposeful that it can inspire people to do voluntarily" যা দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে (পৃ. ১৫৩)। জহরলাল সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন লিপম্যানের মন্তব্যে অনেক কিছুই আছে যা বিশেষ ভাবার কারণ আছে। ভারতে যে প্রশাসনিক যন্ত্র রয়েছে তার হালচাল ও কর্মপদ্ধতি ইংরাজ আমলের, সময়ের সমতালে চলার পক্ষে তা অনুপযুক্ত। লিপম্যানের মতো একজন প্রবীণ সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকের মতামত খতিয়ে দেখার যোগ্য। এরই কয়েক বছর আগে সুইডিশ অর্থনীতিবিদ মিরডাল মন্তব্য করেছিলেন শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতে মাথা পিছু জাতীয় আয় তাদের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-পঞ্চমাংশ বলে এখানে অগ্রগতির হার দ্রুততর না হলে ব্যবধান আরো বাড়তে বাধ্য। জীবনের শেষ দিনগুলিতে ভারতে বিকাশ হার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য নেহরুর যে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছিল, বাস্তবে রূপায়িত করার মতো মানসিক দৃঢ়তা তিনি দেখাতে পারেননি। বরং হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে যে 'তীব্র সংবেদনশীলতা হয়তো বা তাঁর ইচ্ছার দৃঢ়তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল' (পৃ. ১৫৭)।

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি জহরলালের অনুরাগ ও আনুগত্যে কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু ভারতের মতো দেশে বহু যুগের জমে থাকা জঞ্জাল সরিয়ে, জনগণের বিরাট অংশকে ভাগ্য পরিবর্তনে সামিল করতে যে ধরনের বলিষ্ঠ নীতি এবং সংকল্পের দৃঢ়তা দরকার ছিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সে কাজ তিনি করতে পারেননি। বস্তুত এদেশে জহরলাল ১৯২৭ থেকে সমাজতন্ত্রের প্রচারকই থেকে যান, তার রূপকার হতে পারেননি। হীরেন্দ্রনাথ মনে করেন "whether it was Gandhi's spell or his own inner voice, Jawharlal remained himself, as it were, in the middle, 'between two fires...not unsure

about the side he had chosen but unsure about what exactly to do in regard to the choice." (পৃ. ১৬৬) তাঁর অবস্থান ছিল অনেকটা "Like a tortured Kafka in politics, he thought he could see the way but on looking again saw it was only woavering." (পৃ. ১৬৬) কোনো পর্যবেক্ষকের মনে হয়েছে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সোচ্চার ঘোষণা হয়তো জহরলাল করেছিলেন পুরোনো দিনের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে উত্তর উপনিবেশ পর্বের রাজনৈতিক সম্পর্কের একটা যোগসূত্র বজায় রাখার তাগিদ থেকে এবং হয়তো এই ঘোষণার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াসহ বিকাশমান তৃতীয় দুনিয়ার রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভারতকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করার প্রয়োজনে, যাতে পশ্চিম দুনিয়া ভারতের উপর যে চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছিল, তাকে প্রতিহত করা যায়।

কারণ যাই থাক্ না কেন শেষ পর্যন্ত সবটাই হয়ে দাঁড়ায় 'generous proliferation of socialist semantics.' (পৃ. ১৭৩), যা দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিতে গভীরতর কোনো ব্যঞ্জনা এবং গতিবেগ সঞ্চারিত করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার দায় শুধু জহরলালকে ইতিহাসের বিচারে বহন করতে হচ্ছে না, উত্তর উপনিবেশ ভারতে যে বিরাট আর্থ-সামাজিক সমস্যা অক্টোপাসের মতো জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে ধরে তাদের তিল তিল করে এগিয়ে দিচ্ছে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে, সেই দেশের মানুষদেরও সেই দায় গ্রহণ করতে হবে। যে গণআন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করার কথা লিপম্যান বলেছিলেন চীনের বিকল্প পথ হিসেবে, বামপন্থীরাও সেই ধরনের গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি সমাজতন্ত্রের কথা বাগাড়ম্বর থেকে বাস্তবায়িত করার জন্যে। সমাজে যে একটা গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে সেকথা গান্ধী তাঁর আদর্শ অনুযায়ী বরাবরই বলে এসেছিলেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা ঠিক কী চান এবং কীভাবে চান, সেই মত ও পথের দ্বন্দ্ব নেহরু-উত্তর ভারতে এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। জহরলালের সীমাবদ্ধতা আসলে ছিল ভারতের সামাজিক বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা, যা ভাঙার মতো গণউদ্যোগ এদেশে শুরু করা যায়নি।

ভারতের বিদেশনীতি যে জহরলালের উত্তর-উপনিবেশ পর্বে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, কিছু তথাকথিত বিশেষজ্ঞ ছাড়া সেকথা স্বীকারে কোথাও কোনো দ্বিধার অবকাশ নেই। দেশের শাসনক্ষমতার ভার যে দলই গ্রহণ করুক না কেন, তাদের অবস্থানে রাতারাতি পরিবর্তন এসে যায় রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে সারা দেশের সমর্থন বিগত পাঁচ দশক ধরে অটুট রয়েছে। কখনও কোনো সরকার তার সামান্যতম হেরফেরের ইঙ্গিত দিলে প্রতিবাদের যে ঝড় ওঠে, সেটাই প্রমাণ করে যে জাতীয় স্বার্থের যে দৃষ্টিকোণ নেহরুর এই নীতির মধ্যে প্রতিফলিত তার পিছনে জাতীয় সহমত নিয়ত সক্রিয় রয়েছে। জহরলাল জাতীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্যে জোট নিরপেক্ষ নীতির যে নীতি রচনা করেছিলেন, এক মেরুকৃত বিশ্বে সেই জোটবদ্ধতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেও পঞ্চশীলের মর্মবস্তু আদৌ বদলে যায়নি। যে সম্পর্কগুলিকে জহরলাল কালোত্তীর্ণ সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এক মেরুকৃত বিশ্বেও যে সেইসব সম্পর্কের গুরুত্ব সমানভাবে অনুভূত হয়, নেহরুর দূরদর্শিতার সেটাই এক বিশিষ্ট প্রমাণ।

জহরলাল প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের মূল্যায়নে যে কথা অশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে সেটা হলো 'This was a man.' মানুষ নেহরুকে লেখক সমস্ত মানবিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। শেক্সপীয়র অন্য এক মানুষ সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ শেষ অধ্যায়ের সূচনায় তারই কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন

"His life was gentle, and the elements
So mixi'd in him that Nature might stand up
And say to all the world 'this was a man'!"

হীরেন্দ্রনাথ এই অধ্যায়েই বলেছেন অশেষ মানবিক গুণের অধিকারী এই মানুষটি চার দশক ধরে ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে 'gentle colossus'-এর মতো তার নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে ছিলেন, যেখানে তাঁর চরিত্রের অনন্যতার জন্যেই প্রভূত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও তিনি জননায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন। নেহরু চরিত্রের এই দিকটি যাঁদের নজরে পড়েছিল তাঁদের মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চরম বিরোধী এবং নেহরু বিদ্বেষী চার্চিলের মতো মানুষও ছিলেন। সেই চার্চিল নেহরুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর বলতে পেরেছিলেন 'a man without malice and without fear' (উদ্ধৃত, পৃ. ২১৩)। প্রধানমন্ত্রী জহরলালকে খুব কাছের থেকে অন্তরঙ্গভাবে দেখার সুযোগে লেখকের নেহরু চরিত্রের যে দিকটি চোখে পড়েছিল, গান্ধী-উত্তর ভারতের প্রধানতম নেতা, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি 'was no maker of history, for he nad neither the strength not the crudity, that was needed, but in his own way he was peerless' (পৃ. ২১৩)। নিজে একজন রাজনীতিক হয়েও, সারা জীবন রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেও 'had a vital part of himself utterly untainted by peculiar squator of political life.' (পৃ. ২১৪) হয়তো সেই জন্যেই জহরলালের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল সারা জীবন তিনি জনগণকে ভালোবেসে এসেছেন এবং তারাও সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছে অপরিমেয়ভাবে, সারা জীবন ধরে।

জহরলালের জনসভায় ভাষণ ছিল আলাপচারিতার মতো। গুরুগম্ভীর বিষয়কে কঠিন ভাষার আবরণে অপরিসীম বাকপটুতায় উপস্থাপন করার ইচ্ছা কিম্বা ক্ষমতা কোনোটাই জহরলালের ছিল না। তাঁর বক্তৃতার ধরন ছিল অভিজ্ঞতা ও ভাব বিনিময় ধরনের, ডায়ালগের মতো। জনতা আর জননেতার মধ্যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাদের একজন হয়ে পড়া, যে- কোনো বয়সের মানুষদের জনসমাবেশে বিশেষত শিশু, কিশোর, ছাত্র ও যুব সমাবেশে জহরলাল কতো সহজে তাদের একজন হয়ে পড়তেন, যার মধ্যে কোনো অভিনয় থাকতো না, সেটা চোখে দেখার সুযোগ সীমিতভাবে হলেও এই আলোচকের হয়েছে ১৯৪৫ সাল থেকে।

হীরেন্দ্রনাথ তাঁর নেহরু সমীক্ষা রচনার সমসময়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন : "modern India, proud of her past

but somewhat weighed down by its immensity, a little unsure about herself yet aware that she could not do without an acceptance of the spirit of science, was more truly represented by Jawaharlal than by Gandhi" (পৃ. ২১৯) তাই গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণকালে গান্ধী যখন "would justify himself only to himself, Jawaharlal would seek justification not only of himself to himself but to all others." (পৃ. ২২০) দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে শক্তিমান একজন নেতা, যাঁর লোকসভায় গরিষ্ঠতা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না, তিনি যে তাঁর প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে, তাদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করবেন, সেটা গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি গভীর অনুরাগ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। বিপুল জনসমর্থন জহরলালকে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী করেছিল, যা কেবল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকেই উৎসারিত হতে পারে। কিন্তু সেই শক্তিকে নিজের ইচ্ছার রূপায়ণে ব্যবহার করতে গেলে যে ধরনের একাগ্রতা, অনন্যমনা হওয়া দরকার, সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলে যে-কোনো মূল্যে লক্ষ্যপূরণের দিকে অগ্রসর হওয়ার কঠিন সংকল্প থাকা দরকার, ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা জহরলালের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ জহরলাল প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন 'he was greater than his deeds and truer than his surroundings' (উদ্ধৃত, পৃ. ২২৩) সে কথাটাই বোধহয় নেহরু চরিত্রের সার্থক মূল্যায়ন।

হীরেন্দ্রনাথকে তাই বলতে হয়েছে যে, জহরলাল এদেশের মানুষকে পরিবর্তমান দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন, তাদের সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে প্রেরণা দিয়েছিলেন, কিন্তু জনগণ তাঁর কাছে যে প্রত্যাশা করেছিল তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর মতো অদম্য একাগ্রতা, সব কিছু উপেক্ষা করে [illegible]র মতো কঠিন পৌরুষ জহরলালের ছিল না। এই সিদ্ধান্তই তাই হীরেন্দ্রনাথের অনিবার্য [illegible]য় ওঠে : "He was our beautiful but ineffectual angel beating his luminous [illegible]ngs largely in vain." (পৃ. ২২৩)

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমকালের সমস্ত সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। কাশ্মীর, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপায়ণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, দল ও দেশের অসংখ্য জটিল আন্তর সম্পর্ক নিয়ে জহরলাল কাজ করতে করতেই passed into history, যা খুব কম নেতার জীবনচরিতে অপূর্ণতা সত্ত্বেও মহত্ত্বের একটা মাত্রা যোগ করেছিল। হয়তো তাঁর জীবনে অপূর্ণতা অনিবার্য ছিল। কারণ ক্ষমতাসীন খুব কম নেতাই তাঁর যুগের সমস্যা সম্পর্কে সদা সচেতন থেকে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে উত্তরণের জন্যে নিরন্তর প্রয়াস করে থাকেন। নেহরুর কৃতিত্ব হলো সেই কাজটাই তিনি করতে চেয়েছিলেন একনিষ্ঠভাবে, যেখানে তাঁর প্রয়াসে কোনো ঘাটতি ছিল না। তিনি যে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি, সমকালের ভারত তার প্রমাণ। কিন্তু দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ যে একটা নতুন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন এখনও দেখে, ভোগবাদের সুবিপুল প্রাধান্যের মধ্যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতার আতিশয্যের মধ্যে সমষ্টির জীবনযাপনের গ্লানি যে এখনও মানুষকে গণমুখী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, সেই

মানসিকতা সৃষ্টিতে নেহরুর আদান ছিল এবং হয়তো বা আজো আছে। সেকুলার গণতন্ত্রের প্রতি দেশের বেশির ভাগ মানুষের আনুগত্য, মৌলবাদ বিরোধিতা, সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গীকার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যে মানুষ এখনও সমর্থন করে, সেটাই জহরলালের অবদান। হীরেন্দ্রনাথের নেহরু চরিত তাই একটা মানুষের কাহিনী হয়ে উঠেছে, যে মানুষ সবাইকে নিয়ে চলা যায় না জেনে বুঝেও গণউদ্যোগে সকলকে সামিল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। নেতা, রাজনীতিক, প্রধানমন্ত্রী, জহরলাল নয়, মানুষ জহরলালের জীবনচরিত রচনা করেছেন হীরেন্দ্রনাথ যাতে উত্তরকাল "cannot cease to cherish the memory of this gem of a man" (পৃ. ২৩২)।

হৃদয়ের রক্ত

শঙ্খ ঘোষ

নেহরুকে নিয়ে লেখা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *The Gentle Colossus* বইটি যখন বেরোল, প্রগতিশীলদের অনেকে প্রকাশ্যেই বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন তখন। একজন কম্যুনিস্টের কলম থেকে নেহরুকে নিয়ে এমন শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বই? বইপ্রকাশের সেই বছরে কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগও হয়ে গেল, শোধনবাদী নাম দিয়ে এক পক্ষের অপর পক্ষকে আক্রমণ করা সহজ হয়ে গেল, এবং একজন শোধনবাদীর পক্ষেই যে ও-রকম বই লেখা সম্ভব সেটা বুঝতেও আর অসুবিধে রইল না কিছু। কয়েক বছরের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারেও ব্যবহার করা হবে এই বইকে, মার্ক্সিস্ট দলের পক্ষ থেকে বেশ ঘোষণা করেই বলা হবে যে নেহরু-ভজনাকারী এই ছদ্ম-কম্যুনিস্টকে যেন ভোট না দেন বামপন্থার কোনো সমর্থক। নির্বাচনে তবু অবশ্য জিতেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ।

নির্বাচনে জিতে যাওয়া ছাড়াও, আমাদের মতো কোনো কোনো মানুষের মনের মধ্যেও একটা জয় তখন পেয়ে গিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ এবং না-এর উগ্র সীমারেখা দিয়ে ভাগ-করা দৃষ্টির প্রয়োগে যে সাহিত্যবোধ জীবনবোধ এমনকী রাজনীতিরও বোধ একটা দমচাপা রুদ্ধতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছচ্ছে, পৌঁছচ্ছে এক অন্ধ গলিতে, আমাদের কারো কারো তা মনে হচ্ছিল। সেই আমাদের পক্ষে গান্ধী বা নেহরু বিষয়ে লেখা হীরেন্দ্রনাথের বই অনেকখানি আশ্বাসের মতো এসে পৌঁছেছিল সেদিন। আশ্বাসটা এই যে, কম্যুনিস্ট হলেই একদেশদর্শী হয়ে-ওঠাটা সকলের পক্ষে অনিবার্য নয়। আশ্বাসটা এই যে, কম্যুনিজমে বিশ্বাস রেখেও একটা খোলা মনের অধিকারী হওয়া সম্ভব। আশ্বাসটা এই যে, হ্যাঁ এবং না দিয়ে পূর্ণ গ্রহণবর্জন ছাড়াও হ্যাঁ-না-এর দ্বন্দ্ব বুঝে নেবার মধ্যে স্বাস্থ্যকর একটা তৃতীয় বিকল্প কোথাও আছে।

অবস্থাটা যে জটিল ছিল (বা, আজও আছে) তা বোঝা যায় হীরেন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে সন্তর্পণ একটা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গি থেকে। গান্ধী-শতবর্ষে লেখা তাঁর 'গান্ধীজি' নামের প্রবন্ধটিতে একটু জোর দিয়েই তাঁকে বলতে হয় যে 'অসংকোচে গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান আমাদের পক্ষে সমুচিত মনে করি'। সে-প্রবন্ধ শুরু হয়েছিল এই কথায় 'স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, একটা সময় ছিল যখন গান্ধীজি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।' এ-বাক্যের প্রথম অংশটুকু বস্তুত তাঁর কুণ্ঠাটাকেই ধরিয়ে দেয়। প্রবন্ধ শুরু করতে হয় তাঁদের কথা ভেবে, যাঁরা গান্ধীজিতে এককালের আচ্ছন্নতাকে একটা চ্যুতি হিসেবেই গণ্য করবেন। শেষেও আবার বলতে হয় 'গান্ধীবাদে অবিশ্বাসী কারও পক্ষে যা লিখেছি তা লেখা অনুচিত ও অযৌক্তিক, এমন কথা যদি কেউ বলেন তো নাচার।' সেইখানেই অবশ্য থামেন না তিনি। 'নাচার' বলবার পরেও স্বপক্ষের অবলম্বন হিসেবে নিয়ে আসেন লেনিনকে, বলেন, 'ভারতবর্ষের মার্কসবাদীদের তো স্বয়ং লেনিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন

যে দুই যুধ্যমান জগতের মধ্যস্থলে অবস্থান করছিলেন ''টলস্টয়-এর ভারতীয় শিষ্য''।' তাহলে তিনিই-বা কেন বলতে পারবেন না গান্ধীর কথা?

কম্যুনিজমে অটুট আস্থা রেখেও হীরেন্দ্রনাথ জানেন, 'জীবন কিন্তু এমন জটিল যে বাঁধা-ধরা কথা সব সময় চলে না।' এবং সেইজন্য তাঁকে কথা বলতে হয় বাঁধা-ধরা-কথায় নির্ভরশীল মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে মুক্তমতির সম্পর্ক নিয়ে। সাম্যবাদীরা যে অনেকসময়ে তাঁদের তত্ত্ব আর কাজ নিয়ে 'যন্ত্রবৎ বিচার করে থাকেন', তাঁরা যে ভুলে যান 'ইতিহাস কোন অতিমানবিক প্রত্যয় নয়, ইতিহাস স্বয়ম্ভু নয়, তার স্রষ্টা হল মানুষ', এর সমালোচনাই করেন হীরেন্দ্রনাথ। এতটাই তিনি বলেন—'অত্যন্ত সবিনয়ে ও কথঞ্চিৎ কুণ্ঠা নিয়েই'—যে, 'সাম্যবাদের বিশ্ববীক্ষা নিয়ে কার্ল মার্কস তাঁর পূর্ণ বক্তব্য সাজিয়ে রেখে যেতে পারেননি' আর অবস্থার চাপে লেনিনকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংকীর্ণ পরিবেশে নিবদ্ধ থাকতে হয়েছে। ১৯৬০ সালে এই বিশ্বাস তাই তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে কম্যুনিস্টদের জগতে চিন্তার 'গুরুবাদী জড়তা পরিহার করে স্বচ্ছ, সুস্থ, মুক্ত চিন্তার যুগ আরম্ভ হতে চলেছে'। তখনও হয়তো তিনি ভাবেননি যে যাকে তিনি মুক্তচিন্তা বলছেন তাকে কখনো কখনো শোধনবাদ আর কখনো-বা প্রতিবিপ্লবী তকমা দিয়ে অচ্ছুত বানাবার চেষ্টা চলবে কম্যুনিস্ট সমাজ থেকেই। বা, একেবারে ভাবেননি তাও নিশ্চয় নয়। তেমন সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই হয়তো তিনি বলেছিলেন যে সে-যুগের সূচনা হবে না 'যদি আমাদের নিজস্ব ভূমিকায় নামতে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি।'

হীরেন্দ্রনাথ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেননি। সমকালের রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক চিন্তাচর্চায় তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন একটা খোলা মনের আবহাওয়া। আর এটা যে পেরেছিলেন তার মস্ত একটা কারণ মনে হয় আকৈশোর রবীন্দ্রনাথে তাঁর নির্ভরতা, রবীন্দ্রনাথে তাঁর নিমজ্জন, রবীন্দ্রনাথের জীবন আর সৃষ্টি থেকে তাঁর প্রতিমুহূর্তের শক্তি খুঁজে পাওয়া।

২

যে-কুণ্ঠা বা যে-কৈফিয়তের কথা বলছিলাম আগে, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়েও কখনো কখনো সেটা বলে নিতে হয় তাঁকে। তাঁর চোখে রবীন্দ্রনাথ (বা গান্ধী) যে 'hero' অথবা 'পুরুষোত্তম', সেকথা বলবার জন্য তাঁকে জুড়ে দিতে হয় এই শব্দকটি 'মার্কসবাদী হলেও আমার মতো ভারতবর্ষীয় মানুষের চোখে...' ইত্যাদি। 'হলেও' কেন? মার্ক্সবাদে বিশ্বাস রাখবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো কাউকে আদর্শ বলে ভাববার মধ্যে কোথাও একটা স্ববিরোধ আছে বলে নিশ্চয় ভাবছেন তিনি? তিনি ভাবছেন, না কি সাধারণভাবে মার্ক্সবাদীরা ও-রকম ভাবনার একটা পরিমণ্ডল গড়ে তুলছেন? আর, সেই পরিমণ্ডলে মার্ক্সবাদবিরোধীরাও ধরে নিচ্ছেন যে রবীন্দ্রানুরাগ আর মার্ক্সবাদে অনুরাগের কোনো সহাবস্থান সম্ভব নয়।

এই দুই পক্ষের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই তাঁর রবীন্দ্রানুরাগের কথা তুলতে হয় হীরেন্দ্রনাথকে। তিনি ভুলতে পারেন না—ভুলবার কথাও নয়—যে, উগ্র মার্ক্সবাদের দ্যোতক হিসেবে ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রধান এক বাঙালি কম্যুনিস্ট যে 'বল্গাছাড়া রবীন্দ্রনিন্দা করেছিলেন',

দলীয় সূত্রে তার কিছুটা দায় তাঁকেও নিতে হবে।

রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে বহুকথিত যে-রচনাটি তখন লিখেছিলেন ভবানী সেন, তাকে নিজেই অবশ্য তিনি মুছে নিয়েছিলেন বারো বছর পরের আরেকটি লেখায়। রবীন্দ্র শতবর্ষে 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' প্রবন্ধে ভবানী সেন প্রশস্তিভরা চোখেই দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, দেখতে চেয়েছিলেন কীভাবে 'ভাববাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বহুলাংশে বাস্তবতাময়', বলতে চেয়েছিলেন 'জনশক্তিই যে ইতিহাসের চালনী শক্তি এ বিশ্বাস তাঁর ছিল' বা 'গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে জাতিগঠনই ছিল তাঁর কামনা'।

কিন্তু, যে-লেখাটিকে অস্বীকার করবার আয়োজনে স্টালিনোত্তর পর্বে দ্বিতীয় এই প্রবন্ধটি লিখতে হলো ভবানী সেনকে, সেখানে কি নিছক 'রবীন্দ্রনিন্দা' বা 'রবীন্দ্রদূষণ'ই ছিল? দূষণ ছিল, না কি একটা দৃষ্টিই ছিল? কাকে আমরা প্রগতিসাহিত্য বলব, তার একটা মানপদ্ধতি স্থির করে নিতে হচ্ছিল স্বাধীন ভারতের কম্যুনিস্টদের, খুব স্বাধীনভাবে নয় যদিও। সেই স্থিরীকরণের তর্কেবিতর্কে যখন 'স্টালিনের এই বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে' কেউ কথা বলতে চান, তখন রবীন্দ্রনাথের এক স্বতন্ত্র চেহারা কারও চোখে পড়তেই পারে। তখন কথাটা এ নয় যে তিনি নিন্দে করছেন, কথাটা বরং এই যে কোনো এক মতান্ধতায় তিনি জীবনের বা শিল্পসাহিত্যের কোনো আংশিক বিচার করছেন। 'রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেয়ে লোকহিতকর কাজকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেছে' রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ, একথা বললে রবীন্দ্রনিন্দা হয় বলে তো মনে হয় না। কিন্তু ওই বিবেচনাকে কতখানি ক্ষতিকারক 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে ঠেলে ফেলে দেব, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আগে অন্য আরো অনেক সংগঠনের কাজ করণীয় আছে ভাবলে তাকে পরিত্যাজ্য অন্যায় বলে ভাবব কি না, সেটা নির্ভর করে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক মতবিশ্বাসের উপর। এই মতবিশ্বাসের তীব্রতায় অনেকসময়ে বিচার্য বিষয়কে হয়তো আমরা খণ্ডিত করে দেখি। সেই আংশিক দেখায় প্রয়োজনমতো এমনকী এটাও বলে ফেলতে পারি যে ধর্মসম্প্রদায় প্রসঙ্গে 'হিন্দুমহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের' মতের কোনো পার্থক্য নেই।

নিন্দার জন্য নয়, কেবলমাত্র দৃষ্টিসংকীর্ণতার জন্য যখন এ-রকম একটা আদ্যন্ত ভুল সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে হয় ভবানী সেনের মতো কাউকে, তখন দৃষ্টিটাকেই আরও একবার যাচাই করা দরকার হয়ে পড়ে। এই যাচাই বোধটারই জন্য চাই মুক্তমতি। আর, দৃষ্টিসংকীর্ণতার ওই পটভূমি মনে থাকে বলেই হীরেন্দ্রনাথের ভাবনায় মুক্তমতির জন্য এত ব্যাকুলতা। অন্যদিকে, ওই পটভূমি মনে থাকে বলে আর নিজের কম্যুনিস্ট পরিচয়ের গর্ব কখনো ভুলতে পারেন না বলে একটা কৈফিয়ত দেবার সুরও থেকে যায় তাঁর স্বরে। 'রবীন্দ্রনাথ : মার্কসবাদী দৃষ্টিতে' নামে তাঁর গোটা প্রবন্ধটাই (১৯৯১) আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর সেই কৈফিয়ত। তিনি বোঝেন যে 'মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা আজও আমাদের রীতিমতো দুর্বল, অপরিণত, লঘু', আর সেইজন্যেই হয়তো মার্ক্সবাদী কাঠামোর মধ্য থেকে সেই রবীন্দ্রনাথকে ঠিক-ঠিক বোঝানো সম্ভবই হলো না, যাঁর 'সাহসের কী স্পষ্টতা, কী সমাজচেতনার সাক্ষ্য, কী দেশাত্মবোধ আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববোধের মধুনিষ্যন্দ আভাস, কবিসুলভ ''সুরভিত অবসর'' সম্পর্কে কী

অনীহা, কর্মোদ্যোগের কী অপরাজিত অভীপ্সা'। সেটা বোঝাতে গেলে ওই কাঠামোটাকেই কীভাবে ভাঙতে হবে সে-বিষয়ে স্পষ্টত তিনি বলেন না অবশ্য কিছু, কিন্তু নিজে বারে বারে সেই কাঠামোর বাইরে চলে গেছেন ভেবেই বোধহয় কিছু কুণ্ঠা বা কৈফিয়ত কখনো কখনো থেকেই যায় তাঁর লেখায়।

৩

উপরে ব্যবহৃত ওই উদ্ধৃতিটি থেকে অনুমান করা যায় সেই রবীন্দ্রনাথকেই হীরেন্দ্রনাথ তাঁর চেতনার সামনে রাখতে চান যিনি কর্মী, মানবসভ্যতার জন্য ভালোবাসা আর উৎকণ্ঠায় যাঁর মন ভরপুর, যে-কোনো মুহূর্তে যিনি হয়ে উঠতে পারেন বিশ্ববিবেক। তাঁর কথা উঠলেই হীরেন্দ্রনাথের মনে পাশাপাশি জেগে ওঠে রলাঁ আইনস্টাইন শোয়াইৎজার শ কিংবা রাসেলের মতো 'সংবেদনশীল বিশ্ববিরাজী মানুষ'দের নাম। এই 'বিশ্ববিরাজী' শব্দটির মধ্যেই হীরেন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার পরিধিটাকে বুঝে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ১৯১১-১২ সাল থেকে শুরু করে শেষজীবন পর্যন্ত 'পশ্চিমি দৃষ্টির জয়যাত্রা' দেখা যায়, সুশোভন সরকারের এই সিদ্ধান্তের ত্বরিত প্রতিবাদ একদিন জানিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ। পশ্চিমি হাওয়াকে স্বীকার করে নেওয়া আর পশ্চিমি দৃষ্টির জয়যাত্রার মধ্যে যে অনেকখানি প্রভেদ আছে, সেকথা বুঝিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্ত ভারতবোধ বা প্রাচ্যাভিমানকে বেশ জোর দিয়েই সেখানে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথেরই দীক্ষা থেকে তিনি ভাবতে পেরেছিলেন যে এই প্রাচ্যাভিমানের সঙ্গে ওই বিশ্ববিরাজমানতার কোনো মৌলিক সংঘর্ষ নেই। বরং, হীরেন্দ্রনাথেরও এক প্রাচ্যাভিমান তখন জেগে উঠতে চায়, যখন তিনি দেখেন যে বিশ্ববিরাজী এক অস্তিত্ব নিয়ে প্রাচ্যেরই কোনো মানুষ তাঁর প্রাচ্যাশ্রিত প্রত্যয় বা ধিক্কারের ভাষা পৌঁছে দিতে পারেন গোটা পৃথিবী জুড়ে। রবীন্দ্রনাথ তা পেরেছিলেন বলে তাঁর এই প্রফেট বা লেজিস্লেটর মূর্তিই হীরেন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে বেশি।

তার মানে কি শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা নেই তাঁর চেতনায়? সেকথা নিশ্চয় ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর ইংরেজি বইটিতে কবির সংক্ষিপ্ত এবং সর্বাত্মক একটি পরিচয় তিনি তৈরি করে তুলেছিলেন বলেই নয়, সে-বই না লিখলেও তাঁর ভিন্ন সব লেখা থেকেও বুঝে নেওয়া যেত কীভাবে তাঁর শ্বাসেপ্রশ্বাসে জড়িয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা। থাকে তা, এবং একসময়ের মার্ক্সবাদীদের বিচরণসীমা ভেঙে সে-গান বা সে-কবিতা তিনি তুলে আনতে পারেন 'কল্পনা' বা 'খেয়া' বা 'গীতাঞ্জলি' থেকেও, শুধুই 'এবার ফিরাও মোরে' বা 'ওরা কাজ করে' নয়। কিন্তু সেসব সময়েও, কেবলই তিনি মনে রাখেন—রাখতে চান—জীবন আর শিল্পের মধ্যে অবিরাম যাওয়া-আসার কথা। রচনার মধ্যে রচয়িতার ব্যক্তিজীবনকে খুঁজে বেড়ান না তিনি, খুঁজে বেড়ান না শিল্পকৌশলের অন্ধিসন্ধি, স্থির কোনো দার্শনিক বা নৈতিক প্রস্থান থেকে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছবার পথ খোঁজাতেও তাঁর আগ্রহ কম। রবীন্দ্রনাথের রচনায় তিনি শুধু খুঁজে বেড়ান সেই শক্তি বা বিশ্বাস যা আমাদের সমবেত সমাজজীবনে কোনো একটা গতির সঞ্চার করতে পারে। 'জীবনচিন্তার সামগ্রিকতা, মানবচেতনা, প্রবাহের অখণ্ডতা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংহতিভিত্তিতে বিশ্ববোধের সহজ সত্যতা

রবীন্দ্রনাথে সতত কীর্তিত এবং মার্কসবাদী চিন্তা ও প্রয়াসেও তার নিয়ত ঘোষণা'—এই বিশ্বাসে স্থির থাকেন তিনি। সেইজন্য, রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে তাঁর জীবনের যে যোগের কথা তিনি বলেন, সে-জীবন প্রধানত কর্মী রবীন্দ্রনাথেরই জীবন। জাতির দুঃসময়ে—১৯৩০ সালে—দেশ ছেড়ে কেন রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসেছেন, ভারতীয় এক প্রগতিশীল ছাত্রের এই তীব্র প্রশ্নের উত্তরে কবি যখন 'দুঃসময়' কবিতাটি পড়ে শোনান, তখন সে-কবিতাপাঠের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত আবেগ দেখেন না হীরেন্দ্রনাথ, দেখেন এক দেশাভিমান, দেখেন কীভাবে স্বাধীনতার লড়াইয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ভারতের চারণ হয়ে ঘুরছেন এই কবি।

'উৎসর্গ' কবিতার বইতে ছোট একটি কবিতা আছে 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে/গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে'। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আলোচনায় এই কবিতাটির যে খুব বেশি ব্যবহার হয় তা নয়। কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ, একটু গুরুত্ব দিয়েই, এই কবিতাটির কথা বলেন তাঁর রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক ইংরেজি বইটির শেষ অধ্যায়ে। বলেন, কেননা এরই মধ্যে তিনি খুঁজে পান রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে তাঁর শিল্পের সম্পর্কের ঠিক-ঠিক ছবি। ধূপ আর গন্ধ যেমন, ঠিক তেমনই 'Between his life and his work there seemed to have been a similar mutual adhesion; the one merged with the other as in the concord of notes in music'.

রবীন্দ্রজীবনের এই সংগীতই আচ্ছন্ন করে রেখেছে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত অস্তিত্ব।

৪

এই লেখাটি যখন লিখতে বসেছিলাম, ঠিক সেই সময়েই চোখে পড়েছিল দৈনিক পত্রিকায় ছাপানো এক খবর। শিল্পী সুনীল দাসের সাম্প্রতিক চিত্রকলা বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রতিবেদক জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ে ওই শিল্পীর পুরোনো এক মন্তব্যের কথা, এই কথা যে তাঁর ছবিতে সবকিছুই আছে, শুধু রক্ত নেই।

থাকবার যোগ্য কতকিছুই যে রবীন্দ্রনাথে নেই, আজকের দিনের কবি চিত্রী গায়ক গীতিকার সকলেরই কাছে সেকথা শুনতে শুনতে আমরা একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এসব মন্তব্য তাই পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভুলেও যেতে চাই আমরা, বিশেষ কোনো দাগ কাটে না মনে।

কিন্তু কেউ কেউ পারেন না ভুলতে। কারও কারও জীবন মনন স্মৃতি আর আশা এমনভাবে রবীন্দ্রনাথে জড়ানো আছে যে এসব মন্তব্য তাঁদের মনে কোনো-না-কোনো ঢেউ তোলেই। সুনীল দাসের ওই কথাটা যখন প্রচারিত হয়েছিল প্রথম, প্রায় চোদ্দ বছর আগে, সঙ্গে সঙ্গেই তখন তার এক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছিল হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বর থেকে। 'সভ্যতার সংকট' বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন তিনি

> এটা যেন লেখা এবং বলা হয়েছিল হৃদয়ের রক্ত দিয়ে—একটু অস্বস্তি হচ্ছে দেখে যে অনিচ্ছাতেই এমন 'রোমহর্ষণ' শব্দ ব্যবহার করে ফেলেছি। করেছি, কারণ লিখতে লিখতে মনে এল সম্প্রতি এক অতি সৎ ও সন্মতিসম্পন্ন ও

সমাদৃত চিত্রশিল্পী (সুনীল দাস) রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে প্রচুর ও গভীর প্রশস্তি জানিয়েই বলেছেন যে কবির 'ছবিতে সবকিছু আছে, শুধু রক্ত নেই।' এ বিষয়ে শিল্পক্ষেত্রে অনধিকারী আমি কিছু বলতে চাই না, শুধু বলব যে ঔপনিষদিক সমাহিতি ('দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্') তাঁকে অশান্তির অন্তরে সুমহান শান্তির সন্ধান দিয়েছিল এবং তাঁর সর্ববিধ সৃষ্টিকে এক সৌম্য আবরণ দিতে সহায় হয়েছিল বটে কিন্তু আজীবন তাঁর অবিশ্রান্ত কীর্তি সাক্ষ্য দিচ্ছে অন্তরস্থিত বহ্নিমান ও অতলস্পর্শ এক আবেগ বিষয়ে। বিদেশী শব্দ 'প্যাশন' (passion) এখানে ব্যবহার না করে পারছি না। শুনেছি ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে রয়েছে 'যন্ত্রণা'— এজন্যই বুঝি 'প্যাশন-ফ্লাওয়ার'-এর রং হল রক্তের মতো লাল। অন্তত আমার চোখে 'সভ্যতার সংকট' লিখেছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ কবি যেন সেই রক্তাক্ষরে।

নিছক সাময়িক এক মন্তব্যের অভিমানময় প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এই-যে 'প্যাশন' শব্দটির ব্যবহার করলেন হীরেন্দ্রনাথ, তাঁর নিজের লেখারও চরিত্রলক্ষণ সেইটেই। দেশ সমাজ আর সভ্যতার ভাবনা তাঁকে সবসময়েই এক যন্ত্রণায়, এক আবেগে, ভরপুর রাখে। আর সেই যন্ত্রণায় সেই আবেগে সবসময়েই তিনি উচ্চারণ করেন রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো শব্দবন্ধ বা বাক্যবন্ধ, গদ্যের বা পদ্যের। সমকালে যা-কিছু বিপর্যয় ঘনিয়ে ওঠে, তা নিয়ে সভায় এসে তাঁকে কথা বলতে হয় বা ঘরে বসে প্রবন্ধ লিখতে হয়। বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা আফগানিস্থানে বুদ্ধমূর্তির বিনাশ নিয়ে, কিউবা নিয়ে বা ভিয়েতনাম নিয়ে, ভারতছাড়ো আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী নিয়ে বা দুঃসময়ের নববর্ষ নিয়ে, উপসাগরীয় যুদ্ধ নিয়ে বা সাম্প্রতিক ইরাক নিয়ে, যখনই তিনি কিছু বলেন বা লেখেন, তখনই প্রবল আবেগের এক দৃশ্যমান ছন্দ এসে পৌঁছতে থাকে তাঁর শরীরে বা ভাষায়, আর আতসবাজির মতো তার মধ্যে কেবলই স্ফুরিত হতে থাকে রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথের প্যাশন, রবীন্দ্রনাথের আবেগ আর যন্ত্রণার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় তাঁর নিজস্ব প্যাশন, তাঁর আবেগ আর যন্ত্রণা। আমরা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কথা উঠলেই হীরেন্দ্রনাথ কথা বলতে থাকেন ওই 'হৃদয়ের রক্ত' দিয়ে, প্যাশনের ছন্দ দিয়ে। অধীর উত্তেজনায় তিনি ভাবতে থাকেন, সে-রক্ত, সে-ছন্দ কি সঞ্চারিত হবে না তাঁর চারপাশে কোথাও? স্বর্গ কি হবে না কেনা? রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন? স্নেহে-ভর্ৎসনায় তরুণতরদের কেবলই তিনি উদ্দীপিত করতে চান তাঁর স্বপ্ন আর প্রত্যয় দিয়ে, অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে-স্বপ্ন যে-প্রত্যয় তিনি অর্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি থেকে, রবীন্দ্রনাথেরই জীবন থেকে। তাই, সমস্ত জীবন জুড়ে অনেক মনীষীর বিষয়ে অনেকরকম শ্রদ্ধা যদিও জানান তিনি, তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এতটাই অধিকার করে থাকেন যে আত্মজীবনীর উৎসর্গপৃষ্ঠায় একথা লিখতে তিনি একটুও ইতস্তত করেন না যে 'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ/তুভ্যমেব সমর্পয়ে'। এই ত্বদীয়ং বস্তু তো শুধু তাঁর নিজেরই জীবনকথা শুধু নয়, তাঁর সমকালেরও জীবনকথা। রবীন্দ্রনাথেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর সমকালের জীবন, এতখানি কথা আর কেইবা বলতে পেরেছেন!

লিখেছেন অন্তরস্থিত মূলগত মার্কসবাদী প্রত্যয় নিয়ে

কুমার রায়

একবার পার্টি-জীবন বিষয়ে বিরক্ত এক কবিবন্ধুকে মার্কস লেখেন যে,—'নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি খুব ভালরকম জানেন, অজস্র ব্যক্তিগত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকের কথা, কিন্তু তিনি চান শুভবুদ্ধি, সব মানুষই যেন মিলতে পারে।' এখানে পার্টি বলতে তিনি গ্র্যাণ্ড হিস্টোরিক্যাল সেন্স অফ দ্য টার্মকেই বুঝিয়েছেন। এই মহতী ঐতিহাসিক বোধ এবং শুভবুদ্ধির ও মানুষের মিলনের কথাটাই যেন অগ্রাধিকার পেয়েছে আমাদের কাছে কিংবদন্তীতুল্য প্রাজ্ঞ, স্থিতধী, শান্ত, সৌম্য, সংযত কিন্তু বেদনার্ত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ সংকলনে। ভবিষ্যত বিষয়ে অপরাজেয় আশা ও আস্থার গরিমা যাঁর উচ্চারণে প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে আমরা দেখতে পাবো। সংকলনটির নাম 'আমার তুমি জন্মভূমি/কার বা রাখো ডর।'

বিগত শতাব্দীর শেষ দশবছরে দেশে এবং বিদেশে বিপর্যয়কারী কিছু ঘটনা তাঁকে বিচলিত করেছিল। গ্রন্থিত পনেরোটি নিবন্ধে তিনি—অসংখ্য বিষয় নয়,—সেই দশকে ঘটে যাওয়া, মর্মে ঘা-দেওয়া ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই সূত্রেই আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রধান প্রবাহটি বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণসমূহে একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এইখানেই নিবন্ধগুলির মধ্যে অন্তর্গত মিল।

মার্কসবাদের মায়ায় মজে থেকে তিনি ভুলে যাননি, যে পরাধীন দেশে তাঁর জন্ম, স্বাদেশিকতা, স্বদেশের মুক্তিকামনার আবহাওয়াতেই তিনি বড় হয়েছেন, তাই দেশ তাঁর সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি কখনও। তবু তিনি মার্কস্-এঙ্গেলসের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কথা The working man has no country-র প্রতিধ্বনিও মনে রেখেছেন। ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের গানে তিনি এই ধ্বনি শুনতেও পেয়েছেন—'তুমি পাও না একটি মুষ্টি/মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী/তাদের কেমন কান্তি-পুষ্টি, জগৎ ভরা জয়/তুমি কেবল চাষের মালিক/গ্রাসের মালিক নয়/স্বদেশ স্বদেশ করিস্ তোরা, এদেশ তোদের নয়!' স্বভাবকবিদের যেমন তিনি মনে রেখেছেন তেমন রবীন্দ্রনাথকেও। কেবল যে রবীন্দ্রকাব্য তাঁর অধিগত তাই নয়—তাঁকে গভীর করে জানার সুবাদে অনায়াসে তিনি বলতে পারেন—'এই মহাকবি নির্জিত দুর্গত স্বদেশের সত্তার শুধু সমুজ্জ্বল প্রতীক ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে নিদির্ধ্যাসন বলে সেই সত্তার সংরক্ষক, তার শোধক, তার বর্দ্ধক, তার সুষ্ঠু বিকাশে শ্রেষ্ঠ সহায়ক।' অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথের বাণী—গভীরতা ও গৌরব—কখনও পৌনঃপুনিকতায় দুষ্ট হতে পারে না। গান্ধী, জহরলাল বা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর বিবেচনা খাঁটি আগমার্কা মার্কসবাদীদের নিরিখে নিন্দার্হ বিবেচিত হয়েছে। একটি মজার উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। উনিশশো চৌষট্টি সালে নেহরুর মৃত্যুর পর তিনি জহরলাল সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'যথেষ্ট ভাল মার্কসবাদী' হলে, বইটা হয়ত অন্যভাবে লেখা

হত। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কৌতুক করে লিখেছেন, 'আর যায় কোথায়—সাতষট্টি সালের লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে আমার এই স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করে কিছু কটু-কাটব্য চলল। একে তখন শোধনবাদী অপরাধে অভিযুক্ত আমার মত অনেকে। তাই গোদের ওপর বিষফোড়ার মত এই আত্মনিন্দা ইলেকশনে আমার প্রায় হার ঘটাতে বসল। এতে অবশ্য আশ্চর্য হইনি—তবে আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইক্‌লির মতন বিশ্ব-জনপ্রিয় কাগজে একজন ইংরেজী নবীশ এবং উগ্র মার্কসবাদী আমার উক্তিটি উল্লেখ করলেন। যাই হোক, ভেবে একটু সান্ত্বনা, স্বয়ং মার্কস তো একবার ফরাসী অনুগামীদের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন [এঙ্গেলসের বিবরণ অনুযায়ী]—'Thank God, I am no Marxist!'

অন্যত্র তাঁর বিশ্লেষণে দেখি, সে-দেশের বামপন্থার নাম নিয়ে বামপন্থী সংগ্রামের সর্বনাশ সংগঠনের সচেতন, অচেতন, অর্ধচেতন প্রয়াস দেখা দিয়েছে। বাম-বিদগ্ধজনের মধ্যেই জেগেছে যেন এক অদ্ভুত স্খলনের ছবি। হয়তো সেইজন্যেই উনিশশো আটষট্টি সালে প্যারিস শহরে অমন তুমুল যুব-অভ্যুত্থানের ফসল গোলায় উঠলোই না। বিপুল প্রতিশ্রুতি নস্যাৎ হয়ে গেল। পরবর্তী পর্যায়ে সেখানেই জেগে উঠলো 'নিউ ফিলোজফার্স' নামে একদল বিদ্বান। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন—এঁরা সবাই মনস্বী আর এঁরা সবাই স্বঘোষিত কম্যুনিস্ট। এঁদেরই কল্যাণে পশ্চিম দুনিয়াতে রব উঠেছিল, যে, এশিয়ার নোংরা ছোঁয়াচ লাগায়, সোভিয়েত আর তারই প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত পূর্ব য়ুরোপে আসল আগমার্কা মার্কসবাদ সম্মত সোশিয়ালিজম্ গড়ে ওঠেনি—গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। 'পশ্চিম য়ুরোপের সর্বগুণসম্মত গণতন্ত্রবিভূষিত সমাজবাদ তাঁরাই গড়বেন।' হীরেন্দ্রনাথ এঁদের ভাবনাচিন্তাকে ভ্রান্তিবিলাস আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদেরই একজন Michel le Bris বই লিখলেন—'God is dead. Marx is dead and I am not feeling too well either' ওই শতাব্দীর আশির দশকের একসময় থেকেই গর্বাচভ্ বলতে শুরু করলেন,—'আমাদের সকলের প্রিয় য়ুরোপীয় বাসভূমি [Our common dear European homeland.]।—সেইসঙ্গে সোশিয়ালিজম্‌কে ঢেলে সাজানোর [পেরেস্ত্রৈকা-গ্লাসনস্ত] কথাটাও ওঠালেন। এবং তারই ফলে কয়েক বছরের মধ্যে নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই সোভিয়েত দেশের পতন ঘটলো।

সংকলিত পনেরোটি প্রবন্ধের মধ্যে ন'টি ছাপা হয়েছে পাক্ষিক বসুমতী, একটি শারদীয়া বসুমতীতে। সে সময় সম্ভবত একটি নির্দিষ্ট কলাম তাঁর জন্যে বরাদ্দ ছিল। বাকি প্রবন্ধ ঐ একই সময়ে নন্দন কিংবা পরিচয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। দেশের এবং দুনিয়ার বর্তমান দুর্গতি নিয়ে তিনি যে বিচলিত বোধ করেছেন তারই প্রকাশ ঘটেছে নিবন্ধগুলোতে। শুধু বিচলন নয়—তাঁর ব্যাকুলতাও প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যাকুল ও বিচলিত হয়েছেন ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২তে—অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায়। ঐ সময়েই তো সোভিয়েত দেশের পতন সেখানে লেনিন মূর্তির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন থেকেই যার সূত্রপাত তাঁর খেদোক্তি 'নিরবধিকাল চলছে ও চলবে।—আমি দেখবো না। পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে সমাজবাদ-সাম্যবাদের ভবিষ্যত কী আকার নেয়। আমাকে শুধু

একটু অতিরিক্ত যন্ত্রণার শিকার হতে হল দীর্ঘ আয়ু পেয়ে। তবু আশা তো হারাই না—আর বলি আমার প্রিয় হিন্দুস্থানী উদ্ধৃতি দিয়ে—'ম্যয় রহুঁ, ইয়া না রহুঁ/ইস্ চমন্ আবাদ্ রহে।" সংকোচ নিয়েই বলতে ইচ্ছে করছে এসব অনুভবের পর আরো দশবছর কেটে গেছে, অনেক কিছু বদলও ঘটে গেছে কিন্তু বাগানের ফুল ফোটার সম্ভাবনা এখনো দেখা যায়নি।'

ইতিহাসবিদ্ হিসেবে অনেক ঘটনা ও তথ্য যুক্ত করে দিয়ে বর্তমানকে বোঝাতে সচেষ্ট থেকেছেন তিনি—এইখানেই প্রবন্ধগুলি মূল্যবান হয়ে ওঠে এবং নানান তথ্যসূত্র খুঁজে নেবার সুযোগ ঘটায়। বাস্তবিক পরিস্থিতির পারস্পরিক অভিঘাতগুলিকে তিনি প্রার্থিত মূল্য দিয়ে পাঠক হিসেবে আমরা যাতে অতীতকে বুঝতে পারি—সে বিষয়ে আগ্রহী থেকেছেন। জটিল সব ঘটনাকে সাধারণীকরণের প্রশস্ত পথ তিনি আলোচনার মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করার এ এক আয়োজন। মনে মনে তর্ক তোলার উপকরণও আছে। যেমন অগাস্ট '৪২ আন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টির যোগ না-দেওয়ার যুক্তিগুলি শোনার পরেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়—জার্মানীর সোভিয়েত আক্রমণে যুদ্ধের চরিত্র বদল—সেটা সত্যি। কিন্তু আমরা তো জানি হিটলারের মস্কো অভিযানকে পরাস্ত করেছিল লাল ফৌজের অমিতবিক্রম ও শৌর্য এবং স্ট্যালিনের রণকৌশল—সেখানে ইংরেজদের কোনও ভূমিকাই ছিল না। সুতরাং 'ইংরেজ ভারত ছাড়' এবং 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—এমন লড়াকু আহ্বানে সাড়া না দেওয়াটায় খট্‌কা লাগতেই পারে। সোভিয়েত বা চীনকে সাহায্য করার কোনও ক্ষমতাই আমাদের ছিল না। তিনি আমাদের আরো একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন—জুলাই '৪১ সালে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক হতে যখন স্বীকৃত হলেন রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন—'দেখো, তোমরা এই ইংরেজকে বিশ্বাস কোরো না। সোভিয়েতের সঙ্গে ওরা এখন জুটেছে বলছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস নেই ওদের।' স্বীয় প্রজ্ঞাবলেই তিনি সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য শ্রেণীচরিত্র বুঝেছিলেন। তবু বলবো ১৯৯৪ সালের শারদীয় নন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক নিবন্ধটি বিবিধ তথ্য ও সূত্রের জন্যে বিশেষ মূল্যবান, যেমন ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নাগপুর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং লেখক। সেখানে প্রকাশ্য মিছিলের আওয়াজ ছিল—'ন এক পাই ন এক ভাই'। এই যুদ্ধ অসহযোগ। ইতিমধ্যে অবশ্য ১৯৪১-এর জুন মাসে সোভিয়েত আক্রান্ত হল য়ুরোপ ভূখণ্ডে—চিন্তার মানচিত্রটা পাল্টে গেল। তিনি জানিয়েছেন জনযুদ্ধ এই ঘোষণা করবার আগে প্রায় ছ'মাস পার্টিতে বিতর্ক চলেছিল এবং জনযুদ্ধ নীতি ৪২ সালের জানুয়ারি মাসে সারা ভারত ছাত্র-ফেডারেশনের মঞ্চ থেকে প্রথম প্রচারিত হয়। স্বয়ং গান্ধিজী যে হিটলারের আক্রমণের পর ড. বিশ্বনাথ পাণ্ডে সম্পাদিত পত্রিকায় লিখেছিলেন—'সোভিয়েত যুদ্ধে হেরে গেলে দুনিয়ার গরীবদের দেখবে কে?' প্রায় অজানা এই তথ্য তিনি দিয়েছেন। এ তথ্যও পাওয়া গেল যে ৪২-এর অগাস্টে ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাবে কংগ্রেস স্পষ্ট বলেছিল যে 'রুশ এবং চীনের স্বাধীনতা মহামূল্য এবং তাকে কিছুতেই খণ্ডিত হতে দেওয়া চলবে না।' এই নিবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন যে যান্ত্রিকভাবে জনযুদ্ধ নীতির অপপ্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে হয়ে থাকতে পারে। এই বিভ্রান্তিকে

স্বীকার করে নিয়েই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'নিছক লজিক জীবনকে চালায় না, সর্বাবস্থায় যে বৈপরীত্য মানুষ ও সমাজের অবস্থানে থাকে তারই মোকাবিলা করতে শেখায় ডায়লেকটিক্।' আসলে এই নিবন্ধে সদিচ্ছা নিয়েই তিনি চেয়েছেন পাঠককে দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবের দিকে মুখ ফেরাতে।

কিউবা এবং ফিদেল্ কাস্ত্রোর নেতৃত্ব নিয়ে 'নাই নাই ভয়' শীর্ষক লেখাটি আমাদের উদ্বোধিত করে। সেখানে কালোপযোগী বিপ্লবীচিন্তা ও কর্মের আয়োজন আজও চলেছে। সেই জোরে এখনো তাঁরা বলতে পারেন—'Socialism or Death'! কাস্ত্রোর নেতৃত্ব এবং চে গুয়েভারার সাহচর্য কিউবাতে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার স্বকীয়তাকে তিনি বিশ্ববিমোহন বলেছেন। কাস্ত্রো-ইকা বলে চিহ্নিত করে গর্বাচভের পেরেস্ত্রৈকাকে ব্যঙ্গ করেছেন। কিউবায় 'Poor but pure' ব্যবস্থা বহাল রাখতে পারা গেছে নানান বাধার সম্মুখীন হয়েও। গর্বাচভ প্রমুখের উদ্‌যোগিতায় এবং সোভিয়েতের নিজস্ব অধঃপতনের ফলে দুনিয়া জুড়ে কম্যুনিস্ট কার্যক্রম বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে সমাজ রূপান্তরের স্বপ্ন ভ্রষ্ট হতে থাকে। উনিশশো সাতাশিতে সোভিয়েত বিপ্লবের ৭০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এদেশ থেকে সি. পি. আই ও সি. পি. এমের নেতৃস্থানীয় আমন্ত্রিতদের মধ্যে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ছিলেন। সেখানেই তিনি ফিদেল কাস্ত্রোকে আগের তুলনায় অনেক গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখেছিলেন। মস্কো থেকে প্রকাশিত কাগজপত্রে তখন কিউবা এবং কাস্ত্রো-দূষণ শুরু হয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্ব সেখানে খানিকটা অবহেলিত। গর্বাচভ-নেতৃত্বে Strip-tease-এর খেলা শুরু হয়ে গেছে—ক্রমশ উদঘাটিত হচ্ছে সমাজবাদ-সাম্যবাদের নীতি থেকে বিচ্যুতির লক্ষণ। সুকৌশলে প্রতিবিপ্লবের বাহন হয়ে দাঁড়াবে—"more openness, more democracy, more socialising"—ইত্যাদি সুবচন, ফলে একদিন—my mission is fulfilled—এই কথা বলে গর্বাচভ মদ্যপ ইয়েলৎসিনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। ওদিকে আমেরিকায় গর্বাচভকে নিয়ে প্রবল মাতামাতি—নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়ে গেলেন—মার্কিন মহলে man of the decade বলে নন্দিত হলেন। ১৯৮৮-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রধান প্রার্থী ছিলেন বুশ (সিনিয়ার)। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—বুশের স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, Gorby (গর্বাচভের আদরের ডাক)-কে নিয়ে সে দেশে উচ্ছ্বাস এতই প্রবল যে তাঁর স্বামী বুশের বিপক্ষে তাঁকে দাঁড় করালে বুশ কোথাও ঠাঁই পাবেন না! হায় আজ কোথায় সেই গর্বাচভ!

স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিচারবুদ্ধির প্রখরতায় হীরেন্দ্রনাথ এ-ও বলেছেন—সমাজবাদ সাম্যবাদের আপাত অধোগতির পেছনে রয়েছে অনেকবছর ধরে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও অপকর্ম। সেইসঙ্গে অবশ্যই সমাজবাদের গৃহশত্রুদের বহুমুখী বৈরিতা। অল্পে তুষ্ট রাজনীতির কুফল—যাকে প্র্যাগ্‌মাটিজম্ নাম দিয়ে এদেশে এবং অন্যত্র আজও চালানো হচ্ছে। এ সবই চরিত্রস্খলন, আদর্শচ্যুতি ও লক্ষ্যভ্রষ্টতার লক্ষণ।

এদেশেও তাঁর এ জাতীয় অভিজ্ঞতার কথা, নীতিরহিত শৈথিল্যের কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন—যা তাঁর যন্ত্রণার এক বিশিষ্ট কারণ। এদেশে Order

of Lenin সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনজন,—রাজেশ্বর রাও, ডাঙ্গে, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রধান রমেশচন্দ্র। কিন্তু মস্কোয় যখন লেনিন মূর্তির অসম্মান ঘটল তখন বাঙালি কম্যুনিস্টদের ভেঙে পড়তে দেখলেও Order of Lenin-ধারী দুই ভারতীয়ের প্রকাশ্য ধিক্কার শোনেননি। ডাঙ্গে তখন প্রয়াত,—অবশ্য জীবৎকালেই তাঁর রাজনৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি।

আন্তর্জাতিকতা তত্ত্বে গভীরতার প্রতি এইসব নয়া গণতান্ত্রিক বিধি বিধান তাঁর মর্মপীড়ার কারণ—এই সংকলনের শেষ নিবন্ধে—[নভেম্বর বিপ্লব : মনুষ্যত্বের পরাভব নেই'] এই প্রত্যয় তিনি ঘোষণা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকেই উদ্ধৃত করেছেন—'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে, আমি অপরাধ বলে মনে করি।'

রবীন্দ্রকাব্যের এবং 'সভ্যতার সংকট' থেকে গদ্য-উদ্ধৃতি যেমন বারে বারে এসেছে তাঁর লেখায়—তেমনি লোককবির কবিতা থেকেও তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রাঞ্জল করতে—বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক আলোচনায়। 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা' যে দেশের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব, তাকে যখন অনপনেয় মসীতে কলঙ্কিত করা হয়েছে বা হয় তখন দেশবাসীর জীবনে নেমে আসে এক মর্মন্তুদ যন্ত্রণা। বাবরি মসজিদ্ ধ্বংসসাধন যে হিন্দু মানসিকতারই বিকৃতি—তাও তাঁর বিশ্লেষণে প্রকাশ পেয়েছে। রাজনীতির লোকেরা যখন ধর্মকে বাণিজ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার করে তখন রাজনীতির মূলে যে মানব-মমতার তত্ত্ব তাকে চূড়ান্ত অবহেলা করা হয়। কৌশলে ক্ষমতা-দখলের প্রয়াসটাই প্রকট হয়ে ওঠে। তাই নোংরা টেক্কা-টেক্কি-টা এ দুর্ভাগা দেশে চলছেই।

হিন্দুত্বগর্বী আততায়ীর গুলিতে 'হে রাম' বলে গান্ধিজী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ১৯৪৮ সালে—তাঁর 'টাটকা অপরাধ ছিল—ভারত-পাকিস্তান মনোমালিন্য তুঙ্গে তখনই ভারত সরকারের কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে সম্মত করা। দেশবিভাগ তিনি নিবারণ করতে পারেননি কিন্তু তাঁর শেষ কামনা ছিল আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন দুটি দেশের ভবিষ্যতে মৈত্রী সম্ভাবনা। সেটা হল না। ১৯৬৪, সত্তরের দশকের শেষ, তারপরে আশির দশক থেকে, বারবার নরককুণ্ড তৈরি করা হল এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে। রাম জন্মভূমি নিয়ে সম্পূর্ণ এক অসাড় বিতর্ক চলতে থাকল। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'মুসলমানরা এদেশে এসেছিল এবং গুটিকয় ব্যতিক্রম ছাড়া এখানকার জীবনস্রোতে মিশেও গিয়েছিল—অন্য বিজেতার মত শিকারী পাখি হয়ে তারা আসেনি—তাই উড়েও চলে যায়নি লুণ্ঠন ও শোষণের পর—এদেশেরই জীবনস্রোতে তারা মিশে গেছে।' সেই ইতিহাস আলোচনা করেছেন নানা উদাহরণ দিয়ে। বিজেতা রাজার ধর্ম তো এখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে মুসলমান রাজশক্তি প্রবল থাকা সত্ত্বেও ঐ সব অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশি—আবার বাংলার মতো অঞ্চলে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি। এ সব তথ্যের সঙ্গে অনেক উদাহরণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হিন্দুরা আদিল্ শাহ্-কে জগৎগুরু আখ্যা দিয়েছিল। অযোধ্যাকাণ্ড বামপন্থাকে সীমাহীন লজ্জা দিয়ে মসজিদ ভেঙেছে। তখন সংসদের অধিবেশন চলছে কিন্তু সরকারি অপদার্থতার কথা উল্লেখ করা হলেও বামপন্থীসমেত বিরোধীপক্ষ ব্যস্ত

রইল পার্লামেন্টের 'নর্তন-কুর্দনে'র পারস্পরিক প্রতিযোগিতায়—হল্লা আর গলাবাজি চলতে থাকল, এমনকী ৭ ডিসেম্বর হট্টগোলের মধ্যে স্পীকারের উত্থাপিত প্রস্তাব পর্যন্ত গৃহীত হতে পারল না। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে এটা খুব জরুরি ছিল বিশ্বের দরবারে, বলেছেন—'আমাদের, বিশেষত কম্যুনিস্টদের বিবেক ও কর্মোদ্যমে শৈথিল্য এসেছে'। সেইসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন—হয়ত খানিকটা ঠাট্টার ছলে—'র‍্যালি করার গর্বে রেভোলিউশনের রাস্তা বানানোর কথা ভুলে গেছে কম্যুনিস্টরা।' মামুলি ধিক্কার-বিবৃতি নয়—তিনি চেয়েছেন 'মানবমমতা'র অকুণ্ঠ বিঘোষণ। আর এইসব সময়েই তিনি স্বভাবকবি গোবিন্দদাস ও লোককবি বাউল মদনকে উদ্ধৃত করেছেন বারে বারে। মারাঠী বাল থ্যাকারের জন্যে তিনি একটি ঐতিহাসিক সংবাদ উপস্থিত করেছেন—শিবাজীর দেশে যারা শিবসেনা তৈরি করে আস্ফালন দেখায় তাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে শিবাজীর পিতামহ শাহ্ শরির নামে মুসলিম সাধুর ভক্ত ছিলেন বলেই নিজের দুই ছেলের নাম দিয়েছিলেন—শাহ্জী ও শরিফজী। এটাই হল ভারতবর্ষে ইতিহাস-সম্মত ব্যবহার। বিবেক-বিবেচনাহীন, অনুতাপহীন বাল থ্যাকারের কাছে এ-সংবাদ মূল্যহীন।

তাঁর যে মন ভারতীয়ত্বের অন্তহীন গৌরবে গরিয়ান আর একই সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের নানাবিধ তুচ্ছতায় ব্যথিত তারও পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি রচনায় নানাভাবে।

বৈদগ্ধ্যের পরিচয়বাহী এবং মার্কসীয় ইতিহাস লিখনের বিচারে ঘটমান ইতিহাসের একটি অন্তর্মুখী ব্যাখ্যায় উজ্জ্বল এই নিবন্ধগুচ্ছ। লেখক তাঁর অব্যর্থ ক্ষমতায় এই সময়ের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তবে ভাববাদী বিচ্যুতি খুঁজে ফেরেন যাঁরা তাঁদের কাছে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় 'good enough marxist' হতে পারলেন না।

আদর্শবাদের অতন্দ্র সৈনিক

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য

জীবন্ত কিংবদন্তী মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাকে আমি 'স্যার' বলে ডাকি। তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার মতনই ব্যাপার হয়। সম্প্রতি আমার প্রকাশিত 'এগারোর কৈফিয়ৎ' বইটির মুখবন্ধে আমার কলেজ জীবনের 'স্যার' যা তিনি আজীবন ধরেই পরম শ্রদ্ধায় রয়েছেন, যা লিখেছেন তা আজও তাঁর পঞ্চনবতি কর্মসূচীর পরেও জ্বলন্ত এক গভীর কমিউনিস্ট আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাঠকের মর্মে গেঁথে দেয়। তিনি লিখেছেন—

"আমেরিকার অহংকারী ছত্রছায়ায় আজকের 'বিশ্বায়নী' জগতের যে হাল তা দিন দিন আরও প্রকট হচ্ছে। আফগানিস্তান নিয়ে যে কাণ্ড চলছে আর চলবে, তা থেকে শিক্ষা না নিতে পারলে আমাদের শুধু নয় সকলেরই বিপদ বাড়বে। কথা বাড়াবার দরকার নেই, তবে আজ একটা কথা অকাট্য যে, কম্যুনিজম-এর হিসাবমাফিক জগৎ জুড়ে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে, "দৌলত বাড়ছে আর মানুষের ক্ষয় হচ্ছে" (wealth accumulates and men decay) সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছুই বিপন্ন হচ্ছে, বিলাসব্যসন বাড়ছে আর দুর্নীতির দুর্দান্ত বিস্তারের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও চরিত্রভ্রংশ নিশ্চিত হচ্ছে। বছরের পর বছর ইউনাইটেড নেশ্‌নস্‌-এর পক্ষ থেকে সরকারিভাবে প্রচারিত Human Development Report-এ এর অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। কে কবে কেমন করে কোটিপতি হবেন ('লাখপতি' শব্দটিই এখন হাসির খোরাক।) তাই নিয়ে 'ইঁদুর দৌড়' চিন্তায় সবাই মশগুল। "এ জগতে হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি"—কতদিনের পুরনো কবিবাক্য আজও সত্য হয়ে রয়েছে। সমৃদ্ধির পাহাড় উঁচু থেকে আরও উঁচু হতে চলেছে, আগে যাদের মধ্যবিত্ত বলে ধরা হতো তাদের একটা ক্ষুদ্রাংশ এখন ফুলে ফেঁপে উপরতলায় জায়গা করেও হয়ত নিচ্ছে, কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকার যেমন প্রায় তেমনই রয়েছে। শতকরা পঁচাশি জন মানুষকে থাকতে হচ্ছে সেই যন্ত্রণায়। এ দেশে কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় আশি বছর আগে (১৯২২) সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ চেয়েছিলেন 'শতকরা আটানব্বইয়ের জন্য স্বরাজ'। একবারে ঘরোয়া ভাষায় বলতে হয়, আজ দু'হাজার দুই সালে বিশ্বায়নের রায় হলো "সেগুড়ে বালি"। এটাই হল "ধনতন্ত্রের ক্লেদ, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতার" প্রথম ও শেষ নিদর্শন। "গণতন্ত্র"-এর কুহক ছড়িয়ে, সমাজবাদ-সাম্যবাদের দেদীপ্যমান ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্রেফ ভুলিয়ে দিয়ে যে পৈশাচিক প্রবঞ্চনা এখন প্রায় অপ্রতিহত গতিতে ধাবমান, তাকে রোধ করার প্রয়াসে কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্যের এই রচনা সহায়ক হবে।"

ধনতন্ত্রের প্রতি চরম ঘৃণা হীরেন্দ্রনাথের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে প্রবাহিত হয়। তিনি উল্লেখ

করেন কখনো মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে—"নছিত্বা পর মর্মানি, ন কৃত্বা কর্ম দুষ্করং/ন হত্বা মৎস কাতীয়ং প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্", আমার কখনও মহান কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' থেকে বলেন—"যদি ফরাসী লেখক ওজিয়ের কথা ঠিক হয় যে টাকা যখন দেখা দেয় তখন তার গালে জন্মকালের রক্তচিহ্ন (জড়ুল) দেখা যায়, তাহলে বলতে পারি যে পুঁজির আবির্ভাবকালে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।"

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অতীব যশস্বী হীরেন মুখার্জী, আমাদের হীরেনদা আমার স্যার নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাদেশিকতার ছোঁয়া না এনেই বলা যায় বাঙালির এক প্রিয় সম্পদশালী প্রতিষ্ঠান। হীরেনদা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্য। প্রতি বছর দূর অঞ্চলের একজন প্রায় নিরক্ষর একনিষ্ঠ পার্টি সভ্য যেমন শৃঙ্খলার সঙ্গে নবীকরণ ফর্ম ভর্তি করে রাজ্যদপ্তরে পাঠান, হীরেনদাও তেমনি পরম নিষ্ঠাভরে প্রতিবছর নবীকরণ ফর্ম, লেভি ইত্যাদি নিয়ে যান। তাঁর এই কর্মপদ্ধতির মধ্যে এক সাবলীল শৃঙ্খলাবোধ এবং যেন এক পবিত্রতম কাজ করছেন এই মানসিকতা ফুটে ওঠে। কী বিশাল প্রতিভার মহীরুহ, কিন্তু শৃঙ্খলায় একজন কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়ানো কমিউনিস্ট সৈনিক। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের কাছে অবশ্যই শিক্ষণীয় ঘটনা।

অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী শুধুমাত্র ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক আদরণীয় শিরোমণিই নন, বাঙালিদের একজন বরিষ্ঠ সমাজপিতার মতন এবং ভারতের বরেণ্য মনীষীদের মধ্যেও একজন শীর্ষস্থানীয় ও সর্বাধুনিক মনস্বীতার এক গভীর সঞ্চালক। তিনি আমাদের পার্টির সম্পদ। সত্যকথা বলতে কী তিনি আমাদের পার্টির সভ্য ও সম্পদ হতে পারেন কিন্তু আসলে তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের ফসল যেমন আবার সম্পদও তেমন। তিনি আজ শুভবোধসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী জনগণের প্রত্যেকের। তাঁর মেধার শিকড় সর্বব্যাপক, গভীর এবং তা থেকে পরের প্রজন্মের সন্ততিরা রস আহরণ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

১৯৫৯ সালে এক চিঠিতে জওহরলাল নেহেরুকে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার জীবন এমন বাত্যাবিক্ষুব্ধ নয় যে পোতাশ্রয়ের শান্তি আমি দাবি করতে পারি। তবু জীবনের তরী থেকে দূরায়ত হলেও তীরের সাক্ষাৎ কথঞ্চিৎ পেয়েছি এবং সেজন্যই শুধু দিনযাপনের গ্লানি নয়, তার সার্থকতারও স্বল্পসন্ধান অন্তত পেয়েছি।'

দিনযাপনের সার্থকতার স্বল্প সন্ধানের শুরুর জন্য সেই ১৯৩৪ সালে, দেশে ফেরার আগেই, রাধাকৃষ্ণান স্থির করে রেখেছিলেন যে হুমায়ুন কবীর ও হীরেন মুখার্জীকে ওয়ালটেয়ারে নিয়ে যাবেন। হীরেনদা ব্যারিস্টার হোন বা না হোন সেদিন রাধাকৃষ্ণানের তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এখানেই শুরু। হুমায়ুন কবির ও হীরেন মুখার্জীর অতঃপর অধ্যাপনার হাতে-খড়ি ওয়ালটেয়ারে, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাড়ি থেকে ক্রমাগত ব্যারিস্টারী সনদটাকে একটু কাজে লাগাবার তাগিদ পেয়ে হীরেনবাবু ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি ওয়ালটেয়ারের পাট চুকিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। রাধাকৃষ্ণান অপ্রসন্ন হলেন কিন্তু বাধা দিলেন না।

কলকাতায় তাঁর অক্সফোর্ডের বন্ধু সজ্জাদ জহীর কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর কথা জানাতে পার্টির সম্পাদক পি সি যোশী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। হীরেনবাবুর কথায়, 'ব্যবধান রেখে চললাম, ট্রাম বাস কয়েকবার বদলে টালিগঞ্জ এলাকার এঁদো পুকুরের ধারে মেটে ঘরে আলাপ হল যোশীর সঙ্গে। জানি না যোশী ছাড়া অন্য কেউ সেদিন পার্টি প্রধান থাকলে তার মতো আমাকে পার্টিতে টেনে নেওয়া ঘটত কি না—টালিগঞ্জের সেই দীনহীন কুটিরে যে আমার মনস্থির হয়ে গিয়েছিল, পার্টিতে যোগ দেওয়া জীবনব্যাপী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা জেনেও যে কুণ্ঠা বোধ করিনি, গৌণ হলেও যে তার একটা কারণ যোশীর ব্যক্তিত্ব তাতে সন্দেহ নেই।'

ক্রমে মার্কসীয় রাজনীতি এমন প্রভাব বিস্তার করে যে হীরেন মুখার্জীর পক্ষে নিতান্তই ব্যক্তিস্বার্থে অর্থকরী প্রয়াসে লিপ্ত হওয়া সহজ হল না। ব্যারিস্টারীতে সময় নষ্ট না করে 'পিতৃপ্রভাবে এবং কতকটা ছাত্রখ্যাতির কল্যাণে' রিপন কলেজে ইতিহাস বিভাগের প্রধান হয়ে কাজ শুরু করলেন।

অল্পবয়স থেকেই হীরেনবাবু এত খ্যাতকীর্তি হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় না থাকাটাই আশ্চর্যজনক ছিল। আমি কার্যত তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লাম। ইতিহাসের এক শ্রুতিকীর্তি শিক্ষক তিনি বরাবরই ছিলেন। তাঁর অশ্রুতপূর্ব অধ্যাপনার রস আস্বাদনের জন্য অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কখনো কলেজের অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে, কখনো বা সম্পূর্ণ লুকিয়ে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হত। সে এক ইতিহাস-পাগল ছাত্রছাত্রী-গবেষক ইত্যাদির আশ্চর্য মহামিলন তীর্থ। প্রেসিডেন্সী থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স—সব এক কলেজে ঢুকে পড়ত। কলেজের শিক্ষক এবং একজন অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে তিনি শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী সর্বমতের মানুষজনের একান্ত প্রিয় ছিলেন। যে ব্যক্তিই তাঁর সম্বন্ধে কোনও কিছু বলতেন, আমি দেখেছি, এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি থেকে তা বলা হত। ছাত্র ভক্ত হিসাবে যে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম, তাতে সন্দেহ নেই।

পার্টির নেতা, লোকসভার নেতা হিসাবে হীরেন মুখার্জীকে দেখা এক বিরল অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। তার বাগ্মিতা কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছে। ইংরেজি বা বাংলায়, যে ভাষাতেই হোক তিনি যখন বলতেন, তখন প্রাচীন গ্রিক উপকথায় অরফিউসের কথা মনে পড়ে যায়। কণ্ঠে এক অনর্গল মোহময় সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠতো। যে মানুষ সেই বক্তৃতা শুনতেন তাঁর মনপ্রাণ তাতে সম্পূর্ণ আপ্লুত হয়ে পড়ত। এ এক অদ্ভুত আকর্ষণীয়, সম্মোহনী ক্ষমতা। পার্লামেন্টকক্ষে যখন হীরেন মুখার্জী বক্তৃতা করতেন তখন জওহরলাল নেহেরুও যেখানেই থাকুন না কেন সভাকক্ষে চলে আসতেন। দুজনের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। হাসি মস্করা, উতোর চাপান, প্যাঁচে খেলা উভয়ের মধ্যে চলত।

হীরেন মুখার্জী একজন একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মী, পার্টি-শৃঙ্খলার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই শৃঙ্খলাপরায়ণতা এককথায় অভূতপূর্ব এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য বিশেষ 'প্রতিষ্ঠা' বা জবরদস্ত এক 'কেরিয়ার' তৈরি করার কোনও চেষ্টা করেননি। তিনি চাইলে কী না করতে পারতেন। সম্পদ সংগ্রহ, অর্থ, নিজের নাম চতুর্দিকে ছড়ানো—

দীর্ঘদিন লোকসভার সদস্য হিসাবে থাকাকালীন ইচ্ছা করলেই তিনি করতে পারতেন। কিন্তু এসব তিনি ঘৃণা করতেন। গোলাপের সৌরভ যেমন স্বভাববৈশিষ্ট্যে আপনাআপনিই ছড়িয়ে পড়ে, তাঁরও গুণের সৌরভ দশদিকে নিজের শক্তিতেই ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর অতি সাধারণ জীবনযাপন, সহজ আচার ব্যবহার, মূল্যবোধ সত্যিই অনুকরণযোগ্য। নির্বাচনযুদ্ধে বিশেষ দায়িত্ব নিতে তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে যখন থেকেছি তাঁকে কাছ থেকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার মতো নানান ঘটনা ঘটত। সে তো এখন ইতিহাস। তিনি মানুষের মনের নিষ্ঠা ও প্রত্যয় গেঁথে দিতে পারতেন।

হীরেন মুখার্জীর মতো এতবড় একজন বুদ্ধিজীবী, বাগ্মী হিসাবে যাঁর নাম অ-ভারত বিস্তৃত, একজন ঐতিহাসিক পার্লামেন্টারিয়ান, কখনও নিজেকে পার্টির ঊর্ধ্বে স্থাপন করার চিন্তাকে নিজের অগোচরে স্বপ্নেও স্থান দেননি। আশ্চর্য হতে হয় যে এতবড় উদাহরণ, এক নমস্য ব্যক্তিত্ব আমাদের সামনে থাকতেও তাঁর আদর্শ, ত্যাগ ইত্যাদি ভুলে গিয়ে বর্তমানের কিছু জনপ্রতিনিধি পার্টির কোনও তোয়াক্কাই করেন না এবং নিজেদের মহান ভেবে পার্টির ঊর্ধ্বে নিজেকে সচেতনভাবে স্থাপন করেন। সেই স্থান থেকে ক্রমাগত পার্টির মতামত গ্রাহ্য না করে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে বিবৃতি প্রকাশ করে চলেন। আত্মনাম জাহির করার এইসব প্রয়াস পার্টিশৃঙ্খলাকে ক্রমাগত লঙ্ঘন ও ভঙ্গ করে চলে। অথচ কত দীর্ঘবছর ধরে কর্মীদের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট রাজনীতি ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিতে ঘোরতর বিভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। সাম্রাজ্যবাদের মিত্রবাহিনী এই সুযোগে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় নানান গল্পকাহিনী ছাপছে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। এরা ভুলে যাচ্ছেন হীরেন মুখার্জীর লড়াই।

স্যারের মহৎ একটি গুণ ছিল যা সর্বদাই দেদীপ্যমান এবং সর্বদাই অন্যকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমাকে চলার পথে পাথেয় জুগিয়েছে তা হল মূল্যবোধ সম্পর্কে স্যারের আপসহীন মনোভাব। মার্কসের ভাষায় ধনতন্ত্রের 'ক্লেদ, লজ্জা আর অমানবিকতা' যে-কোনও জঘন্য নিম্নপর্যায়ে 'বিদগ্ধ' মানুষকেও নামিয়েছে তা বিস্ময়কর। এই 'নামানো' অর্থাৎ অধঃপতনের বিরুদ্ধে হীরেন্দ্রনাথের জেহাদ কখনও থেমে থাকেনি। আদর্শচ্যুতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন মুক্তকণ্ঠে। বহু সময় তিনি কাস্ত্রোকে উল্লেখ করেছেন, প্রথম আন্তর্জাতিকের মঞ্চ থেকে মার্কসের ঘোষণা স্মরণ করেছেন।

কাস্ত্রো বলেছেন যে, অসম্ভব প্রতিকূলতাও কিউবার জনতাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি কারণ কম্যুনিস্টরা স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুত থেকে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আদর্শচ্যুত হয়নি। 'আমরা কাজ করে চলেছি অনেকটা যেন একটা Priesthood-এর মত'—এমন ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন। কেউ যেন না ভেবে বলেন যে কম্যুনিস্টরা বুঝি আবার এক 'পুরোহিততন্ত্র' খাড়া করতে চলল। কাস্ত্রোর কম্যুনিস্ট চিন্তায় ধর্ম বিষয়ে ধোঁয়াটে আধ্যাত্মিক বাস্তব বর্জিত কল্পনাশ্রয়ী সান্ত্বনার স্থান নেই কিন্তু আছে এই মাটির পৃথিবীতে বাস্তবতাভিত্তিক ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠার উপস্থিতি। আজ যখন জগৎ জুড়ে দুর্বৃত্তির প্রাধান্য আর জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে সুনীতির প্রায় অন্তর্ধান ঘটেছে, তখন

কম্যুনিস্টদের কাজ হল আবার সুনীতির প্রতিষ্ঠা ঘটানো, যে কথা ১৮৬০ এর দশকে প্রথম আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে স্বয়ং কার্ল মার্কস বার বার ঘোষণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর দেশে আমরা সেই আহ্বানেই সাড়া দেব। সম্ভোগ সর্বস্ব জীবনের ব্যর্থ সন্ধানে 'ইঁদুর দৌড়ের' যে সমাজ আজ দেখা দিয়েছে, সে পথে মানুষের পরিত্রাণ নেই। এই পরিত্রাণের পন্থা সম্পর্কে স্যারের তীক্ষ্ণ বক্তব্য এই সঙ্কটে পথ দেখায়।

তিনি লিখেছেন, সোভিয়েত ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লোভ বলে একটি রিপু 'মৃত্যু শেলের' মতো মানুষের সমাজ দেহের গভীরে বহু যুগ ধরে প্রোথিত রয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রায় অসম্ভব প্রয়াসে সোভিয়েত দেশ নিরত রয়েছে—সেই প্রয়াসকে আশীর্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে কবি তাদের জানান যে, একটি অত্যন্ত বন্ধুর, অত্যন্ত কঠিন বলেই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, বিচ্যুতি না ঘটে যায়, আদর্শ থেকে স্খলন না দেখা দেয়, এই সাবধানবাণী সব দেশের কম্যুনিস্টদেরই মনে রাখতে হবে। এই 'লোভ' নামে রিপুটির নানা রূপ সর্বত্র দেখছি। তারই ফলে এত দুর্নীতি, এত দুর্বৃত্তি, এত দুর্গতি। তারই ছোঁয়াচে কম্যুনিস্ট আন্দোলনেও বেড়ে চলেছে বহুবিধ ব্যত্যয়, কর্তব্যচ্যুতি অধঃপতনের। সচরাচর ধর্ম বলতে যা বুঝি তা নয়, কিন্তু কাস্ত্রোরই চিন্তার অনুকরণে উদ্ধৃত করি কবিবাক্য

"ধর্ম যাবে নাম রবে করিবে আহ্বান/দুরূহ কাজে নিজেরে দিও কঠিন পরিচয়।"

প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয় কিন্তু কম্যুনিস্টদের সে ধর্ম তার নির্দোষ আবার দেশে দেশে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে বিপ্লব বিরোধীদের আপাত বিজয়ী দেশগুলিকে করুক।

আজকের কিছু ভাবনা আর দুর্ভাবনা প্রসঙ্গে স্যার যা লিখেছেন তা দিয়েই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সমাপন করছি। প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত সুনীতি, জনকল্যাণভিত্তিক রাজনীতি প্রকৃত মানবিকতামণ্ডিত সভ্যতাকে যদি বাঁচাতে হয়, বিকশিত করতে হয় তা হলে লোভলালায়িত শোষণমূলক, সংখ্যাল্প মানুষের সম্ভোগসর্বস্ব যে মানবিকতা ধনতন্ত্রের পক্ষে অকাট্য, তাকে দূর করে মানুষের যথার্থ গরিমা প্রতিষ্ঠাই হল কম্যুনিজমের অন্বিষ্ট আর কম্যুনিস্টদের সর্ব কর্মে মূল অনুপ্রেরণা। কথা বাড়াব না। কিন্তু সন্দেহ নাই যে প্রাক্তন সোভিয়েত আর মহাচীন সমেত সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে কম্যুনিস্ট চরিত্রে ও কর্মে চারিত্রিক স্খলন ঘটেছে। নইলে এমন বিপর্যয় ১৯৮৭ থেকে ঘটে যেতে পারত না। আমরা স্মরণ করব প্রথম আন্তর্জাতিকের মঞ্চ থেকে কার্ল মার্কসের ঘোষণা যে সুনীতির বিজয় আমাদের কাম্য। মেহনতী মানুষ দেশে দেশে শান্তি আনবে। সভ্যতাকে কলুষমুক্ত করবে—

'কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন/সূর্যের মতন' আসবে সমসুযোগের সর্বজন কল্যাণ ও মানব অভ্যুদয়ের যুগ।

হীরেন মুখার্জীর চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা যারা পরিচিত এবং প্রভাবিত, সেই হিসাবে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি, সমাজতন্ত্রই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ ও শেষ কথা বলবে—ধনতন্ত্র নয়।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় আমি যা অনুভব করেছি এবং স্যরের বিভিন্ন লেখায়ও তা প্রকাশিত হয়েছে যে মনস্বী হীরেন মুখার্জীর মধ্যে এক দুরন্ত যন্ত্রণা সর্বদাই বিদ্যমান রয়েছে,

যেন মর্মে গাথা আর তা হল আজকের ভারতবর্ষে বিগত বছরগুলো ধরে চলে আসা কম্যুনিস্ট অনৈক্য। তিনি বার বার কম্যুনিস্ট ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন, বক্তৃতা করছেন, লিখছেন, এবং অন্তর দিয়ে অনুভব করছেন যে, এছাড়া এদেশের নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি, বামপন্থী দলগুলি ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করছে কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। এজেন্ডার এক নম্বরে রাখতে হবে কম্যুনিস্ট ঐক্য।

অবিসংবাদিত কমিউনিস্ট নেতা হীরেন মুখার্জী গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তিশালী লেখনী ধারণ করেছেন, ক্ষুরধার যুক্তিনিষ্ঠ বাগ্মিতার দ্বারা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে, তার ঐক্যকে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী চরিত্রকে রক্ষা করার জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন—সে সংগ্রাম ইতিহাসের পাতার স্বর্ণাক্ষরে স্থান করে নেবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

হীরেন্দ্রনাথ সাহিত্যভাবনা

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

বিদ্যাপতির একটি পদের তিনটি পংক্তি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যভাবনা প্রকাশ প্রসঙ্গে অনেকবারই ব্যবহারই করেছিলেন। পংক্তি তিনটি হল—

যব গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,
নব জলধার বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বস্তুত মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষমাত্র করে ছন্দেবন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা সংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।' (তথ্য ও সত্য/সাহিত্যের পথে) পংক্তি তিনটির কবিকৃত ব্যাখ্যার এখানেই শেষ নয়, ওই গ্রন্থেরই অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের 'ফুল্লরার বারমাস্যা'-র দারিদ্র্য বর্ণনার চিত্রের সঙ্গে আলোচ্য অংশের তুলনা করে বলেছিলেন, 'তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম—সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হয়ে উঠল।' পাশাপাশি ফুল্লরার—

দুঃখ করো অবধান
দুঃখ করো অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।—

'কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তা রূপ ধরল না।' (সাহিত্যরূপ)

হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা আলোচনা করতে বসে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত মতামত বিচার আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন মনে করা যায় যে, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যার বিরোধিতায় নেমেছিলেন তখন এর তাৎপর্য বোঝা যায়। 'কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই বুঝলে, যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ যে অভিজ্ঞতার রং আর প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য। আর্টিস্ট কর্মিষ্ঠ না হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অনুভূতি আর প্রকাশ তাঁর ব্যবসা। তাই বোঝা শক্ত যে—

যব গোধূলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

—হচ্ছে নিঃসংশয় কাব্যানুভূতি, আর আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকল মজুরদের ধর্মঘট বা কিষাণ জমায়েতের কোনো বিশেষ ভঙ্গিমা, কবিক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর কাব্যানুভূতির সরঞ্জাম নয়।'

রবীন্দ্রনাথের 'তথ্য ও সত্য' প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৩১), আর 'সাহিত্যরূপ'-এর প্রকাশ 'প্রবাসী'-তে (বৈশাখ ১৩৩৫)। হীরেন্দ্রনাথের উপরোক্ত ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছিল অনেক পরে (জুলাই ১৯৪০)। কিন্তু কোনো বক্তব্যই প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে। 'তথ্য ও সত্য' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতার অন্যতম। আর জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে বিশ্বভারতী-সম্মিলনী আয়োজিত দুদিনের আলোচনাসভার একদিনের কবিপ্রদত্ত ভাষণ। এর আগে বিচিত্রা-য় (শ্রাবণ ১৩৩৪) 'সাহিত্যধর্ম' নামে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধটি সাহিত্যিক মহলে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই আলোড়নের কথা জানিয়েছিলেন, 'সাহিত্যধর্ম বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। তার কর্মফল চলছে (১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)।' এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণ সত্য' আরে 'সার্থক সত্যে'-র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সাধারণ সত্যে একেবারে বাছ-বিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই করা।' আধুনিক সাহিত্যের যে দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ 'লালসার অসংযম' আখ্যা দিয়েছিলেন তার প্রতি হীরেন্দ্রনাথেরও সমর্থন ছিল না। কিন্তু যাকে তিনি কেবল 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' বলেছিলেন সেই সাহিত্যকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। কারণ দারিদ্র্য-মোচনের রাজনীতিকে তিনি তখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তাই নাম না করে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় তাঁকে নামতে হয়েছিল। অথচ, 'তরী হতে তীর' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হাতেই তিনি তৈরি, তাই এই গ্রন্থ রচনা করে তাঁর জিনিস তাকেই তিনি সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন, 'ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।' একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সমালোচনার অধিকার কখনও পরিহার করা সঙ্গত নয়, সমুচিত নয়।

হীরেন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যভাবনার মধ্যেই এই দ্বৈততা রয়েছে। বাল্যকাল থেকেই পারিবারিক প্রভাবে নানা সংস্কৃত শ্লোক বা দেবস্তোত্র তাঁর কণ্ঠস্থ, অনেক ক্ষেত্রেই শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ অথবা সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনি অনায়াসে শব্দ আহরণ করেন। পাশ্চাত্য রোম্যান্টিক কাব্য তাঁর অনায়াস আয়ত্ত, ২১.১০.২০০০ তারিখে বর্তমান নিবন্ধকারকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি সাম্প্রতিক 'দুনিয়ার দুর্দশাবৃত্তিতে' তাঁর বিচলিত মানসিকতার কথা জানাতে গিয়ে অনায়াসে শেলীর উদ্ধৃতি দেন, 'Out of the day and night/a joy has taken flight', আবার আশাবাদের কথা শোনাতে গিয়ে Browning-এর সেই নায়কের কথা তাঁর মনে আসে, One who never turned his back but marched breast forward. অত্যন্ত পরিণত বয়সেও এইসব কবিরা যাঁর কণ্ঠস্থ থাকে, তিনি যে রোম্যান্টিকদের একেবারে উপেক্ষা করেন না তা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। প্রেসিডেন্সী কলেজে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াতেন Golden Treasury-র চতুর্থ খণ্ড। ইতিহাসের ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ ইংরেজি পাস ক্লাসে তার কিছুটা স্বাদ পেয়েছিলেন, 'আর অমনোযোগী আমরা শ্রীকুমারবাবুর ব্যাখ্যা একটু আধটু শুনে নিজেরাই ডুবে যেতাম শেলী-কীটস-বায়রণ-ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিয়ে। ইতিমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তো মাথা কিছু পরিমাণে খেয়ে রেখেছিলেন 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য

কোনোখানে'—আলোচনা হয় রবীন্দ্রনাথের কোন্ দুটো বই সবচেয়ে ভালো? চিত্রা আর ক্ষণিকা? বি. এ. যখন সাঙ্গ হয়নি, বেরলো পূরবী—রবীন্দ্রনাথ আমাদের কম ভোগান নি তখন।' (তরী হতে তীর)

রবীন্দ্রনাথ কতটা ভুগিয়েছিলেন তার প্রমাণ তো ছড়িয়ে আছে 'তরী হতে তীর'-এর পাতায় পাতায়। তাই 'নির্দেশিকা'-য় রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে জানাতে হয়, 'সারা বইতে উল্লিখিত'। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর বক্তৃতা বা লেখা কোনোটিই যেন সম্পূর্ণ হয় না। 'আমার মনের গহনে সূর্যের মতো বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ'—কথাটা তিনি অকারণে বলেন নি। মনে রাখা দরকার হীরেন্দ্রনাথ সাহিত্যস্রষ্টা নন, সমালোচক কথাটিও বোধহয় তাঁর পছন্দ হবে না, তাঁকে সাহিত্যের রস-আস্বাদক বলাই ভালো। তাই তাঁর মুগ্ধতা যতটা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে বোধহয় তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে ততটা নয়। তাঁর ছাত্রজীবনে কল্লোল-কালিকলম-কেন্দ্রিক আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের তিনি দ্রষ্টা ঠিকই তবে খুব একটা অনুরক্ত নন। তাছাড়া পারিবারিক ঐতিহ্য তো ছিলই। আবার সাহিত্যে আধুনিকতার যে হাওয়া এসেছিল তাকে উপেক্ষা করবারও কোনো কারণ ঘটেনি। 'আমাদের বাড়িতে 'কল্লোল' বা 'কালিকলম' অথবা কিছু পরে 'শনিবারের চিঠি' ধরনের পত্রিকা সম্বন্ধে একটা যেন অনীহা ছিল, কিন্তু স্বল্পপরিচয় সত্ত্বেও 'কল্লোল' যে হাওয়া এনেছিল তার স্পর্শ মনে না লেগে পারেনি।' জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে সাহিত্য-বিতর্ক এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মতামতের সঙ্গেও তিনি নিজেকে পরিচিত রেখেছিলেন। আধুনিকতা-বিরোধী সমালোচকদের বক্তব্যে তাঁর সায় ছিল না, আবার তথাকথিত আধুনিকতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশে বিরত ছিলেন। বরং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে 'মনের পরিধি আর সাহিত্য রসাস্বাদের যে অভিজ্ঞান' স্থির করে দিলেন সেটাই তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে জীবনবোধের সত্যতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সাহিত্যে হাটের কল্যাণে হট্টগোল দেখা দিতেই পারে কিন্তু যে দেশে হাটই নেই সেখানে হট্টগোল কেন—রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের জবাব আধুনিকরা দেন নি, হীরেন্দ্রনাথও কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাননি। তখনো পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলনের দ্রষ্টা, কোনো শিবিরের লোক নন।

।। দুই ।।

বিদেশে পাড়ি দেবার পর থেকেই বোধহয় হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার অন্যতর পর্যায়ের সূচনা। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ এই পাঁচ বৎসর শুধু জাতীয়ই নয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিরও এক ঝোড়ো সময়। বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। লন্ডন শহরের যে কজন ভারতীয় ছাত্র তখন প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। লন্ডনে একত্রে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে যে আলোচনা করেছিল তারই পরিণতি হলো এই সংস্থা। তারা সবাই যে লেখক তা নয়। প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রথম থেকেই (আশাকরি আজও) লেখক আর পাঠকের সমান স্থান রয়েছে বললে হয়তো ভুল হবে না। সজ্জাদ জহীর, রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, মুলকরাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য এবং আরও

কয়েকজনের আলোচনার জের টেনে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার ১৯৩৫ সালে প্রকাশ করা হয়। এতে আমার স্বাক্ষরও আছে, যদিও ১৯৩৪ সালে আমি দেশে ফিরে আসি।' (প্রগতি লেখক আন্দোলন, 'অর্ধশতাব্দীর মন্থিত স্মৃতি')।

এই প্রগতি লেখক সংঘকে কেন্দ্র করেই হীরেন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করলেন। এতদিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্যের পাঠক ছিলেন, এবার হলেন সাহিত্য-আন্দোলনের সংগঠক। তখনও পর্যন্ত সমকালীন সাহিত্যিকদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় নেই। কিন্তু সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে জড়ো করার রাজনৈতিক দায়িত্ব তাঁর ওপরেই এসে পড়ল। হীরেন্দ্রনাথকে সামনে রেখে একটি বৃহত্তর ও ব্যাপক মঞ্চ তৈরি করা শুরু হয়ে গেল। এটা ছিল তাঁর পার্টি-নির্ধারিত কাজ। পরিচয়-এর আসরে তাঁর যাতায়াতের কারণ নিছক আড্ডা দেওয়া ছিল না, তাও ছিল রাজনৈতিক দায়িত্বেরই অঙ্গ। নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ঠিক গোষ্ঠীভুক্ত হতে তিনি পারেন নি। 'আড্ডাধারী হবার মত স্বভাবও ছিল না। আর তখন (এখনও ভিন্নভাবে) যা আমাকে মাতিয়ে রেখেছিল সেই কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হিসাবে লেখক-শিল্পীদের নিয়ে প্রগতি প্রয়াসে লিপ্ত ছিলাম বলে পরিচয়-এর মতো একটা পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ ছিল কর্তব্যেরই মধ্যে। (ভূমিকা, পরিচয়-এর আড্ডা, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ)।'

কর্তব্য তিনি কতটা পালন করেছিলেন তা শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের সাক্ষ্যেই পাওয়া যাবে। ১৯৩৫ থেকেই আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর পরিচয়-এর আড্ডায় যাতায়াত শুরু। ১৯৩৬-এর শেষদিকে হীরেন্দ্রনাথের তৎকালীন বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ। শ্যামলকৃষ্ণ জানিয়েছেন যে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আড্ডায় যে সমস্ত আক্রমণ হত তা এতকাল একা প্রতিহত করে এসেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। হীরেন্দ্রনাথের আগমনের পর থেকে তিনি যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাই কখনও তাঁকে আড্ডায় ফ্যাসিস্টবিরোধী ইস্তাহারের খসড়া পড়তে দেখা যায়, উদ্দেশ্য সভ্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ। কোনোদিন দুটি বামপন্থী পত্রিকা সুধীন্দ্রনাথের হাতে দিতে দেখা যায়, কোনোদিন বা শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষকে লেফট বুক ক্লাব-এর সদস্য করে নেন। এমনকি, বন্ধু সুধীন্দ্রনাথকে মৃদু অনুযোগ করতেও ছাড়েন না যে, তাঁর বিপুল গ্রন্থভাণ্ডারে সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বইও নেই। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী আড্ডায় প্রায় তাঁর নিত্য সঙ্গী। এই দুজন মিলে আড্ডা থেকে সরিয়ে নিয়ে হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন গোপন কোনো কাজের কথা সেরে নেন, তখন বোঝাই যায় যে, এটাও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গ, নিছক আড্ডা নয়।

বস্তুত শ্যামলকৃষ্ণের প্রায় দুশো চুয়াল্লিশ পাতার বিবরণীতে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কিত প্রায় কোনো বিতর্কেই হীরেন্দ্রনাথকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। কিন্তু এই আসরের মাধ্যমেই সাহিত্যজগতে তাঁর গভীরতর অনুপ্রবেশ। ১৯৩৫ থেকেই রিপন কলেজে বিষ্ণু দে তাঁর সহকর্মী, পরিচয়ের আড্ডায় যাতায়াতে সেই ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হয়। 'জীবনের প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই হীরেনবাবু ওঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন' প্রণতি দে-র এই মন্তব্য মূল্যবান (কোরক, হীরেন মুখার্জী সংখ্যা)। প্রধানত ব্যক্তিজীবন বা শিল্পসাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যার

ক্ষেত্রে এই ধরনের পরামর্শ জরুরি ছিল বলে মনে হয়। কারণ, পরবর্তী কালে দেখা গেছে যে, মার্কসবাদী শিবিরের সাহিত্য-বিতর্কে হীরেন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে একই জায়গায়। অবশ্য বিষ্ণু দে যতটা সরব, তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ততটা নন। হয়তো দলীয় শৃঙ্খলার প্রশ্ন ছিল। তবে তাঁর সাহিত্যভাবনার নতুন একটা চেহারা যে পরিচয় পর্বেই গড়ে উঠছিল আত্মজীবনীর ফাঁকে ফাঁকে তার দু-একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে। পরিচয়-এর আড্ডায় Left review-র মতো পত্রিকার গ্রাহক খুঁজেছেন ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি তাঁর এমন কথাও মনে হয়েছিল যে, বিদেশী লেখকদের 'রক্ত পতাকাবিলাসে উল্লসিত হয়ে কিছু ব্যক্তি এদেশে একটা বিজাতীয় ধারা প্রবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টায়' নেমেছে এমন অভিযোগ উঠতেও পারে, অভিযোগ উঠেও ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭-এই ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, 'ভাবনার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের শাস্ত্র মানা ধাত। এইরকম মানুষরা যখন আচার মানে তখন যেমন গুরুর মুখের দিকে চেয়ে মানে, যখন আচার ভাঙে তখনো গুরুর মুখের দিকে চেয়েই ভাঙে। রাশিয়া বা আর কোনো পশ্চিম দিগন্তে যদি গুরু নবীন বেশে দেখা দেয়, লাল টুপি পরে বা যে কোনো উগ্র সাজেই হোক তখন আমাদের দেশের ইস্কুল মাস্টাররা অভিভূত হয়ে পড়েন। (সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে)'

অসাধারণ সতর্কবাণী। রাশিয়া পরিভ্রমণের পরও কবির এই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, রাশিয়া-ভ্রমণ তাঁর 'এ জন্মের তীর্থদর্শন'—এই সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল ছিলেন, কিন্তু, সেখানকার মতাদর্শ দিয়ে সাহিত্যবিচার-পদ্ধতি সমর্থন করেননি, 'আমি যখন মস্কো গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতিদোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পঙ্‌ক্তি পেল না (সাহিত্য বিচার/সাহিত্যের স্বরূপ)। জীবনের একেবারে অন্তিমপর্বে (আষাঢ়, ১৩৪৮) মহাকবির এই স্মৃতিচারণ। তখনই বিভিন্ন সমালোচনায় তাঁর লেখার রঙ-নির্ধারণের সূচনা হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে তাঁর এই আশঙ্কা তিক্ত সত্য হয়ে উঠেছিল, 'জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তে আছে তাই ভয় হয় যে, এই আগাছাগুলিকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।' উপড়ে ফেলা যে একেবারেই যায়নি ১৯৪৮-৪৯-এর 'মার্কসবাদী' পত্রিকার ছটি সংকলনই তাঁর প্রমাণ। অবশ্য বাদ-বিসম্বাদ কেবল ওই সংকলন কটিতেই সীমিত ছিল না, এর শাখা-প্রশাখাও ছিল অনেক।

হীরেন্দ্রনাথ এই রাবীন্দ্রিক-দৃষ্টিতে ব্যাপারটিকে দেখেননি। বাংলায় প্রগতি সাহিত্যের সূচনা এবং সাহিত্যে বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রয়োগকে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর মনে হয়েছিল 'হিমালয়ের উচ্চতাও যখন যুগের হাওয়াকে বাধা দিতে পারে না, তখন এদেশেও যে সমসাময়িক জীবনসমস্যার স্পর্শ লাগবে তা তো স্বাভাবিক।' কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণের এক বৎসর পর (১৯৩৭) সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে 'প্রগতি' সংকলনটি বের করবার সময়ও হয়তো তাঁর একই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত এই সংকলনে ক্ষণিকা, চিত্রা বা পূরবী থেকে নয়, 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর অনশন, পুনা অ্যাক্ট এবং গান্ধীজীর গ্রেপ্তার—এই কবিতাটির প্রাথমিক উপলক্ষ। কিন্তু মনুষ্যত্বের সামগ্রিক নিপীড়নে কবির ক্ষোভ এবং

বেদনা কবিতাটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বলেই এর আবেদন ছিল চিরন্তন। তাই 'প্রগতি'-র মুখবন্ধে এটির অবস্থান স্বাভাবিক ছিল। মূল 'প্রগতি'র ভূমিকা লিখেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় (২৯.১.৯১) হীরেন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন, 'বহুজন সমাবেশের শক্তিতে 'সংগঠন' 'আন্দোলন' 'সংগ্রাম' ইত্যাকার ব্যাপার সচরাচর অন্তত সহজ সামাজিক পরিস্থিতিতে সাহিত্যিক-শিল্পীদের কাছে যে অস্বস্তিকর তাতে সন্দেহ নেই।' তখন তো সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো পরিস্থিতিই সহজ ছিল না। 'তখন ফ্যাসিস্ট পৈশাচিকতার হুঙ্কারকে পরাভূত করতে শিল্পসাহিত্য-জ্ঞানবিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সর্বজনের সংহত সঙ্কল্প ঘোষণার কাজ ছিল প্রগতি লেখক সংঘের। সেজন্যই বহুকাল আগে কার্ল মার্কস যে কথা বলেছিলেন, The party in the grand historical sense of the term (বিরাট ঐতিহাসিক অর্থে সংগঠিত পার্টি) সেই কথাই যেন অনুরণিত করেছিল।'

একটি বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে 'প্রগতি'-র সৃষ্টি এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও সত্যি যে লেখাগুলোর সবই উঁচু মানের নয়, বিষয়বস্তুও কিছুটা এলোমেলো। মনে হয় বিভিন্ন শিবিরের লেখককে সংঘবদ্ধ করাটাই ছিল মূল লক্ষ্য, তাদের লেখার মান বিচারের আগ্রহ সম্পাদকদের ছিল না, সেটা তাদের উদ্দেশ্যও নয়। 'প্রগতি'র ভূমিকায় প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ছিল, 'জল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি কবির এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সবসময় সুসাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতি সাহিত্য রচনা করিব এ উদ্দেশ্য এ সঙ্ঘের নাই।' সভাপতির বক্তব্য যাই হোক না কেন এই সংঘের অন্তত কারো কারো দল বেঁধে সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা তো ছিলই। ১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ-এ প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে শরৎচন্দ্রের কাছে বাণী নিতে যাওয়ার সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই 'দল বাঁধা' নিয়ে কিছুটা হাসিঠাট্টাও করেছিলেন, 'একটা 'বাণী' অবশ্য দিলেন, কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দে নয়, কারণ ব্যাপারটা ঠিক মনঃপুত ছিল না।' দল বেঁধে সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামতের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু এই সংকলনের উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। অন্যতর সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে লেখা চিঠিতে এই সমর্থন অত্যন্ত স্পষ্ট, 'বন্ধনমুক্তিকামী চিন্তার ও ভাবের, ধর্মনীতির ও কর্মনীতির ঝড়ো হাওয়া আজ সমস্ত জগতকে বেষ্টন করে ছুটেছে এর ধাক্কা থেকে আমাদের মনও নিষ্কৃতি পায় না। তোমার প্রগতি বইখানিতে তুমি তারই পরিচয় একত্র সংগ্রহ করেছ। বিশ্বব্যাপী মানুষ এইযুগে তার জীর্ণ খোলসখানা ত্যাগ করতে উদ্যত। এর ভালোমন্দ পদ্ধতি এবং পরিণাম বিচার করবার সময় এখনো হয়নি—নির্দয় দ্বন্দ্ব এবং বিকৃতির মধ্য দিয়েও নতুন যুগ আবিষ্কারের সূচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। (৬.১০.৩৭)' বিশ্বজোড়া ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে তখন রবীন্দ্রনাথও অন্যতম পুরোধা। তাই প্রগতির মতাদর্শের প্রতি তাঁর প্রবলতর সমর্থন। এই সমর্থনে অবশ্যই হীরেন্দ্রনাথরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। যুগ ও কাল তাঁদের পক্ষেই ছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম সংস্করণের ভূমিকা যখন তিনি লেখেন তখন এই উৎসাহ হীরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার কাজ করে। তখন সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আদর্শগত মাপকাঠি প্রয়োগে তাঁর দ্বিধা নেই। আধুনিক বাংলা কবিতার সমর্থনে তিনি নামেন, কিন্তু তাঁর সমর্থন

সেই অংশের প্রতি যার মধ্যে 'যুগাবর্তের উৎকণ্ঠিত লক্ষণ এবং কাব্যসিদ্ধির সম্ভাবনা' আছে। রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে 'রবীন্দ্রপ্রবাহ থেকে অল্পবিস্তর যাঁরা যুক্ত হয়েছেন বা হতে চেষ্টা করেছেন, তাদেরই লেখা নিয়ে এই সংকলন। সহযোগী সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেই তাঁর সাহিত্যভাবনা থেকে তিনি আলাদা হয়ে যান, কিন্তু সুনিশ্চিত কোনো মতবাদের প্রয়োগও তিনি কাব্যবিচারে ঘটান না। এই ভূমিকাটি আসলে তাঁর নিজের মনের কথা, কোনো দুরূহ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়। War poet উইলফ্রেড ওয়েনের এই দুটি পংক্তিই যেন তাঁর কাছে যুগধর্মের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়—

All the poet can do today is to warn
That is why the true poet must he truthful.

যে সত্যের কথা তিনি এখানে বলেন তা রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সাধারণ সত্য' মাত্র, 'সার্থক সত্য' নয়। আবার বাছবিচার বিহীন সাধারণ সত্যের নিরঙ্কুশ প্রকাশকেও তিনি সবসময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। যুগধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে এলিঅটের ক্যাথলিক চার্চে আত্মসমর্পণে তাঁর সমর্থন নেই। বন্ধু সুধীন্দ্রনাথের কতিায় প্রলয়ের কোলাহল ছাপিয়ে নতুন যুগের নবসৃষ্টির পদধ্বনির বদলে হতাশার এই বাণী শ্রবণে তিনি ব্যথিত— 'মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব, সখা/বেদনা শুধুই বেদনা সূচির সাথী।' আধুনিক কবিতাকে সমর্থন করলেও তার দুরূহতার কারণ নির্দেশ করেন', আধুনিক মনের অপ্রকৃতিস্থ জটিলতা।'

আবার কাব্য সমালোচনায় তাঁর নিরপেক্ষতাও এই ভূমিকায় বেরিয়ে আসে। বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রবলতম অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বলতে হয়, 'আত্মসমাহিত ক্লান্ত মন বিচলিত বলে তাঁর কবিতা যেন জীবনকে খণ্ড, ক্ষুদ্র করে দেখছে, তাঁর ব্যাজোক্তি পর্যন্ত যেন তিক্ততাকেও মোহনীয় করতে চায়, সমাজব্যাধি নির্মূল করা সম্বন্ধে মনস্থির করেন নি। এলিয়ট পাউন্ডের তিনি ভক্ত, কিন্তু তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে পাণ্ডিত্য কবিতাকে গুরুত্ব দেয়, মহত্ত্ব দিতে পারে কিনা সন্দেহ।' সাম্যবাদী কবিদের বিরুদ্ধে আইয়ুবের কটাক্ষের প্রবল বিরোধিতায় তিনি নামেন বটে, কিন্তু তাঁদের সবসময় সমর্থনও করতে পারেন না। তাঁদের কাছে তাঁর প্রত্যাশা যেন অনেক বেশি। 'সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার নানা গুণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় তাঁদের কাব্যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।' আবার 'মার্কসপন্থা যে কাব্যরাজ্যেরও পাসপোর্ট' এই আপ্তবাক্যও তিনি মেনে নিতে পারেন না। তবে তাঁর মতে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের যে আর আশা নেই— তা কবিরা যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই মঙ্গল। তবে শেষ পর্যন্ত কবির কাছে তাঁর চূড়ান্ত আহ্বান, 'আর্টকে ব্যবহার করতে অস্ত্ররূপে, যে অস্ত্র হবে সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রের নির্বিশেষ আভরণে দীপ্ত।' এ হচ্ছে সেই হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য যিনি প্রায় আশি বৎসর বয়সেও অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারেন, 'কম্যুনিস্ট মতবাদ—না বলব জীবনদর্শন, বিশ্ববীক্ষা? গ্রহণ ব্যাপারে আমার মনে কোথাও খাদ থাকে নি। স্বীকার না করে পারি না যে, কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের যুগ থেকে অল্পাধিক আজ পর্যন্ত পার্টিশৃঙ্খলার সর্বব্যাপিতা মাঝে মাঝে একটু যেন আতঙ্কিত করেছে।' আবার এই শৃঙ্খলা যে মাঝে মাঝে সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ভুলেরও জন্ম দেয় তাও তাঁর

জানা। সেক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সান্ত্বনা, 'কম্যুনিস্টরা কখনো বলে না তারা নিয়ত নির্ভুল পথে চলতে থাকে, আত্মসমালোচনা তাদের সতত কর্তব্য।'

এই উদার মানসিকতাই তাঁর সাহিত্যভাবনাকে স্বচ্ছ এবং গতিশীল রেখেছে। এক পরিশীলিত রুচিবোধের দ্বারাই তিনি সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তাই মোহিতলাল বা বনফুল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনকে স্বাগত না জানালেও তাঁরা যে 'কৃতবিদ্য লেখক' এ স্বীকৃতিতে তাঁর দ্বিধা নেই। প্রগতি শিবিরে কাউকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারার জন্য নিজের অক্ষমতাকেই দায়ী করেছেন। তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর চিরকালেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রগতিশিবিরে সমালোচিত তারাশঙ্করেরও তাঁর প্রতি প্রবল আস্থা। দিল্লীতে তাঁকে স্বপ্ন দেখে আবেগে চিঠি লেখেন আর হীরেন্দ্রনাথ তাতে মুগ্ধ হন। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা আমাদের জানা, আবার জীবনানন্দের 'মায়াবী কবিতা' সম্পর্কে তাঁর অস্বস্তির কথা জানাতে তিনি কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেন, বোধহয় সঠিক মূল্যায়ন করা হল না। অমিয় চক্রবর্তী বা প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কেও তাঁর প্রত্যাশাভঙ্গের কথা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন আমাদের বিস্মিত করে। বিভূতিভূষণের সঙ্গে প্রগতিশিবিরের দূরত্বের দায়টি তিনি নিজেদের ওপরই চাপান, 'একটা হয় তো তার কারণ সহজ সাধারণ বাঙালী মনের আবেগাতিশয্য তাঁর লেখায় লক্ষ্য করে একটা অস্বস্তি আমাদের অনেককে অন্ধ করে রেখেছিল বিভূতিবাবুর পর্যবেক্ষণ আর অনুভূতির ঐশ্বর্যের দিকে।' সমকালীন সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-কেই তাঁর মনে হয়েছিল সমাজবোধ ও শিল্পায়নের অদ্বৈত সার্থকতায় তিনি শ্রেষ্ঠ। এই মতে যদি আমাদের সায়ও থাকে সমকালীন মার্কসবাদী শিবির তা কখনো মেনে নিত না।

এইসব নিয়েই হীরেনবাবুর সাহিত্যভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা ঘরানার হয়ে যায়। তাঁকে নিছক মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক না বলে একজন সম্পূর্ণ ভারতীয় সমালোচক বলা চলে। তার একদিকে রয়েছে ভারতের ইতিহাস, দর্শন ও ক্লাসিকাল সাহিত্যের ঐতিহ্য, অপরদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মার্কসবাদ এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে তাঁদের তুলনায় গোপাল হালদারেরই যে ভূমিকা ছিল তা স্বীকারেও তাঁর দ্বিধা নেই। কমিউনিস্ট বিরোধীদের কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে তিনি নিজের গুণ বলে মেনে নিতে চাননি, 'কারণ খুব সম্ভব এটা গুণ নয়, এটা একধরনের দুর্বলতা আর দোষ।' এটা দুর্বলতা বা দোষ কোনটিই নয়, এটা প্রকৃত কমিউনিস্টের আকর্ষণী ক্ষমতা। সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রেও হীরেন্দ্রনাথ তাই সমস্ত শিবিরের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেন, কোনো মতবাদকেই সম্পূর্ণ বর্জনীয় বলে তাঁর মনে হয় না। প্রথম বিদেশযাত্রার সময় স্বদেশভূমি ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্তে হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, 'আমার দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলেই বুঝি ভালো ছিল।' মনের দিক থেকে তিনি চিরকালই দেশের মাটিকেই আঁকড়ে থেকেছেন, সাহিত্যভাবনাও তাই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিদেশ-নির্ভর থাকে না।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ-সাহিত্য

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির অনুবাদের ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, অনুবাদের ভাষা নিয়ে বেশি আশা না করাই সঙ্গত, তিনি তো মায়ের কোলে বসে ইংরেজি শেখেন নি।

আমরাও মায়ের কোলে ইংরেজি শিখি নি। আমাদের পক্ষে হীরেনবাবুর অনুবাদের সাহিত্যমূল্য বিচার করা কঠিন, সেটা করতে পারবেন সেইসব ব্যক্তিরা যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজি এবং সাহিত্যবোধ আছে। এই আলোচনায়, আমরা হীরেনবাবুর অনুবাদ-সাহিত্যের প্রেক্ষাপটটাই শুধু স্মরণ করব। তার সঙ্গে অনুবাদের তথ্যভিত্তিক প্রসঙ্গেও মধ্যে মধ্যে যাব।

তথ্যের প্রসঙ্গ আসায়, একটা কথা গোড়াতেই সেরে নেওয়া ভালো। হীরেনবাবুর জন্মদিন ২৩ নভেম্বর ২০০২-এ প্রকাশিত 'শঙ্কা সংকট প্রত্যয়' নামে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে, তার জীবনীপঞ্জি অনুসরণ করলে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

যে অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসঙ্গ এই রচনায় আসবে, তার তালিকা

ক. Your Tagore for Today। রবীন্দ্ররচনার নির্বাচিত অংশের অনুবাদ। সম্পাদক, হিরণকুমার সান্যাল। অনুবাদক, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেপ্টেম্বর ১৯৪৫।

খ. Epoch's End। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ (জুন ১৯৪৫)-এর অনুবাদ। অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশের সময় অনুবাদ-গ্রন্থে নির্দিষ্ট হয় নি। জীবনীপঞ্জিতে বলা হয়েছে, অনুবাদক 'মন্বন্তর' অনুবাদ করেন ১৯৪৪ সালে।

গ. Boatman of the Padma। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র অনুবাদ। অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ মে ১৯৪৮। জীবনীপঞ্জিতে জানানো হয়েছে, অনুবাদক অনুবাদ করেন ১৯৪৫ সালে Boatman of Padma।

ঘ. One Hundred and One। রবীন্দ্র-কবিতার নির্বাচিত সংকলনের অনুবাদে, আটটি কবিতার অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, দুই পাখি, ব্রাহ্মণ, দুঃসময়, দেবতার গ্রাস, কৃতজ্ঞ, প্রশ্ন এবং ওরা কাজ করে। অনুবাদ-গ্রন্থটির সম্পাদক হুমায়ুন কবির। অন্য অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন অমলেন্দু বোস, জে সি ঘোষ, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বোস, হুমায়ুন কবির, অমিয় চক্রবর্তী, সোমনাথ মৈত্র, সমর সেন, ভবানী ভট্টাচার্য, ভি এস শরবানে, ক্ষিতীশ রায়, লীলা রায়, মণিকা ভার্মা, আবু সয়ীদ আয়ুব, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, তারক সেন এবং শিশির কে ঘোষ। প্রকাশ ১৯৬৬। জীবনীপঞ্জিতে বলা হয়েছে হীরেন মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেন ১৯৬১ সালে।

One Hundred and One অনুবাদগ্রন্থের অনুবাদকদের নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে, সংকলনের সময়ে ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্য অধ্যাপক ও কবিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত অনুবাদ নিয়ে যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদের পরে, আমাদের আগ্রহ থেকেই যায়, সম্পূর্ণতর এবং উন্নততর অনুবাদের চেহারাটা কী দাঁড়ায়। কবীর সাহেব এমন অনেক কবিতাও নিয়েছিলেন যার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ওই কবিতাগুলোর আবার অনুবাদের যাথার্থ্যও আমরা বিচার করতে পারি। এই রচনা যেহেতু হীরেনবাবুর অনুবাদে আবদ্ধ, আমরা হীরেনবাবুর আটটি কবিতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

'প্রশ্ন' কবিতাটি নিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এটি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আছে ম্যাকমিলানের Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore গ্রন্থে।

This Evil Day

Age after age, hast Thou, O Lord, sent thy messengers into this pitiless world, who have left their word : 'forgive all. Love all. Cleanse your hearts from the blood-red strains of hatred.'

Adovable are they, ever to be remembered; yet from the outer door have I turned them today—this evil day—with unmeaning solutation.

Have I not seen secret malignance strike down the helpless under the cover of hypocritical night?

Have I not heard the silenced voice of Justice weeping in solitude at might's defiant outrages?

Have I not seen in what agony reckless youth, running mad, has vainly shattered its life against insensitive rocks?

Choked is my voice, mute are my songs to-day and darkly my world lies imprisoned in a dismal dream; and I ask thee, O Lord, in tears : 'Hast thou Thyself forgiven, hast even Thou loved those who are poisoning thy air, and blotting out thy light?'

হীরেনবাবু কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন দুবার, একবার Your Tagore for Today-এর জন্য, আর একবার One Hundred and One-এর জন্য। প্রথমবার

A Question

God, time and again, you have sent your
  Evangels to this heartless world;
They exhorted us to pardon all, to love all,
  to pluck all poisonous roots of hatred
  out of our hearts;
Adovable they are, memorable they are,
  yet in these dark days, I turned
  them back from my door-step,
  with empty salutations.
Have I not myself seen how secret

violence strikes all helpless
innocence, under the deceitful cover of night;
Have I not seen the voice of Justice choke,
in lonely silence, at the aggression of the strong
that goes unchecked;
Have I not seen young enthusiasts, in a mad rush,
counting painful death, with futile knocks
against walls of stone!
My throat is strangled, my flute is dumb,
my world is cribbed and lost in a
nightmare of pitch-black darkness.
So I ask you, with tears, this urgent question,
Those that are poisoning your air, and
blotting out your light,
Can you forgive them, can you give them your love?

দুটো অনুবাদের নিম্নরেখ শব্দগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় হীরেনবাবুর পছন্দ ভারী শব্দে, এবং এটা বলা যাবে না তাঁর অনুবাদে মূল কবিতা বিদেশি পাঠকের কাছে বেশি গ্রাহ্য হবে। একমাত্র deceitful cover of night (Cover of hypocritical night) ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ পরিবর্তন করার প্রয়োজন ছিল না।

বছর কুড়ি পরে হীরেনবাবু 'প্রশ্ন' কবিতাটি আবার অনুবাদ করলেন। এবার

Question

From age to age, O God, you have sent your apostles to this pitiless world And they preached their gospel 'Forgive all trespasses, love all, and banish hate from all hearts.' They claim our homage, time will not forget them, and, yet, my regard unavailing, I must turn them back.

Have I not seen stealthy malice, in the night's deceitful shadow, hust death at the helpless? Have I not seen Justice mourn, worldless and desolate, when the strong flaunt their unchecked crimes? Have I not seen youth, in agony, rush madly to break their head against the baffling cruelty of stone?

Today I am throttled, my flute has lost its music. Amavasya's gloom has smothered my world in a nightmare. And so, in tears, I ask; 'Have you forgiven them who poison your air and blot out your light? Have you blessed them with your love?' [Amavasya the moon's darkest phase]

দূত শব্দটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন messenger—তাতে কোনও ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছিল না। হীরেনবাবুর Evangel, apostles, gospel-এ ধর্মীয়, বিশেষ করে খৃস্টীয় ধর্মের, ব্যঞ্জনা কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। forgive all trespasses—এই নতুন ভাবের আবহও মূলে ছিল না। পরবর্তী অংশে হীরেনবাবু ভারী শব্দের আওতা থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসেছেন। তবে, মনে হয় না, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের পর এই কবিতাটির নতুন অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। বাংলা কবিতার ছন্দ আর ইংরেজি কবিতার ছন্দে কোনওই মিল

নেই, অনুবাদে এক ছন্দ অন্য ছন্দে আনাও যায় না। তবু, মূল কবিতার ছন্দের ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে আর হীরেনবাবুর প্রথম অনুবাদে কিছুটা ছিল; হীরেনবাবুর দ্বিতীয় অনুবাদে সেটা অন্তর্হিত। হীরেনবাবুর দ্বিতীয় অনুবাদে স্বাভাবিক ইংরেজি অনেকটা বজায় থেকেছে।

হুমায়ুন কবির তাঁর সংকলনের অনুবাদে বলেছিলেন, তাঁর অনুবাদকদের অনুবাদে দুটি ধরন ছিল—একটি আক্ষরিক, আর একটি মূলকে অবলম্বন করে নতুন সৃষ্টি। সম্পাদক সাধ্যমতো দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে চেয়েছেন। হীরেনবাবুর অনুবাদ, প্রথম ধরনের, আক্ষরিক। তাঁর সব কটি অনুবাদেই তিনি মূলানুগ থেকেছেন, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে। তবে, দু-একটি সংযোজন বা স্খলনের কথা বলতেই হয়।

'ব্রাহ্মণ' কবিতার অনুবাদে

আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে;

To the silent ashram returned the children of the sages, on their heads small loads of sacrificial log collected in nearby woods. Called back from daylong pasture, the ashram cattle browsed calmly, tired, yet their eyes tranquil with content.

নিম্নরেখ শব্দগুলো হীরেনবাবুর সংযোজন। এতে অর্থের কোনও বিকৃতি না হলেও, প্রয়োজনও ছিল না। ঋষিপুত্রদের মাথায় হীরেনবাবু ভারী কাঠ চাপাতে চান নি, বেশি খাটানোরও তিনি পক্ষপাতী নন, তাই ঋষিপুত্রদের কাছাকাছি জঙ্গল থেকে কাঠ আনার কথা বলেছেন হয়তো। গোরুরা সারাদিনই মাঠে থাকার কথা এবং ফিরে এসে শান্ত হয়ে ঘাস চিবোনোরই কথা—তবু এসব মূলে ছিল না।

যেখানে অবশ্য হীরেনবাবু অন্যায় করেছেন, সেটা 'ক্ষীণ-স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী'কে the thin, opaque and restful Saraswati করা। স্বচ্ছতাকে opaque কেন করবেন, যেখানে কবিতাটির মর্মবস্তুই স্বচ্ছতা?

রবীন্দ্ররচনার যে সংকলন হিরণকুমার সান্যাল করেছিলেন আর হীরেনবাবু ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, সেই সংকলন প্রকাশের সময়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষ থেকে চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক ছিল। সাহিত্য-শিল্পে রাজনৈতিক দলের আওতা থাকবে কি থাকবে না, সাহিত্য-শিল্পের নিজস্ব নীতি থাকতে পারে কি পারে না, শ্রেণীসত্তা সাহিত্য-শিল্পকে প্রভাবিত করে কি করে না, এই তর্কে সব তাত্ত্বিকেরা যে নিজেরাই স্পষ্ট ছিলেন, তা নয়, নিজেরাই মত পালটাচ্ছেন, দল পালটাচ্ছেন, সব দল থেকে সরে আসছেন—

এমনই ছিল সময়টা। 'অগ্রণী', 'অরণি', 'পরিচয়' সব পত্রিকাই তখন নিজ নিজ সময়ে বামপন্থী, কিন্তু এক পত্রিকার মত অন্য পত্রিকার সঙ্গে মেলে না, পারস্পরিক বিরোধও প্রচ্ছন্ন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তো বটেই, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথও প্রতিক্রিয়াশীল লেখক বলে অভিযুক্ত হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথও লক্ষ করেছিলেন এই তর্কের সূচনা এবং বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, বুর্জোয়া নামে অভিযুক্ত হয়ে।

এই তর্ক-বিতর্কের মধ্যে, যেটা চরমে উঠবে ১৯৪৮-৫০ 'মার্কসবাদী' সংকলনের মধ্যে, হিরণকুমার সান্যাল এবং হীরেনবাবু যে Your Tagore for Today সংকলনটা প্রকাশ করলেন, তার থেকে আভাস পাওয়া যায়, ওই তর্কে তাঁদের অবস্থান কোথায় ছিল। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে অগ্রাহ্য করেন নি। ১৯৬৫ সালে হুমায়ুন কবির যখন One Hundred and One প্রকাশ করেন, তখন অনুবাদকদের জন্য মার্কামারা কমিউনিস্ট হীরেনবাবুকে আমন্ত্রণ জানানো বিস্ময়কর নয়, কেননা তখন রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলে ত্যাগ করার ঝাঁঝ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে হিরণকুমার এবং হীরেনবাবু তাঁদের মত স্পষ্ট করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

ওই একই সময়ে হীরেনবাবু অনুবাদ করেছেন তারাশঙ্কর এবং মানিকের উপন্যাস। মানিকের উপন্যাস নিয়ে কোনও সংশয়ে পড়তে হয় নি হীরেনবাবুকে, কিন্তু তারাশঙ্করকে অনুবাদ করা তাৎপর্যপূর্ণ।

তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসের অনুবাদের ভূমিকায় হীরেনবাবু লিখেছেন, It is, thus, in the fitness of things that Tarasankar is a leader of the Progressive Writer's movement in India। ঠিক কোন্ সময়ে অনুবাদটি বের হয়, গ্রন্থটিতে তা বলা না হলেও, জুন ১৯৪৫-এর পরে, কারণ 'মন্বন্তর'-এর জুন ১৯৪৫-এর সংস্করণের অনুবাদ তিনি করেন। ওই সময়ে তারাশঙ্কর প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে আছেন কিনা সন্দেহ।

সন্দেহের কারণ তারাশঙ্কর নিজেই। 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ তিনি যা বলেছেন বামপন্থী সাহিত্যিক-সমালোচকদের সম্পর্কে, তাতে স্বচ্ছতা নেই। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বেরিয়েছিল ১৯৪৬-এ আনন্দবাজারের পূজা সংখ্যায়। উপন্যাসটি বের হলে বামপন্থীরা 'আকাশস্পর্শী' প্রশংসা করেন। এঁদেরই কেউ নিশ্চয় চেকোস্লোভাকিয়ায় গ্রন্থটি পাঠিয়েছিলেন চেক ভাষায় অনুবাদের জন্য, চেক প্রকাশকও তারাশঙ্করের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে কিনা, তাহলে চেক অনুবাদে সাহায্য হতো। কিন্তু, এর পর আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। কারণ, তারাশঙ্কর জানিয়েছেন, সহজবোধ্য—বামপন্থী পত্রিকায় 'হাঁসুলী বাকেঁর' তুমুল নিন্দামন্দ বেরিয়েছে। যে বামপন্থীরা একসময়ে প্রশংসা করতেন, এখন তাঁরাই নিন্দা করছেন।

এর আগেই তারাশঙ্করের মোহভঙ্গ হয়েছে। ১৯৪৫-এ গঙ্গাধর অধিকারীর পাকিস্তানের সমর্থনে পুস্তিকা পড়ে তিনি ক্ষুব্ধ। অন্যান্য কারণের সঙ্গে, যেগুলো তিনি নির্দিষ্ট করেন নি, এই পুস্তিকাও তাঁকে ১৯৪৫-এ মহম্মদ আলি পার্কে ফ্যাসি-বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনের প্রথম দিন যেতে নিরুৎসুক করেছিল। পরের দিন বা তৃতীয় দিনে

তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হলেও সভাতেই তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটল হীরেনবাবু এবং সুধী প্রধানের সঙ্গে। তারাশঙ্কর অবশ্য বলছেন, তখনও তিনি বামপন্থীদের সংস্রব ছিন্ন করেন নি, তাঁরাও 'ছাড়েন নি বা ছাড়তে চান নি'। এর পরে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৫১ সালেও যখন তিনি রাশিয়া থেকে নিমন্ত্রণ পেলেন, তখন তিনি বুঝলেন বামপন্থীরা তাঁকে ছাড়েন নি, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন, কেননা কোনও দলের সুপারিশে তিনি কোথাও যাবেন না।

'মন্বন্তর' অনুবাদের জন্য নির্বাচন করলেও, হীরেনবাবু উপন্যাসটিকে তেমন সার্থক মনে করেন নি। তারাশঙ্করকে তিনি সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে 'সম্ভবত' শ্রেষ্ঠ মনে করলেও, তারাশঙ্করের আঙ্গিকের ঘাটতি তাঁর চোখ এড়ায় নি। কিন্তু সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে তারাশঙ্করের দৃষ্টির প্রসার এবং সহৃদয় উদ্ভাসন, তাঁর দেশপ্রেম, হীরেনবাবুর তারিফযোগ্য মনে হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশসেবা করে তারাশঙ্কর দুবার জেল খেটে এসেছেন, সমাজসংগ্রাম তিনি কোনও Ivory Tower থেকে দেখেন না। গ্রাম ছেড়ে তারাশঙ্কর এই প্রথম জাগরিক পরিবেশে উপন্যাস লিখলেন। উপন্যাসটি লেখার ধরন থেকে, হীরেনবাবুর মনে হয়েছে, তারাশঙ্কর নাটক লিখবেন মনে করেছিলেন। ঘটনার দ্রুত চাল, অস্বাভাবিক সব ঘটনা—বিমান আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নাগরিক জীবনে বিপর্যয়, পুরনো সমাজব্যবস্থায় ভাঙন এবং নতুন জীবনের ইশারা, হয়তো সিনেমা-সিনেমা মনে হবে পাঠকের।

ষাট বছরের ব্যবধানে আজ 'মন্বন্তর' অত্যন্ত কাঁচা মনে হলেও, সেই সময় 'মন্বন্তর' তুমুল তর্কের সৃষ্টি করেছিল। বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী উভয় পথ থেকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছিল, 'বিজয়বাবু' চরিত্রটি নিয়ে—যে বিজয়বাবু গান্ধীবাদী-কমিউনিস্ট। চরিত্রটির আদ্যন্ত কৃত্রিমতা নিয়ে নয়, একজন কমিউনিস্ট গান্ধীভক্ত হন কী করে এই ছিল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। পরে তারাশঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি জানতেন ১৯৫৩-এর আগে পর্যন্ত রাশিয়ার বিশ্বকোষে লেখা হয়ে আসছিল, গান্ধী একজন প্রতিক্রিয়াশীল নেতা, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অন্তরায় বিশেষ। একজন কমিউনিস্ট গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করতেই পারে না। তবে, তাঁর কমিউনিস্ট আদর্শগত ভাবে কমিউনিস্ট, মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনে সংগ্রামী। তাঁর কমিউনিস্ট কোনও পার্টির অনুগামী কমরেড নন। তাঁর কাছে বিজয়বাবু বাস্তব চরিত্র, বানানো কোনও ব্যক্তি নন।

'মন্বন্তর'-এর ভাষা নিয়ে হীরেনবাবুকে কোনও সমস্যায় পড়তে হয় নি। গ্রামীণ পরিবেশে তারাশঙ্কর আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন, কলকাতার ভদ্রলোকের কাহিনীতে সেই সমস্যা নেই। তারাশঙ্করের ভাষাও সাদামাটা, অলঙ্কার-বর্জিত, বাস্তবিক পক্ষে মার্জিত কানে কিছু অস্বস্তিকর ঠেকে তাঁর চেষ্টাকৃত সাহিত্যিকতায়। তবে অনুবাদের পক্ষে অত্যন্ত সরল-সহজ। হীরেনবাবুও নিষ্ঠার সঙ্গে মূলের কাছে অনুগত থেকেছেন এবং ইংরেজিতে কোনও আড়ষ্টতা না দেখিয়ে। দুর্গানাম জপ করো—Take the name of Goddes Durga জাতীয় বাক্য খুব কমই আছে অনুবাদে।

'মন্বন্তর' অনুবাদ করার সময় হীরেনবাবু জানিয়েছেন, সমসময়ে প্রকাশিত 'পঞ্চগ্রাম'

উপন্যাস হিসেবে সার্থক, এবং সেটারও অনুবাদ করার আয়োজন হচ্ছে। তিনি নিজেই করবেন কিনা, জানান নি, তবে তিনি করেন নি। পঞ্চগ্রামও গান্ধীবাদী উপন্যাস। যে গান্ধী তখন পর্যন্ত কমিউনিস্টদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল, সেই গান্ধীকে আদর্শ করা উপন্যাসের অনুবাদের দায়িত্ব হীরেনবাবু নিয়েছেন, এতে পার্টি লাইনের বাইরে তাঁর স্বাধীন বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও হীরেনবাবু এই স্বাধীন সত্তার পরিচয় দেবেন জওহরলাল নেহরু বিষয়ক রচনায়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তাঁর পার্টি-লাইনের বাইরে আলাপ-আলোচনায়।

ব্যক্তিগত চারিত্র্যে হীরেনবাবু উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং আবেগতাড়িত। তাঁর ভাষায়, ইংরেজিতে ও বাংলাতেও, সেটার স্পষ্ট প্রকাশ। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' অনুবাদে হীরেনবাবুর সমস্যা হওয়ার কথা নয়, তারাশঙ্করও উচ্ছ্বাসপ্রবণ। কিন্তু 'মন্বন্তর' অনুবাদের পরেই হীরেনবাবু হাত দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে। ভাষা ও আবেগে মানিক তারাশঙ্করের বিপরীতধর্মী। তারাশঙ্করের ভাষা যদি হয় শিথিল, শ্লথ, ভঙ্গুর, মানিকের ভাষা সংহত, ঋজু, স্বল্পবাক। মানিকের ভাষার অনুবাদে কিন্তু হীরেনবাবু নিজেকে যথেষ্ট সংহত রেখেছেন, যে কথা এক শব্দে বলা যায় তার জন্য দুটো শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি, আর করলেও মাত্রা হারাননি। 'পদ্মানদীর' মূল সমস্যা হচ্ছে জেলেদের ভাষা। মার্জিত বাংলা গদ্যের মধ্যে জেলেদের ভাষার হ্রস্ব গ্রাম্য ভাষার সহাবস্থানে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটির আবহাওয়া। কিন্তু জেলেদের গ্রাম্য ভাষার অনুবাদে গ্রাম্য ইংরেজি আনার কোনও চেষ্টা না করে হীরেনবাবু কবুল করেছেন তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, কারোর পক্ষেই সম্ভব কিনা তাঁর সন্দেহ আছে। মার্জিত বাংলা আর গ্রাম্য কথোপকথনের ভাষার দ্বৈরথে 'পদ্মানদীর মাঝি'র যে আবেদন, সেটা অনুবাদে অদৃশ্য হতে বাধ্য। হীরেনবাবুর সেই চল্লিশের দশকে করা অনুবাদটি ১৯৭৭ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট পুনঃপ্রকাশ করে। 'পদ্মানদীর মাঝি'-র অসংখ্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, হীরেনবাবুর অনুবাদ সেই অনুবাদগুলোর সাহায্যে এসেছে নিশ্চয়ই, যেমন চীনা ভাষায় অনুবাদে হীরেনবাবুর অনুবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।..

দলিত-সমস্যা ও হীরেন্দ্রনাথের ভাবনা

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

কাহিনীটি এইরকম।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে মহারাষ্ট্রের সাতারায় এক দরিদ্র পরিবারের মাতৃহীন সন্তান তার নিজের এবং পিতার আগ্রহে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় শিক্ষালাভের আশায়। বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হতে পারলেও অন্য ছাত্রদের সঙ্গে বেঞ্চে বসতে পায় না। তাদের কাছ থেকে দূরে, ঘরের শেষ প্রান্তে, বাড়ি থেকে আনা চটের আসনে বসতে হয় তাকে। তার খাতা শিক্ষকরা দূর থেকেই দেখেন, হাত দিয়ে স্পর্শ করেন না, পাছে অপবিত্র হয়ে যান। ক্লাসে সেই বালককে কথা বলতে দেওয়া হয় না, পাছে তার মুখের বাতাসে ঘর অপবিত্র হয়ে যায়। খুব জরুরি পরিস্থিতি হলে তাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে হয় তার প্রয়োজন। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও জল চাইতে পারে না সে। চাতক পাখির মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে হাঁ করে বসে থাকতে হয়। কোনও ছাত্রের মনে দয়ার উদ্রেক হলে সে অনেক ওপর থেকে তার মুখে জল ঢেলে দেয়। তবে তার তৃষ্ণা মেটে।

তার এই অসম্মান ও হেনস্থার একটাই কারণ। 'অতি নীচ' এক জাতে, মহার সম্প্রদায়ে জন্ম তার। জন্ম ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল।

মনুস্মৃতি শাসিত হিন্দু সমাজের এই ধরনের যাবতীয় অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে, শাসন-শোষণ-অসম্মানের বিষনিঃশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে, দেশ ও বিদেশের নানা সম্মানীয় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে প্রাপ্তব্য সব সম্মানই একদিন সে অর্জন করবে। তারপর, তার বয়স যখন মাত্রই পঁয়ত্রিশ, মহারাষ্ট্রে যে 'পবিত্র সরোবরের' জল দলিতদের স্পর্শ করাও নিষেধ, দশহাজার সঙ্গীসহ সেই চাভাদর সরোবরের জল সে পান করবে, এবং সেই সরোবরের তীরে, হাজার হাজার দলিত, অ-দলিত মানুষের সামনে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে মনুস্মৃতি। সেদিন বড়দিন, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৭। একদিন এমন 'অনাচার' যে ঘটাবে, সাতারার সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চটের আসনে বসা বালকটির নাম ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। একদিন স্বাধীন ভারতের ভিত্তি রচনায় এক বড় ভূমিকাও নেবে সে-ই!

বেদের বিধানে ছিল?

কিন্তু হিন্দুসমাজে মানুষে মানুষে এই ভেদ, এই ঘৃণা, এই জঘন্য আচরণ এল কোথা থেকে? জাতপাতের এই কঠোর বিভাগ কার সৃষ্টি? কতদিন ধরে চলে আসছে এই ব্যবস্থা?

হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কঠোর মনোভাবের খুবই শক্তিশালী ও বড় একটি অংশ মনে করে, যে বর্ণাশ্রম এই ব্যবস্থার ভিত্তি তার সৃষ্টি বহুকাল আগে, বৈদিক যুগে। নিজেদের সমর্থনে তাঁরা ঋগবেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সুক্তের ১২শ শ্লোকটি প্রায়শঃই উদ্ধৃত করেন,

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজয়তঃ।

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন,

'এর মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু'বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দু'চরণ হতে শূদ্র হল।'

অর্থাৎ সর্বনিম্ন অঙ্গ হতে জন্ম শূদ্রের। সুতরাং তার স্থান তো সর্বনিম্নেই হবে।

কিন্তু শ্লোকটি কি সত্যিই ঋগবেদের? বৈদিক যুগে বর্ণভেদ আদৌ ছিল কি?

শ্লোকটির অনুবাদ করে পাদটিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন, 'ঋগবেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ চার জাতির উল্লেখ নেই। ঋগবেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে জাতিবিভাগ ছিল না। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে এ পুরুষ সুক্তের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষা।'

তবে কি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নিতান্তই লোকাচার? প্রাচীন কোনও শাস্ত্রের সমর্থন ছাড়াই চলে আসছে এত কাল ধরে? বস্তুত প্রাচীনতম যে-শাস্ত্রে এই ব্যবস্থার কথা পাওয়া যায়, যে-শাস্ত্রে নানা বর্ণকে নির্দিষ্ট করে এবং দলিত তথা শূদ্রকে চিহ্নিত করে সমাজে তার স্থান স্থির করে দেওয়া হয় তা হলো 'মনুসংহিতা'।

মনুসংহিতা কী? মনু-ই বা কে? কী লিখেছেন তিনি? কোথায় স্থান দিয়েছেন দলিতকে?

ইতিহাসের পরিহাস, সাতারার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চটের আসনে বসা, তৃষ্ণায় কাতর, উপেক্ষায় অপমানিত, লাঞ্ছনায় ক্রুদ্ধ সেই বালকটি পরিণত বয়সে একদিন ভারতীয় সংবিধান রচনায় প্রধানতম ভূমিকা পালন করবে। তাকে বলা হবে দেশের সংবিধানের জনক। সেই সংবিধান নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র তথা সমাজকে। এবং কেউ কেউ তখন তাঁকে এই কীর্তির জন্যে 'আধুনিক যুগের মনু' আখ্যায় ভূষিত করবেন, হয়ত একেবারেই ভিন্ন অর্থে।

আচার্যপ্রতিম পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই আমরা এ-খবর পাই। 'মনু' আখ্যা যে আম্বেদকরের মতো বৈপ্লবিক চিন্তার মানুষের পক্ষে—যিনি সমাজের জাতপাত ব্যবস্থাটাই উড়িয়ে দিতে চান—তেমন শংসার বিষয় নয়, তা-ও জানাতে ভোলেন না তিনি, খুবই সূক্ষ্মভাবে, চিকণ ইঙ্গিতেই, যেমনভাবে বলতে পারেন (ইংরেজিতে, এবং বাংলাতেও) শুধু তিনিই। কারণ এর পরেই তিনি চলে যান 'মনু'-র আলোচনায় এবং তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁর সেই মনোভাব কয়েক যুগ ধরে যা আমাদের অতি পরিচিত, প্রিয় ও প্রশংসার কারণ হয়ে উঠেছে এবং হয়ে আছে। সেই মনোভাবেরই তো প্রকাশ ঘটে তাঁর সেই বিখ্যাত বাকভঙ্গিতে যা মাঝে মাঝেই ফুঁসে ওঠে সই ও মহৎ রোষে, তাঁর অস্তিত্বের একেবারে অন্তর থেকে।

ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি মূল্যবান

নূতন দিল্লির 'ইন্‌স্টিটিউট অফ কন্‌স্টিটিউশনাল অ্যান্ড পার্লামেন্টারি স্টাডিজ' তৃতীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মারক ভাষণ (১৯৮১) প্রদানের জন্য হীরেন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান।

আমাদের সৌভাগ্য, ভাষণটি পরে পিপ্‌ল্‌স্ পাবলিশিং হাউস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে (Gandhi, Ambedkar and the extirpation of untouchability)।

ক্ষুদ্রাকার এই গ্রন্থটি হয়ত তেমন পরিচিত বা প্রচলিত নয়। হীরেন্দ্রনাথের প্রখ্যাত গ্রন্থরাজির অন্তর্ভুক্তও নয়। তথাপি, সন্দেহাতীতভাবে, অতি মূল্যবান। বহুকাল ধরে ভারতবর্ষে যে-বিষয়টি সমাজজীবনে ক্যান্সার হয়ে উঠেছে এবং আজও হয়ে রয়েছে, সেই দলিত-সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর ভাবনার এক সুশৃংখল প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থে এবং সেই প্রসঙ্গেই মনুস্মৃতি বিষয়েও।

হীরেন্দ্রনাথ বলছেন, গোঁড়ামির দৃষ্টিতে যত স্বর্গীয় বলেই বোধ হোক, 'মনু' কোনওভাবেই নিতান্ত কোনও ব্যক্তি নয়। এটি সমাজ-দর্শনের এক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তব জীবনে প্রাত্যহিক আচরণের এক ব্যবস্থা। তাঁর মতে মনুবাদ হলো এক সুসংহত, বিশ্বের প্রাচীনতম এবং প্রায় অজেয় এক স্থিতাবস্থাপন্থী নির্দেশপঞ্জি।

তিনি বলছেন, জন্ম, নিবাস অথবা গাত্রবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানবকে 'জীবশিব' ভাবার যে-সাধনা ভারতবর্ষের একান্ত আপন, মনুর বিধান তাকে একেবারেই নস্যাৎ করে দিয়েছে। এই সত্য অতি নির্ভুলভাবে এবং গভীর ক্ষোভ ও বেদনা নিয়ে অনুভব করেছিলেন আম্বেদকর।

মনুর বিধান মতো

কেন এমন তীব্র ছিল আম্বেদকরের অনুভূতি? মনুর বিধান সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথই বা কেন এমন কথা বলছেন? কী বলা হয়েছে সে বিধানে?

বস্তুতপক্ষে এই শাস্ত্রগ্রন্থটিই বর্ণভেদ এবং শূদ্র তথা দলিতদের যাবতীয় যন্ত্রণার মূল শাস্ত্রীয় উৎস। এই গ্রন্থের দশম মণ্ডলে একবার চোখ রাখলেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সমাজে শূদ্রদের স্থান কী হবে, তারা কী করবে ও করবে না, কীসে তাদের পাপ, কীসে পুণ্য, এমনকী তারা কী খাবে, তাদের শয্যা কেমন হবে, সব বিধানই দেওয়া হয়েছে এই মণ্ডলে। সে বিধানের কয়েকটি এইরকম,

'বিপদ-আপদের অবস্থায় ছাড়া প্রত্যক্ষ শ্রমের দায়িত্ব দ্বিজদের নয়...সে দায় শুধু শূদ্রদের।'

'স্বর্গলাভ করার জন্য বা স্বর্গ ও নিজ জীবিকা এই উভয়ের জন্য (শূদ্র) ব্রাহ্মণের সেবা করবে।...ব্রাহ্মণের সেবাই শূদ্রের প্রকৃত কাজ—এ ছাড়া শূদ্রের সব কাজই নিষ্ফল' (১০/১২২, ১২৩)।

'শূদ্রের ভক্ষণের জন্য উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানের জন্য জীর্ণ বস্ত্র, শোবার জন্য জীর্ণ শয্যা এবং ধানের পুলাক (তুষ) দ্বিজ শূদ্রকে দেবেন' (১০/১২৫)।

'ধন অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া চলবে না; কেন না ধন সঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদের কষ্ট হয়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করতে পারে' (১০/১২৯)।

'...ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই...বেদ অধ্যয়ন করবেন...কেবল ব্রাহ্মণই বেদ অধ্যাপনা করবেন...শূদ্রেরা কখনও বেদ অধ্যয়ন ও শ্রবণ পর্যন্ত করবে না' (১০/১)।

'জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল (বেজি), চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গাধা, পেচক ও কাক—তাদের একটিকে হত্যা করলে শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করবে' (১১/১৩২)।

মনুর এই জাতীয় ও এর চেয়ে ভয়ংকর সব বিধানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এদেশের হিন্দু সমাজ। এইসব বিধানই অতীতে সমাজকে পরিচালনা করেছে, বর্তমানে করছে এবং আরও কতকাল করে যাবে কে জানে (শহুরে পাঠক, নিজের পাড়াকেই ভারতবর্ষ বলে ধরে নেবেন না)।

মনুসংহিতাই বর্ণাশ্রমের উৎস। বর্ণাশ্রমের কল্যাণেই জন্ম জাতপাত ভেদাভেদের। এবং তা থেকেই এসেছে অস্পৃশ্যতা। বর্ণাশ্রম, জাতপাত ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার শিকার তপশীলী জাতি ও উপজাতির মানুষের চরম দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে হীরেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবোচিত আবেগে ফ্রান্জ্ ফ্যাননের ভাষায় তাদের বর্ণনা করেছেন 'রেচেড অফ দ্য আর্থ' বলে।

একই আবেগ নিয়ে তিনি বলেন, আমরা যখন পবিত্র পবিত্র ভাব করে রাষ্ট্রসংঘে ও অন্যান্য মঞ্চে বর্ণবিদ্বেষের নিন্দা করে বলি, এটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ তখন স্বাভাবিক মানবিক আঘাতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমাদের বিবেকের গায়ে গণ্ডারের চামড়া পরিয়ে নিতে হয়। কারণ বর্ণবিদ্বেষের পীঠস্থান দক্ষিণ আফ্রিকাতেও (তখনকার) কেউ তত্ত্ব হিসাবে বর্ণবিদ্বেষ সমর্থন করতে সাহস করে না, বলাই বাহুল্য, বাস্তব আচরণে যদিও করে ঠিক উলটোটা। কিন্তু এদেশে তো নানা শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে দর্শন হিসাবেই বর্ণাশ্রম, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা সমর্থন করা হয়।

সত্যিই অতীত হয়ে গেছে?

মনুর বিধান অতীতে, প্রাচীন ভারতে, কীভাবে শূদ্রকে পীড়ন করেছে, অসম্মান করেছে, হীনবল করেছে তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। শূদ্ররাজ শম্বুককে রামচন্দ্রের তরবারির নীচে মাথা পেতে প্রাণ দিতে হয়েছিল বেদ পাঠ করার 'অপরাধে'। গোপনে শস্ত্রবিদ্যা শিখে তাতে অর্জুনের চেয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠার 'পাপে' একলব্যকে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে তা গুরুদক্ষিণা হিসাবে সমর্পণ করতে হয়েছিল অর্জুনের শিক্ষক দ্রোণাচার্যের শ্রীচরণে।

কেউ কেউ বলবেন এসব যখন হতো তখন হতো। এখন সেকথা মনে করার প্রয়োজন কী। এখন তো আমরা অনেক 'সভ্য' হয়েছি। এখন কি আর ওসব হয়? হয় না? দলিত হওয়ার অপরাধে বর্ণহিন্দুর হাতে তাদের প্রাণ দিতে হয় না? দলিত নারীকে ধর্ষিত হতে হয় না? হীরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন পিপরি, বলচি ও গুআ-র ঘটনা। আরও কত ঘটনার উল্লেখ করা যায়!

১৯৮১ থেকে ২০০০, বিশ বছরে শুধুমাত্র বিহারেই অন্তত ৪৫টি ঘটনায় বর্ণহিন্দুদের সংগঠিত ফৌজ 'রণবীর সেনা'র হাতে খুন হয়েছে অসংখ্য দলিত, ধর্ষিতা হয়েছে বহু দলিত নারী, তাদের অনেক বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিবরণের ভিত্তি পুলিশ-প্রশাসনের খাতা। এর বাইরেও ঘটে গেছে কত ঘটনা।

পুলিশের হিসাব থেকেই অল্প কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। জায়গার নামের

পাশে ঘটনার তারিখ ও নিহতের সংখ্যা দেওয়া হলো,

পারশবিঘা (১৯৮১)—১১
কানসারা (১৯৮৬)—১৪
নোনাহিনাগেওড়া (১৯৮৮)—১৯
দামুহা-খাগাড়ি (১৯৮৮)—১১
মেলুবার সিনহা (১৯৮৯)—৯
সাওনবিঘা (১৯৯১)—৭
মেলুবার সিনহা (১৯৯১/দুবছরে দ্বিতীয়বার, দলিতরা প্রতিবাদ করায়)—৭
সারথুয়া, ভোজপুর (১৯৯৫)—৬
নানাউর, ভোজপুর (১৯৯৬)—৫
বাথানিয়াটোলা, ভোজপুর (১৯৯৬)—২৮ (৮ জন শিশু)
খানেত, ভোজপুর (১৯৯৬)—৫
একোয়ারি, ভোজপুর (১৯৯৬)—৬
হাইবাসপুর, পাটনা (১৯৯৬)—১২
হাইবাসপুর, পাটনা (১৯৯৭/ পুলিশে নালিশ করায়, পরের বছরই দ্বিতীয়বার)—১০
লছমনপুরবাথে, জেহানাবাদ (১৯৯৭)—৬১
খাজাসিন, জেহানাবাদ (১৯৯৭)—৮
নাগরিবাজার, ভোজপুর (১৯৯৮)—১০
শংকরবিঘা, জেহানাবাদ (১৯৯৯)—২৩
নারায়ণপুর, জেহানাবাদ (১৯৯৯)—১১
সেন্দানি, গয়া (১৯৯৯)—১২
জাহিরিবিঘা, জেহানাবাদ (১৯৯৯)—১২
মিয়াপুর, ঔরঙ্গাবাদ (২০০০)—৩৪

সব ঘটনার উল্লেখ করা সম্ভব নয় কারণ দেশময়, বিশেষত গোবলয়ে ও দক্ষিণভারতে প্রতিদিনই ঘটে চলেছে একাধিক ঘটনা। তালিকা ছাপা হতে হতে আরও কিছু ঘটনা ঘটে যাবে।

শুধু মাঝে মাঝে হত্যা ধর্ষণ নয়, প্রতিদিনের জীবনের অসংখ্য অপমানের মুখোমুখি হতে হয় দলিতদের, এখনও। বর্ণভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আধুনিক যুগের প্রধান সেনাপতি আম্বেদকরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। আরও পরে, তিনি যখন খানিকটা বড়ই হয়েছেন, তখন এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। হাইস্কুলের শুরুতে আম্বেদকর, তাঁর দাদা ও ভাগ্নের সঙ্গে যাচ্ছিলেন গোরেগাঁও-এ বাবার কাছে। রেল স্টেশন থেকে একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করে রওনা হলেন তাঁরা। কিছু পথ যাওয়ার পর তাঁদের কথাবার্তা থেকে গাড়োয়ান ধরে ফেলে এরা অচ্ছুৎ। 'মহার' সম্প্রদায়ের মানুষ। ফলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়ি থেকে তাদের নামিয়ে দেয়। তাদের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চিৎকার

করে বলতে থাকে তার গাড়িটাই অপবিত্র হয়ে গেল! অনেক সাধ্যসাধনার পর দ্বিগুণ ভাড়া কবুল করে তাকে রাজি করালেন তাঁরা। শর্ত হলো, তাঁরা নিজেরাই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবেন। গাড়োয়ান হেঁটে যাবে গাড়ির পাশে পাশে। এই অচ্ছুৎগুলোর সঙ্গে তো সে এক গাড়িতে বসতে পারে না।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে, জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা অবসানের জন্যে কোনও চেষ্টা এবং সে চেষ্টাকে ফলবতী করার জন্যে কোনও সংগ্রাম কি হয়নি? বহু ক্ষেত্রে বহুবার হয়েছে। আজও নানাভাবে চলেছে সে সংগ্রাম। পীড়ন থাকলে প্রতিরোধ তো থাকবেই।

সেইসব সংগ্রামে যাঁরা নানা যুগে সৈন্যাপত্য করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ। গৌতম বুদ্ধ থেকে রামমোহন, কবীর, রবিদাস, বিদ্যাসাগর, বীরেসালিঙ্গম, কুমারন আসান, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্, মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, জ্যোতিবা গোবিন্দ ফুলে থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর পর্যন্ত মহাজনদের উদ্যোগ ও কর্মের কথা বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন, এঁরা যে স্বাস্থ্যকর, অগ্রণী দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তা যদি আরও অর্থবান করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত! এই প্রসঙ্গে তিনি এ. ভি. ঠাক্কার ও এম. সি. রাজা-র নামও বলেছেন, কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দু'জনের ভূমিকা, মহাত্মা গান্ধী ও বাবাসাহেব আম্বেদকর।

গান্ধীজির কথা

আম্বেদকর সম্পর্কে তিনি বলছেন, আম্বেদকরই হলেন সেই নায়ক যিনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন দলিতদের পাশে, তাদের মনে আশা জুগিয়েছেন, নিজেদের প্রতি তাদের আস্থা গড়ে তুলেছেন, সর্বোপরি তাদের অন্তরে আত্মমর্যাদার এক গভীর বোধ সৃষ্টি করেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা তিনি স্মরণ করেছেন বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে, যদিও এই প্রসঙ্গে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথাও হীরেন্দ্রনাথ ভুলে যাননি। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন, গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৩২ সালের পরেই শুধু নয়, তার ঢের আগে থেকেই তিনি অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটাতে আন্দোলন করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ ১৯২৪-২৫ সালে মহাত্মাজির আমরণ অনশনের কথা স্মরণ করেন। ভাইকমসত্যাগ্রহের কথা বলেন। তারও আগে সবরমতী আশ্রমে বাস করার সময় মহাত্মাজি এক অচ্ছুৎকন্যাকে দত্তক নিয়েছিলেন। ঠাকার বাপা-র মতো মানুষ ছিলেন তাঁর শিষ্য। অনেকবার অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আদায়ে তিনি সত্যাগ্রহ করেছেন। বহু মন্দিরের দ্বার তার ফলে খুলেও গেছে। অচ্ছুৎদের সামাজিক পুনর্বাসনদানের জন্যেই তিনি তাদের নাম দেন 'হরিজন'। কংগ্রেসেও তিনি অস্পৃশ্যতাবাদের বিরুদ্ধে মত গঠনে সদা সচেষ্ট ছিলেন। অস্পৃশ্যতাবাদের বিরুদ্ধে মহাত্মার সংগ্রামের 'রেকর্ড বেশ দীর্ঘ'।

বাবাসাহেবের সঙ্গে একাধিকবার মহাত্মা আলোচনায় বসেন। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারায় বাবাসাহেবকে টেনে নেওয়া ছিল তাঁর লক্ষ্য। বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা নিয়েও উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু কোনও আলোচনাই ফলপ্রসূ হয়নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

আলোচনা সুখকরও হয়নি। এ কারণে মহাত্মার অনুগামীদের অনেকেই বাবাসাহেবকে নানাভাবে আক্রমণ করে। তাঁকে 'ব্রিটিশের দালাল' হওয়ার অভিযোগও শুনতে হয়। বলা বাহুল্য এইসব আক্রমণকারীদের সকলেই, প্রায় অবধারিতভাবেই, ছিলেন বর্ণহিন্দু।

বস্তুতপক্ষে এই দুই মহাজনের সহমত হওয়ার কোনও বাস্তব ভিত্তি প্রায় ছিল না বললেই চলে।

গান্ধীজি সততার সঙ্গেই অস্পৃশ্যতার অবসান চাইতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গান্ধীজি, কোনও সন্দেহ নেই, তাঁর আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে 'অস্পৃশ্যতাকে' অভিশাপ দিতেন। তাঁর স্বচ্ছ আন্তরিকতা তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্মের মধ্যে দিয়ে' তা প্রকাশিত...। গান্ধীজি মনে করতেন, অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্মের অঙ্গ নয়। তাকে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা থেকে ছেঁটে ফেলাই কাম্য। শুধু কাম্য নয়, অবশ্য করণীয় মানবিক কর্তব্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে সমগ্র ব্যবস্থাটাকেই ধ্বংস করে ফেলা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

এই কর্তব্য সাধনে তিনি বর্ণহিন্দুদের বুঝিয়ে তাদের ধ্যানধারণা ও হৃদয় পরিবর্তন করার কথা ভাবতেন। মনে করতেন জোরজবরদস্তি করে এ-কাজ হবার নয়।

কেরলে 'ভিয়া' সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন শ্রীনারায়ণ গুরু। সেখানে আজও তাঁকে ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ১৯২৪-২৫ সালে সত্যাগ্রহের সময় তিনি যখন স্বেচ্ছাসেবকদের সব ব্যারিকেড ভেঙে ফেলতে আদেশ দেন, গান্ধীজি শক্ত হাতে তার বিরোধিতা করেন। এভাবে সমগ্র 'ব্যবস্থার' সঙ্গে যুদ্ধে নামার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তাঁর ভাষায় 'আপোষের সৌন্দর্য'ই ছিল তাঁর কাম্য।

কেরলের শ্রীনারায়ণ গুরু, তামিলনাড়ুর 'পেরিয়ার' রামস্বামী নায়কারের মতো সংগ্রামী মহাজনদের প্রভাবে গান্ধীজি তাঁর 'ইয়াং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে একসময় লিখে দেন, 'কাস্ট মাস্ট গো!' তাঁর পক্ষে এটি এক বিশাল পদক্ষেপ। কিন্তু এ পথে তিনি থাকতে পারেননি।

হীরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে তিনি দলের দোদুল্যমানতা ও সামাজিক সমস্যা থেকে দূরে থাকার মনোভাবের বিপরীতে দাঁড়িয়ে 'অস্পৃশ্যতা স্বরাজের পথে আরেকটি বাধা'—এই বক্তব্য দলের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করান। কিন্তু 'অস্পৃশ্যতা' পর্যন্তই, 'জাতপাত'কে স্পর্শ করতে পারেন না তিনি। হীরেন্দ্রনাথ বলছেন, 'বর্ণাশ্রম'-এর ধারণার প্রতি একধরনের আকর্ষণ থেকে গান্ধীজি তাঁর মনকে যুক্ত করতে পারেননি। ফলে জাতিভেদ ব্যবস্থার প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা থেকেই গেছে। তিনি আন্তরিকভাবে অস্পৃশ্যতা বর্জনের ডাক দিলেও জাতিভেদ প্রথা ত্যাগ করার আহ্বান জানাতে পারেনি।

হীরেন্দ্রনাথ গান্ধীজির এই সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এমন সীমাবদ্ধতা আম্বেদকরেরও আছে। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা তিনি স্মরণে রাখতে চান, পাছে তাঁদের প্রতি অবিচার হয়ে যায়। সে দুটি কথার সারমর্ম এইরকম

প্রথমত তাঁদের ভূমিকা বিচার করার সময় তাঁদের সময় ও পটভূমিকার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মানুষ প্রায়শঃই এই দুটি দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ভার পড়েছিল গান্ধীজির কাঁধে। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে দেশ ও সমাজের সমস্ত অংশ ও সমস্ত স্বার্থগোষ্ঠীকে যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহৎ মঞ্চ গড়ে তোলা ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফলে মাঝে মাঝেই তাঁকে 'সোনালী আপোষের' পথ নিতে হয়েছে। এক পা এগিয়ে দু'পা পিছিয়ে আসতে হয়েছে যাতে পরের বার তিন পা এগোনো যায়।

আম্বেদকরের কথা

কিন্তু বাবাসাহেব আম্বেদকরের অবস্থান ছিল একেবারে অন্যরকম। যেন দুই মহাজনের পরিবার, জন্ম, জীবন, অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসপ্রদত্ত দায়িত্বের গভীর পার্থক্যের মতোই ছিল তাঁদের ভূমিকার পার্থক্য।

জন্মাবধি বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতার কাঁটাওয়ালা এক সামাজিক শৃংখলে বন্দী জীবন যাপন করতে হয় আম্বেদকরকে। শৈশব-কৈশোরেই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁকে বুঝতে হয়েছিল, হিন্দুসমাজ ও সে সমাজের জাতপাত ব্যবস্থার স্বরূপ। তিনি যে মানুষ, নিতান্ত এক অচ্ছুৎ মহার নন, একথা তিনি একবারই উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বরোদার মহারাজের সহায়তায় মার্কিন দেশে উচ্চশিক্ষার্থে গিয়ে। যদিও সেখানেও কালো মানুষের প্রতি বৈষম্য ও তাদের লাঞ্ছনার সত্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

একথা বুঝতেও তাঁর দেরি হয়নি যে দুর্ভাগ্যের এ জীবন শুধু তাঁর নয়, তাঁর পরিবারের নয়, শুধু মহার সম্প্রদায়ের নয়। যন্ত্রণা ও দুর্ভাগ্যের এই বোঝা ঘাড়ে নিয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছে দেশের সমস্ত প্রান্তের কোটি কোটি দলিত মানুষকে। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যে-প্রতিজ্ঞা তাঁর মনে গড়ে ওঠে তা হলো, এই অবস্থা বদলে দিতে হবে। তার জন্যে শুধুমাত্র অস্পৃশ্যতা বর্জন করলেই হবে না। অস্পৃশ্যতার জল যে উৎসে সেই জাতপাত ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করতে হবে। 'কাস্ট মাস্ট গো!'

দেশের বিপুল সংখ্যক দলিত মানুষকে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলে বিশাল এক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া পথ নেই, একথা তিনি বুঝতেন। তাই আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি এবং তাকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যে আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনার কাজেও তিনি ব্রতী হন। বর্ণাশ্রমের উৎস ও স্বরূপ, হিন্দু সমাজের অন্ধকার দিক, দলিত জীবনের বাস্তব চিত্র, সে জীবনের জন্যে কে ও কারা দায়ী, মুক্তির পথ, বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিশাল সময়কাল জুড়ে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন তিনি। তাঁর গবেষণার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অতুলনীয়। যখন তাঁর বয়স মাত্রই পঁচিশ, তখন প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত আকর গ্রন্থ 'কাস্টস ইন ইণ্ডিয়া—দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস অ্যাণ্ড ডেভালাপমেন্ট' (১৯১৬)। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে আর যে-দু'খানি গ্রন্থের নাম না করলেই নয় সে দুটি হলো, (১) 'অ্যানিহিলেশন অফ কাস্টস্' (১৯৩৬) এবং (২) 'হু অয়্যার দ্য শূদ্রজ' (১৯৪৮)।

বাবাসাহেবের সব আন্দোলনেরই লক্ষ্য ছিল সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

ন্যায় অর্জন। তিনি জানতেন, এই ন্যায় কারও দয়ায় পাওয়া যায় না, আদায় করে নিতে হয়, এবং আদায় করার জন্যে চাই যোগ্যতা। যোগ্যতার প্রথম মাপকাঠি আত্মমর্যাদাবোধ। যুগ যুগ ধরে বর্ণহিন্দুর দ্বারা দলিত হতে হতে যে আত্মমর্যাদাবোধ দলিতরা হারিয়ে ফেলেছে তা পুনরায় অর্জনের আহ্বান ছিল তাঁর প্রথম আহ্বান। বর্ণহিন্দুর ছুঁড়ে দেওয়া উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করো না, বরং না খেয়ে মরো। ওই উচ্ছিষ্ট রুটিতে বিষ আছে।

এ কথাও আম্বেদকর জানতেন, শুধু প্রতিবাদে, সমাবেশে ও ভাষণে সমাজের কাছ থেকে মর্যাদা আদায় করা যায় না। অশিক্ষিত মানুষের শত চিৎকারও তাকে মর্যাদা এনে দিতে পারে না। তিনি তাই দলিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একের পর এক স্কুল, হস্টেল, কলেজ ইত্যাদি গড়ে তোলেন। এটাও ছিল তাঁর আন্দোলনের জরুরি অঙ্গ।

এই সঙ্গে তিনি জোর দেন নিজেদের কথা বলার ওপর। তিনি জানতেন এ জন্যে দলিত মানুষের কাছে যেমন তাদের দুর্দশার প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তেমনি সমগ্র সমাজের সামনে তুলে ধরা দরকার তাদের দুর্দশার কাহিনী।

দলিত সাহিত্য ও সাহিত্যিক

এই উদ্দেশ্যে তাঁর হাতে গড়া মিলিন্দ কলেজের ছাত্রশিক্ষকদের উদ্যোগে প্রকাশিত পত্রিকা 'অস্মিতাদর্শ' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশিত যেসব পত্রিকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তার মধ্যে 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'সত্যকথা', 'আমহি', 'প্রতিষ্ঠান' 'মারাঠাওয়াড়া', 'মানোভা' ইত্যাদির কথা বলতেই হয়।

মিলিন্দ কলেজের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে 'সিদ্ধার্থ সাহিত্য সংঘ'। এঁদের সকলের মিলিত উদ্যোগে সৃষ্টি হয় ভারতীয় সাহিত্যের নূতন এক ধারা, 'দলিত সাহিত্য'। এই ধারার অনেক সাহিত্যিকই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁদের কয়েকজন শুধু মারাঠি ভাষা নয়, সমগ্র ভারতে স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পৌষ্য'-র লেখক বাবুরাও বাগুল, আন্নাভাউ মাঠে, দয়া পাওয়ার প্রমুখ।

আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিত সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কিন্তু সম্মেলনের আগেই, ১৯৫৬ সালে তিনি গত হন। সম্মেলনটি পরে, ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই প্রথম 'দলিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আম্বেদকর শুধু তাত্ত্বিক ছিলেন না, সংগঠকও ছিলেন। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তিনি যে-কাজ করে যান তা আজও তাঁকে দলিতদের মধ্যে তো বটেই, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ সমস্ত মানুষের কাছে বরণীয় করে রেখেছে।

তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের ব্যক্তিত্বে, তাঁর ভাবনায় ও কর্মে একটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। সে বৈশিষ্ট্য হয়ত বিতর্কিত, কিন্তু তা মহিমাময়ও বটে। এই কারণেই তিনি জীবৎকালে যা পেয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি গৌরবের অধিকারী হয়েছেন মৃত্যুর পর। অনুরাগীদের ওপর তাঁর প্রভাব এমন, তারা যেন তাঁকে পুজো করেন।

ধর্ম নয়, মস্তিষ্কবিকার

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বাবাসাহেব আম্বেদকরের মনোভাব দিনে দিনে শুধু বিরাগে নয়, তীব্র রোষে ও বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

'যে-ধর্ম মানুষের আত্মমর্যাদার স্বীকৃতিকে পাপ বলে মনে করে তা ধর্ম নয়, নিতান্ত এক অসুস্থতা। যে-ধর্ম মানুষকে নোংরা পশুকেও স্পর্শ করার অনুমতি দেয় কিন্তু মানুষকে ছুঁতে দেয় না, তা ধর্ম নয়, মস্তিষ্কবিকার। যে-ধর্ম বলে, এক শ্রেণীর মানুষ ধন-সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে না, অস্ত্র হাতে নিতে পারবে না, তা ধর্ম নয়, মানব-জীবনের ব্যঙ্গ। যে-ধর্ম শিক্ষা দেয়; অশিক্ষিতদের অশিক্ষিত থাকাই উচিত, দরিদ্রের দরিদ্র থাকাই উচিত, সে ধর্ম ধর্ম নয়, একটা শাস্তি।'

আম্বেদকরের এই কথাগুলি উল্লেখ করে (হীরেন্দ্রনাথের) মন্তব্য 'এই কথার মধ্যে যে-আগুন আছে তা শুধু মহানবীরাই প্রজ্জ্বলিত করতে পারেন, নিজের ভেতরে এবং অন্যদের মধ্যে।'

হীরেন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতি-র উল্লেখ করে যেন একই সঙ্গে আরও দুটি বিষয় বোঝাতে চান। (১) হিন্দু ধর্মের জরাজীর্ণ, কূপমণ্ডুক দশা এবং নিপীড়ক স্বভাব। (২) এই ধর্ম সম্পর্কে বাবাসাহেবের রোষ ও হতাশার সম্পূর্ণতা।

বস্তুতপক্ষে মনুবাদী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো এবং দলিতদের মানুষের মর্যাদাদানে আজীবন সংগ্রাম করেও প্রায় কোনও ফলই দেখতে পাননি বাবাসাহেব। হতাশ হয়ে মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি হাজার হাজার অনুগামীকে নিয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

স্বভাবতই এই ধর্মান্তরে হীরেন্দ্রনাথের মত নেই। তিনি মনে করেন না এই পথে সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ কারণে বাবাসাহেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমে না। তিনি তাঁর হতাশা উপলব্ধি করতে পারেন। হতাশার কারণও তাঁর জানা। ফলে, তাঁর বলতে বাধে না, 'আম্বেদকর এক দেশপ্রেমিক, শক্তিশালী এবং (আমাদের অবিস্মরণীয় ও বিখ্যাত, অপরিবর্তনশীল ভারতীয় পরিবেশে) গভীর এক মুক্তিমুখী ভূমিকা পালন করেন।'

হীরেন্দ্রনাথ আরও বলেন, আজীবন তিনি 'অবিচলভাবে একটি লক্ষ্যপূরণেই সচেষ্ট থেকেছেন, দলিত শ্রেণীর উন্নয়ন। এ-ই ছিল তাঁর বীজমন্ত্র, তাঁর রক্তের অন্তর্গত অঙ্গীকার।'

বাবাসাহেবের এই কর্মযজ্ঞের বর্ণ বর্ণনা করতে গিয়ে হীরেন্দ্রনাথের মতো লেখকও 'স্পিরিচুয়ার গ্র্যানজার' ছাড়া অন্য কোনও ভাষা খুঁজে পান না।

শুধু হিন্দু ধর্ম নয়, যে-সংবিধান স্বাধীন ভারতবর্ষে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে, সেই সংবিধানের অন্যতম জনক বাবাসাহেবের শেষ পর্যন্ত আর লেশমাত্র মোহ ছিল না এদেশের গণতন্ত্র নিয়ে। 'ভারতবর্ষে গণতন্ত্র এখনও এদেশের ভূমিতে ওপর ওপর সাজসজ্জার ব্যাপারই হয়ে রয়েছে, এ-ভূমির চরিত্রই অগণতান্ত্রিক।'

পার্লামেন্টে একথা বলার সময় বাবাসাহেবের চোখের সামনে নিশ্চয়ই সেই শত সহস্র

অপমানিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, ক্ষুধায় কাতর, অতিশ্রমে ক্লান্ত, কোনওক্রমে প্রাণটুকু নিয়ে টিকে থাকা দলিত মানুষের মুখগুলি ভাসছিল।

স্বাধীন, গণতান্ত্রিক এই ভারতবর্ষে তপশীলী জাতি ও উপজাতির মানুষের ওপর পীড়নের কিছু তথ্য হীরেন্দ্রনাথ দিয়েছেন যা ভারতীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে বাবাসাহেবের ক্রুদ্ধ ও মর্মান্তিক অভিযোগের যাথার্থ্যই প্রমাণ করে।

তপশীলী জাতি ও উপজাতির মানুষের ওপর আক্রমণ ও উৎপীড়নের ঘটনার যে-তথ্য সরকারের কাছে আছে তা থেকেই এগুলি উল্লিখিত হয়েছে

> ১৯৭৪ সালে ৮৮৬০টি ঘটনা ঘটে, ১৯৭৫ সালে ঘটে ৭৭৮১টি ঘটনা, ১৯৭৬ সলে ৫১৬০টি, ১৯৭৭ সালে ১০,৮৭৯টি, ১৯৭৮ সালে ১৫,০৫৯টি এবং ১৯৭৯ সালে ১৩,১৮৪টি।

'ঘটনা' বাড়ছেই, ক্রমাগতই বাড়ছে। এর পর থেকে বছরওয়ারি দলিত হত্যার (১৯৮১-২০০০) কিছু ঘটনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসবই সরকারি তথ্য। এর চেয়ে ঢের বেশি, অন্তত কয়েক গুণ ঘটনা যে ঘটেছে এবং তা পুলিশ পর্যন্ত আসেনি বা এলেও সরকারি খাতায় নথিভুক্ত করা হয়নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মার্কসবাদী ভাবনা, না-ভাবনা

এর কি কোনও প্রতিকার নেই? এই বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা কি থামানো যায় না? এতকিছু বদলে যাচ্ছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের এত অগ্রগতি ঘটছে, প্রায় অবিশ্বাস্য, ভারতবর্ষও সে অগ্রগতির অংশীদার। মানুষ চাঁদ জয় করেছে। মঙ্গল-জয়ের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। এখনও কি আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের মনুবাদী সমাজব্যবস্থার অচলায়তন ভেঙে দেওয়া যায় না? দীনের হতে দীন, সত্যিকারের সর্বহারা, 'রেচেড অফ দ্য আর্থ', এদেশের দলিতদের কি কোনওমতেই শৃংখলমুক্ত করা যায় না?

এ প্রশ্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ করে। কিন্তু বোবা ভারতবর্ষ, নির্মম মনুবাদী সমাজ এবং স্বার্থান্বেষী মহল নীরবই থাকে। হয়ত হাতের আড়ালে মুচকি হাসে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর মতো করে চেষ্টা করেছেন। অন্তত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার ভিত্তি নেই।

বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন, দলিতরা যাতে 'মানুষের মর্যাদাটুকু' পায়।

যাঁরা সত্যিকারের কিছু করতে পারতেন, দেশের বিপ্লবী পরিবর্তনই যাদের স্বপ্ন ও ব্রত (অন্তত দীর্ঘদিন ধরে, কয়েক প্রজন্ম ধরে তাই ছিল, হীরেন্দ্রনাথ নিজেও যাঁদের এক অগ্রণী আত্মীয়), তাঁরা, মার্কসবাদীরা কী ভেবেছেন? কী করেছেন?

কিছু কাজ হয়েছে, বিশেষ করে ভাবনা ও তত্ত্বের জগতে। এই সমস্যার উৎস সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেসব ঐতিহাসিক কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী, রামশরণ শর্মা প্রমুখ। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের যাঁরা

তত্ত্ব নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামিয়েছেন, বিশেষ করে ভারতীয় প্রেক্ষাপটের চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় ডাঙ্গে, নাম্বুদিরিপাদ, সরদেশাই প্রমুখের নাম। বলা বাহুল্য এঁরা যে-পথ অনুসরণ করেছেন, যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন, তাতে মিল যেমন আছে, অমিলও আছে।

কিন্তু কাজ হয়নি। কমিউনিস্ট আন্দোলন 'জাতপাতে'র জালে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে এড়িয়ে গেছেন তাঁদের নিজের শ্রেণীকেই। দীনের হতে দীন, এদেশের প্রকৃত সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে সেতুবন্ধনের সুযোগ ইতিহাস তাঁদের সামনে এনে দিয়েছে একাধিকবার। সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি তাঁরা। ফলে ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক দলিত মানুষকে নিয়ে রাজনীতির নানা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ক্ষমতার দাবা খেলছে—দলিতরা তাদের 'বড়ে' মাত্র—আর কমিউনিস্টরা 'জাতপাতের নোংরামি' থেকে দূরে, পবিত্র হয়ে, পড়ে আছে এক কোণে, ভারতের মানচিত্রে সামান্য হয়ে অতি সামান্য। দেশের ও জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ও ট্র্যাজেডি বোধ করি আর কিছু হতে পারে না।

প্রতিকারের ভাবনায় হীরেন্দ্রনাথ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দলিত সমস্যার স্বরূপ যেমন বোঝার চেষ্টা করেছেন, তেমনই সমাধানের পথও অন্বেষণ করেছেন। তিনি সাবেক আমল থেকে, বিগত প্রায় সাত দশক ধরে, আদ্যন্ত মার্কসবাদী। আপন আদর্শ থেকে সরে যাওয়া দূরের কথা, তাঁকে একটু টলতেও দেখেনি কেউ কোনওদিন। দলে-বেদলে-অদলে হয়ত নানা কটূকথা উচ্চারিত হয়েছে ইতিহাসের নানা মোড়ে, কিন্তু তিনি অবিচলিতই থেকেছেন তাঁর পথে। স্তালিনে স্থিত তাঁর মন, চিন্তা ও আবেগ, আজও বহু স্তালিনপন্থীর ঈর্ষার কারণ।

দলিত সমস্যা সমাধানের পথ কী? হীরেন্দ্রনাথের হাতে কোনও ম্যাজিক-ফর্মূলা নেই। তবু এ বিষয়ে তাঁর ভাবনা অত্যন্ত মূল্যবান।

তাঁর মতে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে হয় বৌদ্ধধর্ম, নয় মার্কসবাদের সাহায্যে। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ তার নানা ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবে, এমন কথা ভাবা যেমন অবাস্তব তেমনই অনুচিত। অতএব মার্কসবাদই প্রকৃত পথ। কিন্তু সে পথও তো এদেশে যেমন সুদূর, তেমনই অস্পষ্ট।

তিনি মনে করেন, দলিতের শোষিত ও নিপীড়িত জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন এক বিশাল ও দীর্ঘ সংগ্রাম। হীরেন্দ্রনাথের মতে সে সংগ্রামে এক সঙ্গে মিলতে হবে সব শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে, দলিত অ-দলিত সকলকে।

হীরেন্দ্রনাথ জানেন কাজটা সহজ নয়। সংগ্রামের এমন একটি সংযুক্ত ও বৃহৎ মঞ্চ গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দলিত শ্রেণীর আস্থা অর্জন। তাঁর তো জানা আছে বাবাসাহেব কীভাবে সমাজের অন্যান্য অংশের ওপর থেকে একটু একটু করে হারিয়ে ফেলেছিলেন আস্থা। তিনি এ-ও জানেন, 'ভারতীয় জনজীবনকে' সেই আস্থা পুনরায় অর্জন করতে হবে।

হীরেন্দ্রনাথের মতে 'ব্যাপক অর্থে এইটেই হলো ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাজ। সে আন্দোলনে শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষকে এক হতে হবে।'

হীরেন্দ্রনাথ আদর্শবাদী, কিন্তু তিনি বাস্তববাদীও। তিনি জানেন, 'সে আন্দোলন এখন যেন কেমন গোলমালে পড়ে গেছে।' তবে তিনি মার্কসবাদী, তাই কখনওই আশা ছাড়েন না। 'আরও ভালো হওয়ার আগে হয়ত আরও খারাপ হতে হয়।'

তা যদি না হয়, এই আন্দোলন যদি গড়ে তোলা না যায়, তা হলে ভারতবর্ষের জন্যে এক সর্বনাশ অপেক্ষা করে থাকবে। হীরেন্দ্রনাথের স্পষ্ট মনে আছে, 'প্রথম লোকসভাতে (১৯৫২-৫৭) এক নিরীহদর্শন কবি, অস্পৃশ্য পরিবারে যাঁর জন্ম (কী অকথ্য ভাবনা!), হঠাৎ একদিন কেমন জ্বলে উঠলেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন, যে-হারে সব ঘটছে, ভারতবর্ষে একদিন 'অচ্ছুৎস্থান' গড়ে তুলতে হবে।'

তারপরেই হীরেন্দ্র বলছেন, বাবাসাহেব 'চরিত্রগতভাবেই আগুনখেকো ছিলেন না। তপশীলী জাতি ও উপজাতি কমিশনারের তৃতীয় রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনা করতে করতে তাঁর মতো লোকও বলে ওঠেন,

"বাইরে আগুন জ্বলছে। সহজেই তা চলে আসতে পারে ভেতরে। তখন পতাকা থাকবে তপশীলী জাতির হাতে এবং আপনারা গোল্লায় যাবেন, চুলোয় যাবে আপনাদের সংবিধান। কিছুই আর থাকবে না।"

এইসব বাক্য পড়তে পড়তে কার না মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের কথা! কবেই তিনি লিখেছিলেন, 'রথের রশি!' সেখানে সবকিছুর পর কবি বলছেন,

'তারপরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উলটোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নীচুতে হবে বোঝাপড়া।
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।'

এসব কথা কবি লিখেছিলেন একাত্তর বছর আগে, ১৯৩২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর (৩১ ভাদ্র ১৩৩৯)। বাবাসাহেব তখন 'যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে' তাদের সকলকে এক করে লড়তে নেমেছেন এক অচলায়তন ভাঙতে, যাতে 'তারা' দাঁড়াতে পারে 'একবার মাথা তুলে।'

হীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ববোধ গঠনবিন্যাস ও স্তালিন

অজয় চট্টোপাধ্যায়

বিষয় বৈচিত্র্য নিবিড় পাঠ এবং মগ্ন অনুধ্যানে হীরেন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক বিচরণভূমি অপার। বাছাই একটি দিককেও সম্যক ফুটিয়ে তোলা বর্তমান আলোচকের পক্ষে ধৃষ্ট প্রয়াস। তথাপি প্রগলভ উদ্যোগ-এর প্রেরণাস্থল হীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁর বোধে গড় অথবা বিশেষ নগণ্য কিংবা গণ্য নির্বিশেষে কোনও ব্যক্তির মতামতই ফ্যালনা নয়।

হীরেন্দ্রনাথ প্রথাগত কলমজীবী নন। বুদ্ধিচর্চা তাঁর জীবনযাপনের শ্রয়ণ। বুদ্ধিচর্চা তিনি পরিচর্যা করেন এক নির্দিষ্ট অভিস্রোতে। মানব মুক্তি। মানব মুক্তির উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে তিনি কমিউনিস্ট সংগঠনের শরিক। সংগঠন মানেই শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়া। গঠন সংরক্ষণ এবং বিকাশের দাবিতে মণ্ডিত। এই দাবিকে মাল্যবান করতে যোগ্য নেতৃত্ব জরুরি। পাঠক সংকলনের আগ্রহ তুঙ্গে—আকৃতি প্রকৃতিতে আদর্শ নেতৃত্ব হিসেবে কোন ভাবকল্প হীরেন্দ্রনাথ পোষণ করেন। খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়। চকিত ঘটনার ধারাভাষ্য নয়—ধারাবাহিক অবলোকন বিশ্লেষণ এবং বিচার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব সম্পর্কে যে স্পষ্ট অবয়ব ফুটে ওঠে তাতে এই সিদ্ধান্তে আসা যুক্তিসংগত অবকাশ আছে যে তাঁর কাছে আদর্শ নেতৃত্বের ভাবমূর্তি হচ্ছে স্তালিন।

আড়াল নেই। এ ব্যাপারে কবি এবং পরিচয় সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন অদ্যাবধি ৯৫ অতিক্রান্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে স্তালিনিস্ট ঘোষণা করেন। (২৫.১২.০২, সংবাদ প্রতিদিন)

আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতার কড়চার কলমজীবীও হীরেন্দ্রনাথকে স্তালিনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (২, ১২, ০২, আনন্দবাজার পত্রিকা)

কোন বীক্ষণ এবং কী প্রকার যুক্তি প্রবাহে হীরেন্দ্রনাথ উপগত হয়েছেন স্তালিন নেতৃত্বে? হীরেন্দ্রনাথ স্তালিনিস্ট—এই অভিধায় বিতর্কের উসকানিও বিস্তর। দেখা যাক সংজ্ঞার গোড়ায় যুক্তির বিস্তার কতটুকু। বোঝার চেষ্টা করা যাক হীরেন্দ্রনাথের স্তালিনচর্চার প্রকরণ।

২

জীবনের শেষ কয়েক বছর লেনিন অসুস্থ ছিলেন। তখন তাঁর চারপাশে অগ্রজ এবং সমকালীন বিশিষ্ট নেতা অমনিবাস। কিন্তু একান্নবর্তীতায় বনিবনা হচ্ছিল না। ভাই ভাই এক ঠাঁই-এ ধস নামছে। নিয়ত খটাখটি। একদিকে বাঞ্ছিত নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে সোভিয়েত পুনর্গঠনের চাহিদা। সংকটের বিহ্বলতায় লেনিন আর্ত। হন্যে হয়ে উত্তরসূরী খোঁজ করছেন। খোঁজ মিলল। প্লেখানভ ট্রটস্কি বুখারিন জিনোভিয়েত প্রমুখ তাবড় তাবড় নেতা সমাবেশ টপকে লেনিনের নির্বাচন স্তালিন। যিনি গ্রন্থজীবী নন। পরিচিত সংগঠক

নন। অজ্ঞাত কুলশীল এক মুচি সন্তান।

লেনিনের নতুন কর্মসূচি N.E.P. গ্রন্থবাদী নেতারা এর মধ্যে মার্কসবাদী ধ্রুপদ ধারণার প্রতিফলন খুঁজে পাচ্ছেন না। অভ্যস্ত চর্চার বিপরীতে এর অবস্থান। কৃষককে ছাড় দিতে হবে। শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনে ব্যক্তি মালিকানা থাকবে। NEP. বা নয়া অর্থনীতির প্রথম উপলব্ধি লেনিনের। স্তালিন এই উপলব্ধির শরিক হয়ে যান। সামাজিক পুঁজির ওপর ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠা সাবেকি বিপ্লবী তত্ত্বের প্রকৃতিকে আহত করে। বহু তাত্ত্বিক ক্ষুণ্ণ হন। আবার বিষয়টাকে একটু ঘুরিয়ে দেখলে তত্ত্বগত পবিত্রতার ভিন্ন এক রূপ ফুটে ওঠে। যেখানে স্তালিন ধরতাই এড়িয়ে কমিউনিস্ট ইসতেহারের অনেক কাছাকাছি। ইসতেহার ঘোষণা করছে, "—প্রচলিত মালিকানা. সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই কমিউনিজমের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য নয়।"

ফলিত শাস্ত্র হিসেবে NEP. সফল। সমাজজীবনে অবদান ইতিবাচক। ১৯৩০ অবধি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে। তত্ত্ব এবং বাস্তবে অমিল দেখা দিলে বদলাবার দায়িত্ব কার? তত্ত্বের বিশুদ্ধতা ছেড়ে স্তালিন বাস্তবকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। তা যদি না করতেন তা হলে যেমন চেয়েছিলেন ট্রৎস্কি—গোটা বিশ্বব্যাপী শ্রমিক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় না হওয়া পর্যন্ত আপন সন্তান বিপ্লবকে জঠরস্থ করতে সোভিয়েত রাষ্ট্র যন্ত্রের বিনাস, তাই হত। স্তালিনের জাতীয়তাবোধ সোভিয়েত অস্তিত্বের পক্ষে রক্ষাকবচ ছিল। এই বাস্তব চেতনাকে হীরেন্দ্রনাথ সায় দিয়েছেন।

অবশ্য তত্ত্ববাদী যান্ত্রিক বিপ্লববাদের চাপে NEP বেশি দিন টেকসই হয়নি। তিরিশ দশকের মাঝামাঝি নয়া অর্থনীতির সমাপতন ঘটলো। NEP বর্জনের সময় স্তালিন নিঃসঙ্গ ছিলেন। NEP-এর চরিত্র ছিল সোভিয়েত সমাজের পক্ষে এক বিশেষ ধাঁচ। না সমাজতন্ত্র না ধনতন্ত্র। স্বপ্নবিধুর ট্রৎস্কি এবং অন্যান্য রক্ষণশীল বলশেভিকরা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি এড়িয়ে NEP পরিহার করতে চাপ দিতে থাকেন। লেনিন বাতাবরণ অপসৃত। নেতৃত্বে আধিপত্য বজায় রাখতে স্তালিন আপস করেন। শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনে উদারনীতির যবনিকাপাত। উদার দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে অবস্থাটা বদলে যায়। উৎপাদন-সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানচর্চার স্বাধীনতায় শাসন বলবৎ হয়। নেতা অভ্রান্ত এবং সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী এই চরম ধারণা সমগ্র জাতীয় চৈতন্য চারিয়ে দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্র ভূমিকা নিতে থাকে। ভীতিভিত্তিক এবং ভক্তি-বিহ্বলতার আবেশ বশ্যতায় পুরো জাতীয় মানস মুড়ে দেওয়া হয়। যাতে বহমান ইতিহাস ছন্দ টাল যায়। সমাজে মূল স্রোতই একমাত্র স্রোত নয়। বহু উপস্রোতের মণ্ডনে নৃত্যচটুল সূক্ষ্ম অণুসূক্ষ্ম বক্র বুননের বর্ণাঢ্য নকশিকাঁথা হচ্ছে সমাজ। সমাজের ওপর দল বা সরকার কোনও নির্দিষ্ট ছক চাপিয়ে দিলে সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রতিষেধক হিসেবে প্রতিবাদী সংস্থাসমূহ লালন করা পুষ্ট করা জরুরি। যে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অল্পবিস্তর বিদ্যমান। এই প্রকার গণতান্ত্রিক ধারা শীর্ণ হলে বিকাশের গতি রুদ্ধ হয়।

এখানেই খটকা উথলায়। ব্যক্তি স্তালিনকে মাল্যবান করতে তৎকালীন সোভিয়েত

সমাজে দল এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা হীরেন্দ্রনাথের কাছে কোন তাৎপর্য পেয়েছিল। ভাষ্যে এবং লেখনীতে তাঁর যা মানসিক ঝোঁক ব্যাপ্ত তাতে যে-কোনও প্রকার হুকুমদারি শাসন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের কোনও ছায়াপাত লক্ষ করা যায় না। তিনি সংগত মনে করেছেন ইতিহাসের যে পরিস্থিতিতে বলশেভিক শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঈষৎ জবরদস্তিমূলক হলেও মূলত ছিল সংখ্যাগুরুর স্বার্থে সংখ্যালঘুর ষড়যন্ত্রীয় প্রকল্প প্রতিরোধে অনিবার্য দাওয়াই। আক্রান্তের প্রতিক্রিয়া। আরো একটা দিক আছে। তা হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা, সাহস—সামরিক দক্ষতা—সংগঠন শক্তি ইত্যাদির সমাহার হচ্ছে নেতৃত্বের দ্যোতক। হীরেন্দ্রনাথ স্তালিন চরিতে গুণগুলির সন্ধান পেয়েছেন।

৩

১৯৮৪ সালে গর্বাচভ রাষ্ট্র এবং দলে ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতিতে সোভিয়েত সমাজকে ব্যাপকভাবে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতন্ত্রের চালু ছক ঘেঁটে দেয়। ১৯৫৬ সালে নব ধারার সূত্রপাত করেছিলেন ক্রুশ্চভ। সোভিয়েত বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ বিস্তর নথিপত্র সহযোগে তথ্য হাজির করেছিলেন এই মর্মে যে স্তালিন জমানা ছিল বিপুল ক্ষয় ভুল এবং অনগ্রসরতার প্রসূতি সদন। ব্যর্থতা হিসেবে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন, যথা গণতান্ত্রিকতার অভাব। ব্যক্তি স্বাধীনতার সংকোচন। ভ্রান্ত অর্থনীতির আশ্রয় অর্থাৎ স্তালিন শাসনে ব্যক্তিত্ব বিকাশ থমকে গেছে। সমাজে সংহতি বিপন্ন হয়েছে। অর্থনীতি খঞ্জ হয়েছে। উল্লেখ্য যে প্রাক-ক্রুশ্চেভ পর্বেও স্তালিন বিরোধিতা ছিল। ট্রৎস্কি এবং অর্থনীতিবিদ লিভারম্যান প্রমুখরা স্তালিননীতির বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ক্রুশ্চভই প্রথম স্তালিন বিরোধিতাকে সংহত রূপ দেন বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে। এই ধারা ক্রুশ্চভ-কোসিগিন-ব্রেজনেভ-আন্দ্রপভ হয়ে গর্বাচভে পূর্ণতা পায়। (মাঝে অবশ্য ব্রেজনেভ স্তালিন বিরোধিতা বর্জন করেছিলেন)। এরা সকলেই পার্টি কাঠামো বজায় রেখে সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৯৯১-সালে সাবেকি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। শ্রেণীযুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ গৃহযুদ্ধ—এই ত্রয়ী যুদ্ধে বিপুল রক্তপাত ঘটিয়ে হয়েছিল নতুন সমাজের অভিষেক। নতুন সমাজকে সমীহ করতে ধনবাদী রাষ্ট্র বিমুখ। তাদের চোখ টাটাচ্ছে। পেটে মারার জন্য তারা গড়ে তুলল অর্থনৈতিক অবরোধ। যে নতুন সমাজব্যবস্থা নোঙর করেছিল ১৯১৭-র রাশিয়াতে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সামলে সহে ক্রমে এই সমাজব্যবস্থার বিস্তার হয়েছিল আরো অনেক দেশে। কিন্তু সত্তর বছর না ফুরতেই ঘনিয়ে এলো অন্ত্যেষ্টি। জাঁক করে বসতে না বসতেই বন্দরের কাল হল শেষ। পাততাড়ি গুটোতে গুটোতে খরচার খাতায় উঠে গেল। চমক আছে। আছে বিষণ্ণ বিয়োগের হতবিহ্বলতা। কিন্তু ভুঁইফোড় নয় অন্তর্জলী। বৃহৎ বিনাসের উপকরণে দীর্ঘদিন ধরে পুষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে ফাটল। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নে। সোভিয়েত ইউনিয়নের থাবা আলগা হতেই ক্রমে ক্রমে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও কমিউনিস্ট শাসনে ধস নামল। চিন অচিনের পথে পাড়ি দিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছে। কিউবা এবং ভিয়েতনামের মতো ছোট ছোট দেশ পুরোনো ব্যবস্থা আঁকড়ে

নিবু নিবু টিকে আছে। এই অকাল বিলয় কৌতূহলের বিষয়। সমাজতন্ত্র কেন দিন দিন আয়ুহীন হীনবল হল; জানতে আগ্রহ জন্মে। ব্যক্তিগত ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতিগ্রস্ততা, ঢিলেঢালা সাংগঠনিক চরিত্র ইত্যাদি উপরি কাঠামোর অবক্ষয়ই কি পতনের রোগ, না-কি আদর্শের মধ্যেই ছিল ভূতের বাসা? জিজ্ঞাসা কুরে কুরে দংশায়।

ইতালি কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ভোগলিয়ত্তির মতে সাংগঠনিক ত্রুটি, ব্যক্তিগত দুরভিসন্ধি, উচ্চাশা, অহং-ইত্যাদির ভেতর পতনের ইতিহাস গবেষণা করলে ভুল হবে। বরং উৎপাদন, বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, ইলেকট্রনিক্স, বায়োকেমিক্যাল প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় পশ্চিম দুনিয়া এবং জাপান থেকে যে অনেক হঠে গেছে তার সন্ধান মিলবে ভ্রান্ত দর্শন এবং অর্থনীতির গর্ভে সহসা নয় ধীরে ধীরে পোক্ত হচ্ছিল ধসের পটভূমি। ক্রমে বিস্ফোরণ ঘটলো। বিস্ফোরণের অন্তর্গত কারণ ধরা পড়ে আর্থ-সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের আরোগ্যহীন রোগের প্রকৃতি নিয়ে নানান দৃষ্টিকোণ বিচার চলছে।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব নিয়ে লেনিন যে ধারণা পোষণ করতেন তা তিনি 'রাষ্ট্র এবং বিপ্লব' রচনায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিচারে একনায়কতন্ত্রের দুটি দিক বা শাখা আছে। রাষ্ট্র চরিত্রের একদিকে সংহার অন্যদিকে গঠনাত্মক ভূমিকা আছে। লয় এবং গঠনের দ্বৈত রূপ। বিপ্লবের অব্যবহিত পর পরাজিত শক্তির বিপুল অস্তিত্ব বেঁচে থাকে। বিপ্লবকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান শত্রু লাইনে। সমাজ থেকে তাদের শক্তি প্রভাব উৎখাত করতে বিপ্লবী সরকার শক্তিশালী ভূমিকা নেয়। শত্রুর শক্তি ক্ষয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সরকারের কাছে প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচি। গঠনাত্মক মানবিক স্বার্থ স্ফুরণের মধ্য দিয়ে সূচিত হতে থাকে সমাজতান্ত্রিক সাফল্য। রাষ্ট্রের সংহার রূপ ম্লান হতে হতে লোপ পাবে। লাভ করবে কোমল ভাবমূর্তি। এই ছিল লেনিনের সূত্র। মার্কসও রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের যন্ত্র দমনের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সমাজ বিকাশের এক আদর্শ স্তরে তিনি কামনা করেছিলেন রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। লেনিনও এই তত্ত্ব সমর্থন করতেন। এখন দেখা যাক কমিউনিস্ট শাসনে রাষ্ট্রে রুদ্র রূপ খসেছিল কি-না।

গৃহযুদ্ধ অবসিত। প্রকৃত শ্রেণীশত্রুর সক্রিয়তা ভোঁতা। নিরাপত্তা অটুট। এই অবস্থায় প্রত্যাশা ছিল যে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক অধিকারে শ্রীমণ্ডিত হয়ে সমাজকে মানবমুখী করে তোলার দিকে পদক্ষেপ নেবে। নিল না। সেনাবাহিনী, পুলিশিব্যবস্থা, আমলাতন্ত্রের সহবাসে নিটোল শাসনযন্ত্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এঁটে বসল। কার্যত কী দলের ভেতর কী দলের বাইরে কেউ দলীয় নীতি অনুমোদন না করলে বা ভিন্ন মত পোষণ করলে নিস্তার নেই। কপালে ভোগান্তি। মতভেদ মানেই শত্রুতা, শাসক শত্রু মানেই সমাজতন্ত্রের শত্রু—এই সরল মেরুকরণ ঘটিয়ে চরম দুর্ভোগে আক্রমণ করা হয়েছে নাগরিকদের। শাস্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সংগঠিত হয়েছে বহিষ্কার নির্বাসন হত্যা।

স্তালিনের যুক্তি ছিল বিরোধীরা বিপ্লবের অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। প্রমাণ

হিসেবে অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি হাজির করে 'মস্কো বিচার' তুলে ধরা হয়। যদিও 'মস্কো বিচার' নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নিশ্চিহ্ন হয়নি। সংশয়ের দুটি দিক আছে। এক, স্বীকারোক্তি বাধ্যতামূলক। দুই আত্মরক্ষার্থে ছলনা। কূটকৌশল। টিকে থাকার ফন্দি।

এরকম ঘটনা কমিউনিস্ট শাসনে ঘটে থাকে। যেমন ক্রুশ্চভ এলে 'মস্কো বিচার'-কে প্রহসন বলে উল্লেখ করে পার্টী নথিপত্র হাজির করে ক্রুশ্চভ বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে স্তালিনের অনাক্রমণ চুক্তিতে ভয়ংকর এক শর্ত ছিল। শর্ত ছিল যে চোদ্দ হাজারের মতো কমিউনিস্টদের তুলে দিতে হবে জার্মানীর হাতে। কোতল করাই হচ্ছে যে সমর্পণের উদ্দেশ্য। যেমন স্তালিনে 'মস্কো বিচার' তেমনি 'অনাক্রমণ চুক্তি'র এই শর্ত যে খাঁটি এবং নির্ভেজাল তা নিয়ে সংশয় আছে। এ যেন সাজানো আর বানানোর লড়ালড়ি। কারণ এমন চুক্তি হলে তার নমুনা কপি স্বাক্ষরিত কপি দুই দেশের মধ্যে থাকত। কিন্তু পশ্চিমী দুনিয়ার কাছ থেকে অদ্যাবধি তেমন প্রমাণ আসেনি।

ধর্তব্য হচ্ছে ১৯৩০-এর পর থেকে সমাজের ওপর দল এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা পায়। দল এবং রাষ্ট্রের মুখ দিয়ে নিঃসরণ হয় চার্চীয় কণ্ঠস্বর। মার্কসের মতে যে খ্রিশ্চান ধারণা আঠারো শতকে যুক্তিবাদী ধারণার কাছে হার মেনেছিল তাই আবার চাগাড় দেয়। সর্বরোগ হরক মুশকিল আসান হিসেবে গুরুবাদী দর্শন ধর্মীয় ঝোলা থেকে রাজনৈতিক অবতারবাদে আশ্রয় নেয়। আমার কাছে আইস। আমি তোমাদিগকে সুখ দিব। সমৃদ্ধি দিব। বিশ্রাম দিব।

এটা খুবই উদ্বেগের। কোনও ধারণাকে অব্যর্থ নিশান হিসেবে জনমানসে গেঁথে দেওয়ার অর্থ ভয়ংকর ভ্রান্তির বীজ পুঁতে দেওয়া।

আবার উৎকৃষ্ট পন্থা হলেও গণতন্ত্রের অনেক বায়নাক্কা। অধ্যয়ন-তথ্যসঞ্চয়-মতান্তর-বিশ্লেষণ। অনেক ঝক্কি। গণতন্ত্রের পরিষেবা নিতে গ্রাহককে যোগ্য হতে হয়। সাবালকত্বর স্বাদ অনবদ্য হলেও পথ কঠিন। যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার অংশ। অনেকেই চায় চিন্তাহীন নিশ্চিতি। অভিভাবক বশ্যতার সুখশান্তিতলা। এই মনস্তত্ব মূলধন করে গড়ে ওঠে একনায়কবাদ। কর্তার সংসার। স্তালিন সোভিয়েতে গড়ে তুলেছিলেন কর্তার সংসার। তিনি ছিলেন ত্রাণকর্তা।

গণতন্ত্র অবরুদ্ধ হলে তার ছায়া পড়ে অর্থনীতির প্রাঙ্গণেও। দেখা যাক কেমন সে প্রাঙ্গণ।

৪

উৎপাদন এবং বন্টনব্যবস্থা অর্থনীতির মূলসূত্র। এই সূত্র হচ্ছে 'বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদ'। সমাজের ওপর এই সূত্রের প্রয়োগ লক্ষ করে মার্কস সিদ্ধান্তে আসেন যে সমাজের চেহারা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতের ফলে। একদিকে থাকে উৎপাদন-শক্তি অন্য দিকে থাকে বন্টন-কাঠামো। দুই শক্তির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হলে সংকট সৃষ্টি হয়।

তিরিশ দশকের পর সোভিয়েতে যে পরিবর্তন আসে তার মূলে উৎপাদন এবং বন্টন-

ব্যবস্থার মধ্যে বিনষ্ট সংহতিকে দায়ী করা হয়। বিপ্লবের প্রথম দশকে সোভিয়েতে বন্টন-ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। বরং যথাযথ সঙ্গত করতে পারেনি উৎপাদন-শক্তি। রাষ্ট্রের সার্বভৌম নজরদারি উৎপাদনশীলতা খঞ্জ করে দিয়েছে। কী উৎপাদন হবে কী পরিমাণ উৎপাদন হবে সব ঠিক করে দিচ্ছে সরকার। কারখানায় কোটা বেটে দিচ্ছে। কাঁচামাল জোগান দিচ্ছে।

ফলে কী ঘটছে? যে পণ্যের চাহিদা নেই উৎপাদিত হয়ে পড়ে থাকছে। আবার চাহিদা আছে দাম ক্রয়ক্ষমতার বাইরে সেক্ষেত্রেও মাল গুদোম ঘরে ডাঁই হচ্ছে। কোটা সিস্টেমে সংখ্যা বিচার্য। গুণগত মান অবহেলিত। মুড়ি মুড়কির এক দাম। এটাও অপচয়ের কারণ। বহু ক্ষেত্রে উৎপন্ন মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যে কোনও সঙ্গতি নেই। ফলে ব্যাপক খয়রাতি। লোকসানের স্ফীতি। যে পণ্যের চাহিদা আছে মূল্য ক্রয়ক্ষমতার নাগালে অর্থাৎ বাজার রমরম—সে সব পণ্যের জোগানে টান আছে। অপ্রতুল উৎপাদন এবং প্রতুল চাহিদা। সৃষ্টি হচ্ছে বাটপাড়ি। জোগান এবং চাহিদার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কাড়াকাড়ি। সীমিত জোগান ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে। নেপো হয়ে দই মেরে দিচ্ছে দল এবং সরকারি আমরা জোট। আলুথালু বন্টনব্যবস্থায় ফসল তুলে নিচ্ছে সমর্থরা। কালের যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন ফসলের খেতে বাসা করে উপবাস।

উৎপাদন এবং আমলা আমে দুধে মিশে যাচ্ছে। আঁটি হয়ে পড়ে থাকছে জনগণ। দুর্নীতির গুটি তৈরি হয়। নিজের বেলা আঁটিশুটি আমলাতন্ত্র বিকশিত হয়। যার জঠরে বঞ্চনা-ক্ষোভ-অবদমন-ক্রোধ-হিংসার গর্ভ সঞ্চার হতে থাকে। যেন তেন প্রকারেণ কোটা ভরাও। কোটা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলে চাকরিতে বসে পড়া অথবা সাজা। জীবনের ওপর নেমে আসে অশনি সংকেত। উদ্ধারের একমাত্র রাস্তা কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ। অনুগ্রহ আদায়ে কারখানার ম্যানেজাররা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির চক্রে। অনিবার্য হচ্ছে হিসেব দাখিলে কারচুপি। ভূয়ো তথ্য সরবরাহ। জালি বিবৃতিতে প্রকৃত চিত্রের প্রবাস। ঘুষের চল। কর্তাভজা শাসনব্যবস্থার প্রচলনে দল এবং সরকার থেকে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভারী শিল্পের প্রতি একমাত্রিক ঝোঁক—অন্যদিকে ভোগ্যপণ্যের প্রতি উদাসীনতা জনগণকে রাগী করে রাখলো। সরকারের দিকে পার্টির দিকে মানুষের মুখ অন্তর্হিত।

সরকারের দিক থেকেও দুঃসময়। উৎপাদনমূল্য বেশি বিক্রয়মূল্য কম হচ্ছে। ভারসাম্য বাগে আনতে ভরতুকির প্লাবন। লক্ষ্যমাত্রা যদি 'নীট' উৎপাদন হত, অর্থাৎ কাঁচামাল, জ্বালানি, শ্রম, সময় ইত্যাদি কেটে ধার্য হত তাহলে ম্যানেজারের গরজ থাকত খরচার রাস টানার দিকে। অর্থনীতির নিজস্ব স্বভাব রুখে দিয়ে হুকুমশাহী পন্থায় চালনার চেষ্টায় সরকার দেউলে বনে যায়। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিবহন-গবেষণা-নিরাপত্তা প্রভৃতি পরিষেবামূলক খাতে ভরতুকি অনিবার্য। এর ওপর উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রেই যদি দাতব্য অব্যাহত থাকে তো ফকির হতে সময় লাগে হ্রস্ব। দ্রুত কোষাগার হয়ে যায় ঝাঁঝরা, সরকার মাথা মোটা পা সরু রিকেটগ্রস্ত শিশু অর্থনীতিতে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে।

ফোঁপরা অর্থনৈতিক স্বরূপ ফস করে জাগ্রত তা নয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে

স্বনির্ভরতার সূচক হিসেবে 'লাভ'-কে অর্থনৈতিক সংস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে স্থির করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ লিবারম্যান। প্রস্তাব বিবেচনা করতে স্তালিন নেতৃত্বকে তিনি দুবার চাপও দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ এবং ১৯৫০ সালে। ২ বারই প্রস্তাব খারিজ হয়।

লক্ষ্মণ যা—প্রসঙ্গচ্যুত হবে না উল্লেখ করলে যে উৎপাদনের ওপর মালিকানা এবং পরিচালনার কর্তৃত্ব সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বর্তালেই তা সমাজতন্ত্র হয় না। হয় রাষ্ট্রতন্ত্র। পুঁজিবাদ সমাজে শ্রমিকরা হচ্ছে পুঁজির দাম। রাষ্ট্রতন্ত্রে শ্রমিকরা হয়ে পড়ে আমলাতন্ত্রের দাম।

শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে আস্থাশীল হীরেন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দিয়েছেন স্তালিন নেতৃত্বে আমলাতন্ত্রের কিছু কিছু উপাদান বলবৎ ছিল। তৎসত্ত্বেও বাধা বিপত্তি বিচ্যুতির বন্ধুর পথ বেয়ে শ্রমিক একনায়কত্বে সমাজ সমাজতন্ত্রের সরণিতে সাম্যবাদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। হীরেন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়ে অনেক বিতর্কের ইশারা আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের উত্থান সমর্থন করেও সোভিয়েত সমাজের হয়ে নির্বিচার সওয়ালে প্রবৃত্ত হননি। তাঁর কাছে অন্ধ শ্রেণী মমত্ব কোনও কাজের কথা নয়। এ নিয়ে তাঁর উদ্বেগ আছে। নমুনা হিসেবে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরা যাক। 'কালের যাত্রা'-থেকে

পুরোহিত তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

মার্কস যেমন ভাবতেন শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালনাশক্তি সমাজকে ঠেলে দেবে সাম্যবাদের দিকে। যে সাম্যবাদে ব্যক্তি তার স্বাধীনতার কিছু অংশ যা সে অর্পণ করেছিল সমাজকে, এক্ষণে ফিরে পাবে গচ্ছিত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতার অনুষঙ্গ হিসেবে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান সংস্থানে বরাদ্দ সময় ৩-৪ ঘণ্টা। বাকি সময় শিকার সাহিত্যচর্চা বিশ্রাম ইত্যাদি উপভোগ্য জীবনের আশ্বাস। হীরেন্দ্রনাথ মার্কস মাথায় রেখে স্তালিনে ভর করেছেন পারাপারে। রবীন্দ্রনাথের শঙ্কা সন্দেহজাত ঢেউ খেলান প্রশ্নের সবুরতায় বিদ্ধ হননি।

৫

বিপ্লবের তিরিশ বছর পরেও মানুষ ফিরে পেল না ব্যক্তি স্বাধীনতা। যে মানব মুক্তির প্রতিশ্রুতিতে নতুন সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয় তার এমন করুণ পরিণতি মানুষকে শোকাবহ করে তুলবে আশ্চর্য কি! মানব মুক্তির অস্ত্র হিসেবে যে দল এবং রাষ্ট্রের পত্তন অতিরিক্ত শ্রীবৃদ্ধির ফলে সে হয়ে উঠলো ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের প্রতিপক্ষ। দুধ কলা দিয়ে যাকে পোষ মানানোর কথা সে পোষ মানল না। দাদাগিরি করতে চেপে বসল মাথায় সৃষ্টি স্রষ্টাকে

গ্রাস করার ফলে এলো বিচ্ছিন্নতা। স্তালিন আমলে সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষের দীর্ণ সততা বহু মনীষীকে ব্যথিত করেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর আঘাত এবং নিস্পেষণের চেহারা তিনি এইভাবে তুলে ধরেছেন : "—সোভিয়েত রাশিয়ার মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরোধ করে দেওয়া হয়েছে, এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। সেদিনকার ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় এই রকম মুখ চাপা দেওয়া এবং গর্ভমেন্ট-নীতির বিরুদ্ধবাদীর মত স্বাতন্ত্র্যকে জেলখানায় বা ফাঁসিকাঠে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা দিয়েছিল।" আক্ষেপপ্রসূত ব্যাখ্যা। আরো বিশদ করেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠিতে। উদ্ধৃতির কিছু অংশ হচ্ছে : "—ইউরোপ যখন খৃশ্চান শাস্ত্র বাক্যে জবরদস্ত ছিল তখন মানুষের হাড় গোড় ভেঙে, তাকে পুড়িয়ে বিধিয়ে, তাকে ঢিলিয়ে, ধর্মের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। আজ বলশেভিক সম্বন্ধে তার বন্ধু ও শত্রু উভয় পক্ষেরই পরস্পরের নামে নালিস এই যে, মানুষের মত স্বাতন্ত্রে অধিকারকে পীড়িত করা হচ্ছে। মাঝের থেকে পশ্চিম মহাদেশে আজ মানব প্রকৃতি দুই তরফ থেকেই ঢেলা খেয়ে মরছে।

আমার মনে পড়ছে আমাদের বাউলের গান—
নিঠুর গরজী,
তুমি কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটারি সবুর বিহুনে।
দেখনা আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দম্ভ— ঃ
এর আছে কোন উপায়।
কয় সে মদন দিস নে বেদন, শোন্ নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজধারা আপনহারা তাঁর বাণী শোনে
রে গরজী।"

উল্লেখ বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ শাসক সৌজন্যে রাজনীতিকদের কনডাক্টেড ট্যুর নয়। তাঁর সাবালকত্বের অভিজ্ঞান। পরিব্যাপ্ত তথ্য আহরণ বিশ্লেষণ এবং সংহতি প্রক্রিয়ায় গড়ে তোলা জ্ঞান ও উপলব্ধি। উপলব্ধির এই স্বরূপ কী কাব্যিক চরিত্রের অতিরঞ্জন, একপেশে? না, সহজ ধারা যে বিপন্ন হয়েছিল কমিউনিস্ট হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক সুশোভন সরকারেরও এক উপলব্ধি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই ভাবে, "—এক পার্টির শাসন কি সব অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী? স্তালিন এই-সব প্রশ্ন সরাসরি অগ্রাহ্য করে সাম্যবাদকে ব্যাহত করেছিলেন। প্রায় সব বিপ্লবেই কিছুটা রক্তক্ষয় হয়ত অনিবার্য, কিন্তু স্তালিনে 'টেরর'? শুধু লেনিনের সহকর্মী 'প্রাচীন' বলশেভিকরা নন, হাজার হাজার কত

সাধারণ কর্মী যে নিষ্পেষিত, অমানুষিকভাবে উৎপীড়িত, নিহত, অজ্ঞাতরূপে অদৃশ্য, চিরজীবনের মতন পঙ্গু হয়েছিলেন তার হিসাব কে দেবে? বিপ্লবের ষাট বছর পরেও যদি মত-প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে তবে মার্ক্সের বহুঘোষিত মানবতাবাদের কি বাকি রইল?''—শারদীয় বারোমাস। ১৯৭৯। ঈদৃশ উপলব্ধির ভিত্তিমূলক উপাদান হীরেন্দ্রনাথের চোখে ধুলো দিয়েছে ভাবলে ভুল হবে। আসলে স্তালিন চরিত্রের সাংগঠনিক দক্ষতার ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্তালিন যে লাল ফৌজ এবং মজবুত পার্টি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন সংগঠনের ইতিহাসে তা বিরল উদাহরণ। অন্তত সোভিয়েত মাটিতে এই টীকা যে সুপ্রযুক্ত ৩টি ঘটনার স্মরণ নিলে তা ফুটে ওঠে। হাঙ্গেরী-চেকোশ্লোভাকিয়া-আফগানিস্তানে যে ফৌজি অভিযান হয়েছিল তা সংগঠিত হয়েছিল স্তালিন পরবর্তী নেতৃত্বে। স্তালিন তখন ছাঁটাই। অথচ স্তালিনবাদের শেকড় কী গভীর!

স্তালিনীয় আনুগত্যের চাহিদায় মানুষের জীবনযাপনে নিজস্ব পদ্ধতির ওপরও আঘাত করা হয়েছে। স্বভাবধর্মে সোভিয়েত জনগণ ধর্মপ্রবণ। আত্মশুদ্ধি-স্বীকারোক্তিতে তারা চার্চের শরণ নেয়। স্বাভাবিক প্রবণতার ওপর নির্মাণ করা হল বাঁধ। সাংস্কৃতিক অগ্রগতির দ্যোতক হিসেবে সরকার গর্বভরে ঘোষণা করল মানুষ আর পাপ ক্ষলনে পুণ্যাতুর হয়ে চার্চে মসজিদে হাজিরা দেয় না। যদিও পরিষেবা দিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আয়োজন ব্যাপক। পরিষেবার আয়োজন আছে গ্রাহক নেই। ঘোষণায় প্রচ্ছন্ন চমকানি। সরকার যে সংকেত পাঠাতে চায় জনগণ তা আঁচ করে। কার এমন বুকের পাটা আর ধর্মস্থানে ঢুঁ মারে। অতএব ধর্মস্থান খাঁ-খাঁ। এইভাবে ঘটে যায় প্রবৃত্তি হননের অস্ত্রোপচার।

একই সঙ্গে জমতে থাকে ক্ষোভ। সামাজিক রীতিনীতির মধ্য দিয়ে ধীরে-ধীরে গড়া ওঠা বহুদিনের পোক্ত লোকাচার মানস গঠন আধ্যাত্মিক ঝোঁক জোরাজুরি করে রুখে দিলে ফল ভাল হয় না। জনগণের এই অসন্তুষ্ট মানসভূমির হদিস পেল না দল এবং সরকার। তাই হয়। আত্মবিহ্বলতার ধর্ম হচ্ছে অপরের কাছ থেকে পাঠ না নেওয়া। অতুলপ্রসাদের সেই কলির মতো : নিচুর কাচে হতে নিচু শিখলি না রে মন। ফলে রাশিয়ার ভৌগলিক সত্তা রক্ষা পায় হেজে যায় আত্মা। বরিস পাস্তেরনাক তাঁর উপন্যাসে যেমন ফুটিয়েছেন সেই ছবি।

ঠিক যে অবস্থা সঙ্গীন। কিন্তু এই অবস্থা ব্যক্তি চরিত্রের অংশ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এটা রাজনীতিবিদের সমস্যা নয়। রাজনীতির অন্তর্গত সংকট। রাজনীতির স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ বিজ্ঞ হীরেন্দ্রনাথ মানবিক বিপর্যয়কে কটূ চোখে দেখেছেন। কিন্তু দুর্দশাকে স্তালিন চরিত্রের অনুদান হিসেবে প্রতিপন্ন করে সামাজিক পটভূমির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেননি। স্তালিন ক্রূর কঠোর এবং সতীর্থদের প্রতি মমতাশূন্য—লেনিনের এই মন্তব্য আপ্তবাক্য হিসেবে মান্যতার দায় না থাকলে বলা যায় হীরেন্দ্রনাথের স্তালিনচর্চার সংগ্রহে এমন কোনও তথ্য সম্ভার নেই যার আশ্রয়ে স্তালিনকে অমানবিক আখ্যা দেওয়া যায়। এইচ. জি. ওয়েলসের সঙ্গে স্তালিনের এক সাক্ষাৎকারে আমরাও জেনেছি, স্তালিন কথোপকথনের এক পর্বে জানাচ্ছেন তাঁকে পরিস্থিতির চাপে এমন অনেক সিদ্ধান্ত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যা খুবই বেদনাদায়ক।

ধর্তব্য হচ্ছে 'বেদনাদায়ক'—শব্দ প্রক্ষেপের অন্তর্গতে প্রচ্ছন্ন অনুতাপ আফসোস এবং দুঃখ কাতরতার সুর উৎকীর্ণ। বিপর্যস্ত মানবতার দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে সচরাচর কোনও স্বৈরশাসক 'বেদনাদায়ক'—শব্দ, যে শব্দের চরিত্রে কষ্টের অনুভব যুক্ত তা প্রয়োগ করে থাকেন না।

আবার এমনকী শত্রুশক্তিকে পরাস্ত করতে এক দফা কর্মসূচি হিসেবে হিংসার আয়োজন মার্কসীয় পাঠশালায় অনুমোদিত নয়। Economic and Philosophical Manuscripts of 1844 হাতে আসার পর। কাজেই উদ্দেশ্য লঘু অথবা গুরু সে বিচার বড় কথা নয়। বড় কথা হল মার্কসবাদের দোহাই পেড়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করার যোগ্যতা আসে না। এমন হলে রবীন্দ্রনাথের সেই কলি স্মরণে আসে। তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।

আবার যত দোষ নন্দ ঘোষ বলে স্তালিনকে মুর্গি বানানোর মধ্যে বিস্তর কারচুপি আছে। নাবালক মনস্তত্ত্ব কাজ করে। ভুলে গেলে চলবে না নায়ক মাত্রই সমাজের এক অংশ বা সামগ্রিক অংশের প্রতিভূ। হতশ্রী দিশাহীন বিপন্ন মানবতার ধূসর সন্ধিক্ষণে ব্যক্তিবাদ বা অবতারবাদের উন্মেষ। গজিয়ে ওঠে নাবালক দর্শন। নায়ক আর নিছক ব্যক্তিসত্তা নয়। হয়ে ওঠে ইচ্ছাপূরণের প্রতিরূপ।

জনমানসের প্রকৃত চিত্রটা হীরেন্দ্রনাথ যথাযথ চিহ্নিত করেছেন। সেই সময় সোভিয়েত জনগণ তিনপ্রকার যুদ্ধে বিধ্বস্ত। বাতাস বহন করছে বারুদের গন্ধ। ধু ধু হাহাকারী অনুভবে ছেয়ে যাচ্ছে অন্তর। গৃহযুদ্ধের ঘা শুকোতে না শুকোতে আবার যুদ্ধ। যুদ্ধের বলি চার কোটি কথা ছিল কেউ বাঁচবে না। আশ্চর্যভাবে ঘরে ঘরে কেউ কেউ বাঁচল। সেই যে বলে না হরি যাকে রাখে। যারা বাঁচল তারা চিন্ময় স্মৃতিসৌধ। বিষণ্ণতায় স্তব্ধ। হতাশায় মূহ্যমান। এইসব মূক ম্লান অবসন্ন মুখে ভাষা জোগাতে হবে। আশা জাগিয়ে তুলতে হবে। কঠিন কাজ। অনেক.....অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ। থাক পড়ে—এই বঙ্গীয়করণ স্তালিনের ধাতে নেই। স্তালিন অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। বিলাপ বিলাসীও ছিলেন না। কর্মচঞ্চলতা তাঁর অঙ্গলগ্ন। সোভিয়েত পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন। তাঁর সামনে পড়ে আছে অনেক কাজ। পরিবেশ জটিল প্রতিকূল। ইউরোপ মানদণ্ডে পিছিয়ে থাকা অর্থনীতি। ঘরে ঘরে প্রিয়জন বিয়োগ। সম্ভোগবাদের হাতছানি। পড়শি নাগরিকদের ক্রমাগত প্ররোচনা জীবন দুদিনের জন্য বৈ তো নয়। এসো উপভোগ করি।

পরিস্থিতি এমন হলে ধৈর্য সহিষ্ণুতা গলে যায়। চটজলদি ত্রাণকার্যই মুখ্য হয়ে ওঠে। অর্থনীতিতে আনতে হয় হরিণী ছন্দ। এমন ক্ষণে তত্ত্ব নিয়ে বিশুদ্ধতার কচকচি লাটে ওঠে। সমস্যার নিরসনে স্তালিন জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করেন। দুটি কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেন। (ক) সোভিয়েত শত্রু হিসেবে ধনবাদী রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করা। (খ) সোভিয়েত আক্রান্ত এই মনোবিকলনে গোটা দেশকে আবিষ্ট করে সোভিয়েতকে ঐক্যবদ্ধ করা। এটা প্রয়োজন হয়েছিল ত্যাগে এবং কৃচ্ছসাধনে। চড়া দামের বিনিময়ে হলেও উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। বিশ্ব সমাজে সোভিয়েত রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল, সম্ভ্রম আদায়ী রাষ্ট্র।

হীরেন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র মনস্কতা কেন্দ্রীভূত করেছেন সমাজ-সংস্থা আশা-নিরাশার পটভূমিতে। যে পটভূমিতে স্তালিন হয়ে মনস্কতা কেন্দ্রীভূত করেছেন সমাজ-সংস্থা আশা-নিরাশার পটভূমিতে। যে পটভূমিতে স্তালিন হয়ে উঠেছেন যোগ্য নায়ক। এই যোগ্যতার গায়ে গায়ে সমালোচনার অন্য ধারাও লেপটে ছিল। যে ধারার মধ্যে আছে স্তালিন চরিত্রের অগণতান্ত্রিক ঝোঁকে। শিল্প-কলা বিজ্ঞানসাধনায় তাঁর আমলে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। এর আগে অন্বেষণচর্চার প্রথম ঘাতক হিসেবে নিন্দাভাজন হয়েছেন ঈশ্বরের চর পাদ্রীসমাজ। বিজ্ঞানচর্চায় স্বাধীনতা না থাকার অর্থ অজ্ঞ যুগ টিকিয়ে রাখা। ইতিহাসে এমন অধ্যায় এলে বলা হয় অদ্ভুত এক আঁধার নেমেছে। এমন আঁধার নেমেছিল ৪৯৯ এবং ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময় ঈশ্বর সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড ধারণার একমুখী চিন্তার বিপন্নতা সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিপন্ন প্রথার ঘাতক আর্যভট্ট এবং গ্যালিলেও। তাঁরা শৈশব সারল্যে শূদ্রোচিত কুঠারাঘাত করলেন। আর্যভট্ট পরীক্ষালব্ধজ্ঞানে জানালেন রাহু কেতুর ক্রোধানলে নয় গ্রহণ হয় সূর্য চন্দ্র এবং পৃথিবীর একই সরল রেখায় কাছাকাছি থাকার কারণে। গ্যালিলেও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আহৃত জ্ঞানে ঘোষণা করলেন, হ্যাঁ কোপারনিকাস তুমি সত্য। পৃথিবী ঘুরছে। দুজনকেই হেনস্থা এবং শাস্তির খপ্পরে পড়তে হয়েছিল। আর এ সংবাদও বিদিত যে জ্ঞান অর্জনের জীবনবিমা হচ্ছে গণতন্ত্র। চিন্তার স্বাধীনতা হননের অর্থ আবিষ্কার এবং সঙ্কট মোচনের পথ উদ্ভাবনের উৎস বন্ধ করা।

উল্লেখ্য যে হীরেন্দ্রনাথ মনে করেন জ্ঞানেই মুক্তি। সেই সূত্রেই চিন্তার স্বাধীনতায় বিষম শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মতে "মানুষ কোথাও কোনকালে নিখুঁত হতে পারে না।" তিনি বলছেন, "তাই প্রবল কর্তৃপক্ষীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকায়তবাদ যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের বঞ্চিত জনতার জীবনবোধকে প্রকাশের প্রয়াস করেছে।"—মার্কসবাদ ও মুক্তমতি।

অথচ স্তালিনের গণতন্ত্র বিমুখতা যে হীরেন্দ্রনাথের মৌল সমালোচনা থেকে যে রেহাই পায় বা একপ্রকার উদাসীনতায় পলকা গুরুত্ব পায় তার উৎস কী!

হীরেন্দ্রনাথের মনের হদিস দুর্লভ নয়। তাঁর মনোভূমির আদ্যপান্ত ছিল এক নির্দিষ্ট স্বপ্নের আচ্ছন্নতায় ঘোর ঘোর অনুভব। শোষিত শ্রেণীকে রাষ্ট্রশক্তির সিংহাসনে শুধু আরোহণ নয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রূপকার হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে তাঁর ছিল ব্যাকুলতা। তাড়া একদিকে থরথর অপেক্ষা অন্যদিকে সোভিয়েত জনগণ—যাদের জীবনে চার কোটি জীবনের অবক্ষয়, ধূসর স্মৃতি। রিক্ত বর্তমান এবং শত্রুবেষ্টিত ভৌগোলিক সত্তা। করুণ মানচিত্র। পুরুষকারের প্রতি হীরেন্দ্রনাথ ভরসা রেখেছিলেন। তাঁর পৌরুষ সাধনা তৃপ্ত হয়েছিলো স্তালিন ব্যক্তিত্বে। যে স্তালিনের চোখে অর্জুনের একাগ্রতা। মাছবিদ্ধ চোখ উত্তরণমুখী। রাশিয়ার শ্রমিক সত্তা রাশিয়ার ভৌগলিক সত্তা যার একমাত্র আরাধ্য বিষয়। লক্ষ্যই কাম্য আর সব ব্রাত্য। উপায় নিয়ে কোনও সংস্কার নেই। যেন উত্তীয়র কণ্ঠস্বর ন্যায় অন্যায় জানিনে, জানিনে, জানিনে —শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি।

নিঃসন্দেহ নিশ্চিতি লক্ষ করে স্তালিন গড়ে তুলেছিলেন নিচ্ছিদ্র প্রাকার। হীরেন্দ্রনাথ এই অমোঘ নিশ্চিতির সংকল্প স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে

ধর্মের দোহাই দিয়ে এই অপকর্মটি সংগঠিত হয়। তাঁর ভাষা ধার করে বলা যাক, "নিশ্চিতির কথা জোর গলায় বলতে না পারলে বোধ হয় বহুজনকে চরম উন্মাদনার আস্বাদ দিয়ে কাজে নামানো যায় না—সে নিশ্চিতি ভগবানের কিংবা ইতিহাসের নামেই ধর্ম এবং কমিউনিজম প্রচার করে এসেছে।"—মার্কসবাদ ও মুক্তমতি।

হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন 'জানাতেই মুক্তি'। আস্থা রাখেন গ্রিক বচনে 'জ্ঞানই শক্তি'। মুক্তমতি এবং মার্কসবাদ প্রবন্ধের এই হচ্ছে নির্যাস। এ থেকে স্পষ্ট হয় তাঁর স্তালিনপ্রীতিকে তিনি স্থান দিতে উৎসুক যুক্তিনির্ভরতার ওপর। স্তালিন সংখ্যাগুরু—লঘু মতামতের ধার ধারতেন না। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসনে এই প্রথা মোটেই খাপছাড়া নয়। লেনিনও অন্তত দুবার, এক, NEP-প্রসঙ্গে এবং দুই, জার্মান শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে দলে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও নিজের মত দলের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আদর্শবাদ পূর্ণতা পায় প্রতিষ্ঠার কোলে। স্তালিনকে বুঝতে এটাই হচ্ছে তোরণপথ। হীরেন্দ্রনাথ এই সার সত্য বুঝেছিলেন। লক্ষ্যে স্থির থাকা বিপ্লবী ধর্ম। সেদিক দিয়েও স্তালিন ছিলেন সাচ্চা বিপ্লবী। এটা হীরেন্দ্রনাথের কাছে নেতৃত্বের আকর্ষণীয় দিক।

সংগঠনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি যেমন মনে করেন সংগঠনের চরিত্র হচ্ছে বহুত্ববাদী ব্যবস্থা উপেক্ষা করা। একই সঙ্গে তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির স্বচ্ছতায় এও ধরা পড়েছিল যে উক্ত সত্যের ছায়ায় আরো এক গূঢ় ছায়া আছে। আছে অনির্ধারক অংশ। তা হল ভবিতব্যের আশায় হাত ধুয়ে বসে থাকার ধরতাই মানলে মানবমুক্তির কালসীমা একচুলও হ্রস্ব হবে না। তাই তাঁর একদিকে উষ্মা পাশাপাশি প্রত্যয়। উদ্ধৃতি আশ্রয় করে হীরন্দ্রেনাথ মজা করে বলছেন, "God has a Problem because his will must be implemented through human beings–।" সমাজতন্ত্রকেও সমস্যাটা ভোগ করতে হয়। নিজেকে ফোটাতে সমাজতন্ত্রেরও চাই মধ্যস্থতা। সংগঠন হচ্ছে সেই যোগসূত্র। বিকল্পহীন সহায়।

একদিকে দুঃখ জর্জরতা, বিধুর জীবন, অন্তহীন আশা—অন্যদিকে সাম্যবাদের হাতছানি। মাঝখানে যোজকের মতো সমাজতন্ত্রের জোড়। দিগন্তের নব দিকচিহ্ন। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা জোগাতে এই মন্ত্র ধন্বন্তরী। মন্ত্রটা ঠিকঠাক জনসমাজে চারিয়ে দিতে বিপুল আয়োজন জরুরি। সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আয়োজন পূর্ণতা পায়। কিন্তু সেই ভিড়ে বিশিষ্টতার জোরে কেউ কেউ হয়ে ওঠেন পুরোহিত। প্রতিভূ। এই বিশিষ্টতা স্তালিনে প্রত্যক্ষ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ।

যে বাস্তবতায় ব্যক্তি স্তালিনের রূপান্তর হয়েছিল স্তালিনবাদে—কেমন সে বাস্তবতার স্বরূপ! নজর দেওয়া যাক সোভিয়েত সমাজে।

তছনছ সোভিয়েত সমাজ। শিল্পায়নের যে স্বল্প পরিকাঠামো ছিল তা বিনষ্ট। জমির কর্ষণযোগ্যতা অবক্ষয়ী। গৃহযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধর পরিণতিতে জমির ওপর পড়েছে অনুর্বরতার আস্তরণ। শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনে খরার প্রার্দুভাব। স্তালিনের সামনে দুটো রাস্তা খোলা। প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করে উৎপাদনব্যবস্থা শুরু করায় হিসেব কষে দেখা গেছে

এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদনব্যবস্থা চালু করতে কমসে কম দশ বছর লেগে যাবে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সঙ্গীন। সৈন্যদের পায়ে বুট নেই। যুগোপযোগী অস্ত্র নেই। লাল ফৌজ গড়তে হবে। একদিকে উন্নত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পাশাপাশি আর্থিক উন্নয়ন—উভয় কাজই জরুরি হিসেবে যোগ্য হয়। উন্নয়নের সঙ্গে পরিকল্পনার যোগ নিবিড়। বিনিয়োগ-উৎপাদন-বাজার। শ্রম-মজুরি-উদ্বৃত্ত মূল্য-লাভ। দীর্ঘমেয়াদী জটিল প্রক্রিয়া। এদিকে জনসমাজ তেতে আছে। উপোস ভঙ্গের তাড়নায় ছটফট করছে। তর নেই। আপৎকালীন সময়। ক্রমে ক্রমে নয় লাফিয়ে লাফিয়ে গন্তব্যে নীত হতে চাইলেন স্তালিন। একই সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ এবং উৎপাদনব্যবস্থা চালু করতে উদ্যোগী হলেন। অধিক তৎপরতায় পোক্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গঠিত হল। মূলধন সংগ্রহের জন্য কৃষি সম্পদ আহরণ করে ব্যাপক যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন করলেন। এইভাবে স্তালিন বর্তমান চাহিদা ও বাস্তবতাকে মূল্য দিলেন। অর্থাৎ জনগণের মানসভূমি স্পর্শ করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিলেন।

৬

সোভিয়েতের সামাজিক উপাদান, পার্টি সংগঠন এবং কর্মীসংকলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনও কোনও মহল থেকে স্তালিনকে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যেন স্তালিন এক 'ঐশী' মহাশক্তিমান বা শয়তানী ক্ষমতার অধিকারী। অনিষ্টের গোদা। স্তালিনকে সহজভাবে গ্রহণ না করার আড়ালে আরো এক নিভৃত কারণ আছে। যার অস্তিত্ব মনস্তাত্ত্বিক খুপরিতে। স্তালিন মুচি বংশোদ্ভূত। অ-ইউরোপীয়। আকৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, কুলুজি—যা কিছু আভিজাত্যের দ্যোতক স্তালিন সে বিষয়ে প্রতিবন্ধী। এদিকে পার্টির আকাশে তখন ট্রৎস্কি বুখারিন প্লেখানভ মলোটভ জুকভ প্রমুখ তাবড় তাবড় নেতার আসর। প্রসিদ্ধ গ্রন্থবিদ এবং বিপ্লবের মহান সব কুশীলব। লেনিনের বাতাবরণ অপসৃত হলে কুলীন সংস্কৃতি জমি পায়। স্বদেশ এবং বিদেশে যার ঠেক বিস্তৃত।

এখানে হীরেন্দ্রনাথ অন্যথা। নিম্নবর্গের প্রতি টান শ্রদ্ধা তাঁকে দান করেছে নির্মোহ বিশ্লেষণের মনোবৃত্তি। যে মূল্যায়নের দাবিতে আভিজাত্য প্রথা আস্কারা ভোগে। স্তালিনকে তিনি খাড়া করেছেন ইতিহাসের কালপটে। ফলে সাব-অলটার্ন তাৎপর্য পেয়ে যায় তাঁর নিরীক্ষণ।

স্তালিনের সাংস্কৃতিক মনোভূমি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ। তিনি তুলনা করতে প্রসঙ্গ টেনেছেন মাও সে তুং। চীনের সভ্যতা ভারতবর্ষের মতোই প্রবীণ। উভয় সংস্কৃতিতে মিলে মিশে আছে ধৈর্য সহনশীলতা বহুমুখী চিন্তার প্রবাহ। অপেক্ষার আগ্রহ। মাও যে সংস্কৃতির উত্তরাধিকার স্তালিন তা থেকে বঞ্চিত। বহুমুখী জীবনচর্চার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রথা—যে কনফুসিয়াস ঐতিহ্য চীন এবং ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গে লেপটে আছে, বিবিধের মাঝে মিলনের ঘরানা যা চীন এবং ভারতবর্ষের ঘরকন্না। স্তালিনের রাশিয়া সেই একান্নবর্তী ঘর গৃহস্থালীর সঙ্গে পরিচিত নয়। ঐতিহ্য-বিরহ স্তালিনের মানসিক গঠনকে গড়ে তুলেছিল নিষ্ঠুর, চটপটে, অস্থির। ব্যস্ত। এমনই ঐতিহাসিক পটভূমিকার ইশারা হীরেন্দ্রনাথ দিয়েছেন 'চরৈবেতি চরৈবেতি' প্রবন্ধে।

স্তালিনের কিছু কাজে বিশ্বজনমত থতমত। যেমন ১৯৩৯ সালে জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি। সাম্যবাদী এবং সাম্যবাদীদের প্রতি প্রশ্রয়শীল শিবির হতবিহ্বল। গালে বিরাট থাপ্পড় পড়ল। নাৎসি নায়ক হিটলার হয়ে যাচ্ছে সখা। ভাবা যায়! ছি ছি। বিপ্লব আর ধোয়া তুলসি রইল না।

সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আরো এক প্রসঙ্গ। জার্মানী এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে সহযোদ্ধাদের তেমনভাবে স্তালিন নাকি সাহায্য করেননি। গুরু ভাই গুরু ভাইকে না দেখলে কোথায় আমার বাস। বলশেভিক প্রত্যাশা আলুথালু হয়ে যায়। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে চোখ সয়ে এলে অনুধাবন করা যায় এতে এমন কিছু চমক নেই। তথাকথিত তত্ত্বের বিশুদ্ধতায় পলি পড়েছে অনেক আগেই। বিপ্লবের পুরোধা লেনিনের আমলে। দুবার। একবার, NEP প্রচলনে। ট্রৎস্কি রেগে কাঁই। একী! সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত স্বত্ব? পুঁজিবাদের পুনর্বাসন হয়ে যাচ্ছে না! তত্ত্বের কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ট্রৎস্কির যুক্তি হয়ত প্রবল। কিন্তু বিপ্লবকে লোকান্তরে পাঠিয়ে বিপ্লবীতত্ত্বের কৌমার্য রক্ষা করা লেনিনের কাছে বাতুল গণ্য হল। ধ্বংস অলংকৃত বৃহত্তম সমাজ কৃষকের 'সোভিয়েত রাষ্ট্র'-কে রক্ষা করাই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পায়। দ্বিতীয় বার, বেস্টলিটোভসক চুক্তি। এ ব্যাপারেও ট্রৎস্কির আপত্তি। তাঁর কাছে এই চুক্তির অর্থ জার্মানীর কাছে টুপি খুলে দেওয়া। লেনিন আপত্তি পাত্তা না দিয়ে চুক্তি করেছিলেন। লেনিন চেয়েছিলেন যুদ্ধের আবহ থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে রাখতে।

স্তালিন লেনিনের এই ধারার উত্তরসূরী। তত্ত্ব পরিষেবা নয় লক্ষ্য পরিষেবার প্রতি অনুরক্ত। অনাক্রমণ চুক্তি করে স্তালিনও চেয়েছিলেন যুদ্ধের পরিমণ্ডল থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন রাখতে। স্তালিন সংবাদ পেয়েছিলেন পশ্চিমী দুনিয়া ষড়যন্ত্র করছে জার্মানীকে রাশিয়ার সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত করে দিতে। অহরহ কূটাভাস চলছে নাৎসি নায়ক হিটলার যেন বলশেভিক নায়ক স্তালিনের অস্তিত্ব ও প্রকাশকে ভোগে পাঠিয়ে দেয়। একপ্রকার ভীতি-বিহ্বল মনস্তত্ত্ব স্তালিনকে প্ররোচিত করেছে হিটলারের সঙ্গে আপস করতে।

আসলে স্তালিনের কাছে সোভিয়েত ছিল বিশ্বমঞ্চ। "আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।"

সর্বজনীন মানবসমাজের প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত জনসমাজকে সংস্থাপন করা গেল না বলে আক্ষেপ প্রসূত অভিযোগে স্তালিনকে অভিযুক্ত করার অর্থ উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো। বিজ্ঞান সাধনা দেশকাল নিরপেক্ষ। কিন্তু সমাজ বিপ্লবীদের জাতীয়তাবোধ অমোঘ। তাছাড়া 'শ্রমজীবীদের দেশ নেই' বলে কমিউনিস্ট ইসতেহারে ঘোষিত তত্ত্ব অনেক বছর আগে থেকেই শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে। ১৯১৭ সালে জন্মলগ্ন থেকেই লেনিনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'সোভিয়েত ইউনিয়ন'। এমনকী জাতীয় সংগীত হিসেবে সর্বহারার আন্তর্জাতির সংগীতও কল্কে পায়নি। স্থান পেয়েছে রুশী নায়কদের গৌরবগাথামূলক দেশজ সংগীত। বিশ্বজনীন শ্রমিক শাসনের আশাতুর ছলনে ট্রৎস্কি আপন সন্তান বিপ্লবকে জঠরস্থ করতে মহাকাব্যিক স্বপ্নাবিষ্ট ছিলেন।

ট্রৎস্কির ঠিক বিপ্রতীপ ধারায় অবস্থান ছিল স্তালিনের। সময়ের কাছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কাছে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে তাঁর সমূহ মেধা কর্মদক্ষতা আকাঙ্ক্ষা উৎসর্গীকৃত। হীরেন্দ্রনাথের কাছে এটা কোনও বিচ্যুতি নয়। বরং পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের যে-কোনও বিপ্লবীর এ হচ্ছে সাধারণ পাঠক্রম। তাই হীরেন্দ্রনাথের কাছে স্তালিনের এই মনস্কাম ভ্রষ্টতা নয় বাস্তব চেতনার ধারক হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। কাজেই স্তালিন 'জাতীয়তাবাদী'—এই কারণে স্তালিন চরিত্রে ডাকিনী সন্ধান অমূলক। দ্বিজত্ব তত্ত্বের স্বভাব। ভাবরাজ্যে সে কাব্যিক। মাটিতে নামলে স্থূল বনে যায়।

সোচ্চার হতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আড়ি পাতলে শোনা যায় মানুষ যে হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল। মানুষ চাইছে অবাধ গণতন্ত্র। উন্নত জীবনযাত্রা। চাহিদার উন্মেষ সহসা নয়। উর্বর পটভূমি আছে। যার ঐতিহ্যসূত্র ১৯২৮ সাল। পরিকল্পিত অর্থনীতির গতিপথে। ভারী শিল্পের অনুসৃতিতে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়েছিল। তারই পথ ধরে নাগরিকরা ব্যাপক গণতন্ত্রের চাহিদা এবং উন্নত জীবনযাপনের আসক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই পর্বের সফলতাই পরবর্তী অভাববোধের প্রসবী।

এখানেই কিছু চিত্র উঁকি দেয় যা নিরতিশয় অস্বস্তির কাঁটা। বিকল্প পথের সন্ধান, ভিন্ন মতের প্রকাশ, জীবনচর্চা এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ওপর দলীয় অনুশাসন। পদে পদে বিধিনিষেধ—যেয়ো নাকো ঐখানে কোর নাকো ঐ কাজ। বিচরণভূমিতে খড়ির গণ্ডী। লক্ষ্মণ রেখা। ডিঙোলে কাঠোর শাস্তি। অনেকে দণ্ড ভোগ করেছেন। অনেকে শাস্তির আতঙ্কে হয়ে গেছেন শম্বুক। জ্ঞানীরা মেধা বুদ্ধির ডিপোয় ঝাঁপ ফেলে দিয়েছেন। বিপন্ন হয়েছে রাশিয়ান আত্মা। লাঞ্ছিত হয়েছে মানবাধিকার।

খুচরো অবক্ষয় টুকিটাকি বিচ্যুতিকে হীরেন্দ্রনাথ ছাড় দেননি। পড়া দেখা শোনা এবং অভিব্যক্তিতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। লেখনী বাচন আলাপচারিতা নানান আঙ্গিকে তিনি প্রকাশ করেছেন আপত্তি। তবে সত্যি বলতে কী বৃহৎ স্বার্থের আনুগত্যে তিনি তাঁর মননক্রিয়ায় স্তালিন বিচ্যুতিকে প্রধান স্থান দখল নিতে দেননি। বৌদ্ধিক অভিযানে উৎখাত করেছেন স্তালিন বিরূপতার ভগ্নস্তূপ।

৭

মানুষ হচ্ছে সামাজিক পটভূমির টানাপোড়েনে গড়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন জটিল সত্তা। নিখুঁত সত্তা বলে কিছু নেই। পূর্ণাঙ্গতার অন্বেষণ আছে। অবসান নেই। পরিমিত মানবতার আশ্রয়ে হীরেন্দ্রনাথ ব্যক্তির মূল্যায়নে উৎসুক। তাঁর ভাষা কর্জ করে বলা যায়, "—মানুষের মনে দেহে আছে আশ্চর্য শক্তি, আশ্চর্য প্রসন্নতা, আশ্চর্য নীচতা, আশ্চর্য সহনশীলতা, আশ্চর্য নিষ্ঠুরতা, আশ্চর্য মহানুভবতা।" তিনি ব্যথিত হন লক্ষ করে যে একদা স্তালিনকে কোনও কোনও পক্ষ "অভ্রান্ত, সদাবিশুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ.....বলে চিহ্নিত করে মানবাধিকার এলাকা থেকেই বাইরে বসিয়ে মান্য করার রেওয়াজ চালিয়েছিল। .....বলে চিহ্নিত করে মানবাধিকার এলাকা থেকেই বাইরে বসিয়ে মান্য করার রেওয়াজ চালিয়েছিল।" —(অল্পে সুখ নেই) এখন তারাই আবার এক পক্ষের স্তালিনকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অপরিণামদর্শী দানবিক

বলে আখ্যাত করার দিকে প্রবল প্রবণতা। উভয় মনোভঙ্গী হীরেন্দ্রনাথের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে একটেরে। তাঁর প্রত্যয় সত্যানুসন্ধান নয় প্রসাদ ভিক্ষুতা ঈদৃশ মুমূর্ষু মনোবৃত্তির সৃজনকেন্দ্র। ব্যক্তিচর্চা প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের মতামতের ঝোঁক হচ্ছে যে ঐতিহাসিক ভৌগলিক সমাজের মাটিতে ব্যক্তির পা প্রোথিত—সেই কালপট থেকে পদযুগল ছিন্ন করে ব্যক্তিসত্তার ঠিকুজিচর্চা হয়ে যায় কিমাকার। মনে রাখা দরকার স্তালিনের রাজত্বকাল যার সূচনাপর্ব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ পর্ব। ব্যাপ্ত পাঁচ দশকের প্রথম পর্ব অবধি। অর্থাৎ বৃহদাংশ শিল্পযুগের অন্তর্ভুক্ত। শেষ ক্ষুদ্রাংশ প্রযুক্তি যুগের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। যদি বলা যায় স্তালিন নেতৃত্ব সোভিয়েত সমাজ থেকে উদ্ভূত 'প্রয়োজনাত্মক অভিব্যক্তি' এবং নতুন যুগের প্রয়োজনাত্মক তাড়াই গর্ভসঞ্চার করেছে স্তালিনবাদ অন্তোষ্টির। এই ব্যাখ্যাই কি যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের ঘনিষ্ট শরিক হয়ে যায় না!

প্রশ্ন উঠে আসে কী সেই নবজাত দাবি—অনুভব?

ইতিপূর্বে দৃষ্টান্তমূলক হয়নি যে অবয়ব তা হচ্ছে সমাজ-সংস্থার ওপর রাজনৈতিক প্রভুত্ববাদের ঘরানায় অভ্যস্ত মানুষ রাজনৈতিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে। অর্থনীতি-লোকাচার-রাজনীতির মিলিঝুলি সহবাস হচ্ছে সমাজ। যত প্রকার নীতির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের বন্ধন তার মধ্যে আর্থিক বন্ধন সবচেয়ে নিবিড়। ধনবিদ্যার ভূমিকা নিয়ে উপক্রমণিকায় ব্যাপক গ্রাহ্যতা সুলভ। উপসংহার নিয়ে নানা মুনির নানা মত। রাজনীতির উপজীব্য বিষয় অর্থনীতি। রাজনীতির আঙিনায় এসে অর্থনৈতিক শাসন এবং অনটন বশ্যতামোচন করতে পারলেই মানব মুক্তি কূল পায় না। বৈভবী সমাজ তাক করলেই এর সত্যতা স্পষ্ট হয়। বৈভবী রাষ্ট্রেও এমন সমাজ হয়নি যে সমাজ 'বসুধারে রাখে নাই খণ্ড খণ্ড করি'। ভোগবাদ যত পুষ্ট হচ্ছে দেখা যাচ্ছে রীতিনীতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পৌরসমাজ লোকাচার বিধৃত জনসমাজ ঝুরঝুর হয়ে যাচ্ছে। এ হচ্ছে প্রযুক্তির সংহার রূপ। প্রযুক্তির যুগে সমাজের স্থান দখল নিচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এই পটভূমিতে ইতিউতি নতুন চিন্তার ছায়া পড়ছে। খোঁজ শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিকল্প সন্ধান। বিকল্প সন্ধানীদের ব্যাখ্যায় রাজনীতি কারবার করে ধনবিদ্যা নিয়ে। চায় শাসক হতে, শাসকের ধর্মই প্রভুত্ববাদ। ঠারে আড়ালে প্রকাশ্যে প্রকারভেদ যাইহোক। এই ধর্ম রক্ষার্থে যে তাণ্ডব চলে তার নিত্য বলি শত শত নিরীহ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'অন্তহীন চক্রপথে হিংসা ও প্রতিহিংসার যুগল তাণ্ডব নৃত্য।' কার স্বার্থে? জবাব খুঁজতে নব্যবাদীরা রাজনীতির দিকে আঙুল তুলছেন। ঠিক-বেঠিক প্রশ্ন অবান্তর। বাস্তব হচ্ছে এ যুগের আধারে বিগত যুগের উৎপাদন স্তালিন ভূমিকা কতটা খাপ খায়। কোনও রাজনীতিক যত শক্তিধরই হোন না কেন মৌল পরিকাঠামোর ঊর্ধ্বে নয়। স্তালিনকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য তাঁকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উন্মূল করে ঊর্ধ্বে স্থাপন করার চেষ্টা অপচেষ্টা।

এই চেষ্টা থেকে নিরত থেকে হীরেন্দ্রনাথ স্তালিনকে স্থাপন করেছেন ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধের কালপটে। পরীক্ষকের দৃষ্টিতে স্তালিনকে যাচাই করেছেন। যাচাই-এর কষ্টিপাথর স্তালিন টায়েটুয়ে নয় উঁচু নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ। সফল চরিত্রের কেমন সে প্রকৃতি?

তালিকা দীর্ঘ। এককাট্টা করলে সার হচ্ছে স্তালিনের গঠন প্রক্রিয়া। আধুনিক সোভিয়েত নির্মাণ। গৃহযুদ্ধের সফল মোকাবিলায় যার নেতৃত্বে অভিষেক। রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে নাৎসি শক্তির হাত থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করেছিলেন। জার শাসিত সামন্ততান্ত্রিক বদ্ধতা থেকে সমাজকে মুক্ত করলেন। দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশে এই অগ্রসরতা সম্ভব হয়েছিল। জাপানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাত্র চার বছরের অবকাশে রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সমর্থ হয়। মহাকাশ গবেষণায় পা রেখেছে প্রথম সারিতে। কৃষি উৎপাদনে সফলতা তুঙ্গে। কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ২০০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে। এককথায় ধনী দেশ হিসেবে আলোকিত ইউরোপের বিকল্প শক্তিকেন্দ্র হিসেবে সোভিয়েত আত্মপ্রকাশ করেছে। অনুন্নত অনেক রাষ্ট্রকে স্বনির্ভরতার আয়োজনে প্রভূত বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক সাহায্য জোগান দিয়েছে। এমনকী চেকোশ্লাভাকিয়া, পোল্যান্ড (যাদের জীবনাযাত্রার মান সোভিয়েতের চেয়ে উন্নত), কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশকে ক্রমিক সাহায্য দান করে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর কাছে পিতৃভূমির দায় বহন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহের কাছে ভরসা হিসেবে বিরাজ করত সোভিয়েত ইউনিয়ন।

সাপটা হিসেব হচ্ছে একটা কোলকুঁজো সোভিয়েতের এই যে খাড়া কাঠামো—তার স্থপতি স্তালিন। আর একটা বিষয়েও হীরেন্দ্রনাথ স্তালিনের কাছে কৃতজ্ঞ। সেটা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে যে মহাসংকট সংকটাকীর্ণ তা হচ্ছে ভোগবাদ। স্তালিন এই ভোগবাদকে ঠেকনা দিয়ে রেখেছিলেন। ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্যে অনায়াস জীবনের চাহিদা উপেক্ষা করে স্তালিন যেভাবে মরু অঞ্চলে বনাঞ্চলে সমভূমিতে শিল্পায়ন বিস্তার করেছেন তা ভয়ংকর আশ্চর্যজনক। চোখ ধাঁধানো সুন্দর। এই গঠন প্রক্রিয়া হীরেন্দ্রনাথের সমীহ অর্জন করেছে। পুনর্গঠনকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন সফল নেতৃত্বের ফসল হিসেবে।

কী কী যোগ্যতার সমাহার আদর্শ নেতা হয়ে ওঠার পক্ষে জরুরি! কঠোরতা, স্থির নিশানা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা, সাহস নির্মমতা, সংগঠন ক্ষমতা ঈদৃশ যোগ্যতার সমাবেশ কাম্য। যা স্তালিন চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। যে যোগ্যতার টান লাইনে দাঁড়ানো বহু নেতাকে টপকে লেনিনকে আকৃষ্ট করেছিল স্তালিন নির্বাচন। এখানে লেনিনের সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের মতামতে পূর্ণ সাযুজ্য।

সফলতার ফর্দ এক কথা। এর বাইরে পড়ে থাকে অনেক...অনেক কিন্তু। অনির্ধারক অংশ। অস্বস্তির দিক। গণবিতর্কের আলোচ্য সূচি। যে সফলতায় সোভিয়েত নিপীড়িত বিশ্ব মানবের কাছে দৃষ্টান্তমূলক সেই বাতাবরণ সোভিয়েত জনগণের মনের আকাশ জুড়ে বিস্তারিত কামনার ঘনঘোর ছায়া। ফকিরের বন্ধন ছিন্ন করো আকুলতা। কোষে কোষে চাই চাই হাহাকার। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।"

অথচ প্রাণঝর্ণা স্তালিনের এদিকে মনস্কতা নেই। রাষ্ট্রের শক্ত আঁটুনি শিথিল হচ্ছে না। আবার আঁটুনি যত শক্ত হচ্ছে ফস্কা গেরো দিয়ে নতুন চাহিদার প্রকাশ ঘটছে। অবদমন

উপবাস ছিন্ন করতে ছটফট করছে প্রবৃত্তি। জীবনমুখী তাড়না তাদের পেয়ে বসেছে। লৌকিক চাহিদাকে হীরেন্দ্রনাথ নিন্দে বা খাটো করেননি। সোভিয়েতের পা তখন শক্ত জমিতে। শুভ সময় চলছে। স্থিতির যুগেও মানবিক সাধ—আহ্লাদের গতিপথ যে কমবেশি অবরুদ্ধ হয়েছিল স্তালিন জমানায় তার আবছা স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'বদ্ধ হাওয়া' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। 'সোভিয়েত নব-প্রবোধন প্রয়াস প্রসঙ্গে'-র ছত্রে।

হীরেন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক ভুবনে চিন্তন প্রক্রিয়ায় সংকীর্ণতা এবং রক্ষণশীলতা নির্বাস। অখণ্ড সারস্বত সবিনয়ে তাঁর বোধভূমি প্রতিক্ষণ হাট। বিবিধ প্রকার তথ্য ধ্যানধারণা স্বাগত। মার্কস এবং রবীন্দ্রচর্চার আশ্রয়ে তাঁর এই উদার দর্শন। যে প্রশস্ত দৃষ্টির অঙ্গনে স্তালিনীয় শাসনকে বিদ্ধ করার অবকাশ আছে।

নায়কোচিত শুদ্ধতার আবেশ সেঁচে ফেললে কিছু প্রশ্নের এলাকা পড়ে থাকে। গণতন্ত্র প্রসঙ্গ যার শীর্ষে। যৌথ নেতৃত্বে বলতে বোঝায় যুক্তি-তর্ক-আলাপচারিতার সফরি। যে নেতৃত্বের চরিত্রে লগ্ন হয়ে থাকে বিবিধ মতের লতাগুল্মময় প্রশ্রয়। এই নিরিখে স্তালিন আমলে যৌথ নেতৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না বলে অনেকের অভিমত। স্তালিন নীতির সঙ্গে বনিবনা নেই এবং ব্যক্তি স্তালিনের সঙ্গে আড়ি এমন নেতারা নানান দণ্ডে অপসৃত। কার্যত সোভিয়েত সমাজ ছিল কর্তার সংসার। কর্তা স্তালিন ছিলেন আনুগত্যপ্রিয় খোলবাদক পরিবৃত। নতজানু মেধা ও শ্রমপ্রত্যাশী। প্রচ্ছন্ন চার্চীয় প্রভাব। ছাঁচের সমাজ নির্মাণ এবং একাত্মবাদ হচ্ছে স্তালিনবাদের মূল স্তম্ভ।

অন্যখাতের অভিযুক্ত প্রবাহ কি উপেক্ষা করা যায়! হীরেন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেননি। ধিক দিয়েছেন। উষ্মা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আপত্তিতে বৃহৎ চিৎকৃত প্রতিবাদের আস্ফালন নেই। স্তালিন আমলে গণতন্ত্রের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে তাঁর সে নিরীক্ষা—নিজস্ব স্বভাবধর্ম থেকে তা কি ঈষৎ দোলাচল নয়! তিনি কি হয়ে যাচ্ছেন না আন্তবিভাজনের অংশ!

এখানেই গড়ে ওঠে আবছা ছায়া অঞ্চল। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উঠে আসে যে সম্ভাব্য সূত্র তা হচ্ছে সোভিয়েতের বিংশতম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। স্তালিন বর্জ্য। সোভিয়েত পার্টির এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে C.P.I পূর্ণ সহমত পোষণ করেনি। দ্বিধা জর্জরতায় তালগোল পাকানো ছিল সিদ্ধান্ত। সোভিয়েত পার্টির নতুন দিগদর্শন খারিজ না করেও স্তালিনবাদের প্রতি চোরা টান সিদ্ধান্তে ছায়া ফেলেছিল। CPSU-এর সমর্থনে CPI এক সুরে অবস্থান নেয়নি। এমন অবস্থান নিয়েছিল যা উভয় কোর্টে পা রেখে এক্কা দোক্কা খেলা। যেমন সোভিয়েত পার্টির মূল্যায়নকে স্বাগত জানানো হচ্ছে এইভাবে :—It is evident that Stalin was mainly for the destortions of Soviet democracy and for the violation of in her Party norms." পরক্ষণে পালটি খাচ্ছে অন্যসুরে, "While fully recongising the negative features and grave defects that developed in Stalin's methods of leadership the central committee of communist Party of India considers

that a one sided appraisal of his role during the twenty years of his life, years of mighty developments in the USSR and world communist movement, causes be widerment among the masses, and can be utilised by enemies of communism to confuse them. The central committee, therefore, is the opinion that an objective assesment of Stalin's great achievements and serious shortcomings is essentional for Suceessfully fighting that cult of individual and for effectively combating the Prevailing confusion." দ্বিধা রফা আপসের সুর। যেন প্রবাদ সত্যতার অংশ রাজারও নহি, সাধুরও ঘাতক নহি।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মুক্তির যে তিনটি সমস্যার সঙ্গে গাঁটছড়া; এক, শোষণ থেকে মুক্তি; দুই, রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি; তিন, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি; এ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবলোকন পদ্ধতি যে নাবালক দর্শনে অলংকৃত সে ঐতিহ্যের ছিন্নতা হয় না।

পার্টি সিদ্ধান্তের অবতারণা প্রাসঙ্গিক হয়েছে এই জন্যে যে মনে রাখা জরুরি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আদ্যপান্ত পার্টিতে নিবেদিত সত্তা। ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নয় ঘোষিত সেবক। নিয়মানুবর্তিতায় আবদ্ধ। জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর আবর্তে পার্টি নেতৃত্ব সর্বদা মতামতে ঐকবদ্ধ ছিল না। অনেক সময় সংখ্যালঘু মতামত পার্টি কাঠামো উপছে প্রকাশ্য হয়েছে। তার জন্য বহিষ্কার ভর্ৎসনা সাবধানী চিঠিতে দণ্ড দেওয়ার ঘটনা বার বার ঘটেছে। শৃঙ্খলার প্রশ্নে হীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সতর্ক। সাংসদ হিসেবে পার্টির সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে কখনও পড়তে হয়নি যাতে মৃদু দণ্ডও ভোগ করতে হয়। এই প্রেক্ষাপট খেয়াল রাখলে যে প্রশ্নটা খচখচ করে তা হচ্ছে শৃঙ্খলার বন্ধনে তিনি কি ঈষৎ আড়ষ্ট, শম্বুক? পার্টির অন্তর্গত দ্বিধা-দ্বন্দ্বই যে তাঁর ভাবজগতে সঞ্চারিত হয়নি তাই কি হলপ করে বলা যায়! বাধ্যতা আসে ধর্তব্যে যে, হীরেন্দ্রনাথের মানসিক গঠন প্রকৃতির যা স্বরূপ যাতে মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতার নৃত্যচটুল ছন্দ নন্দিত। লেখনী এবং বাগ্মী সূত্রে তিনি তার ছাপ রেখেছেন। কিন্তু স্তালিন আমলে সংগঠিত ব্যক্তিস্বাধীনতার অবক্ষয় জোরালো প্রতিবাদ যোগ্যতা পায় না। ইতিহাসে সাক্ষ্য আছে স্তালিন রাজত্বে বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক-রাজনৈতিক (যার মধ্যে শলোকভ, শাখারভ, পাস্টেরনাক, বুখারিন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আছেন) সৃজনশীলতার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন।

অনুমান হীরেন্দ্রনাথ মনে করেন কোনও ব্যক্তি তা সে যত বড় শক্তিশালী ব্যক্তিত্বই হোন না কেন—সমাজের যে ঘটনাগুলো ঘটে তা ঘটতে থাকে সমাজের নিজস্ব নিয়মে। ব্যক্তির যোগ্যতা বিচ্যুতি—অভিলাষ ইত্যাদি সে জটিল ঘরকন্না থেকে বিযুক্ত। এই পরম্পরার ধারক স্তালিন। তাঁর আমলে গণতন্ত্রের লাঞ্ছনা এবং সমাজের ওপর রাষ্ট্রের বাড়াবাড়ি থাবা কটু হিসেবে গণ্য। সামগ্রিক বিচারে বিষণ্ণ অনুভবে সীমাবদ্ধ। একদিক দিয়ে হয়ত হীরেন্দ্রনাথ যথাযথ। কারণ ব্যক্তিগত চরিত্র খুঁড়ে খুঁড়ে সামাজিক বিফলতার উৎস আবিষ্কার করতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে নিঃসঙ্গ

ঈশ্বর। অগত্যা ধর ব্যাটা ঈশ্বরকে। হে ঈশ্বর কেন তুমি নাটের গুরু লেনিনকে আরো ২০/২৫টা বছর জিয়ন্ত রাখলে না। অপরাধী খুঁজতে কুশীলব ধাওয়া করার দায় এড়ানো যেত।

তাহলে সমাজ কি স্বয়ংচালিত এমন এক সংস্থা যেখানে মেধা-বুদ্ধি-উদ্ভাবনীশক্তি-খাটনি-কৌশল-ঈপ্সা সব বেকার! সামাজিক পটভূমি সর্বস্ব নিরিখ একমাত্র নিরিখ হিসেবে ধরতাই হলে বিশ্লেষণে ফাঁকফোকর থেকে যাবে। যে ফাঁক দিয়ে মূল্যবান তথ্য পিছনে যাওয়ার সুযোগ আছে। কারণ রাষ্ট্র সাধারণভাবে এক জনসমাজের প্রতিভূ। অথচ এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিচিত্র ধর্মীসমাজ বিদ্যমান। বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৃষ্টি সংস্কৃতি মূল্যবোধ বিনিময় প্রথার প্রকারভেদ আছে। এক রাষ্ট্রের অধীনে এক সমাজ— এমন অস্তিত্ব মরিচীকা। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির যে-কোনও ভূমিকাকে সামাজিক পটভূমির উৎপন্ন ফসল হিসেবে দেখলে যাবতীয় কাজই পার পেয়ে যায়। যে-কোনও কাজকে সামাজিকতার দোহারই পেড়ে ছাড় দিলে ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য কল্যাণ-অকল্যাণ একাকার হয়ে যায়। যে কার্যকরী মূল্যবোধ সমাজের ধারক তা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বিচিত্রতার সহবাস আলগা হয়।

মানুষ তা মানে না। সংবদ্ধ সমাজ গঠনে প্রচলিত হয় রীতিনীতি প্রথা। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রকরণ। বহমান সমাজের নিজস্ব ছন্দে যে-কোনও প্রকার ঈশিত্ব সমাজ মান্য করে না। প্রতিক্রিয়া হয়। এখানেই উঠে আগে প্রশ্ন কে অধিক শক্তিশালী, ব্যক্তিত্ব না সমাজ না রাষ্ট্র? এর মীমাংসা অনির্ণায়ক অংশ অদ্যাবধি। কূটবিচার স্থগিত রেখে যেটা উল্লেখ তা হচ্ছে শিক্ষা-রুচি-উদ্যম-লক্ষ্য-দক্ষতা সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্লেখানভও মনে করেন ইতিহাসের চক্রপথে এক নির্দিষ্ট স্তর অবধি ব্যক্তিসত্তার ভূমিকা মূল্যবান। মার্কসও Economic and Philosopic manuscripts 1844-এ ব্যক্তিসত্তাকে মর্যাদার শিখরে স্থান দিয়েছেন।

স্তালিনচর্চার নেপথ্য প্রস্তুতি হিসেবে এইসব বৈশিষ্ট্য প্রাপ্য মর্যাদা পেলে স্তালিন মূল্যায়নে সুবিধে হয়।

কী সেই বৈশিষ্ট্য? ঘোর তাৎক্ষণিকতা স্তালিন চরিত্রের ধর্ম। ধর তক্তা মার পেরেক হচ্ছে স্তালিনের মানসিক প্রবণতা। ভাবুকতা তাঁর ধাতে নেই। লেখাগুলির মধ্যেও অগভীর মনন এবং লজিকাল বিচ্যুতির ছাপ আছে। গ্রন্থবিদ ছিলেন না তিনি। অন্তত এই অর্থে যে তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছ লেখক হিসেবে তাঁকে প্রসিদ্ধ করেনি। আগাগোড়া তিনি ছিলেন কাজের মানুষ। সমগ্র কর্মকাণ্ডের মূল আকর্ষণ ছিল রুশপ্রীতি। স্তালিনের উগ্র জাতীয়তাবাদ কর্মযজ্ঞের বাড়াবাড়ি বা উপছে পড়া অংশ নয়। তত্ত্বগত বনিয়াদ আছে। নেশন সম্পর্কে স্তালিন তাঁর 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' রচনায় নেশন সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিলেন তাতে গতিশীলতা নেই আছে স্থিতিশীলতা। নেশনকে স্থায়ী রূপ দেয়ার নির্দেশ আছে। কিন্তু লেনিনের দৃষ্টিতে ছিল অন্য ইশারা। তাঁর মতে একটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নির্ভর করছে সেই শ্রমিক সমাজের স্বার্থ ও মঙ্গলের ওপর। এই অধিকার ধ্রুব নীতি হতে

পারে না। স্তালিনের চিন্তা যে খুবই বাস্তবঘেঁষা, পৃথিবীর মানচিত্র তার পরিচয় দিচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা বাড়ছে। ভবিষ্যতে জাতীয়তবাদ বা দেশের সংখ্যা হ্রাস পাবে কি-না; অবলুপ্ত হয়ে যাবে কি না 'দেশ'জনিত ভাবকল্প তার উত্তর জমা আছে সময়ের গর্ভগৃহে।

স্তালিন চরিত্রের আর এক দিক হচ্ছে লক্ষ্য সর্বস্বতা। পাঁড় আদর্শবাদী ছিলেন তিনি। অনেকে মনে করেন আত্মপরায়ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে সমুদায় উপাদান হচ্ছে প্রসূতিসদন। ঈদৃশ উপাদানের সমবায়ে এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে স্তালিন সমর্থ হয়েছিলেন লৌহরাষ্ট্র নির্মাণে। স্তালিন চরিত্রের এই নির্ণয় হয়তো অনর্থক নয় আবার বিতর্কও উসকে দেয়।

অভিজ্ঞতা হচ্ছে নেতা বা নেতৃত্বের ব্যর্থতা বা সফলতা বহু মানুষের সমর্থনের ফল। তাছাড়া যে-কোনও সমাজ বিপ্লব কী ফরাসি বিপ্লব কী লাটিন আমেরিকার বিপ্লব ভুল করতে কোনও ভুল করেনি। জটিল সংকটাকীর্ণ পরিস্থিতিতে ইহাও হয় উহাও হয় আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে বিধির বাঁধন ছিন্ন করার দায় এড়ানো নিষ্ক্রিয়তা প্রতিবন্ধী চেতনার দ্যোতক। যে কাজ করে তার ধর্ম নয়।

বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত পার্টির অঙ্গীকার ছিল সাতের দশকে সমাজতন্ত্র পূর্ণতা পাবে। হল অকাল প্রয়াণ। সত্তর বছর কাবার হতে না হতেই পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে গেল খরচায় খাতায়। কিন্তু ঘটনাটা ২০০১ সেপ্টেম্বর ১১-এ আচমকা বার শত্রুর বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত পেন্টাগণের অগ্রজ প্রতিরূপ নয় কোনও ক্রমেই। রুশী নবায়নে ভাসানের আয়োজন চলছিল নিঃশব্দ চরণে। দীর্ঘদিন ধরে। গর্ভসঞ্চার হচ্ছিল সমাজের অন্তর্গতে। কাঠামোর খাঁজে খাঁজে ঘাপটি মেরে বসতি গেড়েছিল অসুখ। অবহেলা অবজ্ঞা উপেক্ষার সমৃদ্ধ রসে সোমত্ত হয়ে ঝাঁঝরা করে দিল গঠন। অবশেষে বৃহৎ বিনষ্টি।

কোন পথে উঠে আসতে পারে সমস্যার স্বরূপ এবং যোগ্য নিরসন তার চর্চা এবং চর্চাজাত বিহিতের নৈতিকতা এসে যায়। প্রাসঙ্গিক হয় যে নিয়মের অপরিহার্য উল্লেখ তা হল কোনও সিদ্ধান্তই একশো ভাগ নির্ভুল হতে পারে না। ত্রুটি-বিচ্যুতি-সংশোধন-লয়-বৃদ্ধি নিয়েই প্রবাহ। কাজেই স্তালিন রাজত্বের অমানিশা নিয়ে চিরুনি তল্লাস চলছে। চলুক। এমনকী দীর্ঘ স্তালিন রাজত্ব কেন্দ্র করে এ প্রশ্নও আজ আলোচ্য বিষয় হিসেবে যোগ্য হয়ে উঠেছে যে বিপ্লবী রাজনীতির খোলে গণতন্ত্রের প্রশ্রয় কতটুকু।

আলোচনা চলছে। ধারা অব্যাহত থাকুক। সনাক্তকরণ হোক ভ্রষ্টাচার। উপসর্গ এড়িয়ে সর্গ-তে যেতে হবে। শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু স্তালিনকে খলনায়ক বানিয়ে চাঁদমারি করার যে-কোনও প্রকার উদ্যোগ পৃষ্ঠপোষকতা বিরহে যেন ক্ষান্ত হয়।

লেনিনের কীর্তি যদি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা স্তালিনের অমরত্ব সোভিয়েত নির্মাণে। হীরেন্দ্রনাথের মেধা ও বোধ সঞ্জাত উপলব্ধির এই হচ্ছে সার।

স্তালিন নেতৃত্বের জানুতে মাথা রেখে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যুগপৎ ক্ষীণ আশঙ্কা এবং মহতী আশার দ্বৈত প্রকৃতি ফুটিয়ে তুলতে উৎসুক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 = Karl Marks.
২. The Development of the Monist View of History = G. Plekhanov.
৩. মার্কসীয় অর্থনীতির মূলসূত্র = কল্যাণ দত্ত।
৪. বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি = রাজশেখর বসু।
৫. শ্যামা = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬. নৈবেদ্য = ঐ
৭. রাশিয়ার চিঠি = ঐ
৮. সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পুর্নগঠন = কল্যাণ দত্ত।
৯. রাষ্ট্র ও বিপ্লব = লেনিন।
১০. কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার = মার্কস ও এঙ্গেলস।
১১. The Stalin Legacy. = Hiren Mukherjee
১২. নির্বাচিত প্রবন্ধ (১ম, ২য় খণ্ড) = হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
১৩. স্তালিন = আঁরি বারবুস।
১৪. Resolution adopted by the central committee, CPI-I-II, July 1956
১৫. চেতনা = প্রথম সংখ্যা ২০০২
১৬. যোসেফ স্টালিন শতবার্ষিকী প্রসঙ্গে = সুশোভন সরকার।
১৭. ডাক্তার জিভাগো = বরিস পাস্টেরনাক।
১৮. শিল্প এবং সমাজজীবন = জি. ডি. প্লেখানভ।

সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ*

শোভনলাল দত্তগুপ্ত

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও জননায়কদের নিয়ে জীবনীগ্রন্থ কম লেখা হয়নি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের রচনায় মূলত তথ্য ও লেখকের ভাবাবেগ যে ধরনের মিশেল প্রস্তুত করে সেটি অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়। সত্যিকারের বিশ্লেষণধর্মী জীবনীগ্রন্থ যা মননশীল পাঠককে চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে খুব একটা লেখা হয়নি,—এ কথাটি বোধহয় মেনে নেওয়া ভাল। আবার এ কথাও ঠিক যে তথাকথিত জীবনীকারদের ভিড়ের মধ্যে স্বমহিমায় বিরাজ করেন গুটিকয়েক বিরাট ব্যক্তিত্ব, যাঁদের হাতে পড়ে আপাতদৃষ্টিতে সেটিকে মনে হতে পারে নেহাতই আর পাঁচটা বই-এর মতো একটি জীবনীগ্রন্থ তা হয়ে দাঁড়ায় এক আবেগবর্জিত অথচ তথ্যসমৃদ্ধ এক চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী রচনা। আলোচিত বইটি তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন, সেটি উসকে দেয় মননশীল পাঠকের চিন্তাকে, যা প্রবলভাবে আলোড়িত করে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক ভাবনার জগতকে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুভাষ-ভাবনা সংক্রান্ত এই বইটি বিশেষভাবে আলোচনার দাবি করে অন্তত দুটি কারণে। প্রথমত, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অপর দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব যথা, গান্ধীজি ও জহরলাল নেহরু-কে নিয়ে লেখা হীরেন্দ্রনাথের দু'টি বই Gandhiji A Study এবং The Gentle Colossus A study of Jawaharlal Nehru আমাদের কাছে যতটা পরিচিত এবং যেভাবে সমাদৃত, আলোচিত বইটির পরিচিত তুলনায় কম। দ্বিতীয়ত, এই বইটি হীরেন্দ্রনাথ লেখেন সত্তরের দশকের শেষে ১৯৭৭ সালে প্রথম দুটি বই প্রকাশিত হয়ে যাবার অনেক বছর পরে এবং স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী পাঠকের মনে একটি প্রশ্ন জাগে : হীরেন্দ্রনাথের নেহরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কি কোনও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে? এখানে বলে দেওয়া ভাল যে হীরেন্দ্রনাথ নিজেই এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, যার পরিচয় মেলে আলোচিত গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. vi)।

গোড়াতেই আরও একটি কথা লেখক বলে নিয়েছেন বইটি তাঁকে লিখতে হয়েছে অতি অল্প সময়ে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে। এ সব ক্ষেত্রে সব সময়েই একটি আশংকা থেকে যায় যে হয়ত বাদ পড়ে যাবে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিংবা পরিস্ফুট হবে না কোনও কোনও বক্তব্য। এ ক্ষেত্রে তার কোনওটাই হয়নি। বরং হীরেন্দ্রনাথের লেখার ঐশ্বর্যগুণে অনেক কম কথায় এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যা এককথায় পাঠকের

---

* Hiren Mukerjee, *Bour of Burning Gold. A Study of Subhas Chandra Bose* (New Delhi People's Publishing House, 1977) 118 pages.

বিস্ময় উদ্রেক করে। জীবনী রচনার স্টাইলকে আপাতদৃষ্টিতে অনুসরণ করেও লেখক এখানে মূলত প্রাবন্ধিক, আলোচক ও বিশ্লেষক। তথ্য ও ভাবনার এক বিরল মিশ্রণে জারিত হীরেন্দ্রনাথের সুভাষ-চিন্তা আমাদের গতানুগতিক সুভাষ-ভাবনার ক্ষেত্রেও এভাবেই যোগ করে এক নতুন মাত্রা।

১১৮টি পৃষ্ঠায় সীমিত দশটি অধ্যায় জুড়ে রচিত বইটিতে কিছুটা অবিন্যস্তভাবে ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে বিষয়গুলির আলোচনার খোঁজ আমরা পাই তা এরকম দেশপ্রেমিক ও আদর্শবাদী সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের ব্যাখ্যা; সুভাষের চিন্তায় মতাদর্শগত অস্পষ্টতা ও এই প্রশ্নে নেহরুর সঙ্গে পার্থক্য; সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজী; সুভাষচন্দ্র ও কমিউনিস্টরা; সুভাষ, নাৎসি জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়ন; নেহরু ও সুভাষচন্দ্র। এবার দেখা যেতে পারে প্রবন্ধকার হীরেন্দ্রনাথ কীভাবে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রে মধ্যে এক ধরনের মিশ্রণ ঘটেছিল জাতীয়তাবাদ ও বিবেকানন্দের আদর্শাশ্রয়ী আধ্যাত্মিকতার এবং হীরেন্দ্রনাথের ভাষ্য অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর একরোখা, জেদী ও এক ধরনের আত্মভোলা মনোভাবকে অনেকটা এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। কৈশোরের বন্ধু সঙ্গীতাচার্য দিলীপকুমার রায়কে ব্রিটেনে থাকাকালীন মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের প্রবল কুণ্ঠা ও নির্লিপ্ততা বেশ ভালরকম ভাবিয়ে তুলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই উদ্যোগে সুভাষকে কিছুটা পরিমাণে এই ঘেরাটোপ থেকে বাইরে টেনে আনা সম্ভবপর হয়েছিল (পৃ. ১৪-১৫)। পরবর্তীকালে সক্রিয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা, বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর অবস্থান অনেকটাই বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিক মানসিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দুর্বল ভারতবাসীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করার যে ভাবনা বিবেকানন্দকে বিশিষ্টায়িত করেছিল, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়া থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ, সামরিক শৃংখলা, সংগঠন, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির প্রতি সুভাষচন্দ্রের আজন্ম ভালবাসার সূত্রটি সম্ভবত সেখানেই নিহিত ছিল।

মতাদর্শগত চিন্তার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের অস্পষ্টতা ভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতাকে হীরেন্দ্রনাথ বিচার করেছেন এই প্রেক্ষাপটে। Indian Struggle বইতে ফ্যাসিবাদ ও সমাজতন্ত্রের যে বিচিত্র মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়, বহুলাংশেই তার অন্যতম কারণ ছিল সামরিক শক্তি, শৃংখলা ও বলদর্পিতার ভাবনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদের আদর্শের প্রতি সুভাষচন্দ্রের দুর্বলতা। তার অর্থ আবার অবশ্যই এই নয় যে ফ্যাসিবাদের মানবতাবাদবিরোধী চিন্তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর কোনও নৈকট্য ছিল। হীরেন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে নাৎসি জার্মানীর সমর্থন চাইবার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রকে পরিচালিত করেছিল একদিকে তাঁর নিখাদ দেশপ্রেম ও অপরদিকে মতাদর্শগত চিন্তার অস্পষ্টতা। এ কথা আজ সর্বজনবিদিত এবং প্রবন্ধকারও স্পষ্ট করেই বলেছেন যে তাঁর গড়ে তোলা সামরিক বাহিনীর প্রতি নাৎসি জার্মানীর নেতৃবর্গের কোনও ধরনের অসম্মানজনক আচরণ তিনি মেনে নেন নি এবং পরবর্তীকালে এও প্রমাণিত হয়েছে যে নাৎসি জার্মানীতে অবস্থানকালেই হিটলার

সম্পর্কে ধীরে ধীরে তাঁর মোহমুক্তি ঘটতে শুরু করে। কিন্তু মতাদর্শ নিয়ে সুভাষচন্দ্র কোনও দিনই খুব একটা মাথা ঘামাননি; আর সে কারণেই ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর সুভাষ শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ফ্যাসিবাদী জার্মানী, ইতালি, জাপানের সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধাবোধ করেননি। মতাদর্শের প্রশ্নে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে হলে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও ধৈর্যশীল মানসিকতার প্রয়োজন, সুভাষচন্দ্রের চিন্তার বৌদ্ধিক কাঠামো ছিল তা থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

আর এই জায়গাতেই নেহরুর সঙ্গে সুভাষের আদর্শগত প্রশ্নে পার্থক্যের বিষয়টি জরুরি হয়ে দেখা দেয়। হীরেন্দ্রনাথ চমৎকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন (পৃ. ৩৮-৩৯) যে ফ্যাসিবাদের বিপদ ও সমাজতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে নেহরুর চিন্তায় যে স্বচ্ছতা ছিল, যে ইতিহাসচেতনা নেহরুকে নিবৃত্ত করেছিল সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদকে একত্রিত না করা থেকে, যে যুক্তিনিষ্ঠতাকে আশ্রয় করে নেহরু সঠিক মতাদর্শগত অবস্থান নিতে দ্বিধাবোধ করেননি, সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় ভাবাবেগ, জাতীয়তাবাদ ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ অনেক ক্ষেত্রেই মতাদর্শগত স্তরে তাঁর ভাবনাকে সংকুচিত করেছে।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে লেখক নেহরুকে বড় ও সুভাষচন্দ্রকে খাটো করার চেষ্টা করেছেন। বারেবারেই যে কথাটি তিনি বলার চেষ্টা করেছেন তা হল এই জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্ব যদি হাত মেলাতে পারতেন, তাহলে হয়ত ইতিহাস লেখা হত অন্যভাবে। একটা সময়ে অর্থাৎ, তিরিশের দশকের গোড়ায়, সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল হাতে হাত মিলিয়ে Indian Independence League গঠন করলেও পরবর্তীকালে উভয়ের বিরোধ ও বিচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। আর এই ভুল ব্যর্থতা, যাই বলি না কেন,—তার জন্য হীরেন্দ্রনাথ গান্ধী, নেহরু, সুভাষ কাউকেই ছেড়ে দেন নি। গান্ধীর সুভাষ বিদ্বেষ, নেহরুর দোদুল্যমানতা ও গান্ধীর প্রভাবে প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকা, সুভাষের একগুঁয়েমি ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে চট্‌জলদি সিদ্ধান্ত নেবার প্রবণতা এই ত্রয়ীর সম্পর্ককে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছিল (পৃ. ৪৬-৪৭, ৫৫-৫৮)।

বইটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই যে মার্কসবাদী হীরেন্দ্রনাথ একাধারে তথ্যনিষ্ঠ ও নির্মোহ এক বিশ্লেষকের ভূমিকায় এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই হীরেন্দ্রনাথের সুভাষ মূল্যায়ন এখানে শ্রদ্ধাপূর্ণ কিন্তু ভাবাবেগবর্জিত,—যা পাঠকের পক্ষে প্রকৃতই এক বড় প্রাপ্তি। আর সে কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও তার সংগঠক সুভাষচন্দ্রকে তিনি সেলাম জানান, অভিনন্দন জানান হিন্দু-মুসলমান-শিখ সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে আই. এন. এ-র মঞ্চে একত্রিত হবার ঐতিহাসিক ঘটনাকে এবং তার জন্য সাধুবাদ জানান আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাণপুরুষ সুভাষচন্দ্রের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি এই গভীর দায়বোধকে। আর ঠিক এই জায়গাতেই বোধহয় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আরও একটি কথা জাতীয়তাবাদ, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদির যে প্রভাবই সুভাষচন্দ্রের ওপর পড়ে থাকুক না কেন, ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতপাতের সংকীর্ণতা তাঁকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারেনি। অন্য অনেক প্রশ্নে মতপার্থক্য সত্ত্বেও আবার এই জায়গাতেই আমরা লক্ষ করি সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের আদর্শগত নৈকট্য।

পরিশেষে যে বিষয়টি বিশেষ আলোচনার দাবি করে সেটি হল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক। মতাদর্শগত চিন্তার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট থাকলেও সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও আগ্রহে কোনও ঘাটতি ছিল না। হীরেন্দ্রনাথের বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ১৯৪১ সালের গোড়ায় তাঁর ঐতিহাসিক মহানিষ্ক্রমণের সময় পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রে মতপার্থক্য সত্ত্বেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সুভাষের ঘনিষ্ঠতা ও যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট গভীর (ষষ্ঠ অধ্যায়)। মিয়া আকবর শাহ, অচ্ছর সিং চীনা, ভগৎরাম তলোয়ার,—যাঁরা সুভাষচন্দ্রের ভারতত্যাগে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন,—তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত। শুধু তাই নয়, দেশ ছাড়ার পরে জার্মানীতে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্রের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে তাঁর হাতে গড়া বাহিনীর একটি সৈনিককেও যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১৯ আগস্ট, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত রহস্যজনক মৃত্যুর আগেও তিনি পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে—এই ঘটনা ছিল যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী।

লেখকের এই আলোচনা যথাযথ। কিন্তু একটি দুটি প্রশ্ন থেকে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে অতিসরলীকৃত ও বিকৃত ব্যাখ্যা হাজির করেছিল, এবং যার পরিণামে সি. পি. আই-কে কম খেসারতও দিতে হয়নি, তার তেমন কোনও উল্লেখ পেলাম না। লেখক নিজে দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার সুবাদে এই বিষয়টির উপরে আলোকপাত করলে আমরা উপকৃত হতাম। আরও একটি কথা। বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে সুভাষচন্দ্রের সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছবার গোপন প্রয়াস সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কি কোনও স্তরে অবহিত ছিলেন? এই বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য জানার আগ্রহ ছিল।

কিন্তু সব মিলিয়ে লেখকের সুভাষ মূল্যায়ন পাঠককে অনেক নতুন ভাবনা জোগায়। ভাষার প্রসাদগুণে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ মননশীল পাঠককে চমৎকৃত করে। বইটি লেখা হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও অটুট ও অমলিন। এখানেই প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথের মহাসিদ্ধি।

মার্কসবাদ, হীরেন্দ্রনাথ ও মুক্তমতি

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

১৯৫০-এর দশকের শেষ ভাগ, ১৯৬০-এর দশকের শুরু—সময়টা খুব সহজ ছিল না। বাইরের লোকে না জানলেও, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের অনেকেই জানতেন বিশ্ব কমিউনিস্ট ঐক্যে চিড় ধরেছে। যুগোশ্লাভিয়াকে 'শোধনবাদী' বলে মার্কা মারা হয়েছিল অনেক আগেই। হঠাৎ আবার তেড়েফুঁড়ে যুগোশ্লাভ পার্টিনেতৃত্বের বিরুদ্ধে কাগুজে কামান দাগতে শুরু করল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। তার পাশাপাশি, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পার্টি তার চাঁদমারি করল পূর্ব ইওরোপের ছোটো দেশ আলবানিয়ার পার্টিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানেও কায়েম হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

ভেতরের লোকরা বুঝলেন : এ হলো বকলমে লড়াই। আসল বিরোধ বেধেছে সোভিয়েত ও চীনের পার্টির মধ্যে যুগোশ্লাভিয়ার জায়গায় পড়তে হবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আর আলবানিয়ার জায়গায় চীন।

বাইরের লোকে দেখছেন বারোটি দেশ সমাজবাদের পথে চলেছে। ১৯৫৭-য় সেই সব দেশের পার্টিনেতারা মিলিত হয়ে একটি সংযুক্ত ঘোষণাপত্র বার করলেন। ১৯৬০-এ পৃথিবীর একাশিটি দেশের পার্টি একত্র হলো মস্কোয়। সেখান থেকে সকলে একমত হয়ে সই করলেন এক দলিলে।

ভেতরের লোকরা কিন্তু জানতেন এ সবই লোক-ভুলোনো ব্যাপার। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের (১৯৫৬) পর কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে নানা বিরোধ, নানা বিভ্রান্তি মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রচ্ছদপটে যতই ঐক্য থাক, ভেতরে ভেতরে চলছে পারস্পরিক দোষারোপ, আর অভিযোগ। এমনকি, কোন্ পার্টি কতটা বিপ্লবী, কতদূর বিশ্বাসযোগ্য—সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এর মধ্যে ১৯৬২-তে হলো ভারতের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। কোনো রাজ্যেই আর বিকল্প বামপন্থী সরকার গড়া গেল না (১৯৫৭-য় সেটা সম্ভব হয়েছিল কেরলে)। সীমান্ত নিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষ চলেছে ভারত আর চীনের মধ্যে। আর বকলম ছেড়ে প্রকাশ্য বিতর্কে নামল চীন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দুই পার্টি। 'খোলা চিঠি আর পার্টি মুখপত্র-র সম্পাদকীয় মারফত চলল আক্রমণ আর পাল্টা-আক্রমণ।

অন্য দিকে এই সময়েই পাওয়া গেল মার্কস-এর তরুণ বয়সে লেখা কয়েকটি নোট বই-এর ইংরিজি তর্জমা *আর্থনীতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি* নামে বইটি বেরল মস্কো থেকে। আগেও তার কিছু কিছু অংশ এখানে-ওখানে বেরিয়েছিল। কিন্তু একসঙ্গে পুরোটা পাওয়া যেত না। মার্কসবাদীদের পাশাপাশি নিজেদের জায়গা করে নিলেন মার্কস-তাত্ত্বিকরা। 'তরুণ

মার্কস' আর 'পরিণত মার্কস' কি দুটি আলাদা সত্তা? প্রশ্ন উঠল এই নিয়েও।

এই সময়েই হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন "মার্কসবাদ ও মুক্তমতি" (*শারদীয় পরিচয়* ১৯৬৩)। তার পরের বছর *পরিচয়*-এ বেরল "ভারতবর্ষ ও মানবিকতা", আর তার দু বছর বাদে "ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্কসবাদী সংগ্রাম" (*মূল্যায়ন*, ১৯৫৬)। এই তিনটি প্রবন্ধই পরে তাঁর *মার্কসবাদ ও মুক্তমতি* নামে রচনা সঙ্কলনে (১৯৭২) রয়েছে।[১]

গোড়া থেকেই প্রথম লেখাটির সুর আত্মসমালোচনামূলক। "যারা সাম্যবাদী তাদেরই চিন্তায় এবং আচরণে বহু দৌর্বল্য, বহু বিকৃতি, বহু অসঙ্গতি, অন্যায় ও অপরাধ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে এবং আজও দিয়ে থাকে"—খোলাখুলি সে-কথা ঘোষণা করেন হীরেন্দ্রনাথ। কমিউনিস্ট-বিরোধীদের "তৃণে যে সবকটি শর আজ ব্যর্থ তা নয়"—একথাও তিনি স্বীকার করেন। তার ভিত্তিতেই তিনি চান : "সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্যায়ে, রুশদেশের রূপান্তর সংসাধনকালে, লেনিন-স্তালিন যুগে কিয়ৎপরিমাণ তত্ত্ব ও কর্মসম্বন্ধীয় কাঠিন্য ও কঠোরতা অবশ্য বোধগম্য, কিন্তু বর্তমানে, বিশ্বের সামাজিক ভারসাম্য যখন কমিউনিজমের অনুকূল না হওয়ার কোনো হেতু নেই, তখন প্রাক্তন এবং সম্ভবত অনিবার্য কঠোরতা ও কাঠিন্যকে বহুলাংশে বর্জন বোধ হয় করা যেতে পারে।" এই চিন্তা থেকেই ভারতের কয়েক হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে মার্কসবাদকে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন হীরেন্দ্রনাথ। চীন ও সোভিয়েত পার্টির মহাবিতর্কে তিনি তখন বীতশ্রদ্ধ "চীনের কমিউনিস্ট নায়কেরা মার্কসবাদের পবিত্রতা রক্ষার নামে তত্ত্ব ও কর্ম উভয়ক্ষেত্রেই যেন দুরাচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন, আর সোভিয়েত পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ব্যাপক ও মৌলিক পর্যালোচনা হচ্ছে না, সমসাময়িক কর্তব্যের দোহাই দিয়ে দুরূহ চিন্তার বালাই থেকে রেহাই পাওয়াই যেন তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট।" হীরেন্দ্রনাথ তখন ভরসা করছিলেন পোল্যান্ড ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে। বিশেষ করে পোল্যান্ডের ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলীর সঙ্গে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি যে বোঝাপড়ায় এসেছে—তাতে তাঁর সম্পূর্ণ-সম্মতি। তারই খেই ধরে তিনি প্রশ্ন তোলেন "মানবিকতার যে সম্প্রসারণ কমিউনিস্টদের কাম্য তাকে সুদৃঢ়, সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত করতে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংযোগ হবে না কেন?"

"ভারতবর্ষ ও মানবিকতা" প্রবন্ধটিও একই সুরে বাঁধা। এর আগের প্রবন্ধে চার্বাক দর্শনের কথা তুলে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কোনো কোনো দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন এই লোকায়তিকদেররই উত্তরাধিকার পেয়েছে।" তার পরের প্রবন্ধে বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ—সবকিছু থেকেই তিনি ভারতীয় চিন্তার ইহমুখিতা প্রমাণ করতে চান। তিনি স্বীকার করেন অবশ্য "এতে মানবিকতা আমাদের চিন্তা ও কর্মধারায় উপস্থিত ছিল বলা আতিশয্য হবে।" তবে তাঁর আসল বক্তব্য এই "কিন্তু সংসারবিমুখতা বাস্তবিকই কখনও ভারতবর্ষের জীবনকে চিহ্নিত করেনি।" তিনি চাইছেন রামানন্দ কবীর হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব সাধকের "সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা বাড়ুক, নচেৎ এ দেশের মর্মস্থলে প্রবেশ করার মতো ভাগ্য আমাদের হবে না।" তাঁর বিশ্বাস 'চার্বাকের সূত্রে, বৌদ্ধ দোহায়, "বৈদিক ও অবৈদিক ধারার যুক্ত বেণীতে", ভারতে "হিন্দু-

মুসলমানের যুক্ত সাধনায়" যে সত্য কখনও অস্পষ্ট আবার কখনও উদ্ভাসিত হয়েছে, তারই প্রকাশ, চণ্ডীদাসের অতি পরিচিত পংক্তিতে—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" একে শুধু দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণের একটি কাব্যিক বিন্যাস বলে উড়িয়ে দিলে কয়েক হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরাকেই অগ্রাহ্য করা হয়।'[২]

এ বিষয়ে তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধ, "ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্কসবাদী সংগ্রাম"-এ একই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। "আমাদের দেশে এমন দুর্দিন চলেছে যখন মার্কসীয় চিন্তা ও কর্মে যাঁদের ব্যাপৃত থাকার কথা তাঁরা যেন আত্মকলহের চাপে সর্বজনের সমক্ষে সতেজে মার্কসবাদের সৃজনশীল ভূমিকাকে তুলে ধরতে পারছেন না।" তাই "মার্কসবাদ ও ধর্ম" নিয়ে বিচারে নামলেন হীরেন্দ্রনাথ নিজেই। তাঁর মতে "আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম ও নীতির সঙ্গে বিরোধের পরিবর্তে মিলনের মাধ্যমে সমাজবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছে।" এর মধ্যেই তিনি দেখতে পান এক "দুঃসাহসী পরীক্ষা [যা] থেকে নিবৃত্ত হওয়া নীতিনিষ্ঠা হতে পারে কিন্তু সার্থক মার্কসবাদ সম্ভবত নয়।"

এখানেও এসেছে পোল্যান্ডের কথা। হীরেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন ফ্রান্সের খ্রিস্টান চিন্তাবিদ মুনিয়ে-র বক্তব্য : "খ্রিস্টান আর মার্কসবাদী একত্রে কাজ করুক, বিপ্লব শুধু সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ঘটুক।" এরই প্রতিধ্বনি হীরেন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছেন ভূদান আন্দোলনের উদ্যোক্তা, বিনোবা ভাবে-র একটি উক্তিতে "বর্তমান জগতে প্রয়োজন হলো রাজনীতি আর ধর্মকে পরিহার করে বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা (spirituality)-কে বরণ করা।" হীরেন্দ্রনাথ নিজেও বোঝেন "এরকম কথা বেশ খানিকটা ধোঁয়াটে নিশ্চয়"। তবু তাঁর মনে হয়, 'তাই বলে একে "নস্যাৎ" করতে চাইলেও হয়তো পারা যায় না।'

এই প্রবন্ধেও হীরেন্দ্রনাথ চাইছেন ধার্মিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের "প্রকৃত কথোপকথন, যুক্তি ও চিন্তার আদান প্রদান ; তাদের মধ্যে প্রয়োজন সেই দ্বন্দ্ব যা যথাসময়ে আনবে সংশ্লেষণ, সৎ ও স্বচ্ছ বিতর্কের পর হয়তো আসবে সম্বোধি, আর ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সম্ভব ও সহজ ও সৌষ্ঠবপূর্ণ হবে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সহযোগিতা।"

হীরেন্দ্রনাথের এই ধরণের বক্তব্য বাঙলার মার্কসবাদী মহলে সকলের কাছে গ্রাহ্য হয় নি। *মার্কসবাদ ও মুক্তমতি* বইটির সমালোচনায় প্রদ্যোৎ গুহ সবিনয়ে লিখেছেন

> .....আপাতত অবশ্য ভয়ে ভয়ে একটা কথা না বলে পারছি না, মার্কসবাদের ভারতীয়করণের প্রস্তাবটা হীরেন্দ্রনাথ যেভাবে উত্থাপন করেন তাতে এই সমালোচকের মনে নানা সংশয় দেখা দেয়। কথায় আছে চূণ খেয়ে মুখ তাতলে দই দেখে ভয় হয়। মার্কসবাদের চীনাকরণের যে পরিণাম আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি তাতে এ ধরণের কথা শুনলেই জ্বর আসে। কিন্তু সংশয় শুধু সে কারণেই নয়। মার্কসবাদের প্রকরণ হিসেবে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণের যে প্রস্তাব তিনি করেন তাতে মন সায় দিতে অনিচ্ছুক হয়।'[৩]

মুক্তমতির ধারণাটি হীরেন্দ্রনাথের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বিশেষ একটি কারণে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেস (১৯৫৬)-এর আগে অবধি মনে করা হতো : বিপ্লবের পরে শ্রেণী-সংগ্রাম আরও তীব্র হয়। ১৯৫৬-র পরে নতুন নেতৃত্ব মনে করলেন : "সোস্যালিজমের অগ্রগতির আনুসঙ্গিক ফল হল শ্রেণীসংঘর্ষ কঠোরতর না হয়ে ক্রমে হ্রাস পাওয়ারই সম্ভাবনা, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে, কোনো বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে সে সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়াও অসম্ভব নয়।" এর ভরসাতেই হীরেন্দ্রনাথ বললেন : "এই [পরিবর্তিত] ধারণা যদি ঠিক হয় তো এর গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণীসংগ্রামের পূর্বতন অবস্থান ও চরিত্র যদি এমন পরিবর্তন বহু স্থলে এনে [এসে?] থাকে, তাহলে মার্কসবাদী আন্দোলনের সমরনীতি ও ব্যূহকৌশলে যথাযোগ্য রূপভেদ অবশ্য বিচার্য।"[৪]

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এর পরেও কোনো কোনো রচনায় (যেমন, "ভারতচেতনা, সমাজবাদ ও মানবিকতা", ১৯৭০) এই প্রসঙ্গে ফিরে এসেছে, কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে নতুন নতুন সমরনীতি ও ব্যূহকৌশলের কথা আর বিশেষ আসে নি। তবে ভারতীয় চিন্তা মানেই যে ইহবিমুখিতা নয়—হীরেন্দ্রনাথ কখনোই এ কথা বলতে ভোলেন না, বরং বারেবারে সেটি মনে করিয়ে দেন।

ধর্ম, মার্কসবাদ, মানবিকতা ইত্যাদি নিয়ে হীরেন্দ্রনাথ ১৯৬৭-র পরে আর খুব বেশি লেখেন নি। ১৯৭০-এ "ভারতচেতনা, সমাজবাদ ও মানবিকতা"-য় ধর্মের কথা আসেনি, যদিও তাঁর দেশাভিমান (মালয়ালম ভাষার এই শব্দটি হীরেন্দ্রনাথের খুব প্রিয়) তখনও প্রবল। "সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু" (১৯৭৩)-তেও জীবনের ঐহিক দিকের ওপরেই জোর পড়েছে।

এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। ১৯৬৬-৬৭ থেকেই ভারতীয় রাজনীতির জগতে শূন্যতা কেটে যায়। ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দেখা দেয় ভারতের দিকে দিকে। তারই পরিণতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান ঘটে। যুক্তফ্রন্টের রাজনীতিই হয়ে ওঠে সংসদীয় রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত রূপ।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও কম ওলটপালট হয় নি। দেশে দেশে ১৯৬৮-তে ফেটে পড়ল ছাত্রবিক্ষোভ। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তাল হয়ে উঠল ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙন অবশ্য রোখা গেল না। কিন্তু দিকে দিকে দেখা দিল র‍্যাডিকাল চিন্তার বিস্ফোরণ। ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলীর মধ্যে মাথা তুলল লিবারেশন থিওলজি। র‍্যাডিকাল ভাবধারার প্রসার ঘটল লাতিন আমেরিকায়। চে গেভারা হয়ে উঠলেন দুনিয়াব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের নতুন ধ্রুবতারা।

এই পটপরিবর্তনের ফলে, অনিবার্যভাবেই, মার্কসবাদ-ধর্ম-মানবিকতা নিয়ে আলোচনা আর প্রাসঙ্গিক রইল না। ভারতের ঐতিহ্য বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন বহুগ্রাহী, এমনকি সর্বগ্রাহী বললেও ভুল হয় না। লোকায়ত-র পাশাপাশি সব ধর্মমত থেকেই তিনি ইতিবাচক উপাদান খুঁজে পেতেন। ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যে কোন্ ধারাটি তুলনায় ক্ষীণ হলেও সম্ভাবনাময়, আর কোন্‌টি আপাত প্রবল হলেও আসলে প্রাণশক্তিহীন—এর মধ্যে কোনো বাছাই তিনি করেন নি। মুখ্য ধর্ম আর গৌণ ধর্মের মধ্যে কোনোদিনই তিনি তফাত করতেন না। বেদ-

উপনিষদ থেকে কবীর-দাদূ—যখন যেখানে 'মানবিকতা'র লক্ষণ তাঁর চোখে পড়েছে, তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন। ''ধর্ম ও সমাজবিপ্লব'' (১৯৬০) প্রবন্ধে অবশ্য জোরটা পড়েছে ''ছোটো ঘরানা''-র ওপর।

কিন্তু অবস্থা তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে নি। ধীরে ধীরে পূর্ব ইওরোপে ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে অন্তর্ঘাত আর প্রতিবিপ্লব। 'বরফ গলা'র নাম করে ঢোকানো হয়েছে দেদার বেনো জল। গোড়ায় বিভ্রান্ত হলেও ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি, কমিউনিস্ট ভেকধারী গরবাচভ, ইয়েলৎসিন প্রমুখ প্রতিবিপ্লবীদের শেষ পর্যন্ত চিনে নেন হীরেন্দ্রনাথ। ''সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ'' নিয়ে গরবাচভ-এর বাগাড়ম্বর যে কত ফাঁপা সেটাও তিনি বুঝলেন।[৫] ধর্মের নামে, ভারতচেতনার নামে বাবরি মসজিদ ভাঙা থেকে গুজরাতের গণহত্যা পর্যন্ত সব ঘটনাই তো তাঁর চোখের সামনে ঘটল। ধর্ম-র ইতিবাচক দিক বলে যদি কিছু থাকেও, তার নেতিবাচক দিক যে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর—সে অভিজ্ঞতাও তাঁর নতুন করে হলো।

আসলে ধার্মিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের খোলা মনে আলাপ চলে কখন? যখন দুপক্ষই শোষক ও শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরি—দরকার পড়লে হাতিয়ার ধরতেও গররাজি নন। অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে এইভাবেই গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টান কমিউনিস্ট ও এমন সব মানুষদের ব্যাপক ঐক্য, যাঁরা ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানও নন, আবার দায়বদ্ধ কমিউনিস্টও নন। এর থেকেই সূত্রপাত হয় লিবারেশন থিওলজি-র, ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বর ইতিহাসে যা সত্যিকারের বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিল।[৬] কিউবা-র বিপ্লব অভিঘাতেই ঘটতে পেরেছিল এই বিশাল তাৎপর্যবাহী ঘটনা।

১৯৬০-এর দশকে ইওরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে, কমিউনিস্ট-খ্রিস্টান আলাপ ছিল এর তুলনায় নেহাতই শৌখিন বাক্যবিলাস। গ্রেট ব্রিটেন-এর কমিউনিস্ট পার্টির (অধুনালুপ্ত) তত্ত্ববিদ, ড. জন লেউইস এমন এক আলাপ-এর সূচনা করেছিলেন ১৯৬৬-তে। পার্টির পত্রিকা, *মার্কসইজম টুডে*-তে অক্টোবর ১৯৬৭ পর্যন্ত এই নিয়ে মোট বারোজন কমিউনিস্ট ও খ্রিস্টান তাঁদের মতামত জানান।[৭] সব ভেদ ভুলে, যাবতীয় ভক্ত খ্রিস্টান, এমনকি পাদ্রিদের পার্টির তরফে ডাক দেওয়া হয়েছিল দলের সদস্য হওয়ার জন্যে।[৮]

কী লাভ হয়েছিল তাতে? খ্রিস্টানরা যেমন ছিলেন তেমনই থেকেছেন, কেউ পার্টিতে যোগ দেন নি পেছু হটেছেন সি পি জি বি-র কর্তারাই। আলাপের শেষে ড. লেউইস ঘোষণা করেন : মার্কসবাদীদের পক্ষে নিজেদের নিরীশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করা পুরোপুরি অ-মার্কসবাদী আর 'বস্তুবাদ' (মেটিরিয়ালিজম) শব্দটা বাতিল করতে পারলেই তিনি খুশি হন। 'আধুনিক মতবাদ' যাঁরা গ্রহণ করছেন, তাঁরা নাকি আর নিজেদের বস্তুবাদী বলেন না। ''তাঁরা নিজেদের কিছুই বলেন না।'' সুতরাং মার্কসবাদীরাই বা কেন নিজেদের বস্তুবাদী বলে বখেরা বাড়ায়।[৯]

এই সময়ে ব্রিটিশ পার্টির কর্তাদের চোখে ফরাসি কমিউনিস্ট দার্শনিক, রজের গারোদি

ছিলেন নতুন গুরুঠাকুর। গারোদি-র *নিষেধ থেকে আলাপ (ফ্রম অ্যানাথেমা টু ডায়ালগ)* বইটির খুব সুখ্যাতি করেছিলেন ব্রিটিশ পার্টির মুরুব্বিরা। পরে অবশ্য সোভিয়েত পার্টির তাত্ত্বিকরা গারোদি-কে 'দলদ্রোহী' (রেনিগেড) মার্কা মেরে দিলেন। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি থেকেও তাঁকে বার করে দেওয়া হলো।

এই আলাপ চালিয়ে পূর্ব ইওরোপেও, বিশেষ করে পোল্যান্ডে, কোনো লাভই হয়নি। সেখানকার পার্টিনেতারা ছিলেন অপদার্থ, তার জন্যেই সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে পারল সলিডারিটি (সংহতি) নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা। কিন্তু জনগণতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে কামান দাগার কাজে প্রধান গোলন্দাজ ছিলেন খোদ পোপ। দ্বিতীয় পল। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভ্যাটিকান মুখ খুলেছে বটে, কিন্তু তার জন্যে কি ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলীর কমিউনিস্ট-বিরোধী (বহুক্ষেত্রে মানব-বিরোধী) রেকর্ড ভুলে যেতে হবে?[১০]

আন্তর্জাতিকতার ঐতিহ্য ত্যাগ করে ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেন-এর শোধনবাদী পার্টিগুলি এক কিম্ভূত 'ইওরো কমিউনিজম'-এর তত্ত্ব বাজারে ছেড়েছিল। গদ্‌গদ হয়ে তারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন গর্বাচভ।[১১] লাভের মধ্যে সে-পার্টিগুলো এখন সাইনবোর্ড সমেত উঠে গেছে, অথবা ভাগ হয়ে গেছে একাধিক দলে।

ঘটনা হচ্ছে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঙনের পরে, ১৯৬০-এর দশক থেকেই অনেক পোড়-খাওয়া মার্কসবাদীও দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। কোনো পথের নিশানা না পেয়ে কেউ কেউ শুরু করেছিলেন এই নিরিখে ভাবতে ধর্মের সঙ্গে একটা আপস রফা করে একটু বল বাড়ানো যায় কি না। এর ফায়দা লুটেছে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব পুঁজিবাদ—ধর্মকে আশ্রয় করেই তারা সুকৌশলে গড়ে তুলেছে কমিউনিস্ট-বিরোধী জিগির—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে, পোল্যান্ডে, ইওরোপের সর্বত্র। আজ ইওরোপে সমাজবাদী ব্যবস্থার পতনের পর, লাতিন আমেরিকাতেও প্রতিক্রিয়ার শক্তি অনেক বেশি জোরদার। লিবারেশন থিওলজিও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।[১২]

পেছন ফিরে তাকালে ধর্ম-মার্কসবাদ আলাপের ঐ বিফল অধ্যায়টিকে শোধনবাদী ভাবনার অনিবার্য পরিণতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ঐক্য যদি গড়ার হয়, তা গড়া হবে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কাউকে ডাকাডাকি করে আলোচনায় বসাতে হবে না। ধরুন, বাস্তিয়ান ভিলেঙ্গা বা ফাদার বাডাক্কান (Vadakkan)-এর মতো ক্যাথলিক ধর্মযাজক। মার্কসবাদকেই তাঁরা স্বীকার করেন যাবতীয় ঐহিক ক্ষেত্রে। সমাজ-বিশ্লেষণে তাঁরা মার্কসবাদী পথেরই অনুসারী। কিন্তু তাঁদের অন্তরে কিছু আধ্যাত্মিক আকুতিও আছে। তার জন্যেই তাঁরা খ্রিস্টকে ত্যাগ করতে রাজি নন।[১৩] এঁদের মতো খ্রিস্টানের সঙ্গে যে-কোনো মার্কসবাদী স্বচ্ছন্দে আলাপ চালাতে পারেন, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। একই কারণে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে ধর্ম নিয়ে দিনের পর দিন সাক্ষাৎকার নিতে পারেন ফ্রেই বেত্তো।[১৪] সত্য সর্বদাই মূর্ত : বিমূর্তভাবে ধর্ম আর বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে কোনো আলোচনা হয় না।

যদি শুধু ভারতের কথাই বলেন, এখানকার কোন্ হিন্দু বা ইসলামি সম্প্রদায়ের সঙ্গে জনগণের অধিকারের স্বার্থে, সংগ্রামের লক্ষ্যে আলাপ চালানো যায়? শুধু যে ১৯৮০-র দশক থেকেই ভারতে ধর্ম আর রাজনীতির গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে, এমন তো নয়। মাঝে মাঝেই গো-হত্যা নিবারণের নামে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে থাকে রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী কিছু লোক। আর তাদের তালে তালে নাচেন নানান উপসম্প্রদায়ের হিন্দু ধর্মনেতা। শুধু ধর্মনেতাই নন, বিনোবা ভাবে-র মতন গান্ধীবাদী "ভূদান" প্রচারকও। ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই এই নিয়ে তিনি হুমকি ছেড়েছিলেন।[১৫] আর এখানকার ইসলামি সম্প্রদায় ও তাদের উপসম্প্রদায়গুলির কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। এঁদের বেশিরভাগ শুধু প্রতিক্রিয়াশীল নন, চূড়ান্ত অতীতমুখী। একুশ শতকে এঁরা অচল। তাই বা বলি কেন, উনিশ শতকের দুনিয়াতেও এঁরা অচল ছিলেন।

সব মিলিয়ে ঘটনা দাঁড়ায় এই মুক্তমতির নমুনা হিসেবে ধর্ম-মার্কসবাদের আলাপ কোথাও পৌঁছতে পারে নি। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তো নয়ই, এমনকি তাত্ত্বিক স্তরেও তার মধ্যে স্ববিরোধ ও বিভ্রান্তি ছিল প্রচুর। তবে সুখের কথা, হীরেন্দ্রনাথের মুক্তমতি শুধু ঐ একটি ক্ষেত্রেই আটকে থাকে নি, অন্য ক্ষেত্রেও তাঁর মুক্তমতির প্রমাণ দেখা গেছে—যে মুক্তমতি একই সঙ্গে ব্যাবহারিক ও তাত্ত্বিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য।

হীরেন্দ্রনাথের জীবনের যে-কোনো পর্বেই একটি স্থির কেন্দ্র দেখা যায়। পুণ্যে-পাপে, সুখে-দুঃখে, পতনে-উত্থানে কখনোই তিনি সোভিয়েত বিপ্লব ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আস্থা হারান নি। মার্কসবাদের সত্য যে ব্যাবহারিক সত্য, ১৯১৭-র নভেম্বর বিপ্লব থেকেই যে ইতিহাস এক নতুন পথে মোড় নিয়েছে—এই বিশ্বাস তাঁর কখনোই টলে নি। গর্বাচভ-ইয়েল্‌ৎসিন চক্র যখন সমাজবাদী ব্যবস্থার কুইসলিঙ হয়ে দাঁড়াল, হীরেন্দ্রনাথ তাঁদের কৃতঘ্নতায় 'ক্লিষ্ট' হয়েছিলেন।[১৬] তবু তাঁর আস্থা ছিল : নভেম্বর বিপ্লবের মহিমা এমনই যে উত্তরপুরুষের কৃতঘ্নতা সত্ত্বেও তা অটুট থাকে। গ্র্যায়াম গ্রীন-এর মতো তিনি তাই বারে বারে ঘোষণা করেন : ক্যালিফোর্নিআ-র চেয়ে গুলাগ দ্বীপপুঞ্জে শেষ জীবন কাটানো অনেক ভালো।[১৭]

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতনের (১৯৮৯) আগে থেকেই হীরেন্দ্রনাথের মুক্তমতির চিন্তা অন্য এক দিকে বাঁক নিয়েছিল। পার্টির সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন পার্টিতে নাম লেখানো সদস্যদের বাইরে, মানবমুক্তির স্বার্থে নানা ক্ষেত্রে কর্মরত বহু মানুষ রয়েছেন। তাঁরা ধার্মিক নন, বরং অ-ধার্মিক, কিন্তু চিন্তা ও কর্ম-র জগতে সত্যিকারের মৌলিক পরিবর্তনে উৎসাহী। 'বৃহত্তর অর্থে পার্টি'-র কথা মোটামুটি এই সময় থেকেই তাঁর লেখায় দেখা দিতে থাকে। "প্রগতি সাহিত্য শিবির ম্লান, কুণ্ঠিত, স্তিমিত কেন?" (১৯৮৮) প্রবন্ধেই বোধহয় হীরেন্দ্রনাথ প্রথম মার্কস-এর চিঠি থেকে একটি শব্দগুচ্ছ উদ্ধৃত করেন। ফ্রাইলিগ্রাট নামে এক বন্ধুকে মার্কস লিখেছিলেন "The Party in the grand historical sense of the term"-এর কথা।[১৮] তার পরে বারে বারে হীরেন্দ্রনাথের লেখায় মার্কস-এর ঐ শব্দগুচ্ছটি এসেছে। "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" (১৯৯২) প্রবন্ধটি শেষ হয় ঐ কথাগুলি দিয়ে।[১৯] তাঁর

সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংঙ্কলনেও দেখলুম "একুশের ভাবনা" (২০০০) প্রবন্ধে ঐ একই বাক্যাংশ/শব্দগুচ্ছ।[২০] "কেন লিখি?" (১৯৯৮)-তেও তিনি বলেছিলেন

> আমার সর্বদা উদ্দেশ্যসর্বস্ব লেখার পিছনে থেকেছে স্বদেশের মুক্তি আর (সঞ্চার [সত্তার?] কথঞ্চিৎ পরিণতিকালে) লোভ জটিল শোষণভিত্তিক স্বার্থসন্ধ অথচ তৎসত্ত্বেও বহুগুণখচিত এবং এখনও কথঞ্চিৎ মায়াময় বিশ্বব্যবস্থার বিলোপ। এই দ্বৈত অভিপ্রায় হয়তো উদ্ধত মনে হলেও আমার সকল প্রয়াসের মূলে, সকল রচনার উদ্দিষ্ট, তা আমি রাজনীতি বা ইতিহাস বা কাব্যচর্চা বা ক্রীড়াকৌতুক যে কোনো বিষয়েই লিখি না কেন। 'ফরমায়েসি' লেখা বলে ভ্রূকুটি আমায় বিচলিত করবে না, কারণ এটুকু বলতে পারি যে ফরমায়েসটা আমারই নিজস্ব না হলে লিখতে পারি না। এখন এই মুহূর্তেই 'অনিচ্ছা' কাটিয়ে যা লিখছি তার অভিপ্রায় হল যে হয়তো বা আমার চিত্তচরাচর ব্যাপ্ত যে অন্বিষ্ট, যা আমার বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সুগভীর অকিঞ্চিৎকরতার উপশম কিছু ঘটায়, সেই অন্বিষ্ট অল্প হলেও কিছু সহায়তা পাবে আর আমি এই অতি তুচ্ছ রচনার মধ্যে দিয়েও হয়তো কিছু সৎ শুচি সহজ মানুষকে টানতে পারব যাকে কার্ল মার্কস বহুকাল আগে বলেছিলেন 'the Party in the grand historical sense of the term,' তার পরিধির মধ্যে না হলেও অন্তত তার সমীপ্যে।[২১]

মার্কস-এর কথাগুলির প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

ফার্দিনান্দ ফ্রাইলিগ্রাট (১৮১০-১৮৭৬) ছিলেন একজন জার্মান কবি, কমিউনিস্ট লীগ-এর সদস্য *নয়ে রাইনিশ ৎসাইটুং* (১৮৪৮-৪৯) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। মার্কস-এর একটি লেখায় 'পার্টি' শব্দটির ব্যবহার দেখে ফ্রাইলিগ্রাট তাঁর কাছে জানতে চান কোন্ পার্টির কথা তিনি বলছেন। উত্তরে মার্কস জানান নভেম্বর ১৮৫২-য় নিজেই উদ্যোগ নিয়ে কমিউনিস্ট লীগ নামক সংস্থাটি আমি ভেঙে দিয়েছিলুম। তারপর আমি আর কখনও কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলুম না, সে-সংগঠনটি গুপ্তই হোক আর প্রকাশ্যই হোক। তাই পুরোপুরি ক্ষণস্থায়ী অর্থে *পার্টি* ব্যাপারটা আট বছর আগেই চুকে গিয়েছিল। 'পার্টি' বলতে আমি বুঝিয়েছি 'ব্যাপক ঐতিহাসিক অর্থে পার্টি'-র কথা।[২২]

বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্দোলনের এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা। কিন্তু তাই বলে তো খেটে খাওয়া মানুষের বাঁচার লড়াই আর ধর্মীয় উন্মাদনা, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুক্তি ও বিজ্ঞান চেতনার অভিযান থেমে যায় নি। পার্টির নাম ও পতাকা ছেড়ে 'সোশালিস্ট ভদ্রলোক' সেজেছে ইওরোপের প্রাক্তন কমিউনিস্টরা। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় সংগ্রামী মানুষ সে-ভুল করছেন না। তাঁরা বোঝেন : মার্কস-এর এই কথাগুলিই আসল সত্য

> ধর্মের সমালোচনা আনে মোহমুক্তি ; আর সেই মোহমুক্তির ফলে পূর্ণ সম্মতি পেয়ে মানুষ চিন্তা কর্ম এবং আত্মসত্তা গঠনে ব্যাপৃত হতে পারে। মানুষ

তখন নিজেই নিজের সূর্য। স্বকীয় অক্ষপটে [অক্ষপথে?] তার গতিবিধি। ধর্ম হল সেই কপট সূর্য যা পূর্ণ আত্মচেতনা থেকে বঞ্চিত মানুষের চারপাশে পরিভ্রমণ করতে পারে।[২৩]

(হীরেন্দ্রনাথের নিজের-করা অনুবাদ থেকেই এই অংশটি উদ্ধৃত করলুম।)

কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাগাভাগি নিয়ে এখানে যাঁরা শুধু চোখের জল ফেলেন, তাঁদের ঐতিহাসিক বোধের অভাব বড়ই প্রকট। পরিস্থিতির অনিবার্য বিকাশ ও পরিণতিতেই ঐক্য গড়ে ওঠে, বিভেদও দেখা দেয়। কিন্তু তার জন্যে গোটা আন্দোলন চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যায় না। খ্রিস্টধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস কমিউনিস্ট আন্দোলনের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি পুরনো (যদিও শোষিত মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস তার চেয়েও ঢের পুরনো)। খ্রিস্টধর্মের যে কতশত সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় আছে তার তালিকা করা শক্ত। তাদের মধ্যে বিভেদ, বিরোধিতা ও পারস্পরিক চাপান-উতোরও কম হয় না। তার পাশাপাশি আবার বিভিন্ন ধরণের খ্রিস্টীয় ধর্মমণ্ডলী(চার্চ)-কে এক করার জন্যেও চেষ্টা চলে। একুমেনিকাল (আক্ষরিক অর্থে : বিশ্বজোড়া, বসত-গাড়া পৃথিবীময়) আন্দোলনের কথা অনেকেই জানেন।[২৪] ওয়ার্ল্ড্ কাউন্সিল অফ চার্চেস-এর আওতায় বহু ধর্মমণ্ডলী, আর্মেনিয়ান ধর্মমণ্ডলী ও আরও কয়েকটি ধর্মমণ্ডলী এসেছে। কিন্তু বিশ্ব-খ্রিস্টান ঐক্য এখনও সুদূরপরাহত।

এত ভাগাভাগি সত্ত্বেও, দেশে-দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে কিন্তু কখনোই বড় রকমের ছেদ পড়ে নি। ১৯৬০-এর দশকে গণ-আন্দোলনের চাপে একুমেনিকাল তত্ত্বের প্রবক্তারা তাঁদের প্রথম দিকের কমিউনিজম-বিরোধী অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হন—যদিও ঠাণ্ডা লড়াই-এর একটি রণক্ষেত্র (ফ্রন্ট) হিসেবেই ঐ একুমেনিকাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ধর্মমণ্ডলীর নিজস্ব সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই ছিল তার আদি উদ্দেশ্য।

সঙ্কীর্ণ অর্থে 'ধর্মমণ্ডলী'র সীমা ছাড়িয়ে খ্রিস্টধর্মের সব রকমের অনুগামীর এক অদৃশ্য, আল্‌গা জোট প্রায় দু হাজার বছর পৃথিবীতে বহাল রয়েছে। খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার পাল্‌টা জোট এখনও সমান সক্রিয়। 'বৃহত্তর অর্থে পার্টি'র ধারণাটি তাই সর্বদাই প্রাসঙ্গিক। 'ব্যাপক ঐতিহাসিক অর্থে' এই পাটি এখনও মরে নি, কখনও মরবে না, কারণ তার অনুগামীদের জানা আছে : কপট সূর্য আর প্রকৃত সূর্যর মধ্যে কোনো আপস চলে না। হীরেন্দ্রনাথও এই বোধেই নিজ বিশ্বাসে স্থির আছেন। এই তাঁর যথার্থ মুক্তমতির পরিচয়।

টীকা

১. তিনটি প্রবন্ধেই পাওয়া যাবে হীরেন্দ্রনাথের *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, খণ্ড ২, প্রণব বিশ্বাস সম্পা., কলকাতা মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৫-এ।

২. "সবার উপরে মানুষ সত্য" কথাটির মানবতাবাদী ব্যাখ্যায় বোধহয় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন অশোক রুদ্র, *পরিচয়*-এই প্রকাশিত কোনো লেখায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় হীরেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য।

মার্কসবাদ ও *মুক্তমতি*-র সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রদ্যোৎ গুহ লিখেছিলেন .....পংক্তিটির

পরবর্তীকালের মনের মাধুরী মেশানো যে ব্যাখ্যা [হীরেন্দ্রনাথ] উপস্থিত করেন, তাও বৈজ্ঞানিক বিচারে টিকবে কিনা সন্দেহ।" (*নির্বাচিত প্রবন্ধ*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৫০-এ উদ্ধৃত)।

প্রসঙ্গত বলা যায়, গোপাল হালদারও চণ্ডীদাসের ঐ চরণদুটির ঐ রকম অ-ধর্মীয় অর্থ করতেন। সে-ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন গোলাম কুদ্দুস (গোলাম কুদ্দুস, "আমার গোপালদা", *গণশক্তি*, ৩রা মার্চ ২০০২, রবিবারের পাতা, পৃ. ১০ দ্র.)।

৩. *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (পরে *নি. প্র.*), খণ্ড ২, পৃ. ৩০৪-এ উদ্ধৃত।

৪. *নি. প্র.* ২, পৃ. ৩৩-৩৪। পরে অবশ্য হীরেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন : স্তালিন-এর ধারণাই ঠিক ছিল। ১৯৫৬-র পরে ক্রুশ্চভ প্রমুখের মত বাস্তবে মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে। "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" (১৯৯২), *নি. প্র.* ২, পৃ. ৩৩৩-৩৪ দ্র.।

৫. ঐ, পৃ. ৩৩৪-৩৫ দ্র.।

৬. *Monthly Review*, Vol. 36 No. 3 July-August 1984-তে 'Religion and the Left' নাম দিয়ে অনেক ক'টি লেখা বেরিয়েছিল। লেখকদের মধ্যে ছিলেন নিকারাগুআ-র এর্নেস্তো কার্দেনাল, কোলোম্বিআ-র কামিলো তোর্‌রেস প্রমুখ বিপ্লবী পাদ্রি, যাঁরা অস্ত্র ধরেই লড়তেন। তিন মহাদেশে লিবারেশন থিওলজি ও খ্রিশ্চান বামপন্থীদের সম্পর্কে অনেক কথা এই লেখাগুলিতেই পাওয়া যায়।

৭. James Klugmann (ed.) *Dialogue of Christianity and Marxism*, London Lawrence and Wishart, 1986 দ্র.।

৮. মার্চ ১৯৬৭-তে গ্রেট ব্রিটেন-এর কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাব সূত্র ৭, পৃ. ৮৮-তে উদ্ধৃত।

৯. সূত্র ৭, পৃ. ১০৬-০৭ দ্র.।

১০. এই পোপ সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথের মন্তব্য খুবই যথাযথ 'বিচক্ষণ, "বাক্‌পটু" অথচ গভীরভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী ধর্মনায়ক'। "ধর্ম ও সমাজবিপ্লব" (১৯৯০), *নি. প্র.* ২, পৃ. ২১৯। এ ছাড়া ঐ, পৃ. ১৭৯ দ্র.।

১১. গর্বাচভ অবশ্য বলতেন "Our common European home' "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" (১৯৯২), *নি. প্র.* ২, পৃ. ১৭৫, ৩৩৩ দ্র.।

১২. এ বিষয়ে চমৎকার আলোচনার জন্যে জেমস পেত্রাস, "উত্তর-মার্কসবাদ একটি মার্কসবাদী সমালোচনা", *অন্যস্বর/Other Voice*, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৬৮-৮৬; বিশেষত পৃ. ৮৩-৮৫ দ্র.।

১৩. Bastiaan Wielenga, *Marxist Views on India in Historical Perspective*, Madras The Christian Literature Society, 1976, pp. xiii–xvii দ্র.।

১৪. Frei Betto, *Fidel and the Religion*, New Delhi People's Publishing House, 1987 দ্র.।

১৫. ঐ সময়ে একটি অসামান্য দেওয়াল-লিখন চোখে পড়েছিল গরুর জন্যে বিনোবা ভাবে/মানুষের কথা কে ভাবে!

১৬. "ভূমিকা", *বিপ্লবের পরাজয় নেই* (১৯৯০), *নি.প্র.*২, পৃ. ৩৬৬।

১৭. "গণতন্ত্রের সার্থক পরিণতি সাম্যবাদে" (২০০১), *আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে*, কলকাতা অনুষ্টুপ, ২০০২, পৃ. ৫৩। হীরেন্দ্রনাথ আরও একাধিকবার গ্রীন-এর কথার

প্রতিধ্বনি করেছেন।

১৮. *নি. প্র.* ২, পৃ. ৩২৬-২৭ দ্র.।

১৯. ঐ, পৃ. ৩৪৪।

২০. *আকাশগঙ্গা* (সূত্র ১৭), পৃ. ৯৩।

২১. ঐ, পৃ. ১২২।

২২. ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০-এর চিঠি। Marx-Engels, *Collected Works*, Vol. 41, Moscow Progress Publishers, 1985, pp. 81-87 দ্র.।

২৩. *নি. প্র.* ২, পৃ. ২১২-য় উদ্ধৃত।

২৪. Yuri Kryanev, *Christian Ecumenism*, Moscow Progress Publishers, 1983 বইটিতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রদ্যুৎকুমার দত্ত, সিদ্ধার্থ দত্ত, প্রভাসকুমার সিংহ, অমিতাভ ভট্টাচার্য, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্যের পবিত্রতা

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা মুক্তমনকে পঙ্গু করে দেয়। আপন বিলাস ও বৈভবের স্বপ্নটুকু কেড়ে নেয়। এটাই যথার্থ কমিউনিস্টদের প্রতি সাধারণের অভিযোগ। এ অভিযোগ কমিউনিস্টদের কাছে হতাশার এবং একই সঙ্গে গর্বের। একজন যথার্থ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়কের মধ্যে বেঁচে থাকে আর একজন 'ব্যক্তি'। শ্রদ্ধাবত্তা, দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা ও শৃংখলার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে সেই লুকানো 'ব্যক্তি' তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে। এই ব্যক্তি-বা ব্যক্তিত্ব যখন নিজেকে অতিক্রম করে মানুষের কথা বলে, তখনই ঘটে ব্যক্তিত্বের উত্তরণ। ব্যক্তি মানুষকে অবিকল একই রেখে মার্কসবাদী, রাজনীতিবিদ—ইত্যাদি কৃত্রিম 'বিশেষণে' আত্ম-প্রবঞ্চিত না হয়ে অবরুদ্ধ মানবাত্মার মুক্তি-আন্দোলনে নিজস্ব রাজনৈতিক পথকে এক শক্তিশালী ও সফল পদ্ধতি হিসাবে প্রমাণ করতে পারলেই 'মুক্তমন'-কে পঙ্গু করে দেওয়ার সাধারণের এই অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে। আর তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে লক্ষ্যের পবিত্রতা।

'চক্ষুষা কাণঃ' ও 'অল্পে সুখ নেই', হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর এই প্রবন্ধ সংকলন দুটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে ক্রমশ একজন হীরেন্দ্রনাথের মধ্যে জন্ম নিয়েছে এই পবিত্রতা, লক্ষ্য আর লক্ষ্যপূরণের পবিত্রতা।

অনেকের মনে হতে পারে সাহিত্যই ছিল তাঁর স্বভূমি। রাজনীতি তাঁকে সে ভূমি থেকে বিচ্যুত করেছে। বাগ্মী, সাংসদ, সুপণ্ডিত, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর লেখা পড়ে সে কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু 'রাজনীতিবিদ' পরিচয় তাঁর অন্য ব্যপ্তিকে এমন ছোটো করে দিয়েছে যে অদ্যাবধি তাঁর সাহিত্য ও মননশীলতার ওপর তীক্ষ্ণধী কোনো আলোচনা গড়ে ওঠেনি। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে চক্ষুষা কাণঃ ও অল্পে সুখ নেই—এই সংকলন দুটির নিরিখে খণ্ডিত নয়, সমগ্র হীরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি। এবং তা ধ্রুবনীতিপথ থেকে মুক্তমনা মার্ক্সবাদী হীরেন্দ্রনাথের লক্ষ্যে বিচ্যুত না-হওয়া শক্তিশালী ও সফল পদ্ধতি দিয়ে।

'ভারতবর্ষে জন্মেছি বলে আমার অভিমান বড় বেশি—মাঝে মাঝে ভয় হয় যে বুঝি এ অহংকার সমুচিত নয়, কিন্তু একে পরিহার করতে পারি না। হয়তো সেইজন্যই বারবার মনে ঘুরতে থাকে 'ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই'। রাজনীতির আবর্তে ক্ষুদ্রতা লক্ষ্য করি প্রায়ই—শুধু সেখানে কেন, অপর বহু ক্ষেত্রেও, যাঁরা বিদ্বান্ ও নমস্য বলে খ্যাত তাঁদের মধ্যেও দেখি, আর দেখি নিজের দোর্বল্য, ভ্রান্তি, ধ্রুবনীতিপথ অনুসরণে অপারগতা।'—'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ সংকলের মুখবন্ধে হীরেন্দ্রনাথের এই আত্মবিশ্লেষণ-ই পবিত্র লক্ষ্যের প্রেরণা।

বাংলা সাহিত্য আমাদের গর্ব। বাংলা ভাষাভাষী হিসাবে আমাদের মহত্তম কৃষ্টি। এরই মধ্যে আছে, আমাদের দর্শন, আমাদের বিজ্ঞান। ভিন্নমুখী চিন্তার মহৎ পথ-পরিক্রমায় তা বিচরণ করে। আমাদের এই সৃষ্টির মন্দির গড়ে তুলেছি, জনগণের নীরব সমর্থন নিয়ে। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। অতএব ব্যক্তিপরিক্রমার ঊর্ধ্বে সৃষ্টি জগতে ব্যক্তিত্বের উত্তরণ ঘটেছে জনদুয়ারে। রবীন্দ্র সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইতিহাসে রবীন্দ্রসাহিত্য এক বিস্ময় কারণ সাহিত্যের অঙ্গনে আগে কোনো সৃষ্টি রবীন্দ্র সাহিত্যের মতো এত সবলতা ও দ্রুততা নিয়ে, প্রতিভার এমন বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠেনি।

"...কবির কাছে আহ্বান যাচ্ছে আর্টকে ব্যবহার করতে হবে অস্ত্র রূপে, যে অস্ত্র হবে সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রের নির্বিশেষ আভরণে দীপ্ত। কবি বুঝেছেন যে বিপ্লব যখন আগত বা আসন্ন তখন আর্টের চেহারা বদলাবে। সে চেহারা হয়তো মনোরম নয়। কিন্তু সামাজিক সমস্যার নির্বন্ধ লঘু না হওয়া পর্যন্ত কবিতার নতুন মূর্তি আমাদের কাছে প্রকট হবে না।'—

হীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভাবনা এই ভাবেই লক্ষ্যের পবিত্রতাকে সামনে রেখে বিষয় পরম্পরা ব্যাতিরেকে লেখা হতে থাকে। নয়তো 'আধুনিক বাংলা কবিতা' আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে যৌথ সম্পাদনাকালে দুটি পৃথক ভূমিকা এমনভাবে অনিবার্য হত না। এই দুই সম্পাদকের সাহিত্য বিচার ও রাজনীতিবোধ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। তাই স্বতন্ত্র দুটি ভূমিকা ব্যতিরেকে বইটি সম্পাদনায় দুই সত্তার মিলন একেবারেই সম্ভব ছিল না। যদিও তিনি দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকা লেখার ব্যাতিক্রমী এবং অনিবার্য প্রয়াসকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য 'সুভাষিত রত্নকোষ' প্রকাশ কালে ইঙ্গল্‌স্ ও ডি কোশাম্বীর দুটি পৃথক ভূমিকার উদাহরণ অনেকে টেনেছেন তবুও এর অর্ন্তনির্হিত কারণ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা ভূমিকা দুটি পড়লেই বোঝা যায়।

আধুনিক বাংলা কবিতা কোনো ঋজু প্রবাহী নয়, তার মধ্যে আছে ভিন্ন প্রবাহ, ভিন্ন প্রকৃতি এবং ভিন্ন অভিব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা। আধুনিক কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সমর সেনের হাত ধরে প্রতিবাদী যে ভিন্ন ধারার প্রবেশ ঘটেছে তা আসলে আধুনিক কবিতারই উপধারা। তথাকথিত আধুনিকতা ও প্রগতিবাদী ধারা পাশাপাশি বিরাজমান। আইয়ুব যখন এই ধারাকে স্বতন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেন তখন আর মার্ক্সবাদী হীরেন্দ্রনাথ-এর উপায় থাকে না, স্বতন্ত্র ভূমিকা অনিবার্য হয়ে আসে আইয়ুব-এর বক্তব্যের পাশাপাশি উপ-বক্তব্য রাখতে।

সাম্যবাদী কবিতা সম্পর্কে তৎকালীন বহু পাঠকের সংকীর্ণ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। আইয়ুবও এই ধারণাকে লালন করেছেন সযত্নে। তাই হীরেন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র ভূমিকায় মার্ক্সবাদী দর্শন বাধ্যতই প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। সাম্যবাদী কবিতার আবেগদীপ্ত সমর্থনে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'সাম্যবাদী কবিতা আজকাল বাংলাদেশে অনেকে লিখতে শুরু করেছেন, কিন্তু তারা যদি সকলে কবি না হন, তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।...'কিন্তু একথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই বুঝলে—যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ, সে অভিজ্ঞতার রং-ও প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য। আর্টিস্ট কমিস্ট না হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অনুভূতি আর প্রকাশ তাঁর ব্যবসা। তাই বোঝা শক্ত যে—

যব্ গোধূলি সময় বেলি ধ্বনি মন্দির বাহির ভেলি

নব জলধরে বিদুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।—হচ্ছে নিঃসংশয় কাব্যানুভূতি, আর আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকলমজুরদের ধর্মঘট বা কিষাণ জমায়েতের কোনো বিশেষ ভঙ্গিমা, কবিক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর কাব্যানুভূতির সরঞ্জাম নয়।'

হীরেন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনাই বস্তুতই লক্ষণীয়ভাবে ব্যক্তিগত। কিন্তু সমস্ত রচনাই একটি নির্দিষ্ট প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ। প্রতিটি রচনায় আছে নির্দিষ্ট 'ধ্রুবনীতিপথ'। এই পথ হল আমাদের স্বদেশের প্রতি অঙ্গীকার, জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা, এবং সর্বোপরি কমিউনিস্ট বিশ্ব এই বিষয়ে কী ভূমিকা পালন করছে বা করবে, তা অনুমান, অনুভব ও অনুধাবন করার অন্বেষণ। পাশাপাশি প্রতিটি রচনায় ভাষার সম্পদ ও জ্ঞানের বিচ্ছুরণ দেখলে অবাক হতেই হয়। তিনি সমগ্র জীবন নিয়োজিত করছেন মার্ক্সবাদের প্রয়োগের অন্বেষণে ও আবেগপূর্ণ আহ্বানে। জীবনের প্রতি, সাহিত্যের প্রতি, শ্রমশ্রান্ত জনগণের প্রতি, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ ও গভীর ভালোর প্রত্যয়ে অবিচল আছেন তাই আজও একানব্বই-এ। তাঁর ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে তাঁর লেখার দৃষ্টিকোণের মধ্যে, তাঁর অনুভূতি ও চিন্তনের মধ্যে। আর এই কারণেই 'চক্ষুষা কাণঃ' ও 'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ সংকলন দুটিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ শিরোনামের সমান্তরালে একটি সংহতিও লক্ষ করা যায়। এতদ্‌ভিন্ন একই সূত্রে গ্রথিত করার অন্য কোনো কারণ দেখি না।

আলোচ্য গ্রন্থের বহু প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট। সংগত কারণেই· তাই শঙ্খ ঘোষ 'কোরক' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা বলতে গেলে হীরেন মুখার্জীর মত মানুষের গলায় এমন একটা স্বর এসে যায় কেবল বাগ্মিতায় নয়, রচনাতেও—যাতে মনে হতে পারে তাঁরা আচ্ছন্ন হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশয়িতায়'...ইত্যাদি। 'হীরেন মুখার্জীর মত' শব্দ-বন্ধ ব্যবহার লক্ষণীয়। কারণ 'মার্ক্সবাদী' হীরেন্দ্রনাথের নিকট হয়তো এমন রবীন্দ্র-দুর্বলতা বেমানান! কিন্তু এই দুর্বলতা তাঁর সমস্ত আলোচনার 'ধ্রুবনীতিপথ'-এর বিপরীতে নতুন কোনো পথসন্ধান নয়। সার্দ্ধশতবর্ষের আলোকে 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার স্মরণিকা'-র উদ্বোধনী ভাষণ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'মার্ক্সের চিন্তা আর কর্মে সম্ভোগসর্বস্বতার বিপক্ষে যে বিদ্রোহ...তার বিপক্ষে মার্ক্সবাদীরাই সংগ্রামে অগ্রণী হতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর মত যুগন্ধর মহাত্মার চিন্তা থেকেও অনেক কিছু আহরণ করতে পারেন।'

কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে 'অতি বামপন্থী' ঝোঁককে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বামপন্থী ঝোঁককে তিনি কখনও গোপন রাখেন নি। কবিতার ক্ষেত্রে 'সাম্যবাদীর প্রতিপাল্য অনুশাষণ' যে অচল নয় প্রমাণের তাগিদে তিনিই লেখেন, 'প্রকৃত সাহিত্যকে ব্রহ্মসহোদর মনে করার মত তুরীয় ভাব আধুনিক কবির পক্ষে সম্ভব নয়।' সমসাময়িক ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে নিছক আর্টিস্ট ভেবে কবিরা থাকতে পারে না। 'তারা যে কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদিঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনায় যে কবিতা লিখতে পারেন না এমন কথা কেউ জোর গলায়

বললে অন্যায় করবেন।'

তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে 'মার্ক্সবাদের মুক্তবোধি দিয়ে সমস্ত বিক্ষিপ্তির নিবারণ ও স্থিতি প্রজ্ঞার প্রচেষ্টা' করে গেছেন তা প্রবন্ধগুলির বিষয় নির্বাচন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। প্রবন্ধগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণে তাঁর ধ্রুবনীতিপথ-ই প্রাধান্য পেয়েছে, হতে পারে তা কখনও আবেগে আবার কখনও যুক্তিতে তবুও চ্যুত হননি এই লক্ষ্যের পবিত্রতা থেকে।

"চক্ষুষা কাণঃ' প্রবন্ধসংকলন সূচিতে দৃষ্টি আবদ্ধ করলে দেখা যাবে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' ব্যতিরেকে কাব্য আলোচনায় এসেছে 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে'। অর্থাৎ সমকালীন প্রগতিবাদী কবি বিষ্ণু দে। 'আমাদের ইতিহাস' চেতনার ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানেও ইতিহাসের অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ যেন একটু ভিন্নমুখী। পুস্তক আলোচনায় তিনি বেছেছেন 'কয়েকটি সোভিয়েত বই' আর 'ডিস্‌কভারি অব ইন্ডিয়া' জওহরলাল নেহেরুর বিখ্যাত বই-এর আলোচনা 'ভারত আবিষ্কার'। শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে বিশ্বস্ত এই পণ্ডিত তাই অবলীলায় অন্য এক পণ্ডিতের লেখা প্রসঙ্গে বলেন, "বইটি প্রথম যখন হাতে পড়েছিল আশা, হয়েছিল যে নিশ্চয়ই দলিত ভারতবর্ষের কৃষক শ্রমিকদের সম্বন্ধে কয়েকটি দামি কথা লেখক বলেছেন, কিন্তু কৃষকদের উল্লেখ আছে মাত্র এক জায়গায়, সেখানে পণ্ডিতজি ভুল করে বাংলায় 'কৃষক প্রজা পার্টির নাম দিয়েছেন 'কৃষক সভা'। তিনি নিজে একবার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেও কোথাও শ্রমিক সংগঠনের নামগন্ধই প্রায়ই নেই।" কিম্বা "আজাদ হিন্দ ফৌজের বিষয়ে একটি কথাও নেই। জয়হিন্দ শব্দটির অনুপস্থিতিও লক্ষ করার মত।" তিনি সোশালিস্ট নেহেরুকে ব্যাখ্যা করেছেন একটি তরল গল্প দিয়ে। "গল্পে আছে যে বিলাতে রক্ষণশীল দলের একজন শিরোমণি লেডি অ্যাস্টার নেহেরুজির সামনে সোশালিস্টদের বিরুদ্ধে কিছু বলায় তিনি যখন আপত্তি করেন তখন জবাব আসে, 'মিস্টার নেহেরু, আমি আপনার মত সোশালিস্টদের কথা বলছি না।"

'বাঙালির ইতিহাস'—নীহাররঞ্জন রায়-এর পুস্তকটি আলোচনা প্রসঙ্গে স্বকীয় মার্ক্সবাদী সত্ত্বা এতটাই প্রখর ছিল যে এই সুলিখিত পুস্তকটিও তৃপ্ত করতে পারেনি হীরেন্দ্রনাথকে। ইতিহাসের বহুবিধ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ সহকারে নিজের পাণ্ডিত্যকে যথেষ্ট আলোকিত করে অপর একজনের ইতিহাস বিশ্লেষণকে যথার্থ সম্মান দেখিয়েছেন। কিন্তু সবশেষে এই কথাটুকু লিখতে ভোলেননি যে, "নীহাররঞ্জনের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তথ্য বিচারে তাঁর সমাজ সচেতন মন যদি অস্পৃষ্টকল্পনা পাণ্ডিত্যের হিমজাল থেকে আরো বেশি মুক্ত হতে পারত, তো আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি থাকত না।' কিম্বা 'পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রখর সমাজ-চৈতন্য একীভূত হয়েছে বলে নীহাররঞ্জনের 'বাংলার ইতিহাস রচনাক্ষেত্রে অনন্যপূর্ব রূপ দেখা দিয়েছে কিন্তু তাঁর সমাজ চৈতন্য সুসমঞ্জস সিদ্ধান্তে যেন উপনীত হতে পারে নি।"

এই একই কারণে, মার্ক্সবাদীর সত্ত্বার প্রখরতার কারণে, ধ্রুবনীতিপথে অবিচল থাকার কারণে সামান্য 'ফুটবল' প্রসঙ্গে আগাগোড়া ফুটবলপ্রেমী থেকে অবশেষে তিনি না লিখে পারেন না 'এর রহস্য ভেদকালে আজকে সমাজজীবনে যে কত গ্লানি কত দিকে ছড়িয়ে

রয়েছে তা খেলার দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে পারব।' খেলার দৃষ্টিকোণ থেকেও নির্দিষ্ট কিছু বুঝতে পারার তাগিদ, বোঝানোর তাগিদ কোন বাধ্যবাধ্যকতা থেকে অনুভব করেন তা আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না।

আর 'প্যারিস ১৯৪৪' তো ঐ নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণেরই কথা, এখানে তাঁর অননুকরণীয় ভাষার শৈলিতে আমাদের আরো আবেগঘন করে তোলে। আমাদের সেই আবেগ মথিত করে যখন লেখেন 'এই বছরের ২৩শে আগষ্ট তারিখটা তাই ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ব্যাপার। হিটলারী বুটের চাপে যে ফ্রান্স জীবন্মৃত হয়েছিল, দেশের মধ্যে বিভীষণ-বাহিনীর চক্রান্ত যে ফ্রান্সের স্বাধীন সত্তাকে নিঃশেষ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছিল, সেই ফ্রান্সই সুপ্তোত্থিত সিংহের মতো জেগে উঠেছে, কেশর আন্দোলিত করেছে। আর পূর্বের মতেই ফ্রান্সের নবজাগরণে প্রথমে সতেজ দুন্দুভিনিনাদ করেছিল বিপ্লব-স্মৃতিপুত মহানগরী প্যারিস।'—তখন তাঁর মননের কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া আর আমাদের কোনো উপায়ই থাকে না।

উনিশ শতকের উদারচেতা মধ্যবিত্ত পরিবারের এক দেশপ্রেমিক বালক ক্রমশ কমিউনিস্ট বলয়ে অধিষ্ঠিত হল,—এতো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে না, উদারচেতা নাগরিকতার যে ধারা তৎকালীন সময়ে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসকে পুষ্ট করেছিল, তারই সূত্র ধরে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মতো ব্যক্তি কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং 'এটা কোনো নাটকীয় মুহূর্তে নয়, সহজ স্বাভাবিক বিবর্তনেই আমার দেশাভিমান পরিণতি পেয়েছিল মার্ক্সবাদে।' কখনও আত্মকথনের লজ্জায়, অতিকথনের তাড়নায়, কখনও অপ্রিয় কথার সংকচে কুণ্ঠিত হয়েছেন বাংরবার, কিন্তু আদর্শচ্যুত হননি।

আমি যে আপাত প্রভেদ সত্ত্বেও দুটি প্রবন্ধ সংকলনের যে ঐক্যসূত্রের কথা বলছিলাম, তার প্রেরণার উৎস এখানেই। লক্ষণীয় যে 'চক্ষুষা কাণঃ'-র ভূমিকাতেই লুকিয়ে ছিল 'অল্পে সুখ নেই'-এর প্রস্তুতি। 'মার্কস্‌বাদের মুক্ত বোধি দিয়ে সকল বিক্ষিপ্তির নিরসন ও স্থিতপ্রজ্ঞার প্রচেষ্টা স্বল্প শক্তি নিয়ে করেছিলাম। কিন্তু যে নিষ্ঠা, যে নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন ছিল, তা আয়ত্ত হয়নি। 'নাল্পে সুখমস্তি'—তাই সুখ আমার মেলেনি।' তাঁর আকাঙ্ক্ষা কোনোদিনই সাহিত্য যশ ছিল না। দক্ষ সাংসদ হিসেবে তিনি একমাত্র পরিচিত হতে চাননি। সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতির ভাণ্ডার থেকে অকৃপণ চয়নে কৃতী বাগ্মী হয়েও খ্যাত হতেও চাননি কোনো দিন। একটা বোধ সর্বদা তাঁকে তাড়না করেছে। প্রকাশের তাগিদে কখনও তাঁকে প্রগতি লেখক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হতে হয়েছে, কখনও হতে হয়েছে সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দক্ষ পার্লামেন্টিরিয়ান, কখনও বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও সাযুজ্যের উত্তরণে রবীন্দ্রপ্রেমী।

কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তি-শৃংখলে আপাত ন্যায়-এর থেকে মার্ক্সবাদী ভূমিকা-ই প্রকট হয়েছে। সখ্যবন্ধনে নিজেকে কুণ্ঠিত করেও মত প্রকাশে সহমত হননি।

'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ সংকলনের মুখবন্ধে বাধ্যত লেখেন, ''বর্তমান বিশ্ব বহু বিকট ও প্রায়-অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, কোনো বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক অনুধ্যানকে বক্র, জটিল, কঠোর ইতিহাসবর্ত্মের বর্তিকা মনে করা অনেকের মতে বাতুলতা

বলে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে মুক্তমন নিয়ে মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশ আজকের পৃথিবীতে সংগঠিত হলে তন্মিশ্রা অপসৃত হবে, মানব সভ্যতার পথচারণ সার্থক হবে।''

মুক্তমন নিয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তার বিকাশ সর্বক্ষণ তাঁকে পীড়িত করেছে। তিনি লিখতে বাধ্য হচ্ছেন '...রাজনীতির আবর্তে ক্ষুদ্রতা লক্ষ্য করি প্রায়ই শুধু সেখানে কেন অপর ক্ষেত্রেও, যাঁরা বিদ্বান ও নমস্য বলে খ্যাত তাঁদের মধ্যেও দেখি, আর দেখি নিজের দৌর্বল্য, ভ্রান্তি, ধ্রুবনীতি পথ অনুসরণে অপারগতা।'

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন। সেখানে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের অনুরোধে গল্প-উপন্যাস প্রসঙ্গে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি 'অল্পে সুখ নেই' গ্রন্থে সংকলিত হয়। মুক্তমন নিয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তার বিকাশ ও ধ্রুবনীতি পথে অবিচল থাকার দৃষ্টান্তে প্রবন্ধটির সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর দু-একটি লাইন উল্লেখ প্রয়োজন : 'আমার বক্তব্যে হয়তো বাহুল্য ছিল, একটু বুঝি বেয়াড়া ভাবও দেখিয়ে ফেলেছি। বেশ মনে আছে আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তির আবহাওয়া নেমে এসেছিল। বহুদিনের বন্ধু এবং প্রগতি লেখক আন্দোলনের নায়ক মুলকরাজ আনন্দ নিজের বলবার পালা চুকে গেলেও আবার অনুমতি চাইলেন আমার কথার বিরোধিতার জন্য। বেশ মনে পড়ে উপস্থিত অনেকেই যেন বিচলিত। হয়তো বা বিরক্ত ক্ষুব্ধ। মনোজ বসুর মত আমাদের কাছের লোকও অখুশি। শুধু তারাশঙ্করবাবু উৎসাহ দিয়েছিলেন আমার সব কথা মানছেন না জানিয়ে দিয়েই। আর যেন নীহাররঞ্জন রায়-এর সকৌতুক দৃষ্টিতে একটু প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতার পরিচয় পেয়েছিলাম, যাকে অব্যক্ত অনুমোদন বলা যেতে পারে।'

লক্ষ্যের পবিত্রতা নিয়ে ধ্রুবনীতি পথে অবিচল থাকার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? তবু 'আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইনই চূড়ান্ত'—রুশ তাত্ত্বিক জদানভ এবং ফরাসি তাত্ত্বিক লুই-আরাগঁ-র এই বক্তব্যের বিপরীতে আর্টের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিধিনিষেধ না থাকার পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁর সঠিক মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, পরিশুদ্ধ চৈতন্য ও সামাজিক ঔদার্যের কারণে।

সংসদ প্রথম পঁচিশ বছর এবং তারও পর

অজেয়া সরকার

কিংবদন্তি-প্রতিম এক সাংসদের সিকি শতাব্দী ব্যাপ্ত সংসদ-জীবনের এক উজ্জ্বল লেখনীচিত্র এই নিবন্ধের আলোচ্য বস্তু। এক সুবিশাল দেশ ও বৈচিত্র্যময় জাতীয় জীবনের সার্বভৌম অস্তিত্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হিসাবে ১৯৫২ সালে যে প্রথম পার্লামেন্ট গঠিত হলো সেখানে মননে ও কর্মোদ্যোগে প্রাণবন্ত হীরেন্দ্রনাথ ঘটমান ইতিহাসের শরিক। প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং বহুদলীয় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে গঠিত প্রথম পার্লামেন্টে ভারতীয় গণতন্ত্রের যে মুখচ্ছবি প্রস্ফুটিত, পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে তার শক্তি ও দুর্বলতার স্থানগুলি, তার অগ্রগমন-সম্ভবনা ও পশ্চাদ্‌মুখিতা, তার আদর্শগত ও মূল্যবোধজাত সংঘাত ও সংকট সবই এক বিশিষ্ট বহমানতায় হীরেন্দ্রনাথের লেখনীধারায় সঞ্জীবিত হয়েছে। তবে শুধু তো রাজনৈতিক বহমানতাই নয়, হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিপট লেখায় উঠে এসেছে ব্যক্তিমানুষের কত একান্ত মুখ, চেনা মানুষের কত অচেনা ছবি, মতভেদ ও আনুষ্ঠানিকতার বেড়া ভেঙে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কত সম্মিলন, কত সৌহার্দ্য।

কমিউনিস্ট হীরেন্দ্রনাথ ইতিহাস ও রাজনীতির ছাত্র। সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্টকে তিনি ভারত ইতিহাসে নবযুগের সূচনা বলেই মনে করেছেন। হ্যাঁ, তারপর ধারাবাহিক আশাভঙ্গের কাহিনী সত্ত্বেও এখনও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দীপনার অভাব তাঁকে পীড়া দেয়। সমসাময়িক অনেক কমিউনিস্টের সঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর তৎকালীন বৌদ্ধিক অবস্থানের ভিন্নতা উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিক পীড়নে ক্লান্ত একটি জাতির কাছে রাজনৈতিক স্বীধনতার মূল্যও যে যথেষ্ট, এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করেছেন, এ-কথা মেনেও যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতার অধীশ্বর জনগণ নয়, পুঁজি। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান ও নীতিসমূহকে পরিবর্তন করার লক্ষ্যেও যে কমিউনিস্টরা প্রথম লোকসভায় গিয়েছিলেন এমনটা নয়। এমনতর অভীপ্সাও তাঁদের ছিল না। লেনিন কথিত একটি স্মরণীয় পংক্তি উদ্ধৃত করে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন এক্ষেত্রে লোকসভা নামক প্রতিনিধি-সভাটিকে নিছক বাচালতার জায়গা থেকে কার্যকরী ও সক্রিয় এক প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ করাই ছিল কমিউনিস্ট সদস্যদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তথাপি, ধরা যাক ভিট্টল রাও-এর কথা। তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের এই অন্যতম শীর্ষ সংগঠক প্রথম লোকসভার সদস্য হিসেবে সম্মানিত বোধ করলেও, মনে করতেন সংগ্রামের কোনও এক চূড়ান্ত বিন্দুতে ঐই লোকসভাকেই কমিউনিস্টদের পরিত্যাগ করতে হবে। কিংবা, এ কে গোপালন। কেরালার এই প্রবাদ-প্রতিম নেতা স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন স্বাচ্ছন্দ্যে অনভ্যস্ত এবং প্রায়শই কঠিন অর্থসংকটে অভ্যস্ত কমিউনিস্টরা সংসদ-জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যে অস্বস্তিবোধ করতেন। সংসদের রীতি-প্রকরণ ও আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বরে অধিকাংশ কমিউনিস্ট সদস্যই একাত্ম হতে পারেননি,

বরং এসব যে জাতীয় জীবনের প্রকৃত প্রতিনিধিসভা হয়ে ওঠার পথে বাধাস্বরূপ, সেটাই মনে করতেন।

তবু বলাই যায়, স্বাধীন ভারতের প্রথম সংসদ 'ভারতীয় বিপ্লবের সন্তানদের' (নেহরু কথিত) বিশিষ্টতার বর্ণময়তায় সমুজ্জ্বল ছিল। প্রতিভাবান ও মধ্যমেধার এক বিচিত্র সহাবস্থান ছিল সেখানে। ছিল উৎসাহী কর্মদ্যোগী ও প্রত্যাশা-পূরণের ব্যর্থতায় হতাশ অথবা রক্ষণশীল ও র‍্যাডিকাল সদস্যবৃন্দের সহাবস্থান। ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, হীরেন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন কুশলীশ্রেষ্ঠ সাংসদ। রাজ্যসভায় ছিলেন বি. আর. আম্বেদকর, হৃদয়নাথ কুনজ্রু এবং রামস্বামী মুদালিয়র-এর মতো পৃথিবীর যে-কোনও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি-সভায় সম্মান ও সমাদর পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিত্ব। পরিণত বয়সে কিছুটা হতাশাগ্রস্ত আম্বেদকর, ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে, সংবিধান-সংক্রান্ত প্রশ্নে অপ্রত্যাশিত শীতলতা প্রকাশ করলেও নিজের অবস্থান ও লক্ষ্যে কিন্তু কঠোরভাবে স্থিত ছিলেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের যে বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে আম্বেদকর আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে পেরেছিলেন, সংহতি ও সংগ্রামের প্রকৃত সদর্থক একটি আদর্শের অভাবে তা শেষপর্যন্ত কোনও প্রকৃত সামাজিক পরিবর্তনের বাহক হয়ে উঠতে পারেনি। হৃদয়নাথ কুনজ্রু বৃটেনে জন্মালে হতে পারতেন একজন সেরা লিবারাল। রক্ষণশীল মুদালিয়র ছিলেন একজন অতি দক্ষ কমিটিম্যান, জনপ্রশাসনে অভিজ্ঞ, যাঁর প্রতিভার সবটুকু প্রায় ব্যয়িত হয়ে যেত কোনও সামাজিক ভূমিকায় নয়, প্রশাসনিক খুঁটিনাটির তুচ্ছতায়।

প্রথম সংসদ অনেকাংশেই নক্ষত্রসভা। কংগ্রেস তরফে সি ডি দেশমুখ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভি ভি গিরি, রফি আহমেদ কিদোয়াই, টি টি কৃষ্ণমাচারি, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, হরেকৃষ্ণ মহতাব, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ। বাম-বিরোধী অ-কংগ্রেসি নক্ষত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থানটি অবশ্যই শ্যামাপ্রসাদের। ছিলেন আচার্য কৃপালনী, শিল্পপতি তুলসীদাস কিলাচাঁদ, অশোক মেহতা, হরিবিষ্ণু কামাথ, জয়পাল সিং, এন সি চ্যাটার্জী প্রমুখ।

বামপন্থীদের কাছে ১৯৫২-এর সাধারণ নির্বাচন ছিল মূলত নীতিবিষয়ক, দিগ্-নির্ণায়ক সিদ্ধান্তসমূহের প্রশ্নে লড়াই। অর্থ এবং পেশিশক্তির সহায়তা ছাড়াই প্রথম লোকসভার কমিউনিস্ট সদস্যদের নির্বাচন এবং পরবর্তী দিনগুলিতে জাতীয় জীবনের সর্ব-বিষয়ে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সংসদ-প্রক্রিয়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বারংবার। একটি সদ্য-স্বাধীন, অনগ্রসর, কৃষিভিত্তিক, শিল্পায়ন-উন্মুখ দেশ ও জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে প্রথম পার্লামেন্ট অনেকাংশেই সফল বলে হীরেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। এই প্রথম পার্লামেন্টে গুরুত্ব এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রভাবের নিরিখে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুই ছিলেন মধ্যমণি। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল জহরলাল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বও নিতেন গড়পরতার বেশি। সমস্ত জটিল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৫২ সালের মে মাসে সদ্যগঠিত সংসদের বস্তুত প্রথম উল্লেখযোগ্য বিতর্কে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর মন্তব্য করার সময়ে কমিউনিস্ট সাংসদদের নেতা এক গোপালন বলেছিলেন এটি হলো "ভারতীয় জনগণের উপরে সরাসরি যুদ্ধঘোষণার সামিল"। ক্ষিপ্ত জহরলাল জবাব দিয়েছিলেন যে এই মনোভাবের উত্তরে জানাতে হয় যে এটি হলো "ওদের (কমিউনিস্টদের) সঙ্গে আমাদের (কংগ্রেসের)

যুদ্ধ"। এই বিতর্ক চলাকালীনই সম্ভবত হীরেন্দ্রনাথই "প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিনিময়ে তিনি (নেহরু) ইতিহাসে নিজের স্থানকে হারিয়েছেন" বলে মন্তব্য করায় শান্ত কাঠিন্যে জহরলাল জবাব দিয়েছিলেন যে সাধ্যানুযায়ী দেশবাসীর সেবা করতে পারলে ইতিহাসে স্থান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আর বিচলিত নন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি—প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথম পার্লামেন্ট বিতর্কে সরগরম ছিল। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের প্রশ্নে দিগ্‌নির্দেশক সিদ্ধান্তগ্রহণ ছিল জরুরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তজার্তিক রাজনীতিতে নয়া-ঔপনিবেশিক মার্কিনি রাজনীতির প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে নিজস্ব অবস্থান মজবুত করার প্রশ্নটিও ছিল জরুরি। এই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরুর ভূমিকা যতটা না বেশি মহান আদর্শের ভাববাদী প্রচারকের ততটা ঠিক কার্যকরী জনমুখী নীতি প্রয়োগকর্তার নয় বলেও মনে হতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংসদে বহু আলোচনা ও বিতর্কের পর পাস হলেও অর্থনীতির ক্রমাবনতি আটকানো যায়নি। বস্তুত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সংসদে তীব্র বিতর্ক ও আলোচনার পরে মৌলিক কিছু সিদ্ধান্ত ভারী শিল্পস্থাপনার উপরে গৃহীত হওয়ার পরে এবং পরস্পরযুক্ত ধারাবাহিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দেশীয় অর্থনীতির মজবুত বনিয়াদ গঠনের প্রারম্ভটি সূচিত হয় বলে হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। ধারাবাহিক ভাবে এরপর এস্টেট ডিউটি অ্যাক্ট, ইনডাসট্রিস (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, কোম্পানিস অ্যাক্ট এবং বিমান চলাচল, ইমপেরিয়াল ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা জাতীয়করণের পরে দেশীয় অর্থনীতির একটি সুনির্দিষ্ট রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু বিবাহ আইন এবং হিন্দু উত্তরাধিকার আইন গৃহীত হওয়ার ফলেও একটি নবপর্যায়ের সূচনা হয়। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত সংসদে গৃহীত হওয়ায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছুটা পালাবদলের সূচনা হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিসরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সুচিন্তিত পুনর্গঠনে, এই পর্ব ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনাপর্ব। এই ক্ষেত্রটিতে নেহরুর ভূমিকা অপরিসীম। নেহরু নিজেও মনে করতেন সুচিন্তিত স্বনির্ভর অর্থনৈতিক নীতির বাস্তবায়ন ছাড়া পরাষ্ট্রনীতির সাফল্য সম্ভব নয়। এই সকল প্রশ্নেই সংসদে কমিউনিস্ট সদস্যদের ভূমিকার যে প্রতিফলন জনমানসে ফুটে ওঠে সম্ভবত তারই জোরে ১৯৫৭-র দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কমিউনিস্ট পার্টি সংসদে সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের মর্যাদা পায়।

ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথম বেসরকারি বিলটি এনেছিলেন কমিউনিস্টরাই। ১৯৫২ সালের ৭ জুলাই লোকসভার কমিউনিস্ট সদস্য তুষার চ্যাটার্জী প্রথম ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন বিলটি সভায় পেশ করেন। সরকারি পক্ষের বিরোধিতায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়। রাজ্যসভাতেও (১৬ জুলাই ১৯৫২) অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন সংক্রান্ত একই গোত্রের একটি বিল অগ্রাহ্য হয়। এছাড়াও ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচির যথাযথ রূপায়ণ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মকানুনের বাড়াবাড়ি বন্ধ করা, বেকারিত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রশ্নে প্রথম দুটি সংসদে কমিউনিস্টরা অক্লান্ত লড়াই চালিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক

দেশগুলি বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে কংগ্রেস ও অন্যান্য অ-বাম সদস্যদের অজ্ঞানতা অনেকসময় শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও কমিউনিস্ট সদস্যরা সরব হয়েছেন। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে কমিউনিস্ট সদস্য সুন্দরাইয়ার আনা একটি বেসরকারি বিল প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী দেশমুখ এবং তুলনায় অনেক অ-সংস্কৃত শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে ওইসব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের কায়দাকানুন তাঁরা জানেন না। শিল্পপতি লালচাঁদ হীরাচাঁদ রাজ্যসভায় এ-কথাও বলতে কসুর করেননি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে একজোড়া জুতো কেনার খরচও অপরিসীম।

বোম্বাইতে ১৯৫২-র জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদিত শিল্পপণ্যের এক বিশাল প্রদর্শনী এবং ওই বছরেরই গ্রীষ্মে মস্কোয় একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অধিবেশন হওয়ার পরেও সংসদের উভয় কক্ষেই এমনতর অজ্ঞান অর্থহীন বিরোধিতা কংগ্রেস সদস্যরা হামেশাই করতেন। ১৯৫৫ সালের পর থেকে ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্য আরও বিস্তৃত হওয়ার পরে তিন বছর আগে আনা সুন্দরাইয়ার বেসরকারি বিলটির প্রাসঙ্গিকতা জনসমক্ষে আরো গ্রাহ্য হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতারা অনেকেই বিভিন্ন সময়ে রাজ্যসভায় সদস্য ছিলেন। সুন্দরাইয়ার সমসাময়িক ভূপেশ গুপ্ত থেকে পরবর্তীতে অচ্যুত মেনন, এন কে কৃষ্ণন, যোগিন্দর শর্মা প্রমুখ। ১৯৫৫ সালে নব-নির্বাচিত অন্ধ্র বিধানসভায় দলের নেতৃত্ব দিতে সুন্দরাইয়া চলে গেলেও ভূপেশ গুপ্ত ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজ্যসভার স্তম্ভস্বরূপ। চকিত ধারালো প্রত্যুত্তর এবং তারপরেই শান্ত অমায়িকতায় ভূপেশের উপস্থিতি রাজ্যসভায় কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা ও গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়িয়েছিল। বিরোধী সমালোচনাকে শাণিত যুক্তি ও মননশীলতায় ছিন্নভিন্ন করার ক্ষমতায় ভূপেশ গুপ্ত এতটাই দক্ষ ছিলেন যে রাধাকৃষ্ণন তাঁকে একবার হেলিকপ্টারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

প্রবীণদের সভা রাজ্যসভায় দীর্ঘদিন কংগ্রেসীদের নেতা ছিলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ। নেহরুর ডাকে কংগ্রেসী আক্রমণে নেতৃত্বদানের জন্য অনেকবারই তাঁকে ছুটে আসতে হতো লোকসভায়। অ-বাম নক্ষত্র হিসাবে রাজ্যসভায় কখনো বা লোকসভায় রয়ে গিয়েছেন অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং শ্যামানন্দন মিশ্র। দুজনেই সুবক্তা, সংসদীয় আচরণে পারঙ্গম। ষাটের দশকের গোড়ায় রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে ডি এম কে নেতা আন্নাদুরাই ভাষাভিত্তিক রাজ্য বিষয়ে একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দেন যা আমাদের সংসদ-ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে।

দ্বিতীয় লোকসভায় কমিউনিস্টরা আরো শক্তিশালী হয়েছেন। হীরেন্দ্রনাথ স্বয়ং, রেণু চক্রবর্তী প্রভৃতি পুরোনো সদস্যরা তো আছেনই, এসে গিয়েছেন শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের মতো কিংবদন্তিসম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ব্যাঙ্ক-কর্মচারী আন্দোলনের সংগঠক প্রভাত কর, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প শ্রমিকদের নেতা মহম্মদ ইলিয়াস, কানপুর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সংগঠক এস এম ব্যানার্জী, কলকাতা থেকে শ্যামাপ্রসাদের আসনে দাঁড়িয়ে জেতা

সাধন গুপ্ত। ১৯৫৮-তে উপ-নির্বাচনে জিতে লোকসভায় এলেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, শাণিত যুক্তি, সুভদ্র আচরণ, কমিউনিস্ট আদর্শ ও আন্দোলনের প্রতি একান্ত দায়বদ্ধতায় আমৃত্যু যিনি লোকসভার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। এলেন কেরালা থেকে পি কে বাসুদেবন নায়ার, পরবর্তীকালে যাঁর নাম চেয়ারম্যান প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

নেহরু-পর্বে সংসদ চিত্রণ আরো দুটি ঘটনার অনুল্লেখে অসমাপ্ত থাকবে। বান্দুং সম্মেলনে সদ্য-স্বাধীন আফ্রো-এশীয় দেশগুলির যে সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল, নেহরুই ছিলেন তার মধ্যমণি। ভারত-চীন সম্পর্কের একেবারে গোড়ার দিকে নেহরুর চীন-নীতি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। যদিও ১৯৫৪ সালে নেহরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার তিব্বত প্রসঙ্গে বিশেষ অধিকার ও সুযোগের নীতির প্রতি আবারও সমর্থন জ্ঞাপন করে। ক্রমশ যেন তারপর থেকে জে বি কৃপালনীর 'রেপ অফ টিবেট' জাতীয় মন্তব্যই ভারতের সরকারি নীতির প্রধান সুর হয়ে উঠতে থাকে। তিব্বত-কে নিয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের যে আবহাওয়া ভারত-চীন সম্পর্ককেও একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করতে উদ্যোগী হয়, সেখানে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির পঞ্চশীল ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে ইন্দো-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অনুগমনকারীর ভূমিকা নেয়। এই প্রেক্ষিতে বলাই যায়, হীরেন্দ্রনাথও তা-ই মনে করেছেন, যে জোট-নিরপেক্ষ স্ব-নির্ভর জাতীয়স্বার্থ সচেতন পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগের প্রশ্নে নেহরু তাঁর 'fastidious hesitancies'-এর জন্য ব্যর্থ হয়েছেন। বৃহৎ পুঁজি নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ধারাবাহিক চীন বিরোধী অপপ্রচারকে সামগ্রিকভাবে ভারতের আপামর মানুষের মতামত বলে গ্রহণ করে নেহরুও ভুল করেছিলেন। বোঝা যায়, পঞ্চাশের দশকে শেষপর্ব থেকে জীবনের বাকি কটা বছরে নেহরু আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের জটিল ও দ্বন্দ্বময় বিচরণক্ষেত্রে তাঁর পুরোনো নিয়ন্ত্রণ ও স্বকীয়তা হারাচ্ছিলেন। একথাও সত্য যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির পিছনে চীনের ভূমিকা কিছু কম নয়। কিন্তু ভারত সরকারই প্রথম চীন থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে। ১৯৫৪ সালের চুক্তির পুণর্নবীকরণের কথা চীন বললেও ভারত সরকার কর্ণপাত করেনি অথচ এই চুক্তিতে আমাদের তিব্বত-চীন সীমান্ত বরাবর রাজ্যগুলির তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় থাকার কথা বলা ছিল। সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চীনের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি গ্রাহ্য করা না গেলেও আকসাই চীনের মতো একটি বরফ প্রান্তর নিয়ে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে আমাদের কোন লাভ হয়েছিল বোঝা মুস্কিল। অথচ চীন সরকারের পক্ষে আকসাই চীনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা জরুরি ছিল ভারত সীমান্তে খবরদারি করার জন্য নয় বরং তিব্বত ও সিন্‌কিয়াং প্রদেশের মতো দুটি রাজনৈতিক অস্থিরতাময় অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার জন্য। ১৯৬০ সালে চৌ এন লাই যখন ভারত সফরে এলেন প্রথম দফার সীমান্ত সংঘর্ষ হয়ে যাওয়ার পরেও, তখনও ভারতের তরফে কোনও প্রকৃত ইতিবাচক সমঝদারি নজরে আসেনি। একথা মনে করার কারণ যথেষ্ট আছে যে, নেহরু ব্যক্তিগতভাবে চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু নেহরুর কিছু প্রবীণ ক্যাবিনেট সহকর্মী চীন বিরোধিতায় ছিলেন অনমনীয়। সংসদও ছিল বহু মিশ্র কণ্ঠের চীন-

সমালোচনায় মুখর। বিদেশ মন্ত্রকের কিছু আমলাও এই সময় ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নব উদ্যোগে ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করে যাওয়া তৎকালীন নেহরুর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

অপর বিষয়টি হলো কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট সরকারের (1957-59) অন্যায় অপসারণ। বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর পরিসরে থেকেও নির্বাচনকে হাতিয়ার করে একটি রাজ্যে কমিউনিস্টরা যে ক্ষমতায় চলে আসতে পারে কংগ্রেস-সহ কোনও অ-বাম রাজনৈতিক শক্তিই তা মেনে নিতে পারেনি। অথচ কমিউনিস্টদের আদর্শ ও সংহতির এমনই জোর ছিল যে বিধানসভায় মাত্র দু-জন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও, কোনও কমিউনিস্ট বিধায়ক ব্যক্তিগত লাভক্ষতির নিরিখে দলত্যাগ করেননি। করানোর চেষ্টার যদিও খামতি ছিল না। কংগ্রেস-সভাপতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে-কোনও মূল্যে কেরালার কমিউনিস্ট সরকারকে ভাঙার যে চেষ্টা শুরু হয় সংসদের অভ্যন্তরেও কংগ্রেস সাংসদরা তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। বাস্তবিক সোসালিস্ট সাংসদদেরও কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে একই তীব্রতায় কেরালা সরকারকে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরু, হীরেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে, বোধহয় ঘটনার গতিপ্রকৃতিতে একটু লজ্জিতই ছিলেন। সংসদের অভ্যন্তরে কেরালা-কে কমিউনিস্ট-শাসন মুক্ত করার লক্ষ্যে চালিত কংগ্রেস-আক্রমণের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ। যদিও হীরেন্দ্রনাথ স্পষ্টই লিখেছেন, পন্থকে সামনে এগিয়ে দিলেও নেহরু কখনোই কেরালা সরকারকে হঠানোর কংগ্রেসী উদ্যোগ থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নেননি। নেওয়ার কথাও তো নয়। হীরেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক উপমাটি খুব খাঁটি— ১৭৭২ সালে প্রথম পোল্যান্ড বিভাজনের সময় অস্ট্রিয়ার মারিয়া থেরেসা কেঁদেছিলেন এই বলে যে এর ফলে এক মানুষই ভাগ হলো। শুনে প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক মন্তব্য করেছিলেন যে উনি কেঁদেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ভাগের পোল্যান্ড-টুকু নিয়েছেনও।

ভারতীয় জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মহিলা হলেও সংসদে মহিলা সদস্যদের অস্বাভাবিক কম সংখ্যা প্রসঙ্গে ১৯৭৫-এর পঞ্চম লোকসভায় আনা একটি বেসরকারি বিলে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছিলেন—প্রথম লোকসভায় ছিলেন মাত্র তেইশ জন মহিলা সদস্য, আঠাশ জন ছিলেন দ্বিতীয় লোকসভায়, চৌত্রিশ জন মহিলা সদস্য ছিলেন তৃতীয় লোকসভায়, একত্রিশ জন চতুর্থ লোকসভায় এবং পঞ্চমবার মাত্র বাইশ জন। প্রথমাবধি এঁদের মধ্যে কয়েকজন অবশ্যই ছিলেন যে-কোনও বিচারেই যাঁরা লোকসভার সেরা সাংসদ। আবার অনেকেই ছিলেন কিছুটা অন্তত লোকসভার সৌন্দর্যবর্ধনকারী। [হীরেন্দ্রনাথকে সবিনয়ে প্রশ্ন করা যাক্, এমনতর বিভাজন শুধু কি মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রেই করা সম্ভব? পুরুষ সদস্যদের ক্ষেত্রে নয়?] প্রথম ক্যাবিনেটে একমাত্র মহিলা সদস্য আজীবন গান্ধীবাদী রাজকুমারী অমৃত কাউর। কংগ্রেস তরফে প্রথম সভায় ছিলেন আম্মু স্বামীনাথন, সুষমা সেন, লক্ষ্মী মেনন, এম চন্দ্রশেখর। বিরোধী শিবিরে রেণু চক্রবর্তী, পার্বতী কৃষ্ণন এবং অবশ্যই সুচেতা কৃপালিনী। সুচেতা কৃপালনীকে হীরেন্দ্রনাথ লোকসভার অন্যতম সেরা বক্তা বলেছেন,

কৃষ্ণমাচারি যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন "She's hard as nuts"। লোকসভার সৌন্দর্যে কিছুটা হানি হলো বলে হীরেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যখন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর আন্তর্জাতিক দায়িত্বে সভাত্যাগ করলেন। বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে মাইমুলা সুলতান, শারদা মুখার্জী এবং গায়ত্রী দেবী ".....have contributed to parliament an element also as of decoration for which one may be greatful"।

তৃতীয় লোকসভা ছিল সর্বার্থেই সংকটময়। ভারত-চীন যুদ্ধ (১৯৬২), নেহরুর মৃত্যু (১৯৬৪), দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উত্থান, তারপরই ভারত-পাক যুদ্ধ (১৯৬৫), শাস্ত্রীজীর মৃত্যু (১৯৬৬) এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তৃতীয় লোকসভার উপরে অনিশ্চয়তার ছায়া ব্যাপ্ত হয়েছিল। প্রথম দুটি লোকসভায় নেহরুই ছিলেন ভরকেন্দ্র। তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হতো সিদ্ধান্ত এবং সমালোচনার ঝড়। একজন প্রকৃত ক্ল্যাসিকাল লিবারাল ডেমোক্র্যাটের মতোই দেশের সর্বোচ্চ জনপ্রতিনিধিসভার উপরে একান্ত শ্রদ্ধা তাঁর আচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্ণ প্রকটিত ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আলোচনা—সংসদীয় গণতন্ত্রের এই মূল কথাটি তিনি সর্বদা মান্য করলেও মনস্থির করা নিয়ে তাঁর চিরকালীন দোদুল্যমানতায় তিনি প্রশাসনে কোনও সংহতি আনতে পারেননি। জনমোহিনী যে প্রতিভায় নেহরু হয়ে উঠেছিলেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা তা গড়ে তুলতে পারেনি কোনও জনমুখী প্রশাসন। যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও তিনি তৈরি করে উঠতে পারেননি কোনও অনুগামী সহকর্মীদল, কী প্রশাসনে, কী দলীয় সংগঠনে। তাঁর প্রতিভা যেন থমকে আছে এক অদ্ভুত মধ্যবিন্দুতে, হীরেন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "between the conception, and the creation, the emotion and response"।

দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্বভাবত স্বতন্ত্র। ব্যক্তিত্বে, আচরণে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতেও যদিও স্বয়ং নেহরুই তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার কথা সম্ভবত ভেবেছিলেন। অগাস্ট ১৯৬৩-তে কামরাজ পরিকল্পনার কারণে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৬৪-র জানুয়ারিতে নেহরুই তাঁকে মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে আনেন শুধু তাই নয় পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কিছু দায়িত্ব দেবার কথাও ভেবেছেন। নেহরুর কাছে সেই মুহূর্তে অন্তত কোনও বিকল্প ছিল না। লালবাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দক্ষতার প্রশ্নে প্রাথমিকভাবে কিছু সংশয় দ্বিধা থাকলেও এবং প্রধানমন্ত্রীত্বের শুরুতেই অনাস্থাপ্রস্তাব মোকাবিলায় তিনি কিছুটা অস্বস্তিতে থাকলেও অচিরেই তিনি স্ব-পদে বেশ পোক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯৬৫-র ভারত-পাক সংঘর্ষে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যোগ্যতার পরীক্ষায় তিনি বেশ ভালোভাবেই উত্তীর্ণ হন। হিন্দিভাষা প্রীতি থাকলেও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সংসদে অধিকাংশ সময় তিনি ইংরেজিতেই বলতেন এবং জনশ্রুতি অন্যরকম থাকলেও, বলতেন প্রাঞ্জল ও জোরালো ইংরেজিতেই। খুব সাধারণ পরিবার ও পরিবেশ থেকে উঠে এসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন বলে লালবাহাদুরের জনজীবনে এক বিশেষ সমাদর থাকলেও ক্ষমতার রাজনীতির অলিগলি বিষয়ে তিনি যে মোটেই অজ্ঞ ছিলেন না তার প্রমাণ মেলে প্রথম লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে কংগ্রেসী-প্রচার অভিযানের মুখ্যচালকের দায়িত্ব তাঁকেই

দেওয়া হয়েছিল। এ-কথাও স্মরণে রাখা প্রাসঙ্গিক যে কেন্দ্রে রেল ও যোগাযোগ মন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারে পুলিশমন্ত্রী ছিলেন। বলাবাহুল্য নিছকই ভালোমানুষি দিয়ে পুলিশ দপ্তর সামলানো যায় না।

এরই সঙ্গে ১৯৬৪-র এপ্রিলে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হলো। অত্যন্ত সংকটময় ও জটিল এক কালপর্বে যখন সংসদের অভ্যন্তরে ও বাইরে বামপন্থী শক্তির সংহত ও সক্রিয় উপস্থিতি ছিল অত্যাবশ্যক তখনই এই দুর্ভাগ্যজনক বিভাজন। চীন সরকারের যে সব প্ররোচনামূলক কাজগুলি পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে উত্তরোত্তর বাড়ছিল এবং যার প্রতিক্রিয়ায় ভারত সরকার ও অ-বাম রাজনৈতিক দলগুলির দূরদৃষ্টিহীন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে তিক্ত থেকে তিক্ততর করে তুলছিল ক্রমশ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্দরে তাত্ত্বিক বিরোধ থেকে শেষ পর্যন্ত পার্টি ভাগ হয়ে যায়। সংসদে কমিউনিস্ট সদস্যদের সংঘবদ্ধ রূপ ও কার্যকলাপ এতদিন তাদের বিরোধী সরকার পক্ষ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সতর্ক থাকতে বাধ্য হতো। পার্টি ভাগের পরে সংসদেও কমিউনিস্ট বিরোধিতা এতটাই লাগামহীন হয়ে যায় যে তা অনেক সময়ই যেন শালীনতা ও সংসদীয় আচরণবিধির প্রতিকূল হয়ে পড়ে। কী কংগ্রেস, কী সোসালিস্ট, কী স্বতন্ত্র পার্টি—কমিউনিস্ট বিরোধিতায়, অনেক সময় এমনকী স্পীকারের নির্দেশ অমান্য করেও, দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলতেও পিছপা হননি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্য, এমনকী সাংসদ-ও আছেন সেই তালিকায়, গ্রেপ্তার হন। কোনও দল বেআইনি ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই দলের একজন সাংসদের পক্ষে সংসদের অভ্যন্তরে সক্রিয় থাকাই "Paramount to all other claims', হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন। কিন্তু সি পি আই এই নীতি রক্ষায় স্পিকারের কাছে বারংবার আর্জি জানালেও সরকারের অনমনীয় মনোভাবে এবং স্পিকার হুকুম সিং-এর দ্বিধাগ্রস্ততায় সুফল ফলেনি।

সংসদীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি যে ধারায় এগিয়েছে স্পিকার পদাধিকারীদের ব্যক্তিত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে দিয়েও সম্ভবত তার একটি আভাস পাওয়া যায়। এমন স্পিকার জি ভি মভলঙ্কার। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আচরণে এ ব্যঞ্জনা স্পষ্ট ছিল যে লোকসভার গাম্ভীর্য ও মর্যাদা রক্ষায় তিনি সদা সতর্ক। কখনো এমনকী তাঁর কোনও রুলিং হাসির খোরাক্ জোগালেও, ব্যক্তিগতভাবে তিনি সর্বদাই সদস্যদের সম্মান পেয়ে এসেছেন। হীরেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "Mavalankar was on any computation a great Speaker, a dignified if sometimes stodgy stickler for the rules and yet the kind of presiding officer whom the House, howsoever critical and exciting, could not fail to respect"। দ্বিতীয় স্পিকার অনন্ত সায়নম আয়েঙ্গার ছিলেন বুদ্ধিমান। কিছুটা প্রাচীনপন্থী, একধরনের 'Brahmanic independence of mind' নিয়ে বেশ আকর্ষণীয় চরিত্র। তৃতীয় স্পিকার সর্দার হুকুম সিং আলাদা গোত্রের মানুষ অনেকটাই এবং প্রথম স্পিকার যিনি বিচার বিভাগের অভিজ্ঞতা নিয়ে লোকসভা সামলাতে এলেন। প্রতিষ্ঠিত রীতি-পদ্ধতি মান্যতা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল বিচারকসুলভ। কিন্তু ১৯৬২-র ভারত-চীন সংঘর্ষের সময় থেকেই যেন

লোকসভার আবহাওয়াটা বদলে গেল। বিশেষ করে পরপর কয়েকটি লোকসভা উপ-নির্বাচনে জিতে রামমনোহর লোহিয়া, জে বি কৃপালনী ও এম আর মাসানি লোকসভায় আসার পরে ভারত-চীন সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এঁদের তীব্র নেহরু-বিরোধিতা লোকসভার পরিবেশকে যেন কিছুটা পালটে দিতে লাগল। সঙ্গে যুক্ত হল নতুন সদস্যদের একাংশ যাঁদের সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন, ...there was now a new crop—aggressive, unself-conscious, and in the case of a few, also hardworking and preternaturally tenacious in shouting away with whatever they had to say, which was not always sensible and sometimes a trifle vulgar in the manner in which it was said."

চতুর্থ স্পিকার এন সঞ্জীব রেড্ডি সম্পর্কে সেই কথাটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য যে, স্পিকার পদটি "...does not demand rare qualities but it demands common qualities in a rare degree"। সম্ভবত কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে ১৯৬৭-তে সঞ্জীব রেড্ডি ক্যাবিনেট থেকে বাদ পড়েন। তুষ্ট করতে স্পিকার পদে মনোনয়ন। যদিও এতে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। সঞ্জীব রেড্ডিকে কেন্দ্র করে পরবর্তী ঘটনা কংগ্রেস দল ও ভারতীয় রাজনীতির পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ড. জাকির হুসেনের মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রপতি পদে সঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়নকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বিভাজন। সঞ্জীব রেড্ডির বাম-বিরোধী দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট—১৯৬৮-র গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে লোকসভার বিভিন্ন দল ও মতের সোভিয়েত-বিরোধী সদস্যদের চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নোত্তরপর্ব অচল করে দেওয়ার পিছনে তিনি যে পরোক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন সেটি স্পিকার পদের মর্যাদার সঙ্গে মানানসই নয়। পরবর্তী স্পিকার ধীলন একসময় আবার ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছিলেন। সংসদীয় প্রথা ও ঐতিহ্যে বোধকরি মন্ত্রীপদ থেকে স্পিকার হওয়া সঙ্গত হলেও, স্পিকার পদ থেকে ক্যাবিনেটে ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এরপরের স্পিকার বলিরাম ভগতের কার্যকাল সংসদীয় প্রথার নিরিখে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় আর জানুয়ারি ১৯৭৭-এ লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাতে ছেদ পড়ে যায়।

ঘটনাপ্রবাহের অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর অভিষেক যেমন চমৎকারিত্বে ভরা তেমনই সংঘাতময় তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম ক'টি বছর। কংগ্রেস নেতাদের যে গোষ্ঠীটি নিজস্ব গোষ্ঠীস্বার্থে ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেছিল পরবর্তী ঘটনাক্রম তাদের শুধু নিরাশ করেনি, তাদের রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি ও বিন্যাসকেও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। শুরুটা ছিল ইন্দিরার বেশ নড়বড়ে। ১৯৬৬-র শরৎ-অধিবেশনে এলো অনাস্থা-প্রস্তাব। এস কে পাতিল, সি সুব্রমনিয়ম এবং অশোক মেহতা—এই মন্ত্রী-ত্রয়ীর কুখ্যাত কার্যকলাপে সংকট ঘনালো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অশোক মেহতার সেই কুখ্যাত বক্তৃতা 'Open India's Womb' যাতে বিদেশি বিশেষত মার্কিন পুঁজির অবাধ প্রবেশ সম্ভব হয়। অথচ সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা তাঁর শীতল আভিজাত্য আর উজ্জ্বল একাকিত্ব নিয়ে নীরব যেন কিছুটা, হীরেন্দ্রনাথ

বলছেন 'Uncomprehendingly'। হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন, এই পর্বে ইন্দিরা লোকসভায় মোটেই নজরকাড়া উপস্থিতি নয়, বরং কিছুটা আড়ষ্ট, প্রায়শই লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন, কখনো বা অনাবশ্যক নীরব, শুধু যেন সাম্প্রদায়িক কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে ইন্দিরা জ্বলে ওঠেন দৃঢ়মূল কোনও তাগিদ থেকে। ১৯৬৭-র নির্বাচনে দল হিসাবে কংগ্রেস বড় ধাক্কা খেল। একাধিক রাজ্যে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে, প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার এলো। দেশ জোড়া একদলীয় শাসনের শেষের শুরু ১৯৬৭-তেই। তবু বলা দরকার কেন্দ্রে ভোট কমলেও ক্ষমতায় যে কংগ্রেস টিকে যেতে পেরেছিল তার অনেকখানি কৃতিত্ব প্রাপ্য ইন্দিরার অক্লান্ত প্রচারাভিযানের। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভুবনেশ্বরে এক নির্বাচনী জনসভায় তাঁকেই উদ্দেশ্য করে পাথর ছোঁড়া হলেও, ইন্দিরা সভা ত্যাগ করেননি। পাথরে ইন্দিরা গুরুতর আহত হন। নাকে প্লাসটিক সার্জারি করা হয় পরে। কিন্তু অপারেশন করে অতি দ্রুত তিনি আবার প্রচারাভিযানের নেতৃত্বে ফিরে আসেন। এই সাহস আর বিপদের মুখে নিজের অবস্থানে স্থির থাকতে পারার শক্তিই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার সাফল্যের চাবিকাঠি। দেশভাগের পরে ১৯৪৭-র অন্ধকার দিনগুলোয় দিল্লির পথে পথে তরুণী ইন্দিরা যে সাহস দেখিয়েছিলেন তারই রকমফের দেখা গিয়েছে বারবার—১৯৬৭-তে জাকির হুসেনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সময়, ১৯৬৯-এ কংগ্রেসের ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনে সিন্ডিকেট নেতাদের বিরুদ্ধে লড়ার প্রয়োজনে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর্বে কিংবা ১৯৭২-এর নির্বাচনে।

পিতার মতো কোনও আদর্শের প্রতি ঝোঁক ইন্দিরার ছিল না। নেহরু সর্বদাই হতে চেয়েছেন, লেনিনীয় ধারণায় যাকে বলে, 'in step with history'। ইন্দিরা, তীব্র বাস্তবমুখিনতায় সর্বদাই চেয়েছেন সমস্যার কোনও গ্রাহ্য সমাধান, সমস্যার মৌলিক কার্য-কারণ সম্পর্ক সেখানে খুব একটা বিবেচ্য নয়, বরং প্রয়োগ-যোগ্যতাই সমাধানের একমাত্র পথ, অন্তত ইন্দিরার কাছে। ঘনিষ্ঠ দুজন সহকর্মী জগজীবন রাম এবং যশোবন্তরাও চ্যবন-কেও ইন্দিরা তেমন বিশ্বাস করতেন না। অথচ মোরারজী দেশাই-কে হঠাবার জন্য এই দুজনের সহায়তাকে তিনি ব্যবহার করতে পেরেছেন। পিতার মতোই, যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায়, ইন্দিরাও দলে ও সরকারে নিঃসঙ্গ ছিলেন।

চতুর্থ লোকসভা (1967—72) থেকে বস্তুত নেহরু ও তাঁর সমসাময়িকতার চিহ্নগুলি একেবারেই অপসৃত হয়ে যায়। বরং দেখা দেয় কিছু নতুন ধরনের সমস্যা, যেমন দলত্যাগের রাজনীতি। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একদলীয় প্রাধান্যের যুগ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 'আয়া রাম গয়া রামের' রাজনীতি গড়ে উঠতে থাকে কারণ অ-কংগ্রেসি রাজ্য সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এটাই ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পন্থা।

দল ও সরকারে তখন ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁর নিকট ও দূর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতেন, ইন্দিরা একে একে তাঁদের নিরস্ত্র করে দিতে পেরেছেন। আর এই লক্ষ্যে ইন্দিরা ব্যবহার করেছেন এক আশ্চর্য অস্ত্র—জনমুখী এমন কিছু সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি যা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ইন্দিরার অবস্থান তাঁর বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে অনেক বেশি মজবুত করে তোলে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা

বিলোপ, গরিবি হঠাও স্লোগান নিছক একজন রাজনৈতিক নেতা থেকে জনগণের নেতা হয়ে ওঠার পথে ইন্দিরাকে সাহায্য করেছে। তারপর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাকে হারাবার পরে ইন্দিরা 'ভারতমাতা'-র ভূমিকায়। বস্তুত সত্যের খাতিরে মানতে হয় যে, হীরেন্দ্রনাথ লিখছেন, ১৯৭১ এবং ১৯৭২-র নির্বাচনে ভারতবর্ষে ক্যারিসম্যাটিক নেতা একজনই—তিনি ইন্দিরা গান্ধী।

পরিবর্তনের সূচক যে জনমুখী কর্মসূচি ও স্লোগান চতুর্থ লোকসভায় ঘোষণা করে ১৯৭১ ও ১৯৭২-র নির্বাচনে ইন্দিরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেন, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনও প্রকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিন্তু সূচিত হয়নি। কারণ প্রকৃত ইতিবাচক কোনও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে তার অভাবই প্রতীয়মান হয়।

সংসদের প্রতি আচরণেও জহরলাল ও ইন্দিরার প্রভেদ বিরাট। জহরলাল লোকসভায় ঢুকতেন স্পিকার-আসনের প্রতি অভিবাদন জানিয়ে। অধিবেশন চলাকালীন আসতেন প্রত্যহ। নিয়মিত আলোচনায় অংশ নিতেন। বিরোধীদের সমালোচনার তীর যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে লক্ষ্য করেই বর্ষিত হতো, জবাব-ও দিতেন সেইমতো। কোনও সহকর্মী মন্ত্রী বিরোধী সমালোচনায় বিপদগ্রস্ত হলে তাঁকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরু, এমন দৃশ্য হামেশাই দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ। ইন্দিরা হেঁটেছেন উল্টোপথে। ১৯৬০-৭০ পর্বে যখন লোকসভায় ইন্দিরা কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিছুটা টালমাটাল, তিনি সংসদের আলাপ আলোচনায় তবু কিছুটা মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু পঞ্চম লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসার পরে ইন্দিরা যেন সংসদের প্রতি আরো উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। এমনও বহুক্ষেত্রে হয়েছে যে অধিবেশন চলাকালীন সংসদ-ভবনে উপস্থিত থাকলেও ইন্দিরা সভায় আসেননি। বহুক্ষেত্রেই বিরোধী সমালোচনা সামলাবার দায়িত্ব অক্ষম স্কন্ধে বহন করতেন সংসদ-বিষয়ক মন্ত্রী রঘুরামাইয়া। অথচ প্রধানমন্ত্রী সমগ্র লোকসভার নেতা বলেই সভার কাছে দায়বদ্ধতার প্রমাণ তারই সবচেয়ে বেশি দেওয়া উচিত।

পঞ্চম লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রিভবন ঘটে গেছে এমনভাবে যা ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি। সংসদ-কে পাশ কাটিয়ে তৈরি হয়েছে তোষামোদ প্রিয় এক কিচেন-ক্যাবিনেট। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বদল হচ্ছে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ছে। চলছে কালোটাকার সমান্তরাল অর্থনীতি। জনগণের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব বাড়ছে। এরই মধ্যে ইন্দিরার সংসদীয় গণতন্ত্রের জায়গায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রতি পক্ষপাত বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ায় আশঙ্কা ও ক্ষোভ বাড়তে থাকে। সংসদের সঙ্গে সুসম্পর্কের অভাবে জনমানস সম্পর্কে ধারণাও তেমন স্বচ্ছ থাকে না। ১৯৬৯-৭১ পর্বে ইন্দিরা নবীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জনমানসে যে সাড়া জাগিয়েছিলেন পঞ্চম লোকসভায় তা সম্পূর্ণ অপসৃত।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এমন সুযোগ আগে কখনো পায়নি। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থীদের একটি হতাশ অংশ। আর্থিক মন্দা, দুর্নীতি, প্রশাসনিক

অব্যবস্থা-জনিত জনক্ষোভকে ব্যবহার করে এই অবস্থায় চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এক 'সর্বাত্মক বিপ্লব'-এর ডাক দিল। যারা কোনওদিন আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থা ভেঙে পরিবর্তনের কথা বলেনি, তারাই আওয়াজ তুললো 'সর্বাত্মক বিপ্লব'।

সংসদ-কে এড়িয়ে যাওয়া যদি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার দোষ হয়, তবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাটা সংসদেরও ব্যর্থতা। আর এই ব্যর্থতার জন্য ভারতবর্ষের দুটি কমিউনিস্ট দল দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। পার্টি ভাগ থেকে এই পঞ্চম লোকসভা পর্যন্ত সময়কাল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে দুঃসময় পর্ব বলা যায়। বিভাজিত সাংগঠনিক শক্তি, কী সংসদের বাইরে, কী ভিতরে, সর্বভারতীয় স্তরে কোথাও পরিস্থিতির সামান্যতম নিয়ন্ত্রকও হয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৭৪ সালে দেশজোড়া প্রায় সর্বাত্মক রেল ধর্মঘটের মোকাবিলায় সরকারি দমননীতি ক্রমশই যেন ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগল। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসরবরাহে বাধা সৃষ্টির অজুহাতে এই ধর্মঘটকে দেশবিরোধী আখ্যা দিয়ে সরকার কার্যত ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকেই চূড়ান্ত ধাক্কা দিতে চেয়েছিল। বিরোধীপক্ষ সমবেতভাবে সংসদের অভ্যন্তরে এর মোকাবিলা করলেও সরকার অনমনীয় রইল। মধু লিমায়ে ও হীরেন মুখার্জীর সঙ্গে সংসদের অভ্যন্তরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার এই প্রসঙ্গে বাদানুবাদের যে চিত্র পার্লামেন্টারি প্রসেডিংস-এ পাওয়া যায় তার থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে বিরোধীপক্ষের সব সমালোচনাকেই সরকার অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। লোকসভায় হীরেন্দ্রনাথের মন্তব্য পাই যে সরকার ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস ও এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলটদের ধর্মঘট, বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট, মহারাষ্ট্রে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রতিও সরকারি মনোভাব ছিল অত্যন্ত কড়া। শুধু বিরোধীপক্ষ নয়, কংগ্রেসের মধ্যেও যে কজন সাংসদ এই সরকারি মনোভাবের বিরোধিতা করলেন, ইন্দিরা তাঁদের সঙ্গে ও কোনওরকম আলোচনার প্রয়োজন মনে করেননি। এই সংকটজনক মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি-তে সমস্তিপুরে এক বোমা বিস্ফোরণে রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র নিহত হলেন। দলহীন গণতন্ত্রের প্রচারক জয়প্রকাশ নারায়ণকে সামনে রেখে এবার ইন্দিরা-বিরোধী নানা মতের নানা দল ও ব্যক্তি চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হলো। এরই মধ্যে ১৯৭৫-র জুনে এলাহাবাদ হাইকোর্ট একটি ইলেকশন পিটিশনকে ভিত্তি করে ইন্দিরার সাংসদ পদে নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করল এবং ইন্দিরাকে ছয় বছরের জন্য লোকসভা থেকে নির্বাসিত করার কথা বলা হলো। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায়কে আইনি পথে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চ্যালেঞ্জ না করে ইন্দিরা এবার ২৬ জুন ১৯৭৫ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। যুক্তি হলো আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা।

২১ জুলাই ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার মধ্যেই সংসদের যে অধিবেশন বসলো, সেখানে প্রায় ত্রিশ জন বিরোধী নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে অনুপস্থিত। সংসদের এ যাবৎ কালের প্রতিষ্ঠিত রীতি প্রকরণ সব প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো হীরেন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'capitve body'।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে এক সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলেন। এমন একটা আশংকা থেকেই গিয়েছিল যে ভারতেও এমন কোনও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ঘটতে পারে। বিশেষ করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহ করার ডাক দিয়ে জয়প্রকাশ এমন একটি সম্ভাবনার ধারণা তৈরিতে মদত দিয়েছিলেন। ফলত জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ি এমন একটা স্তরে পৌঁছলো যে সারা দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপরেই আঘাত নেমে এল নজিরবিহীন ভাবে। পরবর্তীকালে এ কথা প্রকাশিত হয়েছে যে, জরুরি অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বিশেষ কয়েকজন পরামর্শদাতার প্ররোচনায় মূলত একাই নিয়েছিলেন। মন্ত্রীসভায় তাঁর ঘনিষ্ঠ ও অভিজ্ঞ দুজন সহকর্মী, জগজীবন রাম ও যশোবন্ত রাও চব্যনও এ বিষয়ে কোনও পূর্বাভাস পাননি। যদিও সংসদের অনুমোদন চেয়ে জরুরি অবস্থা জারির রেজলিউশন পেশ করেছিলেন জগজীবন রাম-ই। ইন্দিরা গান্ধী এই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন মাত্র।

এবার ১৯৭৭-র মার্চে যে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ভারতবর্ষের মানুষে সেখানে জরুরি অবস্থা জারির বিরুদ্ধে, ইন্দিরা গান্ধীর একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন।

জরুরি অবস্থার সময় সি পি আই-এর ভূমিকা নিয়ে এ যাবত বহু তর্ক উঠেছে। সত্যের অপলাপ না করলে এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে কোনও দেশ-জোড়া গণ আন্দোলন কোনও রাজনৈতিক দলই গড়ে তোলেননি। বরং বিশ-দফা কর্মসূচির ঘোষণার মধ্য দিয়ে এমন একটি ধারণা সরকার প্রাথমিকভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন যে জনগণের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব ও প্রগতির একটি আবহাওয়া গড়ে উঠতে চলেছে। সেই কালপর্ব পার হয়ে এসে আজ বোঝা যায় তাৎক্ষণিক বড় ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না উঠলেও, জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিকগুলো সম্পর্কে মানুষ অচিরেই যে সচেতনতা অর্জন করে তারই প্রকাশ ১৯৭৭-র মার্চে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে। মধ্যবর্তী সময়ে সংসদ-অধিবেশন হয়েছে কয়েকটি, তবে সংখ্যায় ও মেজাজে সেগুলি সাধারণ সময়ের মতো বলাবাহুল্য নয়। সি পি আই প্রাথমিক অবস্থায় জরুরি অবস্থার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল এই প্রত্যাশায় যে ১৯৭৫ নাগাদ দেশজুড়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল যেসব শক্তিসমূহ জয়প্রকাশের সর্বাত্মক বিপ্লবের ধ্বনির আড়ালে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল এবং সেনাবাহিনীকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে আনার ডাকের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যে চক্রান্ত ভারতীয় গণতন্ত্রের বনিয়াদটিকেই ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছিল, জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতবর্ষের মাটিতে সেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত রূপায়ণের উদ্যোগটিকে প্রতিহত করা যাবে। কিন্তু দেশের বিশেষ করে কংগ্রেসের সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাস সম্পর্কে একটি মৌলিক ভ্রান্তি এবং ইন্দিরার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ নয়া উপনিবেশবাদ বিরোধী অবস্থানের নিরিখে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও তাঁর উপরে অতিরিক্ত ভরসা করার সিদ্ধান্তের কারণে সি পি আইকেও বড় রকমের মাশুল দিতে হয়। কিন্তু বামপন্থী তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক নেতা ইন্দিরার ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশাধিকার না পেয়েও কখনো সখনো ভেবেছেন যে তাঁরা ইন্দিরার নীতি ও আচরণকে

প্রভাবিত করতে পারবেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন।

জরুরি অবস্থার মধ্যে heir-apparent হিসাবে ইন্দিরার কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয়ের উত্থান ভারতীয় রাজনীতির একটি করুণ ঘটনা। ১৯৭৫-এর শেষার্ধ থেকেই যুব-কংগ্রেস সংগঠনের শীর্ষে চাপিয়ে দেওয়া নেতা হিসাবে সঞ্জয় সরকারের বিভিন্ন কাজে শুধু নয় মূল অর্থনৈতিক নীতিকেও প্রভাবিত করতে শুরু করেন। বৃহৎ পুঁজির অনুগামী, রাষ্ট্রীয়-উদ্যোগ বিরোধী এবং তীব্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষে ভরপুর এই যুবক মায়ের ওয়াচ ডগ হিসাবে বাস্তবিক সমস্ত সরকারি বিভাগে খবরদারি শুরু করেন। দিল্লি শহরের সৌন্দর্যায়নের নামে গরিব মানুষের ঝুপড়ি উচ্ছেদ, তুর্কমেন গেটের ঘটনা কিংবা জবরদস্তি নাসবন্দিকরণের মধ্য দিয়ে সঞ্জয় জরুরি অবস্থার ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধীও পুত্রের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে শুধু বিশ-দফা কর্মসূচি নয়, দেশের পক্ষে সঞ্জয়-প্রচারিত পাঁচ-দফা কর্মসূচিও মানা জরুরি। অথচ যত চাপের মধ্যেই হোক্ না কেন বিশ-দফা কর্মসূচি সংসদে গৃহীত হয়েছিল কিন্তু পাঁচ-দফা কর্মসূচি এমনকী কংগ্রেস সংগঠনের দ্বারাও আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়নি।

সঞ্জয়ের রাজনৈতিক উত্থান প্রসঙ্গে কিন্তু সি পি আই-ই প্রথম 'সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার কেন্দ্র' বিশেষণটি ব্যবহার করেছিল। ১৯৭৭-র মার্চে ষষ্ঠ লোকসভার রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণে এই শব্দগুচ্ছ উল্লিখিত হয়। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের যে প্রসঙ্গটি ভারতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণে হামেশা ব্যবহৃত হয়, মাতা-পুত্রের এই যৌথ অভিযানকে বেশ কিছুদিন ধরেই সহ্য করার প্রসঙ্গে সেই সমালোচনাটি থেকে বাম-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিও মুক্ত নয় বলে হীরেন্দ্রনাথ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৯৭৭-র এপ্রিল মাসে সি পি আই নেতৃত্ব স্বীকার করেন যে জাতীয় বুর্জোয়া ও কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাদের প্রতিনিধিদের নেতা হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর প্রগতিশীল উপাদানের উপরে দল বেশি ভরসা করেছিল। একজন একনিষ্ঠ পার্টি সদস্য ও অনুপাতহীন কমিউনিস্ট হিসাবে হীরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে এই অতি-প্রত্যাশা আরো অনেক দ্রুত সদর্থক ও সুনির্দিষ্টভাবে সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এদেশে একচেটিয়া পুঁজির অত্যন্ত সুসময়ে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের উদ্যোগেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র শব্দটি অনুপ্রবিষ্ট করেছিল (নভেম্বর ১৯৭৬)। সংসদে কমিউনিস্ট সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন অন্তত এমনতর অভিমত বা আশঙ্কা প্রকাশ করেওছিলেন। সত্যের খাতিরে বলা উচিত, সংসদের ভিতরে ও বাইরে সি পি আই জরুরি অবস্থার জনবিরোধী দিকগুলি নিয়ে সাধ্যানুযায়ী প্রতিবাদ করেছিল, যেমন সংবিধানের বিয়াল্লিশতম সংশোধনের কয়েকটি ধারা প্রসঙ্গে। কিছুটা পরিস্থিতির চাপে অনিচ্ছুকভাবেই হয়ত কিন্তু জরুরি অবস্থার প্রতি সাধারণ সমর্থন, এমনকী প্রাথমিক প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার পরেও, সি পি আই-এর ভুল সিদ্ধান্ত বলেই ধরতে হবে, হীরেন্দ্রনাথ মনে করেছেন। অন্যদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই এম) জরুরি অবস্থার সময় সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকলেও সি পি আই-এর মতো কংগ্রেসের ফাঁদে পা দেয়নি। এই সতর্কতার সুফল তাঁরা পেয়েছেন ৭৭-র নির্বাচনে। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'Marxist' rivals, largely passive during the emergency, had the advantage the least of

being clever enough not to get tarred with the Congress brush; nothing suceeds like success however, and their opportunism had paid."।

ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নিদারুণ পরাজয় এবং মধ্য ও দক্ষিণপন্থী দলগুলির মিশ্র একটি শক্তি ক্ষমতা দখল করার পরে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ক্ষমতা অলিন্দে প্রকটিত হয়ে উঠতে থাকে—তা হলো, দ্বি-দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার কেন্দ্রে বিরোধী আসনে বসেই কংগ্রেস ঘোষিতভাবেই রাষ্ট্রপতির ভাষণে উল্লিখিত দ্বি-দলীয় শাসনের ধারণাকে স্বাগত জানায়। ইতিহাসের এক নাটকীয় ভঙ্গিমায় ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থের একটি বিশেষ দিক এখানে উন্মোচিত। জাতীয় বুর্জোয়ার একচেটিয়া পুঁজির রক্ষক হিসাবে তাদের শ্রেণীস্বার্থেই কংগ্রেস যেমন একদিন 'সমাজতন্ত্র' শব্দটিকে প্রস্তাবনায় ঢুকিয়েছিল, ঠিক তেমনই কিছুটা পরিবর্তিত শ্রেণী-আঁতাতের প্রেক্ষিতে একচেটিয়া পুঁজি ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের যৌথ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের পরে দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ উপমা টেনেছেন চমৎকার—"...both the Janata and Congress carry baskets where the monopoly bourgeois-landlord interests in the country can safely deposit their eggs, not worrying over much which turns out to be the ruling party."

তাহলে পরিবর্তনের অর্থ কি এদেশে নিছকই শাসকশ্রেণীর গোষ্ঠী আঁতাতের রকমফের? এর বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণীসমূহের সমধর্মী আদর্শের ভিত্তিতে একটি ব্যাপকতর ঐক্য গড়ে তোলা কি একান্ত অসম্ভব? হীরেন্দ্রনাথ এরকমই একটি ঐক্যের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন আলোচ্য গ্রন্থটির প্রায় শেষপর্বে, যেখানে ভারতের দুটি কমিউনিস্ট পার্টি শুধু নয়, সমস্ত বামপন্থী দল ও সংগঠন এমনকী 'ultras'-দেরও সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি এমনই এক প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের যাঁর বিদগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে ভারতের প্রথম পঁচিশ বছরের সংসদীয় রাজনীতি একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। যাঁর লেখনীতে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে গভীর রসবোধ, আদর্শগত সততার সঙ্গে দূরদৃষ্টির এক আশ্চর্য সমাপতনে সংসদীয় রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তথাপি এই স্মৃতিচিত্রণের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে আরো একটি নৈর্ব্যক্তিক জিজ্ঞাসা—হীরেন্দ্রনাথও আভাসে তুলেছেন একথা—জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের যে অঙ্গীকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, সংসদীয় গণতন্ত্রের বর্তমান রূপ তার পক্ষে কতটা প্রাসঙ্গিক?

...When country's sovereighty and integrity is clouded over by 'surrogate colonialism'...the national forum hardly hears the voice of our collective reason and national self-respect."।

ইতিহাস ও অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আজ একথা আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলকারী ভারতীয় শাসকশ্রেণীর চরিত্রের মধ্যেই ছিল আঁতাতের রাজনীতি। প্রেক্ষিত ও আশু-প্রয়োজনের বিচারে সেই আঁতাতের সামান্য রকমফের ঘটেছে মাঝেমধ্যে। ভারী শিল্পে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগভিত্তিক নেহরু-পরিকল্পিত স্বনির্ভর

অর্থনীতি থেকে 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ' স্লোগান তোলা স্থিতাবস্থা রক্ষায় সফল রাষ্ট্রশক্তি হয়ে রাজন্যভাতা বিলোপকারী ভূমিকা ছুঁয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ-দফা কর্মসূচি এবং জরুরি অবস্থা—এসবই মূলত একমাত্রিক শ্রেণীস্বার্থের গড়গড়িয়ে পথ চলা। জরুরি অবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে আঁতাতের আভ্যন্তরীণ শক্তিবিন্যাসে কিছুটা অদলবদল হয়েছে বলেই দ্বিদলীয় শাসন কিংবা আরো সাম্প্রতিককালে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বদলে এমনকী রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও শোনা যাচ্ছে। পুঁজির বিশ্বায়নের পর্বে এই গোষ্ঠী আঁতাতের বিন্যাসে আরো কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই সাম্প্রদায়িকতার প্রবল উত্থান কিংবা স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ। ভারতে আর্থ-সামাজিক প্রকৃত পরিবর্তন, বৈপ্লবিক যদি না-ও বলি, তাই সংসদীয় রাজনীতির সাফল্য বা ব্যর্থতার উপরে নির্ভর করে না। বরং নির্ভর করে সংসদীয় রাজনীতির চৌহদ্দির বাইরে ব্যাপকতম বিকল্প আঁতাত, বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির প্রসারিততম ঐক্য কবে এবং কীভাবে গড়ে উঠবে, তার-ই উপর। সংসদীয় কাঠামো একটি রাজনৈতিক প্রকরণ হিসাবে প্রাসঙ্গিকতা হয়তো এখনো হারায়নি। তবে প্রকৃত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংসদকে ব্যবহার করতে হলে, ক্ল্যাসিকাল উদারনৈতিক ভাবধারা পুষ্ট রীতি ও আচরণপদ্ধতির অনুশীলন ও প্রয়োগ কোনও পদ্ধতি নয়, এক্ষেত্রে পথ ও পদ্ধতি হতে পারে একমাত্র মেহনতি মানুষের ব্যাপকতম ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা, শাসন ক্ষমতার বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণী-সমূহের ব্যাপকতম ঐক্য যা নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের পথ খণ্ডন করে নতুন রাস্তা নির্মাণ করতে সক্ষম। এ দায় ও দায়িত্ব বামপন্থীদের এবং বলা ভালো মূলত কমিউনিস্টদেরই।

আলোচ্য গ্রন্থ Portrait of Parliament Reflection and Recollection (1952–77)—Hiren Mukerjee

(Basumati Corporation Ltd.) Rs. 65.

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি

জ্যোতিভূষণ চাকী

প্রথমেই বলি সুন্দর সাবলীল যে রীতি সেটাই তাঁর রীতি। 'গদ্' মানে কথা বলা। গদ্ থেকেই গদ্য কথাটা। কথা বলার স্বাভাবিক ঢংটাই যদি একটা style হয় তাহলে হীরেনবাবুর গদ্যরীতিও তাই।

বহুদর্শী ও বহুস্পর্শী মানুষটি বহুকাল ধরে পাশাপাশি ইংরেজি ও বাংলায় লিখে এসেছেন। হতে পারে ইংরেজি প্রকাশের কোনো উক্তি বাংলায় এসে থাকবে। তবে আমার সেটা চোখে পড়েনি। বাংলার নিজস্ব প্রকাশধর্মই স্বচ্ছ ধারায় তাঁর গদ্যরীতিতে প্রকাশিত।

প্রথম পত্রের ভূমিকার একটি অংশ দেখুন—

"আর-একজন অবিস্মরণীয় অথচ কেমন যেন এই শিথিল স্বভাব বঙ্গদেশে প্রায় বিস্মৃত কমিউনিস্ট কবি গীতিকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কথা এই লেখার সময় মনে ঘুরছে। ভুলতে পারব না মধ্য কলকাতায় বেনেটোলা লেনে গুপ্ত প্রেসের পুরানো প্রায় ভেঙে পড়া বাড়ি। সেখানে ছাপা হত আমাদের সোভিয়েত সুহৃদসংঘের 'Indo-Soviet Journal' আর একদিন সেখানকার 'ঘুপচি' ঘরে আদ্যিকালের টেবিলে কাগজ পেতে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সভার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে লিখলেন, সুর দিলেন, আর সভায় স্বকীয় ঐশ্বরিক প্রতিভাবদ্ধ কণ্ঠে গাইলেন "এসো মুক্ত করো/মুক্ত করো/অন্ধকারের এই দ্বার'। গণনাট্য সংঘের স্বর্গযুগে যারা প্রধান, তাঁদেরই মর্মে অতিবিশিষ্ট স্থান নিয়েও যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো আত্মশ্লাঘা বর্জনের এক উদাহরণ হয়েছিলেন, তাঁর বিরল বিপুল কৃতিত্ব আজ কাউকে ম্লান করতে দেখি না। সমিতির সাম্যে ও "ঐক্যে" "জনতার মুখরিত সখ্যে" সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। সে-ডাকে সাড়া দেবার সামর্থ্য বুঝি আমাদের নেই। শিশুপ্রতিম প্রতিভাধরের নাম এই মুখবন্ধের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা তুষ্ট।"

অত্যন্ত খোলা মনে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের উপর tribute রচনায় তাঁর গদ্যরীতি যদি আমার লক্ষ করি দেখব বড়ো বাক্য এতে আছে, সমাসবদ্ধ শব্দ এতে আছে। রচনাটি তৎসম শব্দবহুল। কিন্তু লেখকের হৃৎস্পন্দন রচনাটি ছন্দস্পন্দ হয়ে দেখা দিয়েছে। সব মিলে সহজ সাবলীল হয়েও দৃঢ়বদ্ধ।

সংস্কৃতের বাগ্‌বন্ধ বা প্রবচন তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃতের বিপুল বাঙ্‌ময়ে যে সব বচন আমাদের চিন্তাকে উদ্দীপিত করে সেগুলিকে তিনি তাঁর রচনায় এমন করে আপন করে নিয়েছেন যে সেগুলো মূল বাক্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছে। 'সর্বঃসর্বত্র নন্দতু' এই শিরোনামযুক্ত বচনটি মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলিকে পৃথকভাবে দেখা যেতে পারে বটে, কিন্তু যখন তিনি বলেন শতায়ু হব, পশ্যেম শরদঃ শতম্। তখন দ্বিতীয়াংশের

পশ্যেন শব্দঃশতম্ বাক্যটির অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে, নিছক অনুবাদ বলে মনে হয় না। অথবা যখন বলেন উপনিষদের ঋষি ভেবেছেন সমাজের কথা—ঈশবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ—বলেছেন লোভ বর্জন করো। মা গৃধঃ, তখন তাঁর প্রকাশরীতির একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বোঝা যায় তাঁর উপরি-স্তরের বাংলায় অধঃস্তরের সংস্কৃত-চিন্তন অনুসৃত হয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও সংস্কৃত বাক্ স্ফুলিঙ্গগুলি বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করেছেন, যেমন বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই (ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতয়ং হি কিঞ্চিৎ) আর রামচন্দ্রের মুখ থেকে শোনানো হয়েছে, জীবন দিয়েছে কর্মভূমে, শুভ কর্মই সকলের কর্তব্য (—কর্মভূমিম্ ইমানং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্মযৎ শুভম্)।

অবশ্য এ ধরনের মিশ্রণের জন্য রচনাংশ আদৌ ভারী হয়ে ওঠে না। বরং একটি বিশিষ্ট বাক্‌ভঙ্গি চিন্তার আধারগুলিকে মাধুর্যে ভরে দেয়। সংস্কৃতের বাঙ্‌মাধুর্য এসে বাংলাকে রমনীয় করে তোলে।

অনেক ক্ষেত্রে তিনি শিরোনামটিও সংস্কৃত রেখেছেন চরৈবেতি চরৈবেতি। মার্কসবাদ বিষয়ক রচনাতেও দেখি 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' রচনার মূল সুর ধরিয়ে দিতে এগুলো যেন মন্ত্রের মতো। ঋষিরা মন্ত্র রচনা করেছিলেন মানুষের মঙ্গলচিন্তন করে। মার্কস লেনিন প্রমুখ মানুষেরা ছিলেন ঋষির মতোই তারা মানবমুক্তির মন্ত্র রচনা করেছেন। লেখকের অবচেতন মনে যখন আধুনিক ঋষিরা স্মরণে আসেন তখন ঋষিদের কণ্ঠ তাঁদের কণ্ঠে এক হয়ে বাজে। তাই তাঁর রচনায় যে সংস্কৃত বাক্-খণ্ডগুলি দেখা যায় তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁর রচনাশৈলীতে তাই এই সুমিশ্রণ।

'মোঙ্গলিয়ার জনগণ রাজ্যে' রচনায় দেখি হালকা শব্দের মেলা—'মোঙ্গলিয়ায় যাবার রাস্তা আমাদের হল—দিল্লী থেকে মস্কো, সেখানে দেড়দিন কাটিয়ে উলান বাটোর যাত্রা। এটাকে বেশ একটু ঘুর পথ বলা চলে।' এই সহজ চালে চলতে চলতেই তার সঙ্গে এসে গেল 'অভ্রংলিহ মহিমা', ছোট্ট অথচ গাঁটাগোঁট্টা সোভিয়েট প্লেন। তখলিফের খেশারৎ। 'যখন যে ধরনের শব্দ প্রয়োজন বিষয়ের অনুরোধে তখন তা-ই নিচ্ছেন। অনেক সময় পাশাপাশি ভারী তৎসম আর তৎসম মিতালিও তাঁর ভাষার লাবণ্য লাঘব করে নি। তাঁর রচনায় আছে সব ধরনের শব্দের আমন্ত্রণ। তবে খাঁটি বাংলায় অকারণ সংস্কৃতায়নকে তিনি এড়াতেই চেয়েছেন। 'ইতিপূর্বে'কেই তিনি স্বাগত জানিয়েছেন 'ইতঃপূর্বে' লেখায়, 'ইতিমধ্যেই' তাঁর রচনায় 'ইতোমধ্যে' নয়।

৭০-৭৫ বছর যিনি কলম চালিয়েছেন সব্যসাচীর মতো তাঁর পরিমিতি বোধ ও শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নির্বাচন যে সুষ্ঠু হবে তা বলাই বাহুল্য। আর যিনি দেশ ও দশের জন্যে অনবরত লিখছেন, তিনি গৌড়ী রীতি বা বৈদর্ভী রীতির না লাটী রীতির এ তর্ক বৃথা, তিনি বচনে বাচনে যে খাত রচনা করেছেন তাতেই বন্দভাগীরথীর অবাধ সঞ্চলন।

লিখতে লিখতে তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না। এই সৌন্দর্য শুধু তার অঙ্গে নয় লিখন-আঙ্গিকেও।

হীরেন্দ্রনাথ সৃষ্টি

কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি

'দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট'-এর আমন্ত্রণে কমিউনিস্ট ইশতেহার (১৮৪৮) প্রকাশের ১৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সুধীসমাবেশে আলোচনার সূচনা করতে পেরে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

খুব স্বচ্ছন্দে মনে আসিনি, কারণ বেশ কিছুকাল ধরেই দেখছি যে খোদ্ কম্যুনিস্টদের অনেকেরই (সি. পি. আই. এম. কতকটা ব্যতিক্রম) কম্যুনিজম বিষয়ে যেন অপ্রতিভ তত্ত্বগত চিন্তা ও তদানুসারী কর্ম বিষয়ে অনীহা প্রায় সর্বত্র, আর 'পুরানা ঘরানা'-তে আটক রয়েছি বলে আমার মতো অকৃতীকেও কিছু বিদ্রূপের পাত্র হতে হয়েছে। ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে খাস মস্কো 'ক্রেমলিনে' সোভিয়েট বিপ্লবের সপ্ততিতম বার্ষিকী উপলক্ষে মিখাইল গর্বাচভ্-এর বাক্ বিস্তার আর বিশেষ করে পশ্চিম দুনিয়ার কম্যুনিস্ট নেতাদের মুখে তা নিষ্প্রাণ প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম। সংক্ষিপ্ত হলেও আফগানিস্তানের তৎকালীন নেতা নজীবউৎল্লাহ-এর দৃপ্ত ব্যতিক্রমী ভাষণ শুনে তাকে আলিঙ্গন করেছিলাম তার কথা থেকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেয়ে। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে লক্ষ করেছিলাম ফিদেল কাস্ত্রোর বিলম্বিত এবং স্বভাববিরুদ্ধ বিষণ্ণবদন উপস্থিতি ও কাজ সারা ছোট বক্তৃতা। মস্কোতেই মনের দুঃখ-জানাই দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বদন্তী নায়ক Oliver Tambo এবং এদেশে সুপরিচিত (বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিদেশমন্ত্রী) Alfred Nzo- কে, আর তাম্বো বলেন "কমরেড এ-সব আমাদের সয়ে যেতে হবে" ("We have to live with it")। নজরে পড়েছিল পার্টি নেতা রাজেশ্বর রাওয়ের কেমন যেন অব্যক্ত অস্বাচ্ছন্দ্য (পার্টির বিবৃতি তিনি না পড়ে ভার দিয়েছিলেন কমরেড ফারুকী-কে)। অনুমান করি E.M.S. Namboodiripad মস্কোর নতুন আবহাওয়ায় যথেষ্ট বিচলিত। মস্কোতে তখন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কার কম্যুনিস্টরা 'New Age' পত্রিকার সংবাদদাতা মসূদ আলী খান্-এর অফিসে জড়ো হয়ে দেড়ঘণ্টা আমার বিপন্নবোধ জানিয়ে বক্তৃতা আর প্রশ্নোত্তরের একটা 'টেপ-রেকর্ড' বানিয়েছিলেন, শুনেছি। তবে তার পাত্তা আর নেই। যাই হোক্, দেশে ফিরে সাধ্যমতো আমাদের কম্যুনিস্ট প্রত্যয়ের ধ্বজা তুলে ধরার অক্ষম চেষ্টা চালিয়েছি বলে যেন নিন্দিতই হয়েছি। উপহাস শুনেছি যে 'যত্র তত্র' মাথা কুটে মরছি আর বুঝছি না যে দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের বদলাতে হবে।

আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলি যে, এত নির্বোধ নই যে সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে—যেখানে একই নদীর জলে কেউ একাধিকবার স্নান করতে পারে না—আমাদের এই 'বদ্‌লতী' দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাইব না। মার্কস কথিত "সুসমাচার"-কে সনাতন, সর্বগ্রাহ্য, সর্বাবস্থায় অভ্রান্ত ও অবশ্য মান্য ঐশ্বরিক অনুশাসন মনে করলে শুধু মার্কস-চিন্তা নয় আমাদের মানবিক সত্তার অনন্তপার গৌরবেরই অপমান করা হয়। মার্কসবাদ কর্মপথের নিশানা দেয়, আপ্তবাক্যের অনুসরণ চায় না; 'domga' বস্তুটির মধ্যে বিপদের বিষ রয়েছে—তবে উল্‌টো পথে 'Pragma'-র প্রলোভন এড়িয়ে না গেলে নীতিভ্রংশ আর বহুবিধ অধঃপতন

যে অনিবার্য, তা ভুলে যাওয়া একটা বিকট ভ্রান্তি। তাই মার্কিন মনীষী Professor Sweezy যখন সতর্ক করে দেন যে কম্যুনিজম-এর 'বারোটা বেজে' গেছে আর মুনাফাখোর, পুঁজিশাহীর বিকল্প নেই ('There is No Alternative'—TINA) যে মানতে হবে এটা ভুল, তখন কম্যুনিস্ট মহলে (অবশ্য ব্যতিক্রম বাদে) যেমন সাড়া স্বাভাবিক ও সমুচিত ছিল তা দেখিনি। এবম্বিধ নানা কারণে এই বয়সে, ম্রিয়মান অবস্থাতেও যেখানে পেরেছি একটু বুঝি হল্লা করতেও চেয়েছি! কতকটা চাঙ্গা হলাম আপনাদের মতো বিদ্বজ্জন এই আলোচনার আয়োজনে আমার মতো 'বাতিল' একজনকে ডাকছেন দেখে।

এটাও দেখলাম যে "দেশ" পত্রিকার মতো প্রবলপ্রতাপান্বিত প্রচার মাধ্যমে কম্যুনিস্ট ইশতেহারকে "মার্ক্সীয় ফতোয়া" আখ্যা দিয়ে কিছু পরিমাণে বিকৃত করেও সেই সংখ্যায় কয়েকটি দামী লেখা ছাপা হল যার একটি প্রধান রচনার শিরোনামা ছিল "যদি আজ মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবু তাঁদের নিজস্ব বিশ্বদর্শন এবং যুগান্তরের স্বপ্ন কি কখনও ভোলা যায়?" তুষ্ট হতে পারি না এই "স্বল্প দাক্ষিণ্যে" ("ইংরিজিতে যাকে "small mercies" বলা যায়!), তবু এটা এরকম স্বীকৃতি তো বটে!

মার্কস-এঙ্গেলস্-এর "স্বপ্ন" ব্যর্থ জেনে যতই পুলকিত আজকের সমাজপতিরা হ'তে থাকুন, ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে যায় নি। আর রাহুগ্রাস থেকে সাম্যবাদের রেহাই যতই সময় সাপেক্ষ হোক না কেন, লোভসর্বস্ব শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা নিজেরই জমে ওঠা কলুষের চাপে ভেঙে পড়া তো মানুষেরই এ যাবৎ ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায়। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রভুদের জগৎজোড়া বাদশাহীর চিরস্থায়িত্ব ঘোষণা করে 'Time'-এর মতো পত্রিকায় ("America Rules Thank God; ০৪/০৮/৯৭) দর্পিত প্রবন্ধ বেরোতে থাকুক; পুঁজিশাহী 'বিশ্বায়ন'-এর কৃপায় বিশ্বের অধিকাংশ বাসিন্দারই জীবন যন্ত্রণা বাড়তে থাকুক; তবু কি একেই ভবিতব্য বলে সবাই মানতে থাকব? সমসুযোগের সমাজ দুনিয়ার সর্বত্র আবাহন, সমাজরূপান্তরের 'স্বপ্নকে' বাস্তবায়নের ইতিহাসসঞ্জাত পথনির্দেশ, জ্ঞানকে শক্তিরূপে ("Knowledge is power") ব্যবহার করে, মেহনতী অর্থাৎ নির্বিত্ত দলিত মানুষের অপরাজেয় সংগঠন ও সংকল্পকে প্রকরণকে পরিণত করে যুগান্তরী বিপ্লব ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মানুষের নতুন জগদ্ব্যাপী অভ্যুদয়ের দুন্দুভিনিনাদ ঘটেছিল ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। যখন মার্কস-এঙ্গেলস্ কর্তৃক রচিত এবং প্রথমোক্তের গহন গভীর সমাজচিন্তা ও মানবিক আবেগ থেকে প্রসূত এক বিস্ময়কর বিমোহন লিখনশৈলীর জাদু নিয়ে ঘোষিত হল কম্যুনিস্ট ইশতেহার, "গলিত সুবর্ণের প্রস্রবণ" ("a srteam of molten gold") যার এক অবিস্মরণীয় ভূষণ। মার্কস-এঙ্গেলস্ নিজেরাই বলে গেছেন এতে ভ্রান্তি আছে, ফাঁক আছে তৎকালীন সংকীর্ণতা ও অপূর্ণতা আছে, কিন্তু ইতিহাসে এর সগৌরব অধিষ্ঠান নিঃসংশয়। উচ্ছ্বাসপ্রকাশে স্বভাবত বিরূপ জোসেফ স্টালিন এই ইশ্‌তেহারকে বলেছিলেন "The Song of Songs of Marxism"—ছেলেবেলায় খ্রিস্টান পাদরীদের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন বলে বুঝি স্টালিনের আবেগ এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পেয়েছিল।

২

আপনাদের সংগঠনের মুখপত্র "তত্ত্ব ও প্রয়োগ" নামকরণটি ভারি ভালো লেগেছে। তত্ত্ব সন্ধানের বিমল আনন্দ সকলের কাছে সহজপ্রাপ্য হতে পারে না, কিন্তু জীবন বহির্ভূত কোনো কর্ম নেই। আমাদের ভারত চিন্তায় 'জগৎ ও জীবনকে নস্যাৎ' (world-and-life negation') করার প্রবণতা নিয়ে মহামনীষী Schweitzer-এর সমালোচনার প্রত্যুত্তর রাধাকৃষ্ণনের রচনায় পড়েছি আর "শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ/ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা/জীবো ব্রহ্মোতি নাপরঃ" উচ্চারণের সহজ অথচ কদর্থ করে আমাদের বহুযুগব্যাপী দর্শনচিন্তার গভীরতা সূক্ষ্মতা ও ব্যাপ্তির অবমাননা করার মতো নিরক্ষর নই। একটা দুঃখ অবশ্য লুকোতে পারছি না। 'বিচার স্বতন্ত্র' আর 'আচার'-এর নিগড়ে বিদ্বজ্জন সহ সকলকে বেঁধে রাখার সনাতন বর্ণাশ্রমী এবং কার্যত অমানবিক সমাজরীতি জীবনের স্বাভাবিক স্পন্দন ও বিকাশকে আবহমানকাল থেকে রুদ্ধ করে রেখেছে, ভারত চিন্তার বিভূতিকে কলুষিত করেছে। মার্জনা করবেন কিন্তু বড্ড গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ছি বলে হঠাৎ মনে পড়ল অস্ট্রিয়ান্ 'সাধু' অগেহানন্দ ভারতীয় কথা মনে এলে যে যাজ্ঞবল্ক্য থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত যে পরম্পরা তাতে আছে উদ্দীপনার অস্বাস্থ্যকর বাহুল্য। অবশ্য সবাই জানি কর্মযোগী বিবেকানন্দের সর্ব জীবে শিব-দর্শী মহনুভবতা। আর আমার মনে পড়ছে ফরাসী ভারতবিদ্বান্ Louis Renou-র মজাদার আবিষ্কার যে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য একবার বুঝি মাংস ভক্ষণ বিহিত কি না জানতে চাওয়ায় জবাব দেন "হাঁ, বিহিত বই কি, তবে একটু নরম হওয়া চাই ("it must be tender")!"

কোথা থেকে কোথা আপনাদের টেনে এনে বসেছি, তাই রাশ-টেনে বলি যে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে দর্শনকে মার্কস-এঙ্গেলস্-এর মতো বিরাট মর্যাদা আর কেউ দিয়েছেন মনে হয় না। নির্বিত্ত শ্রেণীর মুক্তি সাধনে দর্শনকে আত্মস্থ না করতে পারলে চলে না আর নির্জিত শোষিত দলিত মানবের মুক্তি বিনা দর্শনেরও সার্থকতা নেই, এমন নির্ঘোষ অন্যত্র কোথায় মিলবে? দ্বিধাহীনভাবে ১৮৪৩-৪৪ সালে মার্কস-এর ঘোষণা "তত্ত্ব যখন জনমানসে সন্নিহিত হয় (অর্থাৎ তাদের চিত্ত জয় করে) তখন তা হয়ে দাঁড়ায় এক বাস্তব শক্তি" ("Theory becomes a material force when it grips the masses")। ১৮৪৫ সালে ফয়েরবাখ-এর (Feuerbach) সমালোচনায় আকাশবাণীর মতো মার্কস্-এর উচ্চারণ শুনি "দর্শনশাস্ত্রীরা বিশ্বের বিশ্লেষণ করেছেন নানাভাবে, কিন্তু যেটা চাই তা হল দুনিয়াকে বদলে দেওয়া।" সেখানেই দেখি "The human essence"-এর সংজ্ঞা "মানবত্বের সারাৎসার প্রতিটি ব্যক্তিত্বের অন্তর্গূঢ় কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়; প্রকৃতপক্ষে সামাজিক পরস্পর সম্পর্কের সাযুজ্যেই তার অবস্থান।" মার্কস্-এর জন্ম ১৮১৮ সালে আর এঙ্গেলস জন্মান ১৮২০ সালে। কী বিপুল প্রতিভাধর এই 'দ্বয়ী' ('duo') যারা তরুণ বয়সেই সমাজসত্যসন্ধানে এমন অনন্যার পরিচয় দিলেন। বহু বৎসর ধরে অমুদ্রিত ছিল যে "Economic and Philosophical Muanuscripts of 1844" তাতে কত রত্ন ছড়িয়ে রয়েছে, অনুকূল পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিজম আর মানবিকবাদ যে অভিন্ন তা ঘোষিত হয়েছে। তার কম্যুনিস্ট্ ইশতেহারের মূলে রয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা—In the beginning was not the

Word but the Deed বাক্য নয়, কর্ম, বহুজনের সম্মিলিত কর্মের ভিত্তিতে মানুষেরই সৃষ্ট সভ্যতার বহুমাত্রিক বিকাশ ঘটেছে। বাস্তব জাগতিক সত্তার ('Being') ভিত্তিতে তারই আনুষঙ্গিক ও অনুবর্তী চেতনা (Consciousness) আদিযুগ থেকে জীবন ও কর্মের রূপভেদ ঘটিয়ে এসেছে। যেভাবে মানুষ জীবনযাপন করেছে তারই ভিত্তিতে চিন্তাধারা নির্ধারিত হয়েছে। ইতিহাসে যুগ থেকে যুগান্তর, এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে উত্তরণ এভাবেই বাস্তব জীবন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করেছে। শোষণ রহিত সমাজ, সমসুযোগের সমাজ, সর্বজনের সুখসাধনে প্রবৃত্ত সমাজ মানুষের চিন্তায় কল্পনায় নানারূপে নানাভাবে এসেছে বহুযুগ ধরে, কিন্তু মানুষেরই গ্রাসাচ্ছদন ও জীবনধারণের চাহিদার চাপে আর তাদেরই কর্ম শক্তির ক্রমোন্নতির সহায়তায় প্রাচীন যুগের দাসপ্রথা থেকে সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগ থেকে যন্ত্রোৎপাদনভিত্তিক বুর্জোয়া যুগের আবির্ভাব ঘটেছে। বাস্তব জীবনেরই তাগিদে, প্রতিটি সামাজিক স্তরের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য খণ্ডনপ্রয়াসে, স্তর থেকে স্তরান্তরে মানুষের যাত্রা থেকে এভাবেই বুর্জোয়া কর্তৃত্বের যুগে অনিবার্যভাবেই জন্ম নিয়েছে তারই সংহারক সর্বহারা মেহনতী মানুষের শক্তি—ইশতেহারের ভাষায় "যারা বুর্জোয়া শ্রেণীর কবর খুঁড়বে সেই প্রোলেটারিয়েট"। এমন নয় যে সবাই বসে আছি ইতিহাসের শকটে যা অকাট্য গতিতে যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে, নতুন সমাজ পর্যায়ে পৌঁছে দেবে। বাস্তব কারণেই পথ 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর' না হয়ে পারে না, তাই আত্মপ্রত্যয়ী মানুষকেই যথাযথ সমাজ চেতনা আর সংগঠন ও সংহতিকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে অন্বিষ্ট সাধনের চেষ্টা করতে হবে। এরই আহ্বান ১৮৪৮-এর কম্যুনিস্ট ইশতেহারে বিঘোষিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সাফল্য দূরে থাক, সম্ভাবনা পর্যন্ত নিয়েও আজ বহু প্রশ্ন, বহু সংশয়, বহু দ্বিধা। মনে রাখতে চাই যে, মার্কসীয় নিরিখে এই বিপ্লব এমনই সুদূরপ্রসারী ও গভীরতাস্পর্শী যে এর সাফল্য শুধু ইতিহাসে কতকটা নতুন এক অধ্যায় আনবে তা নয়—সেই সাফল্য প্রকৃত ইতিহাসের জন্ম দেবে, নিঃশেষ করে দেবে 'প্রাক্-ইতিহাস'কে ("pre-history")। বারবার বহু সমাজ রূপান্তরের মধ্য দিয়েও মানুষের বহুলাংশকে সমাজপতিদের কবলে শোষিত, বঞ্চিত, দলিত, অপমানিত হবার মানবিক লাঞ্ছনা থেকে নিস্তার দিতে পারে নি, তার অবসান ঘটাবে আর (সোভিয়েত দেশে ১৯৩০ সালে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী) মানুষের সমাজসত্তায় প্রোথিত 'লোভ' নামক 'মৃত্যুশেল' উৎপাটিত করতে পারবে। এমন যে "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ", তার সাফল্য সহজ নয়, সস্তা নয়। বিপ্লবী চেতনা সংকল্প ও সংগঠনের সঙ্গে বহুজনের শুভবুদ্ধি ও সহযোগিতার অপরিসীম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দীর্ঘায়ত প্রয়াসে লিপ্ত হতে না পারলে সার্থকতা মিলবে কেমন করে? কম্যুনিস্ট ইশতেহারে সাড়া দিয়ে এ যাবৎ দুনিয়ায় যে বিপ্লব ঘটতে পেরেছে, তার মূল্য ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেই বুঝতে হবে যে এখনও বহু "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" লংঘন করে যেতে হবে।

৩

মার্কস-এর *Capital* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে "The Genesis of the Industrial Capitalist" অধ্যায়ের শেষে দেখা যায় যে যদি এক ফরাসী লেখকের ভাষায় বলা যায় যে টাকার যখন

প্রথম আবির্ভাব ঘটে তখন যদি তার গায়ে লেগে থাকে "জন্ম চিহ্ন এক রক্তাক্ত জড়ুল" তো পুঁজি যখন নিজেকে জাহির করে তখন "তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।" বুর্জোয়া শ্রেণীর সুবিপুল ঐতিহাসিক কৃতিত্বের যে বর্ণনা কম্যুনিস্ট ইশতেহার আছে তার তুলনা বুর্জোয়া সাহিত্যে নেই। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক নির্মম অমানুষিক যন্ত্রণা জগৎ জুড়ে অসংখ্য মানুষের জীবনে ঘটিয়ে বুর্জোয়াদের এই কীর্তি সম্ভব হয়েছে—অচিন্তনীয় অত্যাচারের সেই কাহিনী এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মানুষের মন থেকে মুছে দেবার প্রযত্ন বহুকাল ধরে চলেছে কিন্তু সপ্ত সমুদ্রের জল দিয়ে ধুলেও সেই কলঙ্ক কালিমা লুপ্ত হবে না। আরবের সকল কুসুমসৌরভ সেই কলুষের দুর্গন্ধ কাটাতে পারবে না। যাই হোক্, ইশতেহারের ছত্রে ছত্রে বুর্জোয়া দুর্বৃত্তি ও পৈশাচিকতার প্রতি যে অন্তহীন ঘৃণা ছড়িয়ে রয়েছে, তারই সন্ধান এখানে পাই। শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম সমবেত সবাইকে বলেছিলেন "ন ছিত্বা পরমর্মানি/ন কৃত্বা কর্ম দুষ্করম্/ন হত্বা মৎসঘাতীয়ম্/ প্রাপ্নোতি মহতীম্ শ্রিয়ম্।" "পরের মর্ম ছিন্ন না করে, অনেক দুষ্কর কর্ম না করে, জেলে যেমনভাবে মাছকে মারে তেমনই হত্যা না করতে পারলে, মহতী শ্রী ('Big Money') অর্জন করা যায় না।" কম্যুনিস্ট ইশতেহার প্রসঙ্গে এই সুপ্রাচীন অনুভূতি আর মার্কস্ চিন্তার সঙ্গে পূর্ণ সাদৃশ্য আমরা এদেশে অন্তত স্মরণ করব।

রবীন্দ্রনাথ "লোভ" নামক "মৃত্যুশেল" সমাজদেহ থেকে উৎপাটিত করা যে কত দুরূহ তা জানিয়ে সোভিয়েত জনগণকে সতর্ক করে দেন আর সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদও জানিয়ে আসেন (যা মতলব করে সবার মন থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু কাল ধরে) তিনি Zvestia পত্রিকাকে বলেছিলেন 'তোমাদের কাজে কতকগুলো গলদের কথা বলেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, দেখাতে চেয়েছি 'চাঁদের কলঙ্ক'.('the shadow side of the moon')—তোমাদের কাজ যেন কলঙ্কশূন্য হয়।"

সমাজবাদ-সাম্যবাদের অগ্রগতি বিষয়ে, আত্মতুষ্ট থেকে কিম্বা শৈথিল্যবশে কিম্বা অন্য বহু হেতু সমাবেশে আমাদের হিসাবের ভুল ধরা পড়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য মানুষকে নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই—"man, proud man" বলে আনন্দ পেতেন মার্কস, "Man is the measure of everything" ছিল তাঁর এক প্রিয় উদ্ধৃতি। আমরা তো মহাভারতেই দেখি "ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরো হি কিঞ্চিৎ" ("মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই")। কে না জানি চণ্ডীদাসের উক্তি "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"? সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে অষ্টাদশ শতকের বাঙালি কবি দৌলত কাজীর পংক্তি "নর সে পরম দেব, নর সে ঈশ্বর"। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নানাদিক থেকে আজও মানুষ অনেকটা অসহায়, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে আরও সামঞ্জস্য যথাযথ হয়নি—'Original sin'-এর তত্ত্ব মানার দরকার নেই কিন্তু মহাশক্তিধর হয়েও মানুষ এখনও খর্ব, হ্রস্ব, ব্যর্থ, নীতির বিচারে এখনও প্রায় নিঃস্ব, এমনই বৈপরীত্যের জালে জড়িত যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গরিমা লুপ্ত হয়ে যায় 'অ্যাটম' বোমা ব্যবহরের মতো কুৎসিত বীভৎসতায় (আর স্বয়ং আইনস্টাইন মনস্তাপে বলে ওঠেন আবার জন্মালে বৈজ্ঞানিক না হয়ে যেন জলনিকাশী যন্ত্রপাতি বানাবার

কাজে নামেন, যা শুনে "American Plumbers' Union তাঁকে সাম্মানিক সদস্যপদ দিতে চান!) তবুও দোষে গুণে মোড়া এই মানুষকে দিয়েই মানুষের জগৎকে নতুন করে গড়তে হবে। তাই আনাতোল ফ্রাঁস্ অনেকদিন আগে বলেছিলেন যে, ভগবানের সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হল যে দুনিয়ার সব কাজ করাতে হয় মানুষকে দিয়েই। সেই মানুষেরই অধঃপতন আর চারিত্রিক দৈন্য বিনা কি সোভিয়েত ও অন্যান্য সোসালিস্ট দেশের নিঃসন্দিগ্ধ সমাজ নির্মাণ কীর্তির সৌধ অল্পকালের মধ্যেই (১৯৮৬-৮৯) ভেঙে পড়তে পারত? শত্রুপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত বহুরূপ নিয়ে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে চলেছিল বটে, কিন্তু তাকে প্রতিহত করা সম্ভব হল না কেন? কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ১৫০তম বার্ষিকীতে এ সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা যথাযোগ্যভাবে ঘটবে ভরসা করি।

ইতিমধ্যে একটু আশ্বাস খুঁজি বছর চোদ্দ-পনেরো আগে হাঙ্গেরির কম্যুনিস্ট তো Janos Kadar-এর পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা রিপোর্ট থেকে। তখনও গর্বাচভী প্রতিবিপ্লবের প্রারম্ভিক লক্ষণ স্পষ্ট হতে শুরু করেনি, তাই সুস্থ পরিহাসের সুরেই কাদার সমবেত পার্টি প্রতিনিধিদের তৎকালীন হাঙ্গেরির সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসাফল্যের উল্লেখ করে বলেন যে, মানুষের ইতিবৃত্তে হয়তো প্রথম তুলনীয় ম্যানিফেস্টো হল তিন হাজার বছর আগে হজরত মুসা-র (Moses) "দশ নির্দেশ" ("Ten commandments"), আর এত কাল পরেও তা যখন সার্থক হতে পারেনি তখন ১৮৪৮ সালের ইশতেহার অনুসরণে কাজ অপূর্ণ থাকলে সেটা ক্ষমার্হ নয় কি? পরিহাসের সুরে বলা হলেও কথাটির গুরুত্ব প্রচুর। ইতিহাস তো আমাদের ইচ্ছাপূরণের ("wish-fulfilment") দায়িত্ব বহন করে না। ইতিহাস নিজের ছন্দে চলে আর মানুষ তার ভূমিকা পালনে শৈথিল্য দেখালে গতি ব্যাহত হয়, বিলম্বিত হয়— ইতিহাস গড়ে মানুষ, কিন্তু যথেচ্ছভাবে মানুষ তো তা পারে না। তার নিজের স্বভাব, তার পারিপার্শ্বিক তার সমসাময়িক জীবনসংস্থানের চেহারা ইত্যাদি বহু উৎপাদন জড়িয়ে থাকে। ("Man makes history, but not just as he pleases")। মানুষ তার পরিস্থিতিকে নির্মাণ করে আবার পরিস্থিতিও মানুষকে বানায় ("Man make circumstance but circumstances also make men")। মার্কস ১৮৫০-এর দশকেই সতর্ক করে দেন যে বিপ্লব যারা চায়, তাদের তৈরি করতে হবে নিজেদেরই, পনেরো কিম্বা কুড়ি কিম্বা পঞ্চাশ বছর লড়াই করে নিজেদেরই বদলাতে হবে আর তারই জোরে গোটা সমাজ বদলাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। সমাজবাদ সাম্যবাদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বিলম্ব ঘটছে বলে হাল ছেড়ে দেবার মতো ক্ষুদ্রচেতা হৃদয় দৌর্বল্য যেন আন্দোলনকে আচ্ছন্ন না করে।

কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। ১৭৭২ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় ("Declaration of Independence") দ্বিধাহীন ভাষায় বলা হয় যে "সকল মানুষ জন্ম থেকে স্বাধীনতার অধিকারী," অথচ কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ব বিধি বহুকাল অব্যাহত ছিল আর আজও তার অজস্র ছাপ রয়েছে সমাজ জীবনে। ফরাসী বিপ্লবকালে (১৭৮৯-৯৪) "মানবাধিকার" ("Rights of Man") অপরূপ মনোগ্রাহী ভাষায় বিশ্বজনসমক্ষে প্রচারিত হয়ে অভূতপূর্ব চমক সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৭ সালের সোভিয়েত বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী বিপ্লবই ছিল ইতিহাসে

শিরোমণি-স্বরূপ এক ঘটনা। "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" বাণী মানুষের জীবনে নবযুগের আস্বাদ এনে দিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল দুশো বছর বাদে 'বাস্তিলের দুর্গপতন' দিবসে (১৪ জুলাই) অহঙ্কারী বলে খ্যাত রাষ্ট্রপতি মিত্তেরকে যেন বিদ্রূপ করে ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার স্পর্ধিত উক্তি করলেন যে ১২১৫ সালে ইংলন্ডের 'ম্যাগ্‌নাকার্টা' হল ঐতিহাসিক বিচারে আরও গৌরবান্বিত। অনেকে জানি যে ১৭৮৯ সালে ইংলন্ডের পার্লামেন্টে বাস্তিল-এর পতন বিষয়ে বলা হয়েছিল যে তা হল জগতের ইতিহাসে "সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম" ঘটনা! এখনও জগতের পরিস্থিতি এমন নয় যে ফরাসী বিপ্লবের যুগান্তকারী চরিত্র প্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। সোভিয়েত বিপ্লব (১৯১৭), চীন বিপ্লব (১৯৪৯), আর সাম্যবাদী সংগ্রামজাত অন্যান্য বিপ্লব তো তুলনায় সাম্প্রতিক ঘটনা। কম্যুনিস্ট তত্ত্ব ও কর্ম গতানুগতিক রাজনীতির আয়তনে সীমিত নয়; এত কালের ইতিহাসপুষ্ট মানবসমাজের মূলোৎপাটন করে, শোষণের সর্বত্র অবসান ঘটিয়ে, মানুষের লোভ জটিল মানসিকতার বন্ধন মোচন করে, সর্বার্থে নবজীবনের ভিত্তিস্থাপন কম্যুনিজম-এর অন্বিষ্ট। যারা মামুলি রাজনীতির অভ্যস্ত, তাদের কাছ এর দাম না থাকতে পারে, কিন্তু এক অতি কঠিন সাধনার এই আহ্বান—যা কঠিন হলেও জনগণের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অতি স্বচ্ছ, অতি সহজ, অতি নির্মল (এ-বিষয়ে Bertold Brecht স্মর্তব্য)-হল কম্যুনিস্ট ইশতেহারের প্রাণবস্তু।

৪

কম্যুনিস্ট ইশতেহারের ছত্রে ছত্রে মেহনতী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্র ফুটে রয়েছে। প্রকৃত দেশপ্রেমের সঙ্গে এর পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য মার্কস-চিন্তার গৌরব। তবু দেখি কোনো কোনো মহল থেকে অনুযোগ এসেছে "The working men have no country. We cannot take form them what they have not got" এই বাক্যটি সম্পর্কে। বেশি কথার দরকার বুঝি না। "স্বভাব-কবি" বলে বর্ণিত (এবং অবজ্ঞাত), "আমরা হরিহর" প্রভৃতি বহু মধুর অথচ তেজস্বী 'স্বদেশী' গানের রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৪৫-১৯১৮) চমৎকারভাবে এই মার্কস উক্তির ব্যাখ্যা করেছেন "স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা/এদেশ তোদের নয়/তুমি কেবল ত্রাসের মালিক/গ্রাসের মালিক নয়/চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়/যে দেশ যাদের অধিকারে/তারাই তাদের বলতে পারে/কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয়? তোরাই কুলি/তাদের/কুলি তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি/তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি, ক্ষুধায় মৃত্যু হয়/তারাই মালিক তারাই সমুদয়/স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা এদেশ তোদের নয়!"

অত্যন্ত অসৎ এক অভিসন্ধিমূলকভাবে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনকেও ইয়োরোপকেন্দ্রিক ('Euro-centric') মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলে অভিযোগও উঠেছে। সন্দেহ নেই যে, জীবনের প্রথম অধ্যায়ে মার্কসের দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ ছিল পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির দিকে, ইংলন্ডের মতো সভ্যতার অগ্রগতির ফলে বিনা সংগ্রামে, মোটামুটি সংসদীয় 'গণতন্ত্র'-এর জোরে বিপ্লব এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাও কিছুকাল মনে এসেছিল। কিন্তু দেরি হয়নি তা ভেঙে যেতে আর বুঝতে যে ইংলন্ড হল একেবারে নিরেট 'বুর্জোয়া' ("the most bourgeois of all nations") আর সংসদীয় কুহকে শ্রমজীবী মানুষকে "ধনিকশ্রেণীর সহায়ক" ("labour

lieutenants of the capitalist class") বানানো যায়, পার্লামেন্ট গিয়ে তাদের অধঃপতন কতটা ঘটে তা জানতে ত্রুটি হয় নি।

শ্রেণীসংগ্রাম বিষয়ে তাই মার্কসচিন্তা অটল (তুলনীয় সম্প্রতিকালে মাওৎসেতুংয়ের বিখ্যাত বচন "'Never forget the class struggle"), আর ইশতেহারে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে 'গণতন্ত্র'-এর নামাবলী পরলেও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র হল যে "তা ধনিকশ্রেণীর কর্ম নির্বাহক সমিতি" ("executive committee of the captialist class")। বস্তুবাদী দর্শনের বিচারে মার্ক্সবাদ পবিত্র, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, 'গণতন্ত্র'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সেটা হয় বুর্জোয়া নয় প্রোলেটেরিয়ন গণতন্ত্র। আর ঠিক যেমন প্রথমোক্ত মেহনতী মানুষের অধিকার নিতান্ত নাম-কে-ওয়াস্তে, তেমনই দ্বিতীয়োক্ত ব্যবস্থায় বুর্জোয়াদের অধিকার হবে সংকুচিত। কিন্তু তাতে অপ্রতিভ হবার কিছু নেই কারণ চিরবঞ্চিত নিঃস্ব মানুষই সমাজের অধিকাংশ আর তাদের হাতে হাল থাকলে আসল গণতন্ত্রেরই জয় আর সমসুযোগের সমাজ স্থাপনের পথ সুগম হবার সম্ভাবনা। 'Dictatorship' শব্দটি ম্যানিফেস্টোতে নেই কিন্তু এর সদর্থ সেখানেই বিজ্ঞাপিত। 'পবিত্র' 'গণতন্ত্র'-এর 'গঙ্গাজল' ছিটিয়ে বুর্জোয়া কর্তৃত্বকে (ও অত্যাচার) 'পরিশুদ্ধ' করার প্রক্রিয়া কম্যুনিস্ট আন্দোলনের আদি থেকে আজ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে, সমাজবাদ-সাম্যবাদ বস্তুটিকেই অন্তঃসারশূন্য করার জন্য (কে যেন বলেছিলেন "the dreary drip of democratic drivel")। এ নিয়ে আলোচনার সময় আমার নেই। কিন্তু 'Social Democracy'-র ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে যথাযথ আলোচনা (বিশেষত আমাদের মতো একটা পরপদানত দেশের অভিজ্ঞতাসূত্রে) হয়েছে বলে মনে হয় না। একটু কৌতুক আর কৌতূহলের সঙ্গে দেখি যে ভারতবর্ষে 'সোসালিস্ট ইন্টরন্যাশনাল'-এর (যা আজও বর্তমান) অদ্বিতীয় ও অকৃত্রিম মুখপাত্র জর্জ ফার্নান্ডেজ-এর সংকোচ হয় নি ভারতীয় জনতা পার্টির মতো দলের সঙ্গে 'দোস্তি' বানাতে। ফার্নান্ডেজ-এর অনেক গুণ আছে জানি, কিন্তু ভুলতে পারি না যে ১৯৮৩ সালে মার্কস-এর মৃত্যুর পর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনি "The Other Way" নামক তার নিজস্ব পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন রামমনোহর লোহিয়া লিখিত এক প্রবন্ধ যার প্রতিপাদ্য ছিল যে কম্যুনিজম হল "এশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের এক চক্রান্ত মাত্র"!

আবার বলি প্রথম দিকে মার্কস-এঙ্গেলস ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশা ভরসা গড়ে তুলেছিলেন পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলিতে মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থানের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু একেবারে প্রথম থেকেই তাদের বিশ্ববোধ ছিল অগাধ ও অটুট। আয়র্লন্ড থেকে চীন, ভারতবর্ষ থেকে আলজিরিয়া, রুশ দেশ থেকে আমেরিকা, সর্বত্র বিস্তারী ছিল তাদের দৃষ্টি আর সেদিনের সাম্রাজ্যলাঞ্ছিত দেশের মানুষের প্রতি আস্থা আর অনুরাগ। ১৮৫৩ সালে ভারত বিষয়ক মার্কস-এর রচনা অমূল্য হয়ে রয়েছে; ১৮৫৭ সালে ইংরেজ যাকে "সাময়িক মিউটিনি" বলে প্রচার করছিল সেই সিপাহীদের অভ্যুত্থানকে "জাতীয় বিদ্রোহ" বলতে মার্কসের আটকায়নি; আমাদের ইতিহাসে কলঙ্কময় অধ্যায়ের তীব্র সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা আর সংবেদনশীলতা; ১৮৭২ সালে কলকাতায় মার্কস প্রতিষ্ঠিত প্রথম

ইন্টারন্যাশনালে কলকাতা থেকে শাখা স্থাপন প্রস্তাবে মার্কস সাড়া দিয়ে জানান যে স্থানীয় মানুষদের নিয়েই যেন আন্দোলন গড়ে ওঠে; ১৮৮২ সালে যখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সিভিলিয়ান হিউম সাহেব সারা দেশ থেকে পাঠানো ত্রিশ হাজার গোয়েন্দা রিপোর্ট পড়ে ইংরেজ শাসনের বিপদে আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন তখনই মার্কস-এঙ্গেলস-এর পত্রালাপে দেখি ভারতবর্ষে "বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা" নিয়ে তাদের আনন্দ। এ সবের পিছনে ছিল এক ধারণা যা ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে মার্কস-এঙ্গেলস-এর পত্রাবলীতে প্রকাশ হয়েছিল। বিপ্লব যদি শুধু আসে পৃথিবীর "এই ছোট্ট প্রান্তে, যা হল ইউরোপ" ("This little corner")) আর বাকি দুনিয়ায় পুঁজিশাহী পরাক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে সে বিপ্লব সহজেই "চূর্ণ" হতে পারে—এই ছিল দুই মহারথীর দুশ্চিন্তা। এরই প্রতিধ্বনি বারবার মিলবে লেনিনের চিন্তা আর কর্মে—পূর্ব জগৎকে বিপ্লবের আসরে টেনে আনার একান্ত দায়িত্ব তাদের আন্তর্জাতিকতাকে ভাস্বর করে রেখেছিল। মার্কস তো সর্বদাই বলতেন যে পুঁজিশাহী একটা দুনিয়া জোড়া শক্তি আর তাকে পরাস্ত করতে হলে গোটা জগতের নির্জিত মানুষকে গর্জন করে উঠতে হবে। সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে।

৫

সম্প্রতি আজীবন দেশব্রতী শ্রদ্ধেয় পান্নালাল দাশগুপ্ত কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে আলোচনায় জানিয়েছেন যে গ্রামের মানুষ আর কৃষকদের ভূমিকার ব্যাপারে মার্কস অনীহাগ্রস্ত ছিলেন। সন্দেহ নেই যে বুর্জোয়া বিধানে শহরবাসী শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে মার্কস চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে কারখানার মজদুরদের উপর আস্থা অনেক বেশি রেখেছিলেন। পল্লীজীবনে নিয়তির উপর ভরসা মানুষের মনকে সহজে দখল করে। কৃষিকর্মে তুলনামূলকভাবে একাকিত্ব এবং প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর ভরসার অনুভূতিও প্রবল হয়। মনে হয় এজন্যই মার্কস-এর বিবেচনায় 'urban proletariat'-কে বিপ্লবপ্রহরণে 'ব্রহ্মাস্ত্র' ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এটাও নিঃসন্দেহ যে গ্রামের গরীবদের ভূমিকা মার্ক্স-এর চোখে একটুও কম ছিল না। ১৮৭০ দশকের রচনায় দেখি তিনি অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে শ্রমিক যদি কৃষকদের সঙ্গে একত্র না হয়ে 'একা' গান ('solo') ধরে আর কৃষকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'দ্বৈত' সঙ্গীত ('duet') না করে, তাহলে সেটাই হবে শেষ গান, জীবন থেকে বিদায় নেবার গান ("swan song")! বহুস্থলে মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনায়, "The Peasant Question" প্রধান স্থান পেয়েছে। নিজস্ব ভঙ্গিতে মার্কস বলেছেন জার্মানীতে 'বিপ্লব' সফল হবে না যদি তার সঙ্গে "কৃষক বিদ্রোহের এক নতুন সংস্করণ" যুক্ত না হয়। পান্নাবাবু 'বিপ্লবী' কম্যুনিস্ট পার্টিতে ছিলেন, নীতিনিষ্ঠার গুণে তিনি প্রণম্য; হয়তো একটু ভুল করলেন মার্কসবাদ বিষয়ে এই আপত্তি জানিয়ে।

একান্ত শুভবুদ্ধি নিয়েই পান্নাবাবু আমাদের মতো দেশে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর চিন্তার সঙ্গে মার্কসবাদী প্রয়াসকে সম্মিলিত করার কথা উত্থাপন করেছেন। অনেকে বিচলিত ও বিরক্ত হলেও আমার মনেও এই প্রসঙ্গ প্রায়ই ঘোরাফেরা করে। মহাত্মা গান্ধীকে 'বিপ্লবী' বলা নির্বুদ্ধিতা; "বিপ্লবী আর রক্তাক্ত সর্বনাশ"-এর ("revolution and red ruin") নিন্দা তাঁর কাছ থেকে এসেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এসেছে জওহরলাল নেহেরুকে লেখা (১ এপ্রিল

১৯২৮) চিঠিতে স্বীকারোক্তি; "আমি তোমার সঙ্গে একমত যে একদিন না একদিন আমাদের আন্দোলন করতে হবে ধনীদের সরিয়ে রেখে আর বাক্যবাগীশ শিক্ষিতদের বাদ দিয়ে।" সে সময় অবশ্য গান্ধীজীর বিচারে আসে নি, ১৯২১-এ, ১৯৩০-৩২-এ, ১৯৪৫-৪৬এ। সর্বদাই তিনি রাশ টেনে রেখেছেন; অহিংসা নীতির অনুসরণে তাঁরই দেশবাসীকে দেওয়া "অভয়" মন্ত্রকে লুকিয়ে রেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন "মিটমাটের সৌন্দর্যে" ("the beauty of compromise")। কিন্তু তিনিই ১৯২২ সালে আদালতে বিবৃতি দিয়ে যে কথা বলেন তা আজও স্মরণ করলে শিহরিত হয়ে হয় : "The miserable little comforts of the town dwellers in India represent the borkerage they get for the work they do for the foreign exploiter, the profits and the brokerage being sucked form the masses"। অনুবাদ না হয় না-ই করলাম, কিন্তু আজ আবার বিশ্ব সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে "Subsidiary Alliance" ("জো হুকুম বন্ধুতা") করেছে আমাদের দেশ, যাতে নতুন 'অর্থনীতির' কল্যাণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিস্তার ঘটেছে, বিলাসিতা বেড়েছে, সমাজবাদ-সাম্যবাদের আশংকাকে প্রায় হঠিয়ে ফেলার আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এখনও ধনীর ধন বাড়ছে, গরীবদের দুঃখও বাড়ছে—কিন্তু রাজনীতি শুধু কেন জীবনেরই মোড় যেন ঘুরে গেছে। "Affluence" সবাই বুঝি চাই, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন পর্যন্ত মিলিয়ে যাবার উপক্রম। "এ জীবনে হায়/সেই বেশি চায়/আছে যার ভূরি ভূরি/রাজার হস্ত করে সমস্ত/গরীবের ধন চুরি।" রবীন্দ্রনাথের এই সহজ সরল কথার সত্যতা বুঝতে তো কস্‌রত করতে হয় না।

মার্কস-এর চিন্তা আর কর্মে সম্ভোসর্বস্বতার বিপক্ষে যে বিদ্রোহ জাজ্জ্বল্যমান তার সঙ্গে সাদৃশ্য পুরোপুরি রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর ভারত-চিন্তায়। এদেশের ঐতিহ্যকে বোঝার জন্য 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" একমাত্র কথা অবশ্য নয়; কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধন এখনও আমাদের মন টানে। এজন্যই শুধু একটু আভাস দিতে চাই যে মার্কস কঠোর সমালোচনা করেছেন ধনতন্ত্রকে সমাজ জীবনে মানুষের "প্রয়োজন" ("needs") তুচ্ছ করে "লোভ" ("greed")-এর ওপর প্রাধান্য দিয়ে। "অস্বাভাবিক, আতিশয্য দুষ্ট, জীবনযাপনে অপ্রয়োজন, একেবারে অতিরিক্ত আর কৃত্রিম" আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে মানুষের পক্ষে হানিকর বিলাপপ্রিয়তা বেড়ে ওঠে পুঁজির রাজত্বে—এমন কথা মার্কস-এর কাছ থেকে অনেক পাওয়া গেছে। বর্তমানে এদেশে নতুন অর্থনৈতিক অদলবদলের পরিবেশে যে সম্ভোগসর্বস্বতা আজকের ব্যাপক আর প্রায় যেন অনিবার্য নীতিভ্রংশ ও সর্ববিধ মানব কল্যাণ প্রয়াসে দেশব্যাপী অনীহার সৃষ্টি করেছে, তার বিপক্ষে মার্কসবাদীরাই সংগ্রামে অগ্রণী হতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর মতো যুগন্ধর মহাত্মার চিন্তা থেকেও অনেক কিছু আহরণ করতে পারেন। এ কথাটাকে যেন যান্ত্রিকভাবে না নেওয়া হয়। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর বৌদ্ধ জীবনদর্শন ও মার্কস চিন্তার সাযুজ্য বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। তা থেকে বেশ কিছু ধারণা এভাবের প্রয়াসে সহায়ক হ'য়ে ভারতভূমিতে মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার আত্মীয়তাকে সুদৃঢ় করে তুলতে পারে।

৬

অনেক বাগাড়ম্বর ঘটিয়ে ফেলেছি। উপসংহারে স্মরণ করি কবি রাম বসুর একটি লাইন "আনো এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র!" দেশ আর দুনিয়ার দুর্গতি যে আজ কোন্ পর্যায়ে হাজির হয়েছে তা সবাই জানি। সমাজবাদ-সাম্যবাদের আপাত ব্যর্থতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন চলছে দুনিয়া জুড়ে দুর্নীতির বাদশাহী—আমেরিকা, জাপান, ইতালী থেকে আমাদের মতো প্রাচ্য দেশসহ গোটা পৃথিবীতে ঘটছে 'কেলেঙ্কারির' পর 'কেলেঙ্কারি ('Scam'), নীতি বলে বস্তুটিই যেন উধাও। দৃষ্টান্ত দিতে গেলে একটা নোংরা মহাভারত ফাঁদতে হয়। কে আজ বলবে "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে"? সর্ববিধ দুর্বৃত্তি সয়ে যাওয়াই যেন বর্তমানের রেওয়াজ—কিন্তু এমন দুর্দশা মানুষ সইবে কেমন করে? তাই ভাবি যে এই জঘন্য কলুষিত দুর্বৃত্ত পরিস্থিতিকে মানুষ বেশিদিন মাথা পেতে নিতে পারে না, "তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়" আসবেই।

এই বলে নিশ্চিন্ত অবশ্য হওয়া অসম্ভব। কে বা কারা এবং কবে এগিয়ে এসে হাল ধরবে? তবু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাব না। স্মরণ করব মার্কস-এর উচ্চারণ "এক এক সময় বিশ বৎসর কেটে যায় আর মনে হয় যেন মাত্র একদিন, আর আবার এমন সময়ও আসে যখন কয়েক দিনে বিশ বছরের নির্যাস (essence) লুকিয়ে থাকে।" জনশক্তির অভ্যুদয় ঘটাবার উপাদান তো নির্মিত হয়ে চলেছে, শুধু যথাকালে যথাযথ কর্মের উদ্যোগেই দেখা যাচ্ছে না "এই পতনের দায়ভাগে/আমরা সবাই সমান অংশীদার'—রাজনীতিক্ষেত্রে বহুকাল বিরাজ করেছি বলে আমারও উত্তরদায়িত্ব একেবারে হয়তো অকিঞ্চিৎকর নয়। তাই দুঃখ হয়, যন্ত্রণাবোধ করি আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দ্বিধা ত্রিধা বহুধা বিভক্তির ফলে যে ব্যর্থতা এসেছে তার কামড়ে।

এখনও আদি কম্যুনিস্ট পার্টিতে আমার অবস্থান, যদিও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি সমর্থন আমরা মনের দিক থেকে বেশি। 'নকশালবাদী' নামে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের উদ্দীপনা ও ঐকান্তিকতার সুফল থেকে দেশ যে আজও বঞ্চিত হয়ে রইল সেজন্য প্রধান কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির দায়িত্ব মানতেই হবে। "মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ/ন চ ধূমায়িতং চিরং" ভেবে যারা বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই জীবন্মৃত দেশে সাহস সংগঠন ও শৌর্যের প্রাণবায়ু ফিরিয়ে আনার উন্মাদনা এনেছিল, তাদের কোল দেবার জন্য কেন যে ছুটে আসার মতো দরাজ রাজনীতির স্পর্শ দেশবাসী পেল না, তা বোঝা সহজ নয়। সন্দেহ নেই যে, তত্ত্ব বিষয়ে অনীহা, শ্রেণীসংগ্রামের অকাট্য উপস্থিতিকে এড়িয়ে যাবার মনোবৃত্তি, বিপ্লবী আবেগের অন্তর্ধান, প্রশাসন দখলের প্রলোভন, সংসদীয় মায়ায় জড়িয়ে পড়া, পঞ্চায়েৎ থেকে পার্লামেন্ট হরেকরকম নির্বাচন নিয়ে মেতে থেকে "জনতার মুখরিত সখ্য"-কে বিপ্লবী প্রস্তুতির পথে না নিয়ে "প্র্যাগম্যাটিক' কায়দায় আশু কয়েকটি সমস্যা নিয়ে বাগাড়ম্বর এবং প্রায় অনিবার্য ফলস্বরূপ 'rally' অনুষ্ঠানে অদ্ভুত সাফল্য আর সঙ্গে সঙ্গে 'revolution'-এর প্রস্তুতিতে জনসংগঠন ও সংগ্রাম মানসিকতা হারিয়ে ফেলা—এবম্বিধ বহু দুর্ঘটনারই সবাই সাক্ষী। কথাটা কটূভাবে বল ফেললাম কিন্তু উপায়ান্তর নেই।

তবু জানি কালচক্র ঘুরবেই। মার্কস যাকে বলেছিলেন "ইতিহাসের চাতুরী" ("History's cunning), তাও কিছু হয়তো লুকিয়ে রয়েছে! ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে প্রবাসকালে লেনিন "The Lessons of 1905" শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন "পুরোনো প্রজন্মের আমরা হয়তো আসন্ন বিপ্লবের চরম লড়াইগুলো দেখতে পাব না।" অথচ বস্তুত এপ্রিলে জারশাসনের পতন ঘটল আর নভেম্বরে সোভিয়েত বিপ্লব! ১৯৮৭ থেকে ২০০৭, এই কুড়ি বছরের দুঃসময় শেষ হলে কে জানে মার্কস কথিত "একই দিনে কুড়ি বছরের সঞ্চিত নির্যাস"-রূপে নতুন বিপ্লব হয়তো ঘটবে জগৎ জুড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বিশ্বায়নী অর্থনীতির চণ্ডমূর্তি আর সমুন্নত দেশগুলির সমস্যাকণ্টর্কিত চেহারা ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। জনশক্তির নবজাগৃতির প্রস্তুতি সে অনুপাতে তেমন দেখছি না বলেই কষ্ট। বার্লিন থেকে উলানবাটর, লেনিনগ্রাদ থেকে লিবিয়া, বহুদেশে দোষে গুণে জায়মান সমাজতন্ত্র দেখে মনে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলেও শেলীর ভাষায় চাইব "To hope till Hope creates/ From its own wreck the thing it contemplates"। কিন্তু ইতিহাস তো কারও ইচ্ছাপূরণের (wish-fulfilment) দায়িত্ব রাখে না। দায়িত্ব রয়েছে আমাদেরই জনশক্তির ওপর। আপনারা বিদ্বজন, যে যেভাবে পারেন শোষণমুক্ত জীবন-আবাহনে লিপ্ত থাকুন।

দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট আয়োজিত কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার-এর উদ্বোধনী ভাষণ।

"হিন্দু-মুসলমান-কী জয়!"

দেশের নানা অঞ্চলে যখন বেশ কিছুকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আগুন জ্বলছে, কাশ্মীরের মতো এলাকা যখন বিস্ফোরক অবস্থায় রয়েছে, 'রামজন্মভূমি'-বাব্‌রি মসজিদ বিতর্ক নিয়ে বিষময় বিপদের আশঙ্কা দূর হবার লক্ষণ যখন নেই, বাক্‌স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে যখন দাপটের সঙ্গে উগ্র হিন্দু ঘোষণা চলছে যে, অযোধ্যার মতো মথুরা এবং বারাণসীতেও বিধর্মীদের হটিয়ে মন্দির বানানো হবে, ভারতীয় জনতা পার্টির মতো অধুনা শক্তিশালী সংগঠন যখন অবলীলাক্রমে বলে চলেছে যে মুসলমান এদেশে বহিরাগত বলে হিন্দু পরম্পরার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে না পারলে তার নাগরিক অধিকার ভারতরাষ্ট্রে স্বীকৃত হবে না, যখন ভাগলপুরের মতো অঞ্চলে একেবারে অভাবনীয় ধরনের সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা শুধু নয়, অন্য বহু স্থানে বার-বার সংখ্যাল্প মুসলমান আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে, এমনকী খাস রাজধানী দিল্লীতেই হজরত নিজামউদ্দীন দরগার মতো সকল ধর্মাবলম্বীরই আদৃত তীর্থস্থান পর্যন্ত এই কলুষ থেকে নিস্তার পায় নি। "হিন্দু-মুসলমান-কী জয়" উচ্চারণ কি বিদ্রূপ না পরিহাস না নিছক ভাবাবেগী নির্বুদ্ধিতা?

সন্দেহ নেই যে, সম্প্রতি জগৎ জুড়ে এমন অনেক বিচিত্র আর আপাতদৃষ্টিতে বিকট বিপর্যয়কর ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে আর সমাজশৃঙ্খলার জন্য প্রশংসিত সোশালিস্ট দুনিয়াতেও মারাত্মক ওলটপালটের লক্ষণ প্রকট হয়েছে যে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোকে মহাপাপ বলে জীবনান্তের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ঋষিকণ্ঠোক্ত সতর্কবাণীর আশ্রয় ছাড়া যেন উপায়ান্তর নেই। আজকের পরিস্থিতি মাঝে-মাঝে এমন কটু আর কুৎসিত বীভৎসার আকার নিয়ে চলেছে যে নৈরাশ্য দেখা দিলে আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মনের গভীরে প্রচণ্ড প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে শুভবুদ্ধির যে বিপুল সঞ্চয় আছে তা স্মরণে রাখলে নৈরাশ্য পরাভূত হতে বাধ্য।

হয়তো ভাববাদী বিভ্রমের অভিযোগ শুনতে হবে কিন্তু মনে পড়ছে 'The Indian Musalmans'-শীর্ষক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের রচয়িতা মনস্বী মুহম্মদ মুজীব-এর একটি কথা। পাটনার নিকটবর্তী একটি ছোটো শহরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মর্মান্তিক মালিন্য তাঁর মন থেকে মুছে গিয়েছিল যখন তিনি দেখেন কয়েকজন হিন্দু মেয়েকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জলের কলসি নিয়ে গঙ্গাকূলে অবস্থিত 'সূফী' ধর্মস্থান প্রদক্ষিণ করতে। মনে পড়ে যাচ্ছে সত্তর বৎসরেরও বেশি আগের খবর সংবাদপত্রমাধ্যমে জেনে সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগে হতাহতদের মধ্যে পড়ে থাকা মুসলিম কিশোর তৃষ্ণায় জর্জর হয়েও বলে উঠেছিল 'একটু জল! না, দাও আমার পার্শ্ববর্তীকে, আমি চলি, হিন্দু-মুসলমান কী জয়!'

পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটছি বলে উন্নাসিক ভর্ৎসনাকে না হয় উপেক্ষা করে গান্ধীজীর অবিস্মরণীয় সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইনডিয়া' (৮ সেপ্টেম্বরের ১৯২০) থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া

যাক। মাদ্রাজ সফরের সময় বিজয়ওয়াড়াতে সভায় শ্রোতাদের বলেছিলেন যে, ব্যক্তির বদলে আদর্শের জয়গান সমুচিত আর তাই "মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়", "মহম্মদ আলী-শৌকৎ আলী কী জয়"-এর বদলে ধ্বনি উঠুক "হিন্দু-মুসলমান কী জয়।" আমার পর বলতে উঠে ভাই শৌকৎ আলী একেবারে সোজাসুজি বললেন যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সত্ত্বেও তিনি লক্ষ করেছেন যে হিন্দুরা 'বন্দেমাতরম্' বললেই পাল্লা দিয়ে মুসলমানরা বলে উঠেন 'আল্লা- হো-আকবর' কিংবা এর উলটোটা ঘটে, যা কানে খারাপ লাগে আর ভয় হয় যে দেশের মানুষ ঠিক এক হতে পারে নি। এজন্যই তাঁর সুপারিশ হল যে সর্বত্র স্বীকৃত হোক তিনটি "আওয়া"— প্রথমে 'আল্লাহ্-হো-আকবর' যা হিন্দু-মুসলমান সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করবেন, 'ঈশ্বর মহান' বলতে কারও আপত্তি যখন নেই; দ্বিতীয় ধ্বনি হবে 'বন্দেমাতরম্' কিংবা 'ভারতমাতা' কী জয়'; আর তৃতীয়টি হবে 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়' (যা বিনা লড়াইয়ে জয় সম্ভব নয়)। আমি [গান্ধীজী] মওলানা সাহেবের প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিচ্ছি। ...শুধু 'ভারতমাতা কী জয়'-এর বদলে পছন্দ করি 'বন্দেমাতরম্', কারণ তা হবে গোটা দেশের পক্ষে বাঙলার বিদ্যাবুদ্ধি ও আবেগগত উৎকর্ষের মনোরম স্বীকৃতি। ...হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য বিনা সবই অসার্থক আর তাই "হিন্দু-মুসলমান কী জয়" এমন ধ্বনি যা আমরা যেন কখনও না ভুলি।'

বিদগ্ধ বিচারে গান্ধীজীর এই বিবৃতিতে হয়তো অনেক গলদ ধরা পড়বে। মজা করে বলা যেতে পারে যে, মহাত্মা হলেও রাজনীতি ব্যাপারে চাতুর্যেরও অধিকারী গান্ধীজী বাঙলাকে একটু তুষ্ট করারও চেষ্টা করেছিলেন! শুধু আওয়াজ তুলে, আবেগের কুহেলিকা তৈরি করে বাস্তব সমস্যার সমাধান অবশ্য ঘটে নি, কিন্তু সেদিনের উন্মাদনা যাদের স্মরণে আছে, অন্তত কিছুকাল স্বাধীনতার সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব ঐক্যের মনমাতানো সেই আস্বাদ যারা কখনও ভুলবে না, তারা জানে যে বাস্তবিকই তখন এমন এক সুযোগ এসেছিল যা (গান্ধীজীরই ভাষায়) আগামী একশো বছরে আসবে কিনা সন্দেহ। এখানে সম্ভব নয় সংক্ষেপে সেই ইতিহাস বিবৃত করা যা চোখে আঙুল খুঁচিয়ে দেখিয়ে দিল আমাদেরই নিজস্ব বহু প্রজন্মপুষ্ট দুর্বলতা যা কিছুতেই ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের কুটিল দুর্বৃত্ত ভেদনীতির প্রবল প্রয়োগকে পরাজিত করতে পারল না, আর শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের মতো মারাত্মক মূল্য দিয়ে কিনতে হল খণ্ডিত স্বাধীনতা, যে-মূল্য আজও সুদে-আসলে পরিশোধ সম্পূর্ণ হয়নি, যেজন্যই কাশ্মীর জ্বলতে থাকে, পঞ্জাবে বিকট অশান্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসে, আর দেশ জুড়ে সংহতিভঙ্গের নোংরা আবহাওয়া কাটানো যায় না। ১৯৩০ সালে মওলানা মুহম্মদ আলী লন্ডনে গোলটেবিল সম্মেলনে পরম দুঃখেই বলেন 'আমরা নিজেরা ভাগাভাগি করছি আর তোমার শাসন করছ' ('We divide and you rule')। এ যে কত মর্মন্তুদ উক্তি তা এযুগের অনেকেই হয়তো বুঝবেন না।

হাল ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ অন্ধকারের মধ্যে আলোকের দীপ্তি এখনও দেখা যায়। যেখানে জনশক্তি একটু জাগ্রত সেখানেই 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে' প্রস্তুতিও রয়েছে। রামজন্মভূমি নিয়ে উত্তেজনা যে এলাকায় চরমে উঠেছিল সেই অযোধ্যারই ফৈজাবাদ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস দলের অশুভ সংযোগ

সত্ত্বেও বিপুল ভোটে লোভসভায় নির্বাচিত হলেন সি. পি. আই. প্রার্থী মিত্রসেন যাদব। কানপুরের মতো যেখানে হিন্দু-সংকীর্ণতার ঢেউ ছিল প্রবল, সেখানেও সি. পি. আই. (এম) -এর পক্ষ থেকে লোকসভায় গেলেন সুভাষিণী আলি। বিহারে যখন রাজনীতিওয়ালাদের অবিশ্বাস্য দায়িত্বহীন আর দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে ভাগলপুরে নৃংশস অচিন্ত্যনীয় পৈশাচিকতার তাণ্ডব চলেছিল, তখনই ধানবাদের মতো দুর্বৃত্ত-শাসিত বলে কুখ্যাত এলাকা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন কমিউনিস্টমতাবলম্বী এ. কে. রায়ের মতো নির্বিত্ত অথচ জনপ্রিয় কর্মী। অতিবর্ষণের মধ্যে রামধনুর স্বর্ণ আবির্ভাবের মতো হল এ-ধরনের ঘটনা। মনে পড়ছে কিছুকাল আগে মীরাট-মালিয়ানার বীভৎস দাঙ্গার মধ্যে ছোট্টো একটা খবর যাকে খবরের কাগজ স্থান দেবার যোগ্য মনে করে নি' (দেখেছিলাম স্বেচ্ছায় রক্তদান-সমিতির এক বিবরণে)—সাংঘাতিক জখম এক হিন্দুর প্রাণ বেঁচেছিল মুসলমান চিকিৎসকের নিজের (এক বিরল শ্রেণীর) রক্তদানের ফলে। আজ যার "হিন্দুত্ব"-র দর্প নিয়ে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে আর ভ্রূক্ষেপ না করে দেশের শান্তি শুধু নয়,—তার সত্তা তার মর্যাদা আর স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেবার মতো মূঢ়তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে, তারা হয়তো জানে না বা জানতে চায় না যে স্বাধীন ভারতে প্রথম "মহাবীরচক্র" পেয়েছিলেন বিগ্রেডিয়র মুহম্মদ উসমান (যাঁর ভাই প্রয়াত সাংবাদিক সুভান ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু)—তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধে। ক-জনই বা জানেন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংঘর্ষকালে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ দেন হাবিলদাল আবদুল হামিদ খান, মরণোত্তর সম্মান দেশ জানিয়েছিল তাঁর স্মৃতিতে "পরমবীরচক্র" উৎসর্গ করে। আমাদের এদেশে যে একইভাবে হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি-পুণ্যভূমি—বলেন নি কি মওলানা আবুল কালাম আজাদ যে দেশ ভাগ হয়েছে ভূগোলে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তো নয়? বলেন নি ১৯৪০ সালের সভায় পাকিস্তান-বিষয়ক বিতর্কে কলকাতার তৎকালীন মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দীকি (যাঁর কথা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে স্বকর্ণে শুনেছিলাম বলে আজও যেন শুনতে পাই) যে রাষ্ট্রের সীমানার অদলবদল ঘটলেও এদেশ তো হিন্দু-মুসলমান সকলের, আর এটাকেই ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে বলেছিলেন যে মৃত্যুর পর হিন্দুর শবদেহ ভস্ম হয়ে নদীর জল বেয়ে কোথায় যায় কে জানে, কিন্তু মুসলীম তার মৃত্যুর পরও চায় এদেশেরই জমিতে একটু স্থান, শুধু জীবনে নয় মরণেও মুসলিমের দেশ হল এই ভারতবর্ষ।

এর পিছনে যদি কেউ শুধু আবেগ আর উচ্ছ্বাস আর বাক্‌সর্বস্বতা খুঁজে খুশি হন তো নাচার। কিন্তু ভাবি শান্তিনিকেতন-খ্যাত প্রয়াত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর "হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা" ও অন্যান্য রচনা তথ্যসম্ভার-সুরভিত হয়ে কত জ্ঞান আর অফুরন্ত আনন্দ বিতরণ করার ক্ষমতা রাখে! একেবারে সদ্য-প্রকাশিত "মানবতা ও গণমুক্তি"-র মতো গ্রন্থে এবং অন্যত্র বাঙালির সাহিত্যে ও জীবনে বিবর্তনধারার গভীর বিশ্লেষক, বাংলাদেশের প্রমুখ মনস্বী আহমদ শরীফ সমাজসৃষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের সহজ সুস্থ স্বাভাবিক সাযুজ্য বিষয়ে মহার্ঘ অন্তরদৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুসলমান তো এদেশে বহিরাগত নয়।

তারা তো প্রায় সবাই এদেশেরই প্রাচীন সমাজশাসনে নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষ যারা ধর্মভাষাজাতি-নির্বিশেষে যুগ-যুগ ধরে নির্জিত হয়ে এসেছে। এজন্যই তো দেখি পৈশাচিক অত্যাচার শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, হিন্দু সমাজের একেবারে নীচের তলায় যারা পিষ্ট রিক্ত অমানবিক জীবনযাপনে বংশানুক্রমে বাধ্য হয়েছে তাদেরও সইতে হচ্ছে শক্তিমান গোষ্ঠীগুলির দৌরাত্ম্য। জাতিধর্মভাষা-নির্বিশেষে 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' বাক্যটি কবে যে সর্বদেশে সত্য হয়ে উঠতে শুরু করবে তা জানি না কেউ, কিন্তু এজন্য যে লড়াই তার চেয়ে সার্থক প্রয়াস তো নেই। এই প্রয়াসেরই অংশীভূত হওয়ার চেয়ে সুকর্ম আর কী আছে?

বাঙালি আমরা বিশেষ করে এখনও সবাই পারি নি অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করতে যে আমাদের জীবনে আর ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান একত্র থেকেই সৃষ্টিশীলতাকে প্রকাশ করতে পেরেছি। স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় মাতৃভাষার প্রতি বহুগুণ বিপুল ভার গভীর মমতা দেখি না কি বাঙালি মুসলমানের মনে? ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দল স্মৃতিশাস্ত্র চর্চায় ব্যস্ত থেকে যখন বিধান দেয় যে দেবভাষা সংস্কৃত ছেড়ে অপোগণ্ড বাঙালির মাতৃভাষায় রচনায় প্রবৃত্তস্থলে রৌরব-নরকপ্রাপ্তি অনিবার্য তখন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খানের মতো মুসলিম শাসকের সুবুদ্ধি ও উৎসাহ বিনা মধ্যযুগীয় বাঙালির নিজস্ব সাহিত্য বলতে কিছু থাকত মনে হয় না। এ নিয়ে কথা বাড়ানোর দরকার নেই, কিন্তু কজন আমরা জানি যে চণ্ডীদাস যেমন লেখেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই,' তেমনই পরবর্তী যুগে কাজী দৌলতের মুখে শুনি; 'নর সে পরম দেব/নর সে ঈশ্বর/নর বিনা ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর'? কজনের মনে আসে 'রামচরিতমানস'-এর স্রষ্টা মহাত্মা তুলসীদাসেরই সমসাময়িক বিরাট লেখক মালিক মুহম্মদ জৈসি-কৃত "পদ্মবত"-এর কথা যাকে অবলম্বন করে বাঙালি মহাকবি আলাওল লেখেন "পদ্মাবতী" (সঙ্গে-সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-সমেত অন্যান্য বহু বিষয়ে আলাওলের আটকায় নি)?

রাজসভাকবি এবং সর্ব অর্থে বিদেশাগত বলে অভিজাত জীবনে আশ্রয় নেওয়া যাঁর পক্ষে সহজ ও সঙ্গত হত, সেই আমির খসরু-র মতো বিস্ময়কর সর্ববিদ্যাপারঙ্গত প্রতিভা সাতশো বছরেরও বেশি আগে এদেশের মানুষ যেভাবে বনে গিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর নিশ্চয়ই কিন্তু ভারত-ইতিহাসের 'যজ্ঞশালায়" এ ঘটনা জাজ্বল্যমান নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই সুসমঞ্জস। হজরত নিজামউদ্দীন আইলিয়ার শিষ্য ছিলেন এই মহাকবি-সাংগীতিক-রূপস্রষ্টা। নিজামউদ্দীন-প্রতিষ্ঠিত দরগার এক প্রধান বুঝি বলতে সংকোচ করেন নি যে 'হিন্দোস্তানকো দো পয়গম্বর, রাম আওর কৃষ্ণ'। আমির খসরু তো সানন্দে বলতেন তিনি 'তুর্ক' নন, তিনি 'হিন্দিভি'! 'ভারতীয় তুর্ক' তাই বলতেন যে এদেশ গরম নিশ্চয়ই, কিন্তু কারণটা কি কেউ জানে? সূর্য যে ভালোবাসে এই দেশকে! আর এখানকার ফুল! যেমন তার রঙ তেমনই তার গন্ধ, আরবের ফুল তার ধারে-কাছে আসে না। সাহিত্য-সংগীত-শিল্পকলার সর্ব বিভাগে বিপুল গুণধর এই মানুষটিকে হিন্দি ভাষার একজন স্রষ্টা বললে ভুল হয় না। আর খিল্‌জি রাজবংশের সভাকবি হয়েও তাঁর লিখতে আটকায় নি যে, 'বঞ্চিত দরিদ্রের অশ্রুজল জমাট হয়ে তৈরী হয়েচে মুক্তা যা কিন্তু শোভা পায় ধনীর কণ্ঠে।' আজও হয়তো পান-খেকো বাঙালি

খুশি হবে এই বিরাট প্রতিভার মুখে খাওয়ার পর পানের মতো অপরূপ বস্তু চিবানোর মহিমা কীর্তিত হতে শুনে?

মুসলমান এদেশে রাজ্যজয়ে আসার বহু পূর্বে মুসলমান সাধকেরা আসেন, দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে তাঁরা পীঠ স্থাপন করেন যা আজ রয়েছে। হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে ভক্তের দল যেখানে প্রণতি জানায়। যেমন নানকদের ("হিন্দুকা গুরু, মুসলমানকা পীর"), তেমনই বাবা ফরীদ-এর মতো মুসলমান সাধুকে বলা যায় পঞ্জাবি (এবং সিন্ধি) ভাষার জনক। ওই দুই ভাষায় আর-এক স্রষ্টা ছিলেন শাহ আবদুল লতীফ। ভাষাভেদবুদ্ধি যখন প্রকট হয় নি তখন লেখা হয় আলী হায়দর এবং তার চেয়েও বিখ্যাত ওয়ারিস শাহ-র "হীর-রঞ্ঝা"-র মতো প্রেমগাথা যা সারা উত্তর ভারতের হৃদয় জয় করে রেখেছে আজও। কাশ্মীরে (বর্তমানে সংকট সত্ত্বেও) হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে যে সৌহার্দ্য যুগ-যুগ ধরে দেখা দিয়েছে তাতে সহায় হয়েছিলেন "কাশ্মীরের আকবর" নামে খ্যাত নরপতি জৈনুল আবেদিন। আকবর বাদশাহ শুধু যে 'দীন ইলাহী' প্রবর্তনচেষ্টার দুঃসাহসে নেমেছিলেন তা নয়, তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে তৎকালীন জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের রামায়ণ-মহাভারতের বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে ডেকেছিলেন, যা "আকবরনামা"-র অন্তর্ভুক্ত হয়তো হয়েছিল, কিন্তু যতদূর জানি তার সন্ধান পাওয়া যাবে ব্রিটেনে (অস্ত্রপ্রদেশের জয়পুর-মহারাজের প্রাসাদে বুঝি এককালে সেগুলি ছিল)। অনেকেই অবশ্য জানি কিন্তু তাৎপর্য বুঝি না যে, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারু শিকোহ এদেশের সর্বশাস্ত্রমন্থনের ব্রত নিয়েছিলেন, "সত্যস্য সত্যং" বলে বলে যার বানা সেই পাকিস্তান, বাংলাদেশে, নেপাল, ভূটান, বার্মা (তার নতুন নাম যাই হোক) সিংহল প্রভৃতি নিয়ে একটা মৈত্রীক্ষেত্র সৃষ্টি এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয় আদত তো নয়-ই? আজ ও আগামী কালের হিসাব নয় কিন্তু কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি (এবং হ্যাঁ, কল্পনাও) নিয়ে এই সহমর্মী সহযোগী সাহচর্য-ক্ষেত্র নির্মাণে ভারতবর্ষ সক্রিয় ভূমিকায় নামতে পারে না, অবিলম্বে সার্থকতার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেই?

'চতুরঙ্গ' মাসিক পত্রিকা, জুন ১৯৯০

"প্রাণের ভুবন করো পূর্ণ"

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্মরণে)

সমাজবাদ-সাম্যবাদের দিন ফুরিয়ে গিয়েছে আর সোভিয়েট বিপ্লবের (১৯১৭) স্মৃতিকে পর্যন্ত মুছে ফেলে 'মুক্ত' দুনিয়াজোড়া পুঁজিবাদ জগৎ জয় করেছে বলে চতুর চকমপ্রদ প্রচার, প্রায় বছর দশেক ধরে চলেছে। আমাদের দেশ সমতে সর্বত্র সম্প্রতি সেই ধনতন্ত্রের ফাটল ফুটে উঠতে থাকা সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট মহলে কেমন যেন 'অপ্রতিভ' ভাব আর তাই কেবলই শুনতে হয় একটু বাড়াবাড়ি ধরনের 'ভুল করেছি' 'ভুল করেছি' বলে চলার রেওয়াজ। বিপ্লবের মূলনীতিতে বিশ্বাস যেন শিথিল হয়েছে। কম্যুনিস্ট তত্ত্বের ওপর আস্থায় রীতিমতো ঘাট্‌তির লক্ষণও মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠছে। আমাদের এবং অন্যান্য সব দেশেরই জনতার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তাই কতকটা যেন হাল ছেড়ে দেওয়ার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গিয়েছে। কিন্তু এটাই আজকের মূল বাস্তব নয়। দেশে দেশে, পূর্বে ও পশ্চিমে, মানুষের জয়যাত্রা সম্প্রতি কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হলেও যে অপ্রতিরোধ্য তার প্রমাণ মিলছে। সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্র যে কত বিরাট আর বিকট প্রবঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আর্থিক বিপর্যয়ে। যাকে বলা হয় 'crony capitalism' তার নোংরামিতে, ভারতের মতো দেশেও শেয়ার বাজারে ক্রমান্বিত কেলেঙ্কারির ঘৃণ্য চেহারা হাসিল হবার মধ্য দিয়ে। তাই নভেম্বর-এর এই পুণ্য মাসে, আপাত বিচারে পরাস্ত সোভিয়েট বিপ্লবের ৮১-তম বার্ষিকীতেই স্মরণ করতে হবে যে বিপ্লবের পরাজয় নেই, শোষণের কারাগার থেকে গোটা দুনিয়ার মানুষের মুক্তিপথে কোনো বাধাই টিক্‌তে পারে না।

পশ্চিমবাংলার শিক্ষকসমাজের পক্ষ থেকে যখন বিপ্লব বার্ষিকী বিষয়ে লেখার অনুরোধ এল তখন নানা বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা সত্ত্বেও সাড়া না দিয়ে পারছি না। আজই (৪ নভেম্বর) কাগজে পড়ে ভাল লাগল যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা একজোট হয়ে পালন করছে এই বার্ষিকী। আবার বলি 'বিপ্লবের পরাজয় নেই'। ইতালিতে, বিশের দশকে, মুসোলিনির ফ্যাসিজম-এর যখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ, তখন দার্শনিকপ্রবর বেনেদেত্তো ক্রোচে-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে 'গণতন্ত্র' বস্তুটির কি আর ভবিষ্যৎ আছে? মনীষী ক্রোচে-র অবিস্মরণীয় উত্তর এসেছিল "গণতন্ত্র-এর শুধু 'ভবিষ্যৎ' নেই, তার জন্য পড়ে রয়েছে 'অনন্তকাল' (eternity)"। আমরাও প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি যে প্রকৃত জনগণের নবজীবনের সূচক যে সমাজবাদ-সাম্যবাদে গণতন্ত্রের সুপরিণতি, সেই কম্যুনিজম-এর জন্য শুধু ভবিষ্যৎ নয়, অনন্তকাল পড়ে রয়েছে। এখানেই তাৎপর্য মেহনতী মানুষের জগদ্ব্যাপী জয়ধ্বনির 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'।

*

রাশিয়ার জার-এর শাসন যখন অপ্রতিহত, তখন ১৯০৬ সালে সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে 'ইয়োরোপীয় রাশিয়া' অঞ্চলে (যা তুলনায় উন্নত) সকলের শিক্ষালাভের সম্ভাবনা পূর্ণ হতে লাগবে একশো কুড়ি বছল, 'ককেশস্' পার্বত্য অঞ্চল আর সাইবিরিয়াতে লাগবে চারশো ত্রিশ বছর আর যাকে বলা হত তুর্কিস্থান (অর্থাৎ মধ্য এশিয়া) সেখানে লাগবে চার হাজার ছয়শত বছর। সরকারি বিবরণেই একটু রং দেবার জন্য লেখা হয় যে তাজিকিস্তানে (যা হল আফগানিস্তানের লাগোয়া) সকলে সাক্ষরতা অর্জন করবে ৬৫০০ খ্রিস্টাব্দে, যদি অবশ্য তাজিকরা ততকাল 'বেঁচে বর্তে থাকে। এই যে প্রকাণ্ড এক দেশের হাল ছিল নভেম্বর বিপ্লবের আগে, সেখানে যে কী বিপুল পরিবর্তন এসেছে তা প্রায় কল্পনাতীত। আমরা এদেশে স্বাধীন হয়েও অশিক্ষার অভিশাপ মোচন করতে পারিনি, আর সোভিয়েট বিপ্লবের কল্যাণে অতি দ্রুত যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে তার কথা কারও অজানা নয় (যদিও সে কথাটাই সবাইকে ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত সর্বদা সর্বত্র চলছে)। আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাই ১৯৩০ সালে সোভিয়েট ভ্রমণে গিয়ে বলেছিলেন 'ইতিহাসের মহাযজ্ঞ' সেখানে চলেছে, যে ছিল পঙ্গু সে যেন কোন্ এক বিস্ময়কর প্রভাবে চলৎশক্তি ফিরে পেয়েছে। শিক্ষা—যা হল সুস্থ সভ্য সৎপথী জীবনের ভিত্তি—সেখানে সকলের কাছে সহজলভ্য, দুনিয়াটাকে নতুন করে লড়বার অসমসাহস প্রয়াসে সে দেশ নেমেছে। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেছিলেন সোভিয়েটকে এই বলে "মানুষের মর্মে মর্মে ঢুকে রয়েছে 'লোভ' নামক যে 'মৃত্যুশেল', তাই উৎপাটিত করার একান্ত দুরূহ সংকল্প তোমাদের—তোমরা যেন জয়ী হতে পারো।"

সোভিয়েট আমলের তাকিজিস্তানে আমি নিজে দু'বার গিয়েছি—১৯৪৫ সালে, আবার ১৯৬৯ সালে। সেখানকার রাজধানী স্তালিনবাদে জাতীয় গ্রন্থাগার হল মহাকবি ফির্‌দৌসির নামাঙ্কিত। দেখা হয়েছিল প্রধান গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে—একজন মহিলা যার নাম এখনই মনে আসছে না, যাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে তাজিকদের মধ্যে রুশ ভাষার বিরুদ্ধে মনোভাব আছে কিনা। তিনি বলেন যে তার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু বিপ্লবকালে এবং তার অব্যবহিত পরের সংকটময় সময়ে রাশিয়ান্ মেয়ে কম্যুনিস্টরা তাজিক পরিবারের অন্তঃপুরে বাস করে, মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে, সবাইকে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল আর তাই রুশ জাতির প্রতি তাদের আক্রোশ আর থাকে না, পরস্পর মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই হল বিপ্লবের অমোঘ মহিমা।

ত্রিশের দশকে আইরিশ লেখক Scan O'Casey একবার বলেন যে তিনি দুটো কারণে সোভিয়েটের অনুরাগী : এক হল এই যে সোভিয়েট দেশে আধুনিক ফরাসি ছবির সবচেয়ে সরেস সংগ্রহ আছে, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে জগতের সকল দেশের তুলনায় মেয়েদের এবং শিশুদের কল্যাণব্যস্থা সোভিয়েটে সবচেয়ে ভালো। আমি বহুবার সেভিয়েটে গিয়েছি; কিরঘিজিস্তান ছাড়া আর সাতটি এশিয়ন্ সোভিয়েট রিপাব্‌লিকে গিয়েছে। O'Casey-র মন্তব্য যে কত নির্ভুল তার অজস্র প্রমাণ পেয়েছি।

উজ্‌বেকিস্তানে বহু বৎসর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (পেশায় চিকিৎসক) ইয়াদ্‌গার নাসিরুদ্দীনোভা, যার সঙ্গে একাধিবার আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। সেখানকারই লেখিকা (এদেশে সুপরিচিত)

জুল্‌ফিয়ার সঙ্গে পরিচয়র সৌভাগ্য হয়েছে। দেখেছি নৃত্যপটীয়সী তামারা খানুম আর গালিয়া ইস্‌মাইলোভাকে (এই দ্বিতীয়োক্তা পরিবারের অমতে পালিয়ে গিয়ে নাচতে শিখে দেশজোড়া খ্যাতিলাভ করেছিল)। বেশ মনে পড়ছে একবার আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এক উজবেক মহিলা মন্ত্রী, যিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন যে 'ভাগ্যিস' বিপ্লব হয়েছিল। নইলে তাঁকে হয়তো কোনো জমিদারের তৃতীয়া পত্নী ("third wife of a Bey") হয়ে জীবন কাটাতে হত! কথা বাড়াব না, কিন্তু প্রকৃতই যারা বঞ্চিত, বিপ্লবই তাদের সাম্‌নে মুক্ত জীবনের সম্ভাবনা আনতে পারে।

তুর্কমেনিস্তানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বিবি পালমালোভার সঙ্গে একাধিবার দেখা হয়েছে। সদাহাস্যময়ী এই সুন্দরীর জন্মকথা জেনেছি অপরের বর্ণনা থেকে। চোদ্দজন ভাইবোনের পরিবারে জন্মেছিলেন। কিন্তু এক তিনি ছাড়া আর কেউ বাঁচে নি। কম্যুনিজম্‌-এর জীবনদায়ী শক্তি তাঁর মতো একজনকে বাঁচিয়েছিল, 'মানুষ' করেছিল, নেতৃপদে বসিয়েছিল। আর এক তুর্কমানী মন্ত্রী ছিলেন Dzheren Mamedova, যার এগারোটি ভাইবোনের মধ্যে নয়জনের মৃত্যু হয় শিশুকালে আর একজনকে (বিপ্লবপূর্ব যুগের দুর্দশার জ্বালায়) পিতামাতা পাহাড়ের মাথায় রেখে দিয়ে এসেছিল, মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিয়েছিল।

শুধু যে জার শাসনে একান্ত অত্যাচারিত অঞ্চলে এমন হত, তা নয়। নাম করব না কিন্তু আমি ঘনিষ্ঠভাবে বহু বৎসর জেনেছি একজন রাশিয়ানকে, যে দিল্লিতে সোভিয়েট দূতাবাসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল। অথচ তার জীবনে (১৯১৩ সালে জন্ম) প্রায় আঠারো বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩১ সাল পর্যন্ত, সে কখনও চামড়ার জুতো পরতে পারেনি! বিপ্লব ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই যে সব মুশকিল আসান হয়নি, তার অনেক কারণ, প্রধানত গোটা পুঁজিদারী দুনিয়ার দুর্দান্ত দুষ্‌মনী, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক অবরোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও যেমন "পঙ্গুঃ লংঘয়তি গিরিম" তেমনই সোভিয়েট গড়েছিল তার ইমারত, যা এমনই মজবুত যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণে (১৯৪১-৪৫) তার মাথা নত করেনি। অ্যাটম বোমার হুমকিকেও হটিয়ে দিয়েছিল। Glasgow University থেকে প্রকাশ হত 'Soviet Studies' যাতে অনবরত সোভিয়েটের গালমন্দ থাকত, আর তাতেই দেখেছি ১৯৮৩/৮৪ নাগাদ সময়ে স্বীকারোক্তি যে সোভিয়েটের অগ্রগতিকে বাতিল করা চলে না, তবে কিনা তারা (পাশ্চাত্যের তুলনায়) সবাই দশ ফুট লম্বা না হলেও 'আট ফুট'-এ পৌঁছে গিয়েছে! হয়তো ঠাট্টা শুন্‌ব যে এসব কথা শিকেয় তুলে রাখা হোক্‌, এখন তো তাদের 'বারোটা বেজে গেছে', দুনিয়া এখন পুঁজিবাদের হুকুমে চলবে। জানি আজ এ ধারণাটাই প্রবল আর তারই সুযোগ নিচ্ছে কম্যুনিজম-এর শত্রুরা। কিন্তু 'এক মাঘে শীত শেষ হয়না'—অন্তত ইতিহাস, মাঝে মাঝে পিছু ঠেলা খেলেও এগিয়ে চলে। মানুষ জানে বাঁচতে হলে এগোতে হয় 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'।

*

এ লেখাটা আমার অবিস্মরণীয় সুহৃৎ সহমর্মী সহকর্মী কবি-শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নামে উৎসর্গ করতে চাই। মনে পড়ছে কলকাতায় সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির একটা বড়ো সভা

হবে আর সেজন্য জ্যোতিরিন্দ্র একটা গান লিখবেন। সেটা তিনি লিখলেন আমার উপস্থিতিতে বেনিয়াটোলা লেনে গুপ্ত প্রেসের ভাঙা বাড়ির এককোণে বসে। প্রতিভাধর সঙ্গীতকারের হাত থেকে বেরিয়ে এল প্রাণ মাতানো গান, যা তিনি নিজে তখনই সুর দিলেন ও সন্ধ্যার পর গাইলেন—"এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার"। এখনও মনে বাজছে "উঠেছে যে জীবনের লক্ষ্মী/মৃত্যু সাগর মন্থনে/নূতন জীবন চায় শিল্পীর বরাভয়/নবসৃষ্টির শুভক্ষণে।" "এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে/এসো জনতার মুখরিত সখ্যে" কী অপূর্ব সেই আহ্বান! ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে যে বিপ্লব যথাসময়ে আসে ভগীরথের মতো ঊষর ভূমিতে ভাগীরথীর পুণ্যবারি নিয়ে—বিপ্লবের পরাজয় নেই। মনে পড়ছে ১৯৩৬/৩৭ সালে শিলচরে মস্ত ছাত্রসভা, সেখানে যমজ দুই ভাই গাইল নজরুলের গান : "বলো ভাই মাভৈ মাভৈ/নবযুগ অই এলো ঐ/এলো আজ রক্ত যুগান্তর!" অধৈর্য হয়ে, আশাহত হয়ে, পরাজয় স্বীকার করবে না জনাশক্তি, করবে না মানুষের মন। জ্যোতিরিন্দ্র যেমন চেয়েছিলেন তেমনই দিন আসবে "প্রাণের ভুবন করো পূর্ণ!"

তরী হতে তীর গ্রন্থের তৃতীয় মুদ্রণের মুখবন্ধ

বেশ কিছুকাল ধরে 'তরী হতে তীর'-এর দ্বিতীয় মুদ্রণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় কিছু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তৃতীয় মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্য স্বভাবতই প্রসন্ন বোধ করতে পারা যায়। বস্তুত প্রথম থেকে 'তরী হতে তীর' অপ্রত্যাশিতভাবেই যে পাঠক-সমাদর পেয়েছে, ভিন্ন রুচির বহু সুধীর মনেও যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পেরেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে হয়।

দ্বিতীয় মুদ্রণকালে প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি ভুলক্রমে বাদ পড়ে গিয়েছিল। এতে কিছু ক্ষতি ঘটে। কারণ সংক্ষিপ্ত হলেও সেই ভূমিকার সঙ্গে মূল গ্রন্থের চরিত্র ও উদ্দেশ্যের এক বিশেষ অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ছিল। এবার সেটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদি কেউ সংস্করণগুলি মিলিয়ে দেখার কষ্ট স্বীকার করতে পারেন তো এর তাৎপর্য স্পষ্ট হবে।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট তারিখে দেশবিভাগের মূল্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত মূল রচনায় লেখকের "পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত" শেষ হয়েছিল। বহু সজ্জনের কাছ থেকে অনুরোধ আসে তৎপরবর্তী কাল নিয়ে প্রয়োজন হলে একাধিক খণ্ড যেন লেখা ও প্রকাশ করা হয়। পাঠকদের এই একান্ত সঙ্গত ও সদাশয় ইচ্ছা পূরণে অসামর্থ্য জানাবার জন্যই দ্বিতীয় মুদ্রণে একটি নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধ সংযোজিত হয়েছিল। সেটি এই গ্রন্থেও রয়েছে, যদিও আগ্রহী পাঠকদের তুষ্ট করা হয়তো যাবে না। তৃতীয় মুদ্রণের আবার একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ দেওয়া হবারও কয়েকটি বাড়তি কারণ রয়েছে। এটা শুধু নতুন কিছু ঢুকিয়ে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির অজুহাত নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ৪৭ বছর কেটে গেছে; লেখকের এখনও পঞ্চভূতে প্রত্যাবর্তন যখন ঘটেনি এবং কিছু পরিমাণে সক্রিয়ভাবেই যখন তার অবস্থান, তখন অন্তত গ্রন্থের নামকরণের দিক থেকে রচনাটিকে কতকটা প্রাসঙ্গিক করার দায়িত্ব থেকে যায়। এজন্যই এই গৌরচন্দ্রিকা।

বার্ধক্যের এক অভিশাপ এই যে বহু প্রিয়জনকে হারাতে হয়, পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে অনেককে চলে যেতে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে যা এক্ষেত্রে ঘটেছে, অর্থাৎ স্বদেশে ও সমকালীন বিশ্বে ইতিহাসগত কারণেই সংঘটিত অশুভ, অশুচি, আসুরিক, অবিবেকী দুর্জনপ্রাধান্যের প্রায়-নিঃসঙ্গ ও সহায়হীন দর্শক যদি হতে হয় তো ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয়বিধ যে যন্ত্রণা তার পরিমাপ নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো বাড়িয়ে বলে ফেলছি, কিঞ্চিৎ নাটুকেপনাও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অন্তত সাত-আট বছর ধরে দেশে বিদেশে মানুষের সভ্যতার এক বাস্তবিকই বিকট সংকট ইতিহাসের দেহে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে অথচ কবিকল্পনায় ভুবন জুড়ে কল্যাণ শক্তির যে তেজ তা স্তিমিত বলে বিপর্যয় রোধকল্পে যথাবিহিত চেতনা ও প্রয়াসের লক্ষণও ক্ষীণ। একটু অপ্রতিভ বোধ করলেও স্বীকার না করে পারছি না যে অধুনা প্রায়ই মনে ঘুরছে বহুকাল আগে পড়া শেলীর কবিতা "Out of the day

and night/A joy has taken flight/Fresh spring and summer and winter hoar/ Move my faint heart with grief/But with delight?No more, oh, never more!” সঙ্গে সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থনের দায়েই অবশ্য বলব যে সম্প্রতি সাতাশি বছর অতিক্রম করেও শারীরিক অপটুতাকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে কর্মব্যস্ত রেখেছি। প্রকৃত মার্কসবাদী চরিত্রবলের অধিকারী না হয়েও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা অর্জিত সাম্যবাদী প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হবার কোনো যুক্তি দেখিনি। মনে ঘুরেছে আর এক ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর কথা আর ভেবেছি দুর্দিনেই আমাদের সবাইকে হতে হবে : “One who never turned his back/But marched breast forward/Never doubted clouds would break/ Never felt though night were worsted, wrong would triumph/Held, we fall, to rise/Are baffled, to fight bètter/Sleep, to wake.” “পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা” তো কল্পনা নয়, এ হল ইতিহাসেরই বাস্তব। অধুনা জগতের যে দুর্দশা, স্বার্থমগ্ন নীতিহীনতার প্রাবল্যে জনজীবনে সামগ্রিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের যে চেহারা, আমাদের মতো দেশে বিত্তবান সংখ্যাল্পদের স্বার্থে ছদ্ম-স্বাধীনতার স্বর্ণশৃংখল পরিধানের যে কুটিল প্রস্তুতি এবং তার ফলাফল, এ-সবই মূলগতভাবে সম্ভব হয়েছে সমাজবাদী সোভিয়েট ও অন্যত্র ‘পবিত্র গণতন্ত্র’-এর মুখোশ-পরা প্রতিবিপ্লবী বিপর্যয়ের আনুষঙ্গিকরূপে। আমার কোনো সংশয় নেই যে এই বিপর্যয় সুচতুর শত্রুশক্তির নিরবচ্ছিন্ন ও বহুরূপী আক্রমণ সোশালিস্ট দেশগুলিরই আভ্যন্তরীণ শৈথিল্যপ্রসূত দোষদুর্বলতার সুযোগ নিতে পেরেছিল বলে।

ফিদেল কাস্ত্রো বলতে কুণ্ঠিত হননি যে সোভিয়েট দেশকে “annihilate” (“সংহার”) করা হয়েছে। ১৯৮৭ নভেম্বরে ক্রেমলিন প্রাসাদে বিপ্লববার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে গর্বাচভ্-প্রমুখের কথা শুনে আর তারপর থেকে ১৯৮৮-৮৯-এর বিপ্লববৈরিতার বিচিত্র বাহাদুরীর ‘খেল্’ দেখে কাস্ত্রোর বিচারকে পুরোপুরি ঠিক বলে আমি অনেকদিন ধরে, অনেক চিন্তা ও কর্ম-সহচরের বিরূপতা ও বিদ্রূপ-সত্ত্বেও, মনে করে এসেছি। বড়াই করার জন্য নয়, শুধু ‘তরী হতে তীর’-এ উল্লেখযোগ্য হিসাবে স্মরণ করছি যে ১৯৮৮ সালে “দেশ” পত্রিকায় গর্বাচভ্-দের অভিসন্ধি বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি (তখনও মতলবের চেহারা সুনিপুণ বাক্যজালে লুক্কায়িত বলে ঠিক জাহির হয়নি) আর ১৯৮৯ সালের শেষদিকে কলকাতা ময়দানে ‘সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্’-এর (‘CITU’) সমাবেশে অকুণ্ঠে গর্বাচভকে বর্ণনা করি ‘প্রতিবিপ্লব’-এর নায়করূপে আর আশঙ্কা প্রকাশ করি যে এই দুষ্কর্মের ফলে ইতিহাস হয়তো পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যাবে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আবহে অল্প কিছু সুলক্ষণের সাক্ষাৎ মিলছে, কিন্তু মনের ভার কাটার মতো পরিস্থিতি দেশেবিদেশে দেখছি না আজও।

ইতিহাস অবশ্য চলবে নিজের গতিতে আর অবিরাম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী কর্মধারার অসাফল্যের শাস্তি দেবে। কোনো ব্যক্তির বা দলের বা আন্দোলনের ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা রাখা ইতিহাসের কাজ নয়। তাছাড়া ইতিহাস নামে তো কেউ নেই, রক্তমাংসের মানুষই ইতিহাস গড়ে আর মানুষকেই ইতিহাসের দায় বইতে হয়। সন্দেহ নেই যে সমাজবাদ সাম্যবাদী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যারাই নানা দেশে নানাভাবে থেকেছি তাদের সবাইকে দায়ভাগ নিতে হবে।

সোভিয়েট ও অন্যান্য যেসব দেশে প্রতিবিপ্লব প্রাধান্য পেয়ে আপাতত সমাজবিবর্তনের 'আরোহী' ('ascendant') স্তর থেকে 'অবরোহী' ('descendant') স্তরে নামিয়েছে, সেসব দেশের দায়িত্ব বেশি হতে পারে, কিন্তু জগৎ জুড়ে মেহনতী মানুষের যে লড়াই আমাদের গর্ব, আমাদের আশাভরসার মূল, সে-লড়াইয়ে অল্পবিস্তর যারাই রয়েছি তাদেরও দায়িত্ব কম নয়। 'Eternal vigilance is the price of liberty' এ-কথা তো আবাল্য সবাই শুনে এসেছি; সমাজবাদ-সাম্যবাদ বিষয়ে সেই 'vigilance', সেই বিরামহীন সতর্কতা, সঙ্গে সঙ্গে নীতিনিষ্ঠা ও কর্মক্ষেত্রে তার রূপায়ণে সততা প্রভৃতি গুণ প্রায় সব দেশে কম্যুনিস্টদের মধ্যে বেশ কিছুকাল ধরেই হ্রাস পেয়ে এসেছে। এজন্যই ফিদের কাস্ত্রোর মতো অতি অল্প কয়েকজনকে বাদ দিলে 'পেরেস্ত্রৈকা' ('পুনর্বিন্যাস') আর 'গ্লাসনস্ত্' ('খোলামেলা রাজনীতি') ধ্বনি শুনে এবং "More Openness, More Democracy, More Sociallism" ইত্যাকার বচনে অনেকেই মুগ্ধ হয়ে প্রতিবিপ্লবের প্রতিরোধ চাননি, আজও চান না। তাই পুলকিত হয়ে Zbicgniew Brzezinski মস্ত কেতাব লিখে ফেললেন "বিংশ শতকে কম্যুনিজম্-এর জন্ম ও মৃত্যু" বিষয়ে (১৯৮৯) আর জাপ-মার্কিন বিদ্বান Fukuyama ১৯৯০-৯১-তে ঘোষণা করলেন শুধু যে "The End of Ideology" তা নয় "The End of History", ধনপতিদের বিশ্বকর্তৃত্ব চিরতরে স্থাপিত হয়েছে বলে। মতটা অবশ্য তাঁকে বদলাতে হয়েছে কিন্তু তা হল গৌণ। আপাতত মহানন্দে আছেন দুনিয়ার দৌলতশাহীরা, আর 'চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয় না' জেনেও সাম্যবাদী মহলে নীতির দিকে নজর কম, কৌশল নিয়ে ব্যগ্রতা বেশি আবার বিপ্লবের দিকে মানুষকে মাতাবার আয়োজন প্রায় নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লালফৌজের বিক্রম ফ্যাশিজ্ম্-এর পরাজয় ফলে দুনিয়া অনেকটা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে একধরনের আত্মতুষ্টি আর শ্লথভাব এসেছিল। এজন্যই বোধহয় সোভিয়েট ও অন্যত্র সমাজবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংঘর্ষ আরও প্রবল ও প্রখর হবে বলে স্টালিনের সতর্কবাণী উপেক্ষিত হয়। তাই ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে দলের নেতা খ্রুশ্চভ্-এর রিপোর্টে স্টালিনযুগের অবমূল্যায়ন এবং কিছু কুৎসিত কুৎসা বুর্জোয়া জগৎকে উল্লসিত করল, কম্যুনিস্ট প্রত্যয়ের মেরুদণ্ড প্রায় ভেঙে দিয়ে আবহমান দীর্ঘায়ত শোধনবাদকে পরিপুষ্ট করল, হয়তো বা কতকটা অচেতনভাবেই বিপ্লবের বৈরিতা করে বসল। প্রায় অকল্পনীয় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সোভিয়েট ব্যবস্থার কীর্তি অবশ্য ছিল এমনই অকাট্য (মহাশূন্যে মানুষের প্রথম প্রবেশ যার এক প্রতীক বলা যায়) যে খ্রুশ্চভ-এর মতো ব্যক্তি বড়াই করতে ছাড়ল না যে মার্কিন শক্তির সঙ্গে টেক্কা দিতে সোভিয়েটের বছর পনেরোর বেশি লাগবে না! ("We will bury you" বলে জাঁক দেখালেন খ্রুশ্চভ্ যদিও "Foundations of Leninism" বক্তৃতাবলীতে বহুদিন আগেই স্টালিন চেয়েছিলেন "কম্যুনিস্ট বিশ্বাসের উদ্দীপনা ও আমেরিকান কর্মকুশলতার সমন্বয়"!)। কেল্লা মোটামুটি 'ফতে' হয়ে গিয়েছে, এমনই একটা ভাব দেখা দিল, যা সবার কাছে তখন ধরা পড়েনি, কিন্তু এই চিন্তারহিত অবিমৃষ্যকারিতার ফলভোগ করতে হয়েছে

গোটা দুনিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে। এভাবে একপ্রকার নিস্তেজ স্থবিরতা (পরে যাকে "stagnation" বলা হয়েছে) ক্রমশ সর্বনাশের রাস্তা বানাতে সাহায্য করেছে। ভারতবর্ষের মতো দেশে আমরা খ্রুশ্চভ-এর কাণ্ডকারখানা পছন্দ করিনি কিন্তু কম বেশি প্রায় সবাই ভাবতে শুরু করেছি যে মোটামুটি ধীরে-সুস্থে ধনবাদ-সমাজবাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মধ্য দিয়েই পার্লামেন্টারী এবং নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির জোরে সর্বনাশী যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রেখে বিপ্লবের বিপুল ওলটপালট বিনাই সমসুযোগের জীবনকে কাছাকাছি টানতে পারব। স্টালিনের সতর্কবাণীকে শিকেয় তুলে রেখে প্রায় সর্বত্র কম্যুনিস্ট মহলে যে Plekhanov-এর বর্ণনামতো কল্পনা করা হল যে "ইতিহাসের শকটে" ("locomotive of history") সবাই বসে পড়েছি আর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো নিয়ে ভাবনা নেই। "শকট" যে আপনা থেকে চলে না, তাকে চালাতে হয় আর সেজন্য দীর্ঘ পথযাত্রার উপযোগী সরঞ্জামের আয়োজন করতে হয় তা ভুলে গিয়ে ভাবা হল যে প্রায় নিয়তির মতোই যেন সমসুযোগের সমাজে মানুষ সহজে জাহির হতে পারে! কেমন যেন ভুলে যাওয়া হল যে সোশালিজ্‌ম্‌ সমাজবিবর্তনে অনিবার্য বলেই মানুষ সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয় না, মানুষ আকৃষ্ট হয় শ্রেণীসমাজের অন্যায় আর যন্ত্রণা আর অমানবিকতা দূর করে প্রকৃত স্বাধীন, সুস্থ, সুখী জীবন জয় করার আদর্শ আর উদ্দীপনায়।

১৯৬৩ সালে "লেবর মন্থলি" পত্রিকার বিশ্ববিখ্যাত সম্পাদক রজনী পাল্‌মে দত্ত-এর মতো স্থিতধী কম্যুনিস্ট মনস্বী কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে ১৮১৮ সাল (মার্কস্‌-এর জন্ম) থেকে একশো বছর বাদে ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশ ধনতন্ত্রের আওতা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আর যেভাবে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে তাতে ভাবা একেবারে ভুল হবে না যে হয়তো ১৯৮৩ (মার্কস্‌-এর মৃত্যু থেকে শতবর্ষ পূর্তি) নাগাদ সময়ে দুনিয়ার অনেকটাই সেই পথে এগোতে পারবে। মনে পড়ছে ১৯৭৯ সালে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় খ্যাতিমান 'লিবারল' সাংবাদিক Russell Warren Howe মন্তব্য করেন যে মধ্যপ্রাচ্যে এমন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে জগতের তিন-চতুর্থাংশে সোশালিস্ট ধাঁচের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে দেখা যেতে পারে। এ ধরনের কথার বৈজ্ঞানিক মূল্য কম, কিন্তু তা হল তৎকালীন মেজাজের একটা চিহ্ন। সব দিক থেকে মার্কিন দেশকে দশ পনেরো বছরে হারিয়ে দেব বলে খ্রুশ্চভ্‌-এর বড়াইয়ের মতো সেদিনের একটা লক্ষণ। আশ্চর্য নয় যে পৃথিবীব্যাপী সোশালিজ্‌ম্‌-এর জয় যে সহজসাধ্য নয়, তা অনেকেই, সম্ভবত সবাই, কমবেশি ভুলতে বসেছিলাম। সংসদীয় ব্যবস্থার মায়ায় জড়িয়ে পড়ে মেহনতী মানুষের লড়াই বিষয়ে অনীহা, মূলগতভাবে এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে সঠিক হলেও বিশ্বশান্তি আন্দোলনের মতো ব্যাপারে কম্যুনিস্টদের অতিরিক্ত ব্যস্ততা আর অনুরূপ বহু উপসর্গ তাই দেখা দিয়েছিল। "I am impatient for the Revolution. I shall be jolly happy if the Revolution happens tomorrow. Is it being an overage coward I want you to make the revolution in as gentlemanly a manner as posible."—বার্নার্ড শ'-র এই মনোরম উক্তিটির (১৯৩৪) প্রকৃত অর্থ না বুঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জগৎ বিষয়ে আত্মসন্তুষ্টির সঞ্চার হয়েছিল কম্যুনিস্ট

মহলেও। দেরিতে বুঝলে তার দাম দিতেই হয়; তবে অভিজ্ঞতা বিনা তো জ্ঞান আসে না আর অভিজ্ঞতার অর্থই হল ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করে শিক্ষা নেওয়া।

এবিষয়ে মহাচীনের নায়ক মাওৎসেতুং-এর বিচিত্র অথচ গভীরতাব্যঞ্জক কথা স্মরণ করলে উপকৃত হব। চট্‌পট্ সোশালিস্ট সমাজ বানাবার স্বপ্ন দেখার বদলে তিনি সাবধান করতেন বলে যে আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য সিদ্ধি হতে কয়েকশো বছর কিম্বা কয়েক হাজার বছরও লাগতে পারে। এটা শুনে একটু ভড়্‌কে যাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সস্তায় কিস্তিমাতের কল্পনা থেকে নিবৃত্ত করাই ছিল মাওয়ের উদ্দেশ্য। স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় এ-নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে বেশ মজাও করতেন। চীন-সোভিয়েট বিসম্বাদ যখন প্রবল তখন মিটমাটের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ফিরে যাবার সময় মাও বুঝি বলে ওঠেন যে দশহাজার বছর এই ঝগড়া চলবে। শুনে কোসিগিনের মুখে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত হতে দেখে মাও হেসে উঠলেন : "তবে কিনা, কমরেড কোসিগিন এমন চমৎকারভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে আমি দশহাজার থেকে এক হাজার ছেঁটে ফেলছি!" ঘরের আবহাওয়া বদলাল, আর সবাই বুঝল যে মাওয়ের কথার পিছনে শুধু আলোচ্য সমস্যার গুরুত্বই সূচিত হচ্ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটা সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা যা কম্যুনিস্ট লক্ষ্যসাধনে ধৈর্য ও প্রত্যয়নিষ্ঠার অপরিহার্যতাকেই স্মরণ করিয়ে ছিল।

'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' বলে যে শাদা-মাটা কথাটি আমাদের সাধারণ জীবনে প্রচলিত, তাই মনে পড়ে যায় যখন ভাবি যে সোভিয়েট পার্টির বিংশ কংগ্রেস-এর (১৯৫৬) পর চীনের পক্ষ থেকে 'Long Live Lininism' আখ্যা দিয়ে এবং স্টালিনের বিপ্লবী ভূমিকাকে ইতিহাসে "indelible" (অর্থাৎ যাকে কখনও মুছে দেওয়া যাবে না) বলে যে ঘোষণা তা নিয়ে বিতর্কের সুষ্ঠু সাফল্যের দিকে নজর না দিয়ে আন্তর্জাতিক আন্দোলনে একটা জোড়াতালি দিয়ে মেরামতের চেষ্টা হল, যার ফলে অধিকাংশ পার্টি নানা কারণে সোভিয়েটের পক্ষ অবলম্বন না করে পারল না আর তার বিপুল সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক সাফল্যের সঙ্গত অহঙ্কার নিয়ে নিজের বাছাই রাস্তায় চলতে চাইল। মূলধনের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য যখন জগৎজোড়া, তখন তার সঙ্গে লড়াইয়ে অপরিহার্য আন্তর্জাতিক সংহতি বিনা যে মেহনতী দুনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি দুর্বল হতে বাধ্য তা জেনে-বুঝেই কম্যুনিস্ট দুনিয়ার অন্তর্ঘাতী ভেদাভেদ আমরা সবাই নানা দেশে যেন মেনে নিতে বাধ্য হলাম। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে চৌ এন লাই-য়ের মতো নেতার মুখে চীন ও সোভিয়েটের অক্ষয় ঐক্যের ধ্বনি শোনা গেলেও বাস্তব অবস্থার যে অবনতি হল তা বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজ্‌ম্-এর ভবিষ্যৎকেই বিপন্ন করে তুলল। ১৯৫৮ সালে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির অষ্টম সম্মেলন পর্যন্ত বন্ধুতাসম্পর্ক প্রায় অটুট থাকলেও ক্রুশ্চভ্-নেতৃত্বে চীনবিরোধী বহু ব্যবস্থা যে কত বড়ো অপরাধ ছিল তা তখন অনেকেরই নজরে আসেনি। পরস্পর সম্পর্কে যে ফাটল তা মেরামত করার মনোবৃত্তি ও মনোবল হারিয়ে ফেলার মূল্য যে কত, তা তখন বোঝা যায়নি। এরই দূরায়ত পরিণাম যে সমাজবাদ-সাম্যবাদের সাম্প্রতিক বিপর্যয়কে টেনে এনেছে তা কতদূর সবাই বুঝেছি জানি না। বুর্জোয়া প্রাধান্য

যখন চলছে তখন সমাজবাদী সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তার বিপদও যে বাড়ছে বই কমছে না, স্টালিনের এই সতর্কবাণী ভুলে যাবার মাশুল সবাইকে দিতে হল, আজও হচ্ছে।

স্টালিনের জীবৎকালে মাঝে মাঝে চীন কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যে সোভিয়েট নেতৃত্বের গরমিল হয়নি তা নয়। বুর্জোয়া প্রচারবিদরা তো স্টালিন-মাও 'রেষারেষি' নিয়ে বহু কাহিনী রটাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। আশ্চর্য নয় যে উভয়েই যখন রক্তমাংসের মানুষ, তখন তাদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয় নিয়ে মতান্তর ঘটেছে, হয়তো বা কিছু পরিমাণে কিঞ্চিৎ পারস্পরিক ঈর্ষারও সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু চীনে বিপ্লবের বিজয়-পরবর্তীকালে মাও প্রায় দু'মাস সোভিয়েটে থাকার সময় ১৯৪৯-এর বিপ্লবের অতুলন ও সর্বাগ্রগণ্য নেতারূপে বিশ্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত একজন বিপ্লবীশ্রেষ্ঠের উল্লসিত স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। খুঁটিনাটি খবর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে মনে পড়ছে যে একবার মস্কোতে নৈশাহারের পর 'toast'-পান উপলক্ষে চীনা পার্টির প্রধান প্রতিনিধি যখন বলেন যে চীন হল সোভিয়েটের 'শিষ্য', 'গুরু'-র কাছে তার অশেষ ঋণ, তখন স্টালিন বুঝি বলেন "ওটা বাজে কথা ('nonsense')! যদি গুরুকে হারাতে পারে, তবেই তো সে আসল শিষ্য!" হাসির রোল উঠে সবাইকে যেন তখন তুষ্ট করেছিল। স্টালিনের জীবদ্দশায় আর মৃত্যুর পর বছর পাঁচ-ছয় না কাটা পর্যন্ত খ্রুশ্চভ্-মার্কা রাজনীতি কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় বিতর্ক-বিসম্বাদ ছাপিয়ে সরাসরি সংঘাত ঘটাতে পারেনি।

সঙ্গে সঙ্গে না বলে পারছি না যে চীনও যেন তার প্রকৃত বিপ্লবী গরিমা বিস্মৃত হয়ে আর অতিরিক্ত বিরক্তি ও রোষ বোধ করে আন্তর্জাতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সরিয়ে রেখে নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে কেমন যেন আত্মম্ভরী ভূমিকায় নামল। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের আয়তন ও সুবিপুল জনসংখ্যা ইত্যাদির জোরে সহজ হয়েছিল একপ্রকার গর্বিত স্বাবলম্বিতা। "গোটা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব আমাদের কম্যুনিস্ট কৃতিত্ব আর তখন সবাই আমাদের মানবে, কথা শুনবে"—এমন চিন্তা হয়তো এসেছিল, অস্বাভাবিকও ছিল না। ফলে গোটা জগৎ দেখল চীনের বিরাট অসমসাহস অগ্রগতি, অতিরিক্ত মূল্যের তোয়াক্কা না রেখে বিপ্লবকে এগিয়ে নেবার অকল্পনীয়, প্রায় অসাধ্যসাধক কর্মযজ্ঞ। মাও-য়ের অনুপ্রেরণা, অবিরাম নির্দেশ ও অবিচল পরিচালনায় মহাচীনের সূর্য-সম আবির্ভাব বর্তমান জগতের সমুজ্জ্বল ঘটনা। আজও চীন বিষয়ে কিছু সংশয় ও বহু জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও সন্দেহ নেই যে পরিবর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিপ্লব-পথে চলার তুলনাহীন কৃতিত্ব চীনে দেখা গিয়েছে। তবে এর জন্য গোটা কম্যুনিস্ট দুনিয়াকেও একটা দুঃসহ মূল্য দিতে হয়েছে যা ভুললে চলবে না।

ইতিহাসের বৈপরীত্য-কণ্টকিত এই অধ্যায়ে চীন যখন প্রায় যেন বাকি দুনিয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজস্ব বিপ্লবী কর্তব্য পালনে লিপ্ত তখন ভিয়েতনাম-এর মতো নমস্য দেশ আক্রমণ করার মতো ঘটনা দেখা গিয়েছে। কাস্ত্রো-র মতো শুদ্ধচেতা কম্যুনিস্ট প্রকাশ্যে চীনের স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য পশ্চিমি শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে অত্যন্ত কুশলী কর্মকাণ্ডের প্রখর নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হননি। মনে পড়ছে একবার বলেছিলেন যে 'NATO' (North Atlantic Treaty Organization)-তে আছে পনেরোটি পুঁজিদারী রাষ্ট্র। কিন্তু চীন যেন তার অনুল্লিখিত

ষোড়শতম সদস্য! এছাড়া আমার মনে যেটা বহুকাল খচ্‌খচ্‌ করে চলেছে তা হল যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই চীন আমাদের এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সমাজবাদী আলোড়নের যে জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ার-কে স্তিমিত করে দিতে সংকুচিত হয়নি। বেশ মনে আছে ১৯৫২ সালে যখন প্রথম লোকসভায় আমরা কম্যুনিস্টরা নির্বাচিত হয়ে যাই তখন প্রায়ই বার্মা (এখন 'মিয়ানার'), সিঙ্গাপুর, সিংহল ('শ্রীলঙ্কা'), মালয়, ইন্দোনীশিয়া প্রভৃতি দেশে কম্যুনিস্টদের ব্যাপক সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে লোকসভাতেও আলোচনা হত। গোটা অঞ্চল জুড়ে চীনা কম্যুনিস্টদের বিপুল ভূমিকা ছিল, আর ইন্দোনীশিয়ার নিজস্ব কম্যুনিস্ট পার্টির (যা ছিল এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কম্যুনিস্ট সংগঠন) প্রভাব ও ক্ষমতা (তৎকালীন জাতীয় নেতা সুকর্ণের সঙ্গে থেকে) প্রায় সাফল্যের শিখরে উঠেছিল। এরা সবাই ছিল মহাচীনের মুখাপেক্ষী। সোভিয়েট আর পশ্চিম জগতের কম্যুনিস্ট দেশ তখন চলছে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" নীতি নিয়ে—আমাদের এশিয়ার এই বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে বিপ্লবপ্রচেষ্টা বিষয়ে তাদের যেন অনীহা দেখা দিয়েছিল। চীন-সোভিয়েট মতানৈক্য সে-অনীহাকে পুষ্ট করেছিল আর একই সময়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের সাফল্য ছিনিয়ে আনার প্রচণ্ড সংগ্রামের ভারে ক্লিষ্ট হয়েই বোধ হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জায়মান সমাজবাদী অভ্যুত্থান চীনের কাছ থেকে সম্যক্‌ সাহায্য পেল না। ১৯৬৬ সালে পাঁচ লক্ষাধিক কম্যুনিস্টকে নির্মমভাবে হত্যা করে 'গণতন্ত্র' সুস্থির হয়ে বসল, আর সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোনীশিয়া প্রভৃতি একেবারে পড়ল নয়া-সাম্রাজ্যবাদী খপ্‌পরে। কেউ যদি ভাবেন ঐ-সব দেশ এখন তোফা রয়েছে, তাইওয়ান-দক্ষিণ কোরিয়া-থাইল্যান্ড প্রভৃতির সঙ্গে মিলে দারুণ সমৃদ্ধির এলাকা তৈরি করেছে তো নাচার। শোষণমুক্ত সমাজ, সমসুযোগের সমাজ, লোভলোলুপ ভোগসর্বস্ব জীবনধারার অবলোপ সাধন করার সংকল্পে আগুয়ান প্রকৃত মনুষ্যোচিত সমাজ যাদের অন্বিষ্ট, তারা এই 'Asian Tigers'-দের ফাঁদে পা দেবে না।

কিছু অবান্তর কথা এসে গেল, তবে যেটা বলতে চাই তা হল যে কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় নীতিগত বিতর্কের সুষ্ঠু সমাধানের বদলে বিক্ষিপ্ততার উদ্ভব হল—১৯১৭ থেকে জগতের এক ষষ্ঠাংশ জুড়ে আর ১৯৪৯ থেকে বিশ্বজনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ নিয়ে দুই যুগান্তকারী বিপ্লবের মিলিত অগ্রগতি ঘটল না, চীন থেকে আহৃত উদ্দীপনা দেশে দেশে ছড়িয়ে রচনা করল বহু বীর কাহিনী, কিন্তু কোথায় যেন ভিতরকার গলদ রয়ে গেল।

কেন লিখি?

বেশ একটু বিরস মনে "কেন লিখি?" প্রশ্নের একটা জবাব দিতে বসেছি। স্থির করেছিলাম যে এ-বয়সে আর 'উপরোধে ঢেঁকি গিলতে' রাজি হব না। তবু নিজেরই দুর্বলতা মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কিছু না লিখে দিয়ে পার পাচ্ছি না।

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে মূল আপত্তি আমার এই যে কেবল প্রকৃতপক্ষে 'খাস্' লেখক, যাদের বলা যায় 'জাত' লেখক, যাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকে সৃষ্টিশীল রচনা, যাদের ভাবনাচিন্তায় বিভিন্ন পরিসরে ও প্রকরণে থাকে মৌলিকতা আর সংবেদনী প্রতিভার স্বকীয় ব্যঞ্জনার মহিমা, তারাই যদি বলতে পারেন কেন তারা লেখেন আর চান সে-লেখা অপরে অনেকে পড়েন ও তাই নিয়ে ভাবেন ('সহিত' থেকে 'সাহিত্য'), তাহলেই শুধু এই 'প্রশ্নোত্তর' ব্যবহারের কিছু সার্থকতা থাকতে পারে।

সাহিত্য জগতের একান্ত এক 'অন্তেবাসী' ছাড়া আমি কিছু নই। এটা বিনয়ের কথা নয়, এটা তথ্য। সম্প্রতি, কতকটা আকস্মিকভাবে আমার বহু বছর ধরে ছড়ানো লেখালেখি নিয়ে কয়েকজনের আগ্রহ দেখে অল্প একটু তুষ্টি হয়তো পেয়েছি, কিন্তু এ তো তুচ্ছ ঘটনা। সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা বহুজনের চিত্ত জয় করার সৌভাগ্য পেয়েছেন আর বাস্তবিকই সৃজনী প্রতিভার যারা অধিকারী, তারাই যদি খোলামনে 'কেন লিখি' প্রশ্নের উত্তরে স্বদেশ স্বকাল স্বসমাজ আর হয়তো সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব সর্ববিশ্ব বিষয়ে কিছু বলেন তো তার মূল্য অনেক। এই আলোচনায় আমার অনিচ্ছুক উপস্থিতির অবান্তর বলতে কুণ্ঠিত নই।

কার্ল মার্কস তার মহাগ্রন্থ 'মূলধন' লেখার সময় একবার বলেন যে তিনি "ইঁদুরের দাঁত-কড়মড়ানি সমালোচনার" খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছেন ("gnawing criticism of mice")! এটা মনে পড়ে গেল যখন এই লেখাটা ফাঁদছি, আর ইতিহাসের এক কালজয়ী মহর্ষির রহস্যবোধ লিখতে বসার অপ্রসন্নতাকে একটু কাটিয়ে দিল। আমাদের এই "দুর্ভাগা" (অথচ কেমন যেন কিসের জোরে অপরাস্ত) দেশে জন্মে দুটো ভাষায় (বাংলা আর ইংরিজি) অর্থাৎ কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিকতার পরিবেশে, পঁচাত্তর বছরেরও বেশি কাল ধরে লিখে চলেছি, যার বেশ কিছু উদ্ধার করা যাবে না (আর তা উদ্ধারেরও যোগ্য নয়), তা হল মার্কস-কথিত "ইঁদুরের দাঁত কড়মড়ানি সমালোচনারই" সমুচিত খোরাক। তাই জবাব দিচ্ছি কেন "মরতে" এতকাল লিখছি আর আজও লিখে চলেছি। এইসব লেখার জন্য কত কাগজ লেগেছে আর কত গাছের মরণ ঘটেছে! (সেদিন দেখলাম এক পরিবেশ বিজ্ঞানীর মন্তব্য যে আমাদের দেশের সবাই যদি 'সাহেব' দেশগুলির অনুকরণে দৈনন্দিন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার জন্য 'টয়লেট পেপার' ব্যবহার শুরু করে তো গাছ আর কোথাও থাকবে না!) মনে এল হঠাৎ যে একবার মস্কোর সাজানো-গোছানো হোটেলে চিঠি লেখার সরঞ্জাম নিরেশ কেন জানতে চাওয়ায় শুনেছিলাম যে তাদের 'পরিকল্পিত' ('planned') অর্থনীতি অনুযায়ী

কাগজের ব্যবহারে সাবধান হওয়া অনিবার্য, কারণ সব চেয়ে বেশি দরকার হল অত বৃহৎ দেশে শিক্ষাব্যবস্থা, সাম্যবাদ বিষয়ক প্রচার, সঙ্গে সঙ্গে শুধু বহুজাতিক সোভিয়েট দেশ নয়, সারা দুনিয়ার সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় (রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর প্রকাশ তো কোটিকে ছাড়িয়েছে, সত্তরের দশকে আমাদের সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর একটি কবিতাসংগ্রহ ছাপা হয় একলক্ষের সংস্করণে) আর অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনে কাগজের চাহিদা যে কী বিপুল তা ভাবলে হয়তো কিছুকালের জন্য হোটেলের খরিদ্দারদের প্রয়োজনকে একটু নামিয়ে রাখাই দরকার। জবাবটা মনে আছে, বিশেষ করে এজন্য যে আমি এখনও প্রায়ই ভাবি যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনেক ঘাট্‌তি আর ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও একটা ব্যবহারে তার অনন্যতা একটু ভাবলেই মানতে হবে—ইতিহাসে এ যাবৎ কোথাও দেখা যায়নি গোটা দুনিয়ার (আর বিশেষ করে আমাদের মতো দুর্ভাগা সাম্রাজ্যশৃংখলিত আর সৃষ্টিশীলতার বিচারে উপেক্ষিত দেশের) সাহিত্য ও শিল্পবৈভব বিষয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে তুলনীয় আগ্রহ ও কর্মপ্রয়াস। কথা বেড়ে যাচ্ছে জেনেও বলছি যে ইংলন্ডের কাগজেই দেখেছি যে শেক্‌স্‌পীয়রের জন্ম থেকে চারশো বছর পূর্তিকালে কাজাকস্তানে ইংলন্ডের চেয়ে অনেক বেশি অনুষ্ঠান হয়েছিল। আর এও তো জানি (যদি অতি ক্বচিৎ কদাচ এর স্বীকৃতি এখন শুনি) যে পশ্চিমী দুনিয়াতে আমাদের বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিদ্বৎমহলে বিশেষজ্ঞ কিছু থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে তার অস্তিত্বই নেই, অথচ (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি) সোভিয়েটে 'কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকতার' কল্যাণে বহুজনের আগ্রহ প্রশ্নাতীত। সমর সেন, অশোকবিজয় রাহা, শুভময় ঘোষ, ননী ভৌমিক, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সোভিয়েটের অনেক কিছু অপছন্দ করলেও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারতেন আর কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তো রয়েছেনই আমাদের মধ্যে (তিনি শতজীবী হোন্‌!) এ-ব্যাপারে মনের জিজ্ঞাসাকে তুষ্ট করতে পারেন।

হয়তো বোকার মতো এই সোভিয়েট প্রসঙ্গ টেনে এনে ফেলেছি, প্রায় অযাচিতভাবে। কিন্তু 'কেন লিখি?' প্রশ্নোত্তরে এই বোকামিরও একটা 'প্রাসঙ্গিকতা' আছে। যে পরিবারে জন্মেছি এবং যে পরিবেশে 'মানুষ' হয়েছি, সেখানে 'লেখাপড়া' একটা স্বাভাবিক ও প্রায় অপরিহার্য কর্ম বলেই ভাবতে পেরেছি। আমার পিতা ও পিতামহের উত্তরাধিকারসূত্রেই যেন নিজের অগোচরেই লেখা এসেছে আর ছাত্রাবস্থা থেকেই তার অল্প কিছু ছাপার সুযোগ ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অঘটনের কথাও না উল্লেখ করে পারছি না। আমার প্রথম যে লেখা কলেজ পত্রিকায় ছাপা হয় তা ইংরিজিতে; আমার প্রথম যে বাংলা লেখা ঐ পত্রিকাতেই বেরোয় তা হল প্রাচীন ভারতবর্ষের অবদান বিষয়ে আচার্য ভিন্তর্‌নিৎস্‌-এর (Winternitz) ভাষণের অনুবাদ। সাম্রাজ্যশাসিত ('colonial') দেশে জন্মানোর মূল্য এভাবেই দিতে হয়েছে। মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য মাধ্যমে প্রথম মুদ্রণযোগ্য লেখা কলম থেকে বেরোনোর মতো অঘটনের কলঙ্ক কেমন করে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলি? কিন্তু এটা শুধু ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর বেশ কয়েক প্রজন্মের এই কলঙ্ক বহনের দায় থেকে গিয়েছে। গভীর প্রশ্নে প্রবেশ করি কেমন করে। কিন্তু একটু ভাবলেই ধরা পড়বে কেন আমাদের মতো 'কলেনিয়াল'

চিত্তাবহে অকাট্য থেকে রয়েছে প্রায় এক অনিবার্য অনুকরণ স্পৃহা, মৌলিক স্বকীয় জীবন্ত স্বভাবস্বচ্ছন্দ সৃষ্টিশীলতার পরিপন্থী প্রভাব—কেন প্রচুর যাথার্থ্য রয়েছে 'The Legacy of India' (Oxford 1936) গ্রন্থে সংকলন-সম্পাদক G. T. Garratt-এর মন্তব্যে : "ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রতিভার দিক থেকে সবচেয়ে অনুর্বর যুগ হল ইংরেজ শাসনের কাল" (এই Garratt-ই রবীন্দ্রজীবনীকার Edward Thompson-এর সঙ্গে 'Rise and Fulfilment of British Rule in India'-এর রচয়িতা)। 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' নিয়ে যতই বড়াই করি না কেন, তার 'মূলে হাভাত' ('original sin') এই সাম্রাজ্যশাসনের আনুষঙ্গিক বিকলতা। সাধ্য নেই নিজের ভাবনাকে ঠিকমতো সাজিয়ে বলার, তাই শুধু এখানে বলে নিই যে পরাধীনতার চাপেই নিজের অজান্তে যেন আমার লেখা শুরু বিদেশী ভাষায়।

ইস্কুলে বাধ্য হয়ে পড়তে হত সরকারি হুকুমে বাঙালি বিদ্বান নগেন্দ্রনাথ ঘোষ-এর "England's Work in India" (ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্য)। পরীক্ষা পাশের জন্য মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা (১৮৫৮), জানতে হয়েছিল ইংরেজ শাসনের 'সদুদ্দেশ্য', যা নাকি 'সংরক্ষণ' ('conservation') আর 'অগ্রগতি'কে ('progress') মিলিয়ে আমাদের মঙ্গলসাধন। জানি না পড়ার সময় কিশোর মন কতটা বিদ্রোহ করতে চাইত। শুধু মনে আছে যে তখনই, ১৯২০-২২ সালে (কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়) "কোন্ পাগল পথিক ছুটে এল/বন্দিনী মা'র আঙিনায়/ত্রিশ কোটি লোক সকল ভুলে/গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়" সেদিনের জনগণমন অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব তখন ঘটেছিল। পরাধীনতার শৃখলমোচনের যে প্রয়াস আমাদের এই বাংলায় পূর্বেই তেজস্বী রূপ নিতে আরম্ভ করেছিল তার এক নতুন বিরাট জনমুখী অকল্পিতপূর্ব চেহারা দেখা দিতে লাগল। একটু 'নাটক' করে, অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করেই বলি আমাদের কবিকুলকে একটু পুলকিত করার জন্য 'Bliss was it in that down to be alive/And to be young was very heaven!"

ঠিক 'অবস্থাপন্ন' না হলেও মোটামুটি সচ্ছল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মানোর সুবাদে আর কিছু পরিমাণে সাংবাদিকতার পরিবেশের প্রভাবে স্রোতে সহজে গা না ভাসানোর একটা প্রবণতার কল্যাণেই হয়তো সেদিনের 'স্বদেশী করা'-র টানে কিশোর বয়সেই ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস দেখাতে পারিনি, কিন্তু তখনকার অভিজ্ঞতার ছাপ আজীবন বয়ে চলেছি। আজ এই জীবনান্তের প্রাক্কালে আমার দীর্ঘায়ুর অভিশাপ দেশের স্বাধীনতা ও সমাজবাদ বিষয়ে আশাভঙ্গ না হলেও বেদনার্ত দুর্ভাবনার এই দ্বিবিধ ব্যর্থতার জ্বালা এনে দিয়েছে।

এত কাল ধরে এত যে লিখেছি, তা নিষ্কাম কর্ম বলে করিনি। কে কবে কোথায় সার্থক কর্মে লিপ্ত হয়েছে নিজস্ব উদ্দেশ্য বিনা? সে উদ্দেশ্য যদি শুধু স্বার্থসাধন ও সংসারধর্ম পালন হয় তো তা হল প্রত্যবায়। কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র মনস্কামনাপূর্তিকে বহু দূর অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক (অথচ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে একান্ত জড়িত) অন্বিষ্টের অন্বেষণ মানব অস্তিত্বের সার্থকতা। মহাভারত যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বারবার লক্ষ্যসাধনের জন্য পাণ্ডবপক্ষকে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর দুর্যোধনের মতো অপরাজেয় মহারথীদের পরাস্ত করার জন্য প্রজ্বলন্ত প্রবঞ্চনার

উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হননি, অথচ তিনিই নাকি নিষ্কাম, সম্পূর্ণ "ফলাকাংখাহীন" কর্মনীতির প্রবক্তা! এখানে খেই হারিয়ে ফেলছি বলে ভয় হচ্ছে, তাই সুবিনীতভাবেই বলি বিচিত্র জটিল সংকটসংকুল বিভ্রমসঞ্চারী পরিস্থিতিতেও যথাসাধ্য বাস্তব বিচারে যথাসম্ভব নীতিনিষ্ঠ কার্যক্রমের সন্ধান ও তদনুযায়ী প্রয়াস চাই কিন্তু অবশ্যই অন্বিষ্ট নিয়ে, যা হল "জনগণ-মঙ্গলদায়ক, জনগণ ঐক্যবিধায়ক, জনগণ পথপরিচায়ক, জনগণদুঃখত্রায়ক", শোষণমুক্ত সর্বজনের সমসুযোগের সহায়ক সমাজের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা বাক্যজাল বুনে চলছি যেন বলে বিরক্তি লাগছে, তবু নিজের মনের কথা স্পষ্ট করার জন্য সহায় নিচ্ছি মাওৎসেতুং-এর একটি কাব্যাংশের অমিতাভ দাশগুপ্তকৃত অনুবাদ "বাতাস, আমাদের এমন ভালোবাসা দাও/যাতে শত্রুদমনের পর আমরা/প্রত্যেকে, একে-ওকে/তোমার মতো জড়িয়ে ধরতে পারি!"

আমার সর্বদা উদ্দেশ্যসর্বস্ব লেখার পিছনে ঠেকেছে স্বদেশের মুক্তি আর (সত্তার কথঞ্চিৎ পরিণতিকালে) লোভ জটিল শোষণভিত্তিক স্বার্থসন্ধ অথচ তৎসত্ত্বেও বহুগুণখচিত এবং এখনও কথঞ্চিৎ মায়াময় বিশ্বব্যবস্থার বিলোপ। এই দ্বৈত অভিপ্রায় হয়তো উদ্ধত মনে হলেও আমার সকল প্রয়াসের মূলে, সকল রচনার উদ্দিষ্ট, তা আমি রাজনীতি বা ইতিহাস বা কাব্যচর্চা বা ক্রীড়াকৌতুক যে-কোনো বিষয়েই লিখি না কেন। 'ফরমায়েসি' লেখা বলে ভ্রূকুটি আমায় বিচলিত করবে না, কারণ এটুকু বলতে পারি যে ফরমায়েসটা আমারই নিজস্ব না হলে লিখতে পারি না। এখন এই মুহূর্তেই 'অনিচ্ছা' কাটিয়ে যা লিখছি তারও অভিপ্রায় হল যে হয়তো বা আমার চিত্ত চরাচর ব্যাপ্ত যে অন্বিষ্ট যা আমার বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সুগভীর অকিঞ্চিৎকর উপশম কিছু ঘটায়, সেই অন্বিষ্ট অল্প হলেও কিছু সহায়তা পাবে আর আমি এই অতি তুচ্ছ রচনার মধ্য দিয়েও হয়তো কিছু সৎ শুচি শুদ্ধ সহজ মানুষকে টানতে পারব যাকে কার্ল মার্কস বহুকাল আগে বলেছিলেন "The party in the grand historical sense of the term", তার পরিধির মধ্যে না হলেও অন্তত তার সামীপ্যে।

যথাসম্ভব কম কথায় বলতে চেষ্টা করি কিভাবে আমার এই চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ হল। মূলে অবশ্যই রয়েছে আমার জীবৎকালের অভিজ্ঞতা। আর পরাধীনতার শৃংখল মোচনের সঙ্গে সঙ্গে "সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু" চিন্তার মিশ্রণ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই আমার জীবনে ঘটেছে। এদেশে ছাত্রাবস্থায় সমাজবাদ-সাম্যবাদের 'পাঠ' নিতে পারিনি, বরঞ্চ কলেজী কেতাবে পড়েছি "socialism is a bit of all right but not to be expected this side of the golden gates of Paradise." কিন্তু আমার যখন চোদ্দ বছর পাঁচমাস বয়স (মার্চ, ১৯২২), তখনই মহাত্মা গান্ধী রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে আদালতে যে বিবৃতি দেন তা আজও কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে "The government established by law in British India is carried on for the exploitation of the masses. No sophistry, no jugglery in figures can explain away the evidence presented to the naked eye by skeletons in our native villages. The miserable little comforts of the town-dwellers in India represent the brokerage they get for the work they

do for the foreign exploiters and the profits and the brokerage are sucked from the masses. I have no doubt whatsoever that both England and the town-dwellers in India will have to answer, if there is a God above, for this crime against humanity which is perhaps unperalleled in history."

তরজমার চেষ্টা করছি না। গান্ধীজীর মতো সরেস ইংরিজি খুব কম লোকেরই কলম থেকে বেরিয়েছে। তাছাড়া বাঙালি বিদ্বানদের কাছে ইংরিজি তো 'জলভাত'।

স্বদেশমুক্তি আর "বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ" (এ-ধরনের শিরোনাম হল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত সোভিয়েত বিষয়ক বিস্মৃত অথচ মহার্ঘ গ্রন্থের)—এই দুই বিষয়ের সম্পর্ক ও অঙ্গাঙ্গিযোগও তারই অন্বেষণে বিপ্লবের উপযোগিতা ও বাস্তব সম্ভাবনা বিষয়ে আমার 'চক্ষুরুন্মীলন' ঘটেছে প্রায় পাঁচবছর ইয়োরোপ বাসকালে (১৯২৯-৩৪)। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েতে গেলেন, গান্ধীজী ইংলন্ডে এলেন, উভয়ের কথা শুনলাম, যদিও তখন আমার গান্ধীবাদী ঝোঁক মার্কসচিন্তার কল্যাণে প্রায় কেটে গেছে। দেশে ফিরে অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সাদর আনুকূল্যে যেতে হল আন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকর্মে, আর হল-তো-হল তখনই বিলাত থেকে আনা আমার কিছু বই ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তৎকালের নামজাদা বিলাতী সাপ্তাহিক 'New statesman and Nation'-এ প্রতিবাদ লিখে পাঠালাম যা ছাপা হবার ফলে আমার সদ্যলব্ধ চাকরি বাতিল হবার উপক্রম ঘটল। সে-চিঠির একাংশ হল "I have lived some of the happiest years of my life in England. I count English men and women among my best friends. I love England, her sights and sounds, more than I care to tell. But I cannot help hating, with all the hate of which I am capable, the abominable relationship beytween our two countries today." আবার বলি, তরজমা না হয় না-ই করলাম, পাঠকেরা তো সবাই বিদগ্ধ মানুষ, নিজগুণে দোষত্রুটি মার্জনা করবেন।

যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিণ্ডিকেট'-এ প্রবলপ্রতাপ সদস্য ছিলেন বিশাখাপত্তনম্ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টর উড (Wood)। তিনি প্রশ্ন তুললেন আমার মতো স্বয়ংস্বীকৃত 'রাজদ্রোহী'কে (যা বুঝি চিঠির বয়ান থেকে স্পষ্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা যায় কেমন করে। নিতান্ত রাধাকৃষ্ণন-এর তখনই বিশ্বব্যাপী খ্যাতির কল্যাণে আমার চাকরিটা রইল আর গোটা আন্ধ্র এলাকায় ঘুরে ঘুরে সভাসমিতিতে বক্তৃতায় 'বরাত' আমার জুটল (যারই পরিণতি তদানীন্তন বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টিতে ১৯৩৬ সালে আমার প্রবেশ!)। সেই সুদূর ত্রিশের দশক থেকে চলেছে (আর আজও স্তব্ধ হয়নি) স্বদেশমুক্তি ও সমাজবাদ নিয়ে এই অধমের প্রব্রজ্যা—ভীরু কণ্ঠে (তার চেয়ে বেশি ভীরু স্বভাবগতি কারণে) কুণ্ঠা হয়তো এসেছে। কর্মক্ষেত্রে অগ্রণী হতে সংকোচ দেখা দিয়েছে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত কারণে, তেমন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে যাবার ভাগ্যও হয়নি। তবু আমার মতো ব্যক্তির যে-অবস্থান, সেখান থেকে যথাসাধ্য দুনিয়াজোড়া এক মনমাতানো প্রাণজাগানো লড়াইয়ের একপ্রান্তে ছোট্ট একটু জায়গা নিয়ে থেকেছি, আজও এই ব্যাপৃতির বিরাম নেই। নইলে 'লিখ্‌ব না লিখ্‌ব না' করেও লিখছি—আগে যা বলেছি "একটুকু আশা" যদি কোনোক্রমে আজীবন অন্বিষ্ট একটু

দ্রুতায়িত হতে পারে।

এখনও তাই দেশেবিদেশে রাজনীতি শুধু নয় সর্ববিধ নীতির 'জবাই' দেখে প্রায়ই মনে আসে কতকাল আগে রবীন্দ্রনাথের খেদ "একি শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা শুধু মিছে কথা ছলনা", আর তার ডাক "কে জাগিবে আজ? কে করিবে কাজ? কে ঘোচাবে বলো জননীর লাজ?"—না, ক্ষান্ত হই, বুড়ো বয়সে 'ভীমরতি' ধরল নাকি? একটু বাঁচোয়া যে আমায় যারা লিখতে বলেছেন তারা আমার মেজাজও কতকটা চেনেন।

বাংলা ইংরিজি মিলিয়ে লিখে লিখে 'হদ্দ' হয়েছি বলে পার পাব না জানি, তাই আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে চলে না। একটা নালিশ প্রায়ই শুনি যে সোভিয়েট আর সাম্যবাদ নিয়ে বড্ড বেশি আবেগ আর আকুলতা দেখিয়ে চলেছি বহুকাল ধরে আর দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতির হিসাব রাখতে পারিনি। হয়তো তাই—বিশেষত যখন 'Nothing fails like failure', আর সমাজবাদ-সাম্যবাদের রাহুমুক্তি কতকাল নেবে (যদি প্রাকৃতিক রাহুগ্রাসের মতো এই ঐতিহাসিক রাহুগ্রাসও সাময়িক হয়) তা কেউ জানে না, তার কিছু লক্ষণ দেখা দিলেও এখনও তা উৎসাহব্যঞ্জক ভাবতে পারছি না (বিশেষ করে নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে)। কিন্তু স্বীকার করছি যে সোভিয়েট ব্যবস্থা নিয়ে Sidney & Beatrice Webb-এর মহাগ্রন্থ কিম্বা The Vasy Rev. Hewlett Johnson, Dean of Canterbury-র "The Socialist Sixth of the Earth"-এর মতো বই ও অন্যান্য অজস্র রচনার (ও ঘটনার) সাক্ষ্য এবং বহুবার সোভিয়েট দেশে (বিশেষ এশিয়ার রাজ্যগুলিতে) নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করার সাধ্য আমার নেই। সেখানকার দোষত্রুটি কিছুই কি দেখিনি, তা নয়—কিন্তু গোটা দুনিয়ার ধনশক্তি আর তার 'গণতন্ত্রপ্রেমী সহায়কদের অবিরাম কুৎসা শুধু নয়, সক্রিয় সর্ববিধ জিঘাংসু বৈরিতার সম্মুখীন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ কথিত (১৯৩০) "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ"-এর গরিমা কীর্তনে ক্লান্ত হইনি। দুনিয়া বদলাবার জন্য যে বিপ্লব তার সাফল্য সোভিয়েটের আকারে সমাজবাদের প্রথম প্রকৃত পথপ্রদর্শক ("pilot project") রাষ্ট্রের যে ইতিবাচক ভূমিকা শত্রুও অস্বীকার করতে পারেনি। সেই ভূমিকার পরিচিতি যথাসম্ভব ছড়িয়ে দেবার প্রযত্নে অবসাদবোধ করিনি। আজও এই ঐতিহাসিক দুর্দিনে সেই প্রযত্নের ঔচিত্য বোধ করি বলেই হয়তো 'ফাটা ঢাকে' 'বাদ্যি' বাজাবার প্রায়-উন্মাদ প্রয়াসে লিপ্ত বলে প্রশ্রয় মিশ্রিত কিঞ্চিৎ কৌতুকেরও পাত্র হয়ে বসেছি। এতে ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ আমার নেই, নিজের বিশ্বাস, অর্থাৎ সর্বদেশের জনগণের মুক্তি ও তারই পরিণতিরূপে শোষণ রহিত সমসুযোগের সমাজগঠনের আবশ্যিকতা বিষয়ে মতিস্থির রাখতে আমার চিন্তার, আমার মর্মের, আমার নিত্যকর্মে, আমার কল্পনায় যে-অবস্থান তা সজ্ঞানে পরিহার আমার কর্ম নয়। হতে পারে না।

খানিকটা ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রচলিত 'confession'-এর ধরনে স্মরণ করছি ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার টাউনহলে একটি জনসভায় আমার মনে যা হঠাৎ ভেসে উঠেছিল তা আমি লিখি এবং ছাপাই। আর এখানে তার একটু উদ্ধৃত করি

"সোভিয়েট আমারও দেশ। হাঁ, আবার বলি একথা, যদিও সঙ্গে সঙ্গে আবার বলি

যে মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আমি ভারতীয়। ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসি, আমার দেশের প্রতিটি ঘাসের ডগাকে আমি ভালোবাসি। ভারতবর্ষের মুক্তির চেয়ে বড়ো কোনো কামনা আমার নেই। তবুও বলি যে সোভিয়েটও আমার দেশ, বিশ্বমানবের কল্যাণ ও প্রগতি সোভিয়েট বিপ্লবের অন্বিষ্ট, ভারতবর্ষ ও অপর পরাধীন দেশের শৃংখল মোচনে সোভিয়েতই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত সহায়ক"। অনুরূপ কিছু কথা শুনেছি অন্যের মুখে, কিন্তু ভালো লেগেছিল ১৯৬৪ সালে সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসে ভিয়েৎনাম-এর অবিস্মরণীয় নেতা হো চি মিন্-এর শুভেচ্ছা পাঠের পর সে দেশের পার্টিনেতা Le Duan বলেন "আমাদের কাছে মাতৃভূমি যেন দুটি—প্রথমত ভিয়েৎনাম, আর দ্বিতীয়ত, যে দেশে সমাজবাদ প্রথম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেই সোভিয়েট ভূমি, যে দেশ ভিয়েৎনামের কৃচ্ছ্রসাধনে ভাগ নিয়েছে, আমরা পান্তাভাত ভাগাভাগি করেছি ("shared our rice and water") আর আমাদের সর্ববিধ সাহায্য তারা করেছে"। আনুষ্ঠানিক ভাষণের অবিকল অর্থ নিয়ে ঝগড়ার দরকার নেই, তবে এবম্বিধ চিন্তাই একদা সাম্যবাদী মহলে প্রচলিত ছিল। হয়তো বা কিছু পরিমাণে সঙ্গত কারণেই সেই মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু সে হল স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়। আমার মনে পড়ছে স্টালিনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তার দোষকীর্তন যখন চলছে তখন ভারতে বসবাসকারী বিজ্ঞানী J. B. S. Haldane-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জবাব দেন যে স্টালিনের জীবৎকালেই সুসঙ্গত কারণে প্রচুর প্রশংসা তিনি করেছেন আর তার মৃত্যুর পরে এই ছিদ্রান্বেষণে তাঁর রুচি নেই।

সোভিয়েটকেও আমার দেশ বলাটাতে জ্যোতি বসুর মতো সুহৃৎ ও সতীর্থেরও মনে বোধহয় প্রশ্ন ওঠে আর তাই পার্টিবিভাগের (১৯৬৪) পর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ঐ কথা কি আমি বলে যেতে পারি। জবাব দিই যে নিশ্চয়ই, এ তো মূল নীতির কথা, সেটা বদলাই কেমন করে। আমার এটা আনুষ্ঠানিক পার্টিকর্তব্যগত জবাব ছিল না, এটাই আমার মনের কথা, অন্তরের কথা, হৃদয়ের কথা। সেই সোভিয়েত আর নেই, তার নিজেরই 'কলুষ কল্মষ'-এর ফলে আর দেশবিদেশে বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি বদলাবার চাপে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদ-সাম্যবাদের শত্রুশক্তির সুচতুর সুকৌশলী সুসংবদ্ধ দীর্ঘকালীন চক্রান্তও সক্রিয় বৈরিতার ঠেলায় গর্বাচভ-ইয়েলৎসিন ধরনের নেতৃত্ব সম্ভব হয়েছে, বিশ্বব্যাপী নীতিভ্রংশ ও চীনের মতো বিপ্লবী পরম্পরাসমৃদ্ধ দেশেও 'কুবের-এর কাছে মার্কস-এর হার' ("Marx vs. Mammon") আর জগৎজোড়া অনুরূপ বহু দুর্ঘটনা বিংশ শতকের অবসানকালে ইতিহাসকে বিকৃত, কলুষিত, বিপথগামী করার উপক্রম ঘটেছে। তবুও আমার মতো জীবনান্তে অবস্থিত একজন লিখে চলেছে, মাঝে মাঝে অবসন্ন হয়ে "আর লিখব না" সংকল্প করেও স্বেচ্ছায় আবার লিখছি। কেন, তার জবাবে এই অক্ষম রচনায় আমার দুই আজীবন পোষিত অন্বিষ্টের কথা প্রথমেই জানাবার চেষ্টা করেছি। অজুহাত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কথাই উচ্চারণ করব :"মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই"। এটাই হল এই অধম অনুবর্তীরও জবাবদিহি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত কেন লিখি গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

বঙ্কিম-গরিমার উত্তরাধিকার

(মুক্তমতি জনদরদী আচার্য আহ্‌মদ শরীফ স্মরণে)

> "Men make their own history but do not make it just as they please, they do not make it under circumstances chosen by themselves but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past. The tradition of all the dead generations weighs like a nightmare on the brain of the living..."(Karl Marx, 'The Eighteenth Brumare of Louis Bonaparte. 1851-52)

একাধিক বাঙালি প্রজন্মের কাছে 'সাহিত্যসম্রাট' বলে বন্দিত, সমসাময়িক বাধ্যবাধকতায় শীর্ণ হলেও বিশাল গভীর দিগন্তব্যাপী প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, বহু বিতর্ক সত্ত্বেও কীর্তির সামগ্রিকতায় শুধু স্বভূমি বাংলা নয়, বহু যুগ ধরে বঞ্চিত দুঃখদীর্ণ অথচ অপরাস্ত 'মহাভারতবর্ষ'-এর প্রতীক রূপে হিন্দু মানসে 'ঋষি' আর মূলগতভাবে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যুগন্ধর বলে সমাদৃত, সেই দেশ-গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, আর মনে জিজ্ঞাসা ('জানবার ইচ্ছা') ও হৃদয়ের আবেগকে সংহত, সঙ্গত, তথ্যসিদ্ধ, শোভন, মনোগ্রাহীরূপে বহুজনের মধ্যে সঞ্চারের প্রযত্নে তিনি নেমেছিলেন। কালিক কণ্টকে ও 'জীবন-ধনদীন' স্বদেশবাসীর দুর্দশা ও চিত্তদৈন্যের চাপে বিঘ্নিত হলেও *বঙ্গদর্শন*-এর গরিমা হল অক্ষুণ্ণ। প্রথম প্রকাশকালে অনুপ্রেরিত কিশোর রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরীর সেই পুণ্যকীর্তির সাযুজ্যে রত হতে পেরেছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি আড়াই জন 'ঋষি'-কে—এক, বঙ্কিম; দুই, রবীন্দ্রনাথ; আধ, মাইকেল। এখানে 'ঋষি'-র অর্থ ত্রিনয়নসম্পন্ন কোবিদ, সত্যদ্রষ্টা, পথপরিচায়ক। এমন যে *বঙ্গদর্শন*, বঙ্কিমস্মৃতিকে প্রণতি জানাবার জন্য তার পুনঃপ্রকাশ প্রয়াসে কিছু দর্প, কিছু ঔদ্ধত্য, বর্তমানের বহু বিড়ম্বনা সত্ত্বেও অবশ্য আছে। হরধনুতে শর প্রয়োগের সাহস ও শক্তি তো একান্ত বিরল হতে বাধ্য। তবু একেবারে নির্ভয় না হলেও এই প্রযত্নকে অভ্যর্থনা করছি।

এই রচনায় প্রতিশ্রুতি দেবার পর রীতিমতো বিব্রত বোধ করেছি। দীর্ঘ পরমায়ু যে একটি অভিশাপ নিয়ে আসে তা সবাই বুঝবেন না। শারীরিক অপটুতা ছাড়াও মানসিক একটা কুণ্ঠাও আসে, এমন এক মহার্ঘ বিষয় আলোচনার প্রস্তুতি এ বয়সে সহজ নয়, সম্ভবও নয়। হাতের কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্যেরও অভাব, নিজের পক্ষে যথাযথ অধ্যয়ন এখন অসাধ্য, মূলত স্মৃতি ও আপাতত সহজলভ্য কিছু রচনার সহায়তা ভিন্ন অন্য সঙ্গতিও নেই। তাই বেশ কিছুকাল দোমনা হয়ে কুণ্ঠিতভাবে চিন্তার চেষ্টা করেছি। এমন সময় সত্যজিৎবাবুর একটি পত্রে পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' থেকে একটি উদ্ধৃতি যেখানে কৃষ্ণচরিত্র স্মরণ করে বঙ্কিম লিখছেন·

"যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, 'বেদে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশু খ্রীস্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র, যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।"

উদ্ধৃতিটি অজানা না হলেও আমার মতো নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী, ধর্মবিশ্বাস রিক্ত, লোকায়ত দর্শনে অনুরক্ত মানুষকে কিছুক্ষণ 'স্তব্ধ' করে দিয়েছিল আর তারপরই স্থির করলাম যা হোক্ পারি একটু কিছু লিখব যা হয়ত নবপর্যায়ে *বঙ্গদর্শন*-এর 'পাতে দেওয়া' চলতে পারে।

বহুকাল আগে Carlyle-এর মতো রগচটা সাহিত্যরথী বলেছিলেন শেক্সপীয়র বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে যে একটা "area of sancity" আছে সাহিত্যক্ষেত্রেও যেখানে প্রবেশ করতে হলে চাই সম্যক্ যা লেখায় আয়ত্ত করা দুরূহ। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহাভাগ বিষয়ে কিছু বলতে হলে নিজেকে তৈরি করতে হয়। তীর্থস্থানে দেবালয় প্রবেশকালে যথাসাধ্য শুচি স্নিগ্ধ মনে যেতে হয়। বয়সের ভার ও অন্য বহুবিধ বাধা কতটা কাটিয়ে উঠতে পারব তার বিচারের দায়িত্ব রইল সহৃদয় পাঠকদের হাতে।

নিজেকে তৈরি করতে অনেক সহায়তা পেয়েছি ১৯৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের পর একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমি প্রকাসিত স্মারক গ্রন্থ থেকে। এর দীর্ঘ ও চিন্তাশীল মুখবন্ধ লেখেন রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের ছাপ এই বৃহৎ সংকলনে সুস্পষ্ট। পুরনো ও নতুন রচনায় সুসমৃদ্ধ বইটি যদি বাংলা ভাষায় (কিছু অদল বদল করে কিম্বা আলাদাভাবে লিখিয়ে) ছাপা যেত তো একটা বড়ো উপকার সবাই পেতাম। বঙ্কিমপ্রতিভার নানা দিক নিয়ে আলোচনার অজস্র অবকাশ রয়েছে, তাই আশাকরি যে, বঙ্কিমেরই স্বগৃহে স্থাপিত গবেষণাগার থেকে যথোচিত কাজ হতে থাকবে।

ভাগ্যক্রমে গ্রন্থশাস্ত্রবিদ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* বইটি হাতের কাছে ছিল। এতে ফাঁকি নয়, তবে ফাঁক বেশ কিছু আছে। তবু সন্দেহ নেই এটি মূল্যবান্, বিশেষত মহারাষ্ট্রে ১৮৭০-এর দশকে বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে-র অসমসাহস বিদ্রোহের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কতটা বিস্তৃত হয়েছিল তার বর্ণনা বিষয়ে। মূল চিন্তার দিক থেকে সহায়তা সব চেয়ে বেশি পেয়েছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'জরিপ' করে খ্যাতনামা বিদ্বান, আমার একান্ত সুহৃৎ আহ্মদ শরীফ-এর *প্রত্যয় ও প্রত্যাশা* এবং অন্যান্য কিছু রচনা থেকে। নতুন কিছু বলছি না কিন্তু দেশের বতমান দুর্দশা ভাবিয়ে তুলছে কেন আহ্মদ শরীফ্-এর মতো বিদগ্ধজনকে বলতে হয়েছিল

"মানবকল্যাণ লক্ষ্যে মুক্তবুদ্ধি বঙ্কিম মানবজীবনের রহস্য প্রেরণায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ক্রমে তিনি বিশ্বের ও বিশ্বমানবের উদার অঙ্গন ত্যাগ করে স্বদেশের ও স্বজাতির সংকীর্ণ সীমায় স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করে তৃপ্ত ও কৃতার্থমন্য হতে থাকেন। তাঁর বিশ্বদৃষ্টি এভাবে

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিরূপে স্বল্পালোকিত স্বসমাজ সংকটে নিবদ্ধ হল। যুগসৃষ্ট বঙ্কিম যুগোত্তর প্রতিভা নিয়েও যুগপ্রভাব অতিক্রম করে যুগস্রষ্টা হবার গৌরব থেকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজেকে বঞ্চিত রাখলেন। হিন্দুবন্দ্য ঋষি হবার লোভে তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্বমানবের শ্রদ্ধেয় প্রতিভূ-প্রতিনিধির আসন ত্যাগ করলেন। বঙ্কিম-ইকবাল এভাবে আমাদের বঞ্চিত ও নিজেদের বঞ্চনা করেছেন।" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ১৭৬)।

বঙ্কিমচন্দ্রের ষড়ৈশ্বর্যশালী প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব ছিল না তৎকালীন পরিবেশে। মহাকবি গ্যেটে অনেকদিন আগে বন্ধু একেরমান্‌কে লেখা পত্রে খেদ করেছিলেন, পরিবেশ 'নোংরা' ('shabby') আর 'নিরীহ' ('tame') হলে প্রতিভার অপচয় অনিবার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন বাঙালি জীবনের আবহ যে কত প্রতিকূল ছিল তা আমরা যেন জেনেও জানতে চাইনা। বরঞ্চ উল্‌টোপথে গিয়ে মাঝে মাঝে প্রায় মস্তিষ্কহীন উল্লাস বোধ করি উনিশ শতকের তথাকথিত 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' ('বাংলার পুনর্জন্ম') নিয়ে। ইতিহাসাচার্য যদুনাথ সরকারের মতো তথ্যবিচারে সত্যসন্ধ ব্যক্তি এতদূর উল্লসিত হন যে ঐ 'বাংলার পুনর্জন্ম'কে ইয়োরোপের পঞ্চদশ শতাব্দীর অনুরূপ ঘটনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলতে সংকোচবোধ করেন নি। কথা বাড়ছে, কিন্তু উল্লেখ না করে পারি না যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো বহুমানভাজন বিদ্বান লিখেছেন, ষোড়শ শতাব্দীর প্যারিস বা লন্ডনের তুলনায় উনিশ শতকের কলকাতা ছিল সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে সেরা! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বাংলার 'পুনর্জন্ম' দেখেছিলেন নবদ্বীপে ও অন্যত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে (অবশ্য ইয়োরোপের 'পুনর্জন্মের' সঙ্গে তুলনীয় ভাবে একেবারেই নয়) যেটা আমরা ভুলে থাকি কিন্তু বঙ্কিম ভোলেন নি, আর ঋষি নেত্রের অধিকারী বলেই বুঝেছিলেন যে উনিশ শতকের 'নবজন্মে'র মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ফাঁকি, "প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীর মর্যাদা, জাতীয়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, হিতবাদ, প্রগতি, পর মত সহিষ্ণুতা প্রভৃতির কোনোটাই তাদের আত্মোপলব্ধ ছিল না, পড়ে পাওয়া বুলির সম্পদ হিসাবেই রইল"। (আহ্‌মদ শরীফ)। 'Huxley, Vedanta and goose' নিয়ে 'আমরা reformed Hindoos,' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের, এই বিখ্যাত ব্যঙ্গ তৎকালীন ছবি এঁকেছে।

প্রায় প্রসঙ্গান্তরে আটকে পড়ার জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু বলতে চাই যে, সমকালীন চিত্তাবহগত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা বঙ্কিমের অমিত চিত্তৈশ্বর্যরও সাধ্য হয়নি। বঙ্গভূমি রত্নগর্ভা বলেই ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের অভিশপ্ত পরিমণ্ডলে পেয়েছি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, লালনশাহ, রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষকে। কিন্তু প্রায় 'নরোত্তম' বলে বর্ণিত হবার গৌরব সমন্বিত হলেও যেন এক ঐতিহাসিক কলঙ্কের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া এঁদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। গোটা কেতাব একটি লিখেও এর বিশ্লেষণ প্রায় অসাধ্য, কিন্তু এজন্যই বঙ্কিম মহিমা স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় যেন জাগতিক নিয়মেই তারই আনুষঙ্গিক কথঞ্চিৎ 'কালিমা' নিয়ে কিছু চিন্তায় নামতে হয়। সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য গৌরব মেঘের ছায়ায় একটু ম্লান হলেও তা অক্ষুণ্ণই থাকে।

সমকালীন 'নোংরা' ('shabby') ও 'নিরীহ' ('tame') পরিবেশের চাপ এড়ানো যে কত কঠিন তা বোঝা যায় উনিশ শতকে রুশদেশের মনস্বী লেখক চেখভ (Chekov) যখন বলেন যে প্রতি মুহূর্তে যেন দেহের রক্তস্রোত থেকে ক্রীতদাসের রক্ত ফোঁটার পর ফোঁটার মতো ('drop by drop') বার করে দিতে হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্রষ্টাকে এই যন্ত্রণা আজীবন সইতে হয়েছে। আজও পর্যন্ত তাঁর উত্তরসূরীদের কম বেশি একই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে! ইতিহাসের ঋণ-পরিশোধ সহজ কর্ম নয়। সবাই জানি বঙ্কিমবাবুর ইচ্ছা ছিল ঝান্সীর রানীর প্রদীপ্ত জীবন অবলম্বনে লিখবেন। কিন্তু ইংরেজের চাকরির অভিশাপ মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন বলে মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখলেন। কী যন্ত্রণাই পেতে হয়েছিল *আনন্দমঠ* (১৮৮২) প্রকাশের পর! 'সাহেবরা' যাতে প্রচণ্ড খেপে না যায় সেজন্য বইটি ইংরেজদের বিপক্ষে লেখা হয়নি তার সাফাই গাওয়াতে হয় সমালোচকদের দিয়ে। আর প্রথম সংস্করণকে রীতিমতো বদ্‌লাতে হয়—যেখানে 'ইংরেজ', 'গোরা' ইত্যাদি শব্দ, সেখানে 'যবন' 'মুসলমান' শব্দ বসাতে হয় (শিল্পগত যুক্তি বিনাই)। ভীরু, 'ভেতো' বাঙালির বীরত্বের বড়াই ইংরেজের অপছন্দ বলে 'পঞ্চাশজন ইংরেজ'কে নিহত করি' বদলে দিয়ে 'কয়েকজন' বসাতে হল! চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন যদিও প্রথম সংস্করণে ছাপা 'বন্দে মাতরম' গাথা-র 'কে বলে মা তুমি অবলে' শব্দবন্ধটিকে চতুর্থ সংস্করণে বদ্‌লে দিয়ে যে 'অবলা কেন মা এত বলে' করা হয় তার বিশদ বিবরণ দেননি। অবশ্য অনুমান করা যেতে পারে যে, রাজপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে রাজরোষ থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশাতেই 'শুভার্থী' বন্ধুদের সুপরামর্শেই দেশাভিমানী শিল্পীকে এই স্খলন সইতে হয়। 'কে বলে মা তুমি অবলে?'-র মধ্যে যে তেজ আছে, দর্প আছে তা 'অবলা কেন মা এত বলে'-র প্রায় কাঁদুনিতে নামিয়ে আনা হল।

তুলনীয় না হলেও মনে পড়ছে যে এ ঘটনার অনেক পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'বঙ্গ আমার জননী আমার' লেখার সময় 'শুভার্থী'দের চাপে (এবং সরকারি চাকরি হারাবার ভয়ে) 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয় রক্ত করিয়া শেষ' পংক্তিটিকে 'খুন' করে বাধ্য হয়েছিলেন ছাপাতে 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ!' (কবিপুত্র দিলীপকুমার স্বয়ং এই তথ্যটি দিয়েছেন।

বঙ্কিম-রচিত যে মহাগীত ভারতমানসে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে, সীমিত, কুণ্ঠিত, নানা ঐতিহাসিক কারণে বিভক্তিদুষ্ট আজও অসম্পূর্ণ মুক্তি প্রয়াসের বিবরণে যে মহাগীতের ভূমিকা সদা সমুজ্জ্বল, যাকে কণ্ঠে নিয়ে বহু দেশব্রতী ফাঁসির মঞ্চে উঠে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন, দশকের পর দশক যে গান এই 'মহাভারতবর্ষে' ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে, সেই 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের প্রথম অঙ্গচ্ছেদ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজে হাতে করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে (১৯৩৭ সালে) যখন সর্বজনের পক্ষে সহজে ও সানন্দে উচ্চারণযোগ্যীকরণের জন্য 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী', 'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে' প্রভৃতি পংক্তি বাদ দেওয়া হয়, তখন (এবং আজও পর্যন্ত) এই দ্বিতীয় 'অঙ্গচ্ছেদ' নিয়ে ক্ষোভ উষ্মা সরব হয়েছে, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য-সংঘর্ষকেই সহায়তা করা হয়েছে। আমরা ভুলতে বসেছি সেই প্রথম 'অঙ্গচ্ছেদ'-এর কথা, যেখানে আমাদের মুক্তিপ্রয়াস আর প্রজাতিপ্রযত্নের মূলগত দুর্বলতা ধরা পড়েছিল।

ইংরেজকে তুষ্ট করার জন্য—অ-হিন্দু ভারতবাসীদের মনস্তত্ত্বকে সম্মান দেওয়ার জন্য নয়—তখন এই বদল ঘটানো হয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যথাসম্ভব যুক্তিজাল ছড়িয়েও না লিখে পারেন নি: "[*আনন্দমঠ*-এর] প্রথম সংস্করণে আছে, 'ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্যধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।' পঞ্চম বা শেষ সংস্করণে 'আগে' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আগে পরে নয়, সবসময় ইংরেজ রাজত্ব থাকবে, এই রকম ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে।

"পঞ্চম বা শেষ সংস্করণ আরও যোগ করা হয়েছে : 'ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কন্টকে ধর্মাচরণ করিবে।'

"পরে মহাপুরুষ যা বললেন তাতে আরও চমকিত হতে হয়। তিনি সত্যানন্দকে বোঝালেন 'ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ, ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ...।'" (*আনন্দমঠ রচনার প্রেরণা ও পরিণাম*, কলকাতা ১৯৮৩ পৃ. ৪৭)।

কেবল চাকরি বাঁচানো বা বইয়ের প্রচার যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য উৎকণ্ঠাবশে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মহাভাগ এভাবে এগিয়েছিলেন বললেই অজুহাত মানা যায়না। 'ইংরেজরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা থেকে উদ্ধার করিয়াছেন' এই 'বিজ্ঞাপন' প্রথম সংস্করণের উৎসর্গের পরেই জ্বল জ্বল্ করছে। প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে ঐ সার্থকনামা সুধী বহুখ্যাত *নীলদর্পণ* (১৮৬০) রচনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, বইয়ের ভূমিকায় মহারানী ভিক্টোরিয়ার শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জানাতে কুণ্ঠিত হননি। কী অভিশাপ আমাদের যে বিদেশি বিধর্মী বিভাষী এবং সব দিক থেকে অনাত্মীয় এবং শোষণ বিশারদ ইংরেজ শাসনকে বিধিদত্ত আশীর্বাদস্বরূপ ভারত মানসে উপস্থাপিত হয়েছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়-এর কাল থেকে এর প্রচলন, আজও এর বিলোপন ঘটেনি। এ নিয়ে অজস্র কথা মনে এসে ভিড় করছে। শুধু বলি যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এবম্বিধ স্খলন দেখা গিয়েছে, যার অন্যতম উদাহরণ হল 'স্বদেশী' যুগের উন্মাদনাকালে 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি, যেখানে 'রাজতপস্বী বীর'কে অভিবাদন জানানো হয়েছে 'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে' দিয়েছেন বলে, তাছাড়া আরও মারাত্মকভাবে লিখে ফেলেছিলেন ইংরেজ শাসন বিষয়ে, 'বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি/নিল চুপে চুপে/বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী/রাজদণ্ড রূপে।' বলতে ইচ্ছা করে, অন্যে পরে কী কথা? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এমন উক্তি! কলমকে টেনে ধরতে হচ্ছে। 'অলমতি বিস্তরেণ।'

পরাধীনতার যন্ত্রণা জেনেছি আর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পঞ্চাশাধিক বৎসর কেটে গেলেও দেশের দুর্দশার অন্ত ঘটানো যায়নি, দেখার ক্লেশ আরো কলুষ পীড়িত করে চলেছে বলেই হয়তো আতিশয্য করে ফেলেছি। ইতিহাস আর বিবেকের দরবারে আমরা সবাই দোষী সাব্যস্ত হব, 'এ আমার এ তোমার পাপ;' নিয়তিকে দায়ী করে বা পরস্পরকে নিন্দা করে দোষক্ষালন চলবে না; নক্ষত্রের অবস্থানবশে নয়, আমাদেরই লঘুতার হ্রস্বতার, স্খলনপ্রবৃত্তির মূল্য সবাইকে দিতে হচ্ছে।

১৯৪৫ সালে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নে লেনিনগ্রাদ শহরে বিজ্ঞান আকাদেমির গ্রন্থালয়ে বঙ্কিমচর্চায় নিরত বিদুষী নোভিকোভা (কয়েকবার এদেশে এসেছেন) দেখালেন বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত *বিষবৃক্ষ* ও আর একটি গ্রন্থ যা তিনি দিয়েছিলেন ভারতবিদ্যাভূষণ আই. পি. মিনায়েভকে। ইনি ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮৫-৮৬-র মধ্যে তিনবার ভারতে আসেন এবং শেষবারের ভ্রমণে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে এসে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এই 'ভারতসঙ্গীত' রচয়িতাকে সবাই খুশিমনে ভুলে আছি কেন?) রশেমচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি পরিবৃত বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ করেন যা সেখানে উপস্থিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিবরণে রয়েছে। (*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*-২, ১৯৮৯, পৃ. ৪১-৪১)। ইংরেজের বর্মা দখল আর কিছু পূর্বে মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের নায়কত্বে যে কৃষকবিদ্রোহ সরকারকে সন্ত্রস্ত করেছিল তা নিয়ে কথাবার্তা চলে। বঙ্কিমবাবু বুঝি বলেন যে, ছাপাখানার ওপর নিয়ন্ত্রণের কড়া আইনের ভয়ে মনের কথা খুলে বলতে তাঁরা পারেন না। রুশ সূত্র থেকে জানা যায় যে, মিনায়েভ লিখেছিলেন যে এই লেখকরা পুরো বিপ্লবী হতে পারেন নি, ইংরেজ শাসন বিতাড়নের চিন্তা তাঁদের ছিল না।

আনন্দমঠ লেখার পিছনে মহারাষ্ট্রের কৃষকবিদ্রোহের প্রভাব প্রমাণ করবার প্রযত্নে থেকেছেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবু বঙ্কিমচন্দ্র যে মানসিকতার অধিকারী ছিলেন তাতে দেশাভিমান উদ্দীপ্ত করে তোলবার মতো ঘটনা তাঁর যৌবন থেকে প্রচুর পরিমাণেই ঘটেছিল। ১৮৫৭-র ২৪ জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। যার প্রথম স্নাতক হলেন (একজন সাথী নিয়ে) বঙ্কিম। প্রায় তখনই স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে বন্দিত, অথচ ইংরেজ হিসাবে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের সূত্রপাত দেখা যায় ব্যারাকপুরে বিদ্রোহী নায়ক মঙ্গল পাণ্ডের জীবনদানে। বাঙালি শিক্ষিতেরা (প্রায় সবাই হিন্দু) সেই বিদ্রোহ থেকে সতর্ক দূরত্ব রেখেছিল বলে প্রচলিত যে কাহিনী তা পুরো সত্য নয়। বিদ্রোহের বহুখণ্ডে যে ইতিহাস (Kaye and Malleson-কৃত) সরকার প্রকাশ করে তাতে কলকাতা আর জেলাওয়ারি বিবরণ থেকে চাঞ্চল্য, বিক্ষোভ আর বিস্ফোরণের আশঙ্কা সুপরিস্ফুট। খুঁটিনাটি এখানে সম্ভব নয়, তবে খুবই গুরুত্ব রয়েছে বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী পাদরি আলেকজান্দার ডফ্ (Duff) সাহেবের মন্তব্যে যে, বাঙালি শিক্ষিতেরা ইংরেজ শাসনের প্রতি 'disaffection' ঢেকে রাখলেও তাদের দিক থেকে সরকার নিয়ে 'affection'-এর লেশমাত্র ছিলনা। কলকাতায় সাহেব ও ফিরিঙ্গিদের 'আতঙ্ক' ('panic') আর পালিয়ে যাবার জন্য জাহাজ তৈরি রাখা ইত্যাদি বহু ঘটনাই রয়েছে। বঙ্কিম যে তখন 'আমরা সব পোষা গরু। ঘুষি চাই না ভূষি পেলেই তুষ্ট রই' (ঈশ্বর গুপ্তের হৃদয়বিদারী ব্যঙ্গ) ধরনের চিন্তায় তুষ্ট। ভালো চাকরির অনিবার্যতায় পুলকিত, তা ভাবতে পারিনা।

তারপর চলেছে ঘটনাস্রোত যার একটু আভাস আমাদের পক্ষে উপকারী হতে পারে। বিদ্রোহের নৃশংস দমনের অব্যবহিত পরে দক্ষিণ বাংলার নীলচাষীর বিদ্রোহ (১৮৬০) বড়োলাট ক্যানিংকে যে ১৮৫৭ সালের দিল্লীর মতো ভয় পাইয়েছিল তা তিনি নিজে লিখে গেছেন।

সত্তরের দশকে শুধু মহারাষ্ট্র নয়, বাংলার পাবনা-বগুড়ায় কৃষকরা 'সমিতি' গড়ে নিজেদের 'বিদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে অভ্যুত্থান চালায় যা তখনই সরকারি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমের অজানা তো ছিলই না, হয়তো বা যথাযথ প্রস্তুতি বিনা তদ্বিধ কর্ম বিষয়ে সুবিদিত অনীহা সত্ত্বেও প্রভাবিত করেছিল *সাম্য, বঙ্গদেশের কৃষক*-এর মতো এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তকারী রচনাকে। ১৮৮২-তে *আনন্দমঠ*-এর প্রকাশ আর ১৮৮৫ সালে বড়োলাট ডফ্‌রিন-এর পরিকল্পনায় দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে অল্প কিছু 'অধিকার'-এর প্রলোভন দেখিয়ে Indian National Congress প্রতিষ্ঠার ভূমিকারূপে Alan Octavain Hume সিমলার শৈলশিখরে বসে গোটা দেশজুড়ে ত্রিশহাজার গোয়েন্দা রিপোর্ট যাচাই করে বলেন যে বিক্ষোভ সর্বত্র, দেশ তখন 'on the brink of revolution' (ইংরেজ কলম থেকে এ শব্দটি চট্ করে বেরোয় না!), সাধারণ-মানুষের ব্যাপক অসন্তোষকে সংগঠিত করতেও শিক্ষিতদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এগিয়ে আসছে, ইত্যাদি। তখনকার বাংলা যে এ রিপোর্টের এলাকার বাইরে, তা হতে পারে না। Wedderburn-এর হিউম জীবনীতে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এর পূর্বে ওয়াহাবি-ফরাজিরে কাণ্ডকারখানায় কয়েক দশক ধরে ইংরেজ সন্ত্রস্ত বাংলায় চল্লিশের দশকে দুধু মিঞার (হাজি শরীয়ৎউল্লাহ্) নেতৃত্বে কৃষক-বিক্ষোভের (বিশের দশকে তিতুমীরের লড়াই স্মরণীয়) ঢেউ সাম্‌লানো শেষ হয়নি; ষাটের দশকে ওয়াহাবি নেতাদের ফাঁসি আর ঐ বিচারের বিবরণী পড়ে বিপিনচন্দ্র পালের মতো মানুষের 'দেশব্রতের দীক্ষাগ্রহণ' ('baptism into patriotism'), ইত্যাদি ঘটনার মেলা। তাই ১৮৮২ সালে মার্কস্-এঙ্গেল্‌স্-এর পরস্পরকে লেখা চিঠিতে দেখি যে ভারতবর্ষে বুঝি বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এলাম শুধু জানাতে যে বঙ্কিম মানসে এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের ছাপ নিশ্চয়ই পড়েছিল, যদিও হয়তো শিক্ষিতদের চিন্তা ও কর্মের পরিধিতে দেশ তখনও নিস্তরঙ্গ, ইংরেজ শাসনের অভিপ্রায় যে শুভ্র, তার কিছু সংস্কারেই যে ভারতের কল্যাণ এমন ধারণাও তখন প্রবল জনশক্তির অভ্যুদয় সংঘটনের বাস্তব পরিবেশ তৈরি হবার সম্ভাবনা ছিল কম।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে যে বঙ্কিম 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' চিন্তায় লিপ্ত, জ্ঞানার্জনের আগ্রহে ও স্বকীয় প্রতিভায় যখন তৎকালীন 'shabby' ও 'tame' পরিস্থিতিতেও বঙ্কিমের চেতনা নব নব উন্মেষে উদ্‌ভাসিত। অর্থাৎ 'অভিশাপ' স্বরূপ সরকারি চাকরিতে শৃংখলিত কণ্টকিত হ্রস্বীকৃত অবস্থানে আটক থেকেও কী অসাধারণ কীর্তি রেখে গেলেন বঙ্কিম। মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মৃত্যু। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃতই সাহিত্যসম্রাট, বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তক, সমাজ সাহিত্য, জীবনদর্শনের সব্যসাচী মনস্বী, দেশাত্মবোধের কথক চূড়ামণি আর (রবীন্দ্রনাথের মতো পুরুষোত্তমকে ধরলেও) বাংলা গদ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী।

•

রবীন্দ্রনাথের মতোই যিনি বলতে পারতেন 'ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র হানো/এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো', চিত্তৈশ্বর্যে অসামান্য সেই মানুষ। সংশয়বাদী হিতবাদী মানবতাবাদী, এমনকী সাম্যবাদী দর্শনে যাঁর ব্যুৎপত্তি (মার্কস্-এর উল্লেখ বঙ্কিমরচনায় নেই, যদিও 'কমলাকান্ত'-এর সুবাদে Feuerbach-সেখানে হাজির) সাম্যের মহিমা আর ইতিহাস

জুড়ে গণমানবের যন্ত্রণা যিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি 'মরমিয়া-সুলভ ভক্তিতত্ত্বে অভিভূত হলেন। মনুষ্যত্বের অধ্যাত্ম-মরীচিকার শিকার হলেন' (আহ্‌মদ শরীফের ভাষা)। 'বন্দোমাতরম' গাথার, ঐতিহাসিক গৌরব তাই ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যারা অনধিকারী, বঙ্কিমমানসের সন্ধান যাদের অগম্য, হিন্দু চিন্তার বাহক হয়ে তারা ক্ষমতায় বসেছে। হয়তো এই দুশ্চিন্তাই আমাকে বারবার এভাবে লিখতে বাধ্য করেছে।

জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষায় 'সূর্যবন্দনা' প্রত্যহ করার যে গর্ব ছিল বঙ্কিমের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত, তাই তথ্যের বিচার ও যুক্তির ঋজু প্রয়োগে অনুরক্ত ও পারদর্শী বঙ্কিম হয়তো ক্রমশ জীবনে প্রতিকূলতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মচিন্তার মোহন মায়াজালে বাঁধা পড়েছিলেন। তাঁর মানসিকতায় 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর' ধরনের চিন্তা স্থান পায়নি, কিন্তু বোধ হয় তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, ভারতবর্ষীয় ধ্যানে 'বিচার স্বতন্ত্র্য, কিন্তু আচার সমাজ-সময়-তন্ত্র'-এর ধারণা। সমাজ বাধা দেয় না কারও নিজস্ব বিচারে—কেউ নাস্তিক হলেও ক্ষতি নেই, বৈদান্তিক হোন্ বা বৃক্ষ বা সর্প পূজক হোন্, আচারে যদি সমাজের নির্দেশ মেনে চলেন তো সব ঠিক আছে! প্রত্যয়ের প্রখরতা যে পরমত-সহিষ্ণুতাকে সহ্য করতে পারে না, তারও একটা বিশিষ্ট শক্তি আছে, কিন্তু আমাদের এই 'যত মত তত পথ'-এ বিশ্বাসী দেশে অনেকটা আমরা এই 'সহিষ্ণুতা'র পক্ষে থেকেছি। তাছাড়া ধর্মবিশ্বাসের যে বহুযুগব্যাপী ইতিহাস, জ্ঞানবিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও যার প্রভাব এখন ও বহুল পরিমাণে অপ্রতিহত, কার্ল মার্কস্-এর ভাষায় 'নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস। হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, জনসাধারণকে ঝিমিয়ে রাখার আফিম' বলে যার বর্ণনা তাঁর বহুধা বিস্তীর্ণ সমাজ জীবনজাত মনোমোহিনী শক্তি (উপনিষদে বুঝি একে বলেছে সর্বেষাং ভূতানাং মধু') কত মহৎ মানুষকে অভিভূত করে রেখেছে। স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্য তুরীয় চিন্তাবলে 'ভগবৎপাদ' বলে পূজিত হয়েও (যদি কিম্বদন্তী ভুল না হয়) সংসারের সাধারণ স্তরে নেমে লিখতে পেরেছিলেন। 'ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ মূঢ় মতে!' জেনেছি যে অদ্বৈত বেদান্তের অদ্বিতীয় প্রবক্তা মধুসূদন সরস্বতী নির্গুণ-ব্রহ্মের ব্যাখ্যাতা কিন্তু কুণ্ঠিত নন্ বলতে : 'পূর্ণেন্দুসুন্দর মুখাৎ অরবিন্দ নেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরম্ কিমপি তত্ত্বমহম্ ন জানে।' সাধকের হিতার্থেই বুঝি ব্রহ্মের রূপকল্পনা ঘটেছে। ভক্তমনের আকুলতা দেখি বহু পরিজ্ঞাত উচ্চারণে 'যে রূপবিবর্জিত তাতে ধ্যানবলে কল্পিত রূপ আরোপ করেছি, যে অনির্বচনীয় তাকে বাক্যে স্তুতি জানিয়েছি, যে সর্বব্রব্যাপ্ত তাকে তীর্থযাত্রাদি দ্বারা সন্ধান করেছি, এই দোষ, এই বিকলতা, হে জগদীশ, তুমি ক্ষমা করো।' আশ্চর্য কী যে অসামান্য মানসিক পরিক্রমার মধ্য দিয়ে (অল্পকাল নাস্তিক্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েও) বঙ্কিমচন্দ্র অটল অধ্যাত্মবিশ্বাসে উপনীত হতে পেরেছিলেন। তাঁর চিন্তাকে একটুও হেয় করতে চাইছি না, কিন্তু দেখি কী এক উদ্ভট বিবর্তনের মাধ্যমে বঙ্কিম-প্রভাবিত প্রজন্মের পর প্রজন্মের প্রতিভূ হয়েই যেন সুবিদিত সাহিত্য পত্রিকা *দেশ* (শারদীয় ১৪০৬) সম্পাদকীয়ে লেখা হল 'আমার চিরকালের সকল খেলার সাথী' শিরোনামা দিয়ে 'দুর্গাপূজা— মা—বাঙালির মা', 'এই যে মা দুর্গা এখন নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থাৎ বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সমবায়িক চরিত্রদর্পণ, তিনি আমাদের এই শতাব্দীর প্রাণময় ইতিহাসও।'

আমার মনটাই কি বেয়াড়া, কিন্তু অস্তস্তি লাগে, বিশেষ করে বর্তমান সাম্প্রদায়িক অবস্থানে, যে দুর্গাপূজাকে (কিম্বা ঈদ্) প্রভৃতি হিন্দুমুসলিম সকলের মিলনের পুণ্য প্রতীকরূপে দেখার পুরানো রেওয়াজ হারিয়ে যাচ্ছে বলে। রবীন্দ্রনাথ একবার 'মহাভারতবর্ষ' শব্দটি ব্যবহার করে বলেন যে বিদেশি বিধর্মী মুসলমান এসে এদেশের সংস্কৃতিতে সমন্বিত হওয়ার জন্যই এদেশের বিশিষ্ট মহিমা। আমীর খস্রু থেকে দারা শিকোহ্ থেকে আবুল কালাম আজাদ, আবদুল গফ্ফর খান প্রভৃতি কি দেশের স্মরণের পরিধি থেকেই অপসৃত হবে? শিখ-মুসলিম সংঘর্ষ কত তীব্র হয়েছিল, অথচ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যস্থান বলে বিদিত 'হরিমন্দির সাহেব' (যেখানে ১৯৮৪ সালে 'Operation Bluestar'-এর গুলিবর্ষণের ফলে ইন্দিরা গান্ধীর নিধন ঘটে) উদ্‌বোধনকালে স্বয়ং গুরু অর্জুন বুঝি তৎকালে সব চেয়ে মান্য সুফী সাধু মিঞা মীরকে প্রধান অতিথি করেছিলেন। থাক্ এসব চিন্তা, ফিরে যাই মূল প্রসঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে অপার শ্রদ্ধাবশেই প্রলুব্ধ হয়েছি এত বেশি কথা টেনে আনতে। কিন্তু একটি লেখায় মোটামুটি পূর্ণ বিবৃতি সম্ভব নয়, তাই এবার শেষ করি। বঙ্কিমকে মুসলমানবিরোধী ভাবা যে বাতুলতা, তিনি যে তেমন ক্ষুদ্রতার বহু ঊর্ধ্বে তা মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ-বিচলিত হবার হেতু ঘটলেও স্থিতধী সমালোচকরা জেনে এসেছেন, আর এ নিয়ে তুচ্ছ খুঁচিয়ে তোলার মতো অপকর্ম আর নেই। মুসলমান চরিত্র চিত্রনে অকিঞ্চিৎকর কিছু বিভ্রম থেকে গেলেও প্রকাশ পেয়েছে বহু উপন্যাসে তাঁর মনের উদার ব্যাপ্তি। অওরংজেব-এর মতো বহুনিন্দিত চরিত্রের মানবীয় দিক ফুটিয়ে তুলেছেন সহজ সুন্দর ভাবে। 'এদেশে মেয়েরাই শুধু মানুষ,' এই মহাবাক্য তিনি একবার বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেন। মেয়েদের নামে উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখেছেন—*দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, মৃণালিনী, ইন্দিরা, রজনী,* তাছাড়া *কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ* প্রভৃতিতে মেয়েদের ভূমিকা বিরাট। আফগান মেয়ে আয়েষা হিন্দু রাজপুতের প্রেমে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!' উচ্চারণে ভারতবর্ষ অভাবনীয় মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন। নির্মলকুমারী, জেব্‌উন্নিসা, দরিয়া *রাজসিংহ* উপন্যাসের নিষ্প্রভাতকে যেন পরাস্ত করেছে। বঙ্কিম হীরা মেয়েটিকে 'পাগল করে ছেড়েছেন' কিন্তু আহ্‌মদ শরীফের বিচারে সেই হল 'বাংলা সাহিত্যে শাস্ত্রের, সমাজের ও নিয়তির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহিনী।' রোহিনীকে সৃষ্টি করে নীতিবাগীশ বঙ্কিম যতই বিমুখ থাকুন না কেন 'দেশশুদ্ধো লোক তো রোহিনীর পক্ষেই রয়েছে।' 'অসাধারণ প্রেমিক-সপ্রতিভ সুন্দরী নারী শৈবলিনী বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের অতুল্য অবদান। বিনোদিনী-বিমলা-কিরণীময়ী-অচলা-কমল কেউই শৈবলিনীর তুল্য নয়। শৈবলিনীর অরণ্য প্রবেশে গ্রন্থ সমাপ্ত হলে এ চিরকালের একটি নিখুঁত সৃষ্টি হতে পারত। হিন্দু নারীর অতি স্থূল সতীত্ব-গৌরব প্রচারের অপপ্রয়োগ সব পণ্ড করেছে। এই গ্রন্থের দলনীও একটি চিরস্মরণীয় সৃষ্টি শিল্পী বঙ্কিমের এক নিখুঁত মানসকন্যা, এক মুহূর্ত নারী মহিমা।' (আহ্‌মদ শরীফ)। বঙ্কিমের সৃষ্ট বাঙালি তিলোত্তমা ভালোবাসে রাজপুতকে, পিতা বা অভিভাবককে মানেনা। তিলোত্তমা কেবল সুন্দরী নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষিতা। বিমলা তরুণী নয় কিন্তু জাতিনির্দেশ মানেনা। কুন্দনন্দিনীকে বঙ্কিম কুসুমকোমল

করেছেন, তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মেয়ে-চরিত্র ভ্রমরকে দিয়ে অপদার্থ স্বামীকে এমন চিঠি লিখিয়েছেন, যা অনেক পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' মনে পড়িয়ে দেয়। মনে ভেসে আসে মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা। বঙ্কিমের উপন্যাস সমালোচনা এখানে করছি না, কেবল দেখছি তার সৃষ্টির সাহস বৈচিত্র্য, দূরদর্শিতা যা সমকালীন পরিস্থিতিতে বিস্ময়কর।

'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি নিয়ে বঙ্কিমকে অভিবাদন জানিয়ে পুনর্মুদ্রণে আপত্তির জন্য অভিশাপ দেবার দুর্মতি পরিহার করাই উচিত। দেশের রাজনীতি যেখানে নিবীর্য, সমাজজীবনে মান্ধাতাগন্ধী, মনুবাদী, ভীরু, স্থানু, মস্তিষ্কহীন কর্মশক্তিহীনতার আধিপত্য, সাম্রাজ্যতন্ত্রের শোষণে অল্প কিছু লোককে বাদ দিলে 'জীবনধনদীন' অবস্থান যখন প্রায় সকলের, তখন কেমন করে ভাবি যে একজন বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম পরিত্রাণ-ঘটিয়ে দেবেন? কারণ বিনা কার্য নেই, আমাদের দুর্দশার হেতু সন্ধানের কাজ তো আজও চলছে। ইতিমধ্যে কৃতজ্ঞ থাকি বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের মতো বেদনাদীর্ণ অথচ উচ্চশির মনীষা ও মানবিকতার মহিমা দেখে। আর একটু জাঁক করে বলি যে 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এর আলোক না পেয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় একশো বছর আগে রামপ্রসাদ সেন গেয়েছেন 'মন তুমি কৃষিকাজ জানো না/এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা' আর শ্রেণীভেদতত্ত্বের ধারণা ধরে বলেন ''করুণাময়ি, কে বলে তোকে দয়াময়ী?/কারও দুগ্ধেতে বাতাসা। আমার এম্‌নি দশা/শাকে অন্ন মেলে কই?/কারো দিলি মা, ধনজন, হস্তী অশ্বরথচয়/মাগো, ওরা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি বুঝি তোর কেউ নই?'' একই সঙ্গে ভাবি একেবারে সমাজের দীন বঞ্চিত নিম্নতম স্তর থেকে আসা অনামা কবি 'মোমিন' হয়তো বাউলদর্শনের সুবাদে 'রেনেসাঁস'-এর নামগন্ধ না জেনে লিখলেন : ''নানারঙের গাভীরে দেয়/একই বরণ দুধ/জগৎ ভরমিয়া দেখি-একই মায়ের পুত!'' এই হতদরিদ্র স্বদেশকে বড়ো বেশি ভালোবাসার দাম দিতে হয়েছে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমদেরই।

কত সহজ সুন্দর ভঙ্গিতে বনিয়াদী কথা বলতেন বঙ্কিম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পাওয়া একটি উদাহরণ : ''Wealth হচ্ছে—গোবরের মতো। এক জায়গায় ডাঁই করলে বেজায় দুর্গন্ধ। অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে দিলে জমি হবে শস্য শ্যামলা। ছ'জন বিরাট ধনী। আর ষাটলক্ষ না খেয়ে মরে! এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু আছে জগতে?'' আজকের দুন্দুভিনিনাদিত 'বিশ্বায়ন'-এর কল্যাণে এই অন্যায়কেই দেখছি আর সইতে বাধ্য হচ্ছি 'ডুবিয়াই যখন গিয়াছি তখন আর দুর্গানাম জপিয়া কি হইবে?'

কারও নাম 'জপিয়াই' কিছু হবার নয়, 'আগুনের পরশমণি' জগৎ জুড়ে মানুষের প্রাণ স্পর্শ আজ না হোক্ একদিন করবে-ই। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, চলে গেলেন, দোষেগুণে রেখে গেছেন এমন মানবমহিমা যা যে-কোনো কালে বিরল। বাঙালির মনোমুকুরে সেই তেজঃপুঞ্জ অবস্থিতি চিরন্তন হয়ে থাকবে, অন্তত যতদূর ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টি যায়।

বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

'শের-য়ে-বঙ্গাল' ফজলুল হক

বাংলার বাঘ-বলতে সচরাচর আমরা বুঝি স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিদ্যাবারিধি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু সর্বভারতীয় সমাবেশে মুসলিম লিগের ১৯৩৭ অধিবেশনে লখ্নউ শহরের জনাকীর্ণ মণ্ডপ গম্‌গম্‌ করে উঠেছিল ফজলুল হকের নাম 'শের-য়ে-বঙ্গাল' জয়ধ্বনিতে। এই মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) সুচতুর জিন্নাহ্‌ সাহেব (তখন লিগের সর্বময় কর্তা) বাছাই করেছিলেন এই ফজলুল হককে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য। দেশভাগের সময় পাকিস্তান গঠন বিষয়ে সেই প্রস্তাব অবশ্য পুরোপুরি মানা হয়নি। কিন্তু তা হল ভিন্ন কথা। তবু ফললুল হক সাহেবের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ করা যাক তাঁর বহু বিচিত্র বিতর্কিত আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ণময় জীবন ও কীর্তি। মুসলিম লিগের উল্লেখ শুনেই যাঁরা প্রকুপ্ত হতে পারেন, তাঁদেরই জানা দরকার যে একটা সময় ছিল আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে, যেমন ১৯১৬ থেকে দশ বছর, যখন কংগ্রেস আর লিগের মধ্যে দূরত্ব ছিল অল্প। ১৯১৬ সালে লখ্নউ কংগ্রেসে 'হিন্দু-মুসলমান চুক্তি' গৃহীত হয় আর বিপিনচন্দ্র পাল লিগের সভায় ভাষণ দেন। ফজলুল হক তখনই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপরিচিত; ১৯১৮ সালে যখন কংগ্রেস ও লিগ উভয়েরই অধিবেশন হয় এলাহাবাদে, তখন হক সাহেব একই সঙ্গে লিগের সভাপতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক! গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও জনজীবন থেকে ফজলুল হকের অবস্থান কখনও দূরে থাকেনি।

কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই জন্মবার্ষিকী প্রতিপালন খুবই সঙ্গত এবং আজকের দিনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বায়ত্ত শাসনমূলক আইনের প্রবর্তক, সেই আইন অনুসারে কলকাতার প্রথম নির্বাচিত 'মেয়র' হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর 'ডেপুটি' হলেন হুসেন শহীদ সোহ্‌রাবর্দি (যিনি তখন কংগ্রেসী!)। তখনই কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্তা হলেন তরুণ কর্মী সুভাষচন্দ্র বসু আর সহকারী হিসাবে দেশবন্ধু নিয়ে এলেন নোয়াখালির প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা হাজি আবদুর রশিদকে। যাই হোক দেশবন্ধুর তিরোধানের পর থেকে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী সাধনে কুচক্রীরা নানা বাধা সৃষ্টি করল। যার সুরাহা যথাযথ না হবার মাশুল সুদে আসলে গোটা দেশকে দিতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। ফজলুল হকের মর্যাদা (বহু বিতর্ক সত্ত্বেও) এমন ছিল যে তিনি একবার 'মেয়র' নির্বাচিত হলেন। এর উল্লেখ করছি এজন্য যে বাংলায় চিরাচরিত দলাদলির প্রাবল্যে একবার সুভাষচন্দ্রকে 'মেয়র' নির্বাচনে (বোধহয় ১৯২৭) রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায় অপরিচিত এক 'লিবারল' বিজয়কুমার বসুর কাছে হারতে হয়েছিল। ফজলুল হকের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও আর একজন কংগ্রেস-লিগ উভয়েরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তেজস্বী মুসলমানকে কলকাতা 'মেয়র' পদে বসিয়েছে; তিনি হলেন আবুদর রহমান সিদ্দীকি, অবাঙালি হয়েও কলকাতারই মানুষ।

ফজলুল হকের সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বের চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গ পরিচয় হল তাঁর 'বাঙালিয়ানা', যার অস্তিত্ব বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বোধ হয় বাংলাদেশে বেশি দেখা যায়। সেখানকার প্রখ্যাত বিদ্বান সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ-এর ভাষায় ফজলুল হক ছিলেন "এই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা" এবং তাঁর সময়কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মুসলিম নেতা বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না।' (দ্রষ্টব্য "বাংলাদেশ ঃ জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, 'ঢাকা ১৯০৩, পৃ. ৬০)। অনেক ঝড়ঝাপ্টা হক সাহেবের জীবনকে বিধ্বস্ত যখন করেছে তখন অতি স্বল্পকাল ঘটনাপ্রবাহে বিরোধী যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হবার সময় (১৯৫৪) সবাই শুনেছে তাঁর সাহসী ঘোষণা (যার মূল্য দিতে হয়েছিল) "দুই বাংলার বাঙালি চিরকাল এক বাঙালিই থাকবে।" এবম্বিধ বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গে বিরল কিন্তু বাংলাদেশের বিদ্যানুরাগী মহলে আজও শোনা যায়। খুবই আনন্দের কথা হবে যদি অন্তত দুই বাংলায় "শের-য়ে-বঙ্গাল" ফজলুল হকের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী সোৎসাহে প্রতিপালিত হয়।.

'স্বদেশী যুগে' যে জেলার গৌরবময় অবদানের জন্য তাকে 'পুণ্যে বিশাল' বলা হয়েছিল পূর্ব বাংলার সেই বরিশাল জেলার গ্রামে সম্পন্ন পরিবারে ফজলুল হক-এর জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে আইন ব্যবসায় প্রতিপত্তির ফলে কলকাতায় বসবাস সত্ত্বেও গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক, বাংলার গ্রামীণ জীবনের নাড়ি নক্ষত্রের জ্ঞান, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে খোলা মনে দরাজ ব্যবহারে অভ্যস্ত মানুষটি যে দেশের সমসাময়িক জীবনে বড় জায়গা পাবেন, তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। স্বভাবত তেজস্বী ফজলুল হক ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন আর সম্ভবত তাঁরই মতো মুসলিম যুবসম্প্রদায়ের মনে ইংরেজ শাসনের বিপক্ষে বিক্ষোভ বৃদ্ধির কথা লিগ প্রতিষ্টার পূর্বে আগা খাঁর নেতৃত্বে 'রাজভক্ত' মুসলিম নেতাদের বড়লাট মিন্টোর কাছে পেশ করা বিবৃতিতে বর্ণিত হয়েছিল। যাই হোক হক সাহেব কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করে ১৯১২ সালে সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে নামেন। অনতিবিলম্বে এই উপমহাদেশের প্রধান রাজনীতিবিদ্দের মধ্যে স্থান তিনি পান।

এটা মনে রাখা উচিত যে তখনও পর্যন্ত আবদুল রসুলের 'স্বদেশী' যুগের নেতাদের মতো ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ছিল নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী (ইংরেজ শাসনে 'প্রিভি কাউন্সিল'-এর' প্রথম ভারতীয় সদস্য) কিংবা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ-এর (যিনি স্বদেশী আন্দোলনে 'আকৃষ্ট', হবার লক্ষণ দেখাতেই ইংরেজ সরকার বিপুল অর্থ সাহায্য করে মতিগতি বদলিয়ে দেয়) মতো অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির হাতে। এঁরা এদেশবাসী হয়েও অনেকেই 'বাংলাভাষী' ছিলেন না, যা দেখা যায় 'স্যর' আবদুর রহিমের মতো বহু গুণান্বিত মানুষের ক্ষেত্রেও। ফজলুল হক ছিলেন আলাদা জাতের মানুষ, আর কিছু পরিমাণে অস্থিরমতিত্বের জন্য খেসারত দিতে হলেও তিনি আজীবন মাথা উঁচু রেখেই দেশের জীবনে স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন। গত একশো বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও ভারতীয় জননেতার মধ্যে তাঁর স্থান অকাট্য। নানা অবান্তর কারণে এটা ভুলে যাওয়া হয়

আর এজন্যই তাঁকে স্মরণ করা আজকের দিনে বিশেষভাবে সকলের কর্তব্য।

১৯১৩ সালে তৎকালীন বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে বাগ্মিতা ও চিন্তাশীলতার খ্যাতি তিনি অর্জন করেন। ১৯১৫ সাল থেকে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয় সংস্থাকে কাছাকাছি এনে প্রগতিশীল রাজনীতির আসরে হক সাহেবের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯২০-২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে (এবং বিশেষ করে খেলাফৎ সমস্যা বিষয়ে গান্ধীজী মুসলমানকে 'কোল' দেবার ফলে) মুসলিম সমাজ বিপুল সাড়া দিলেও ফজলুল হক সেই আন্দোলনে যোগ দেননি। 'অসহযোগ' নীতির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে (গান্ধীজীর 'বয়কটের' কারণে) পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের ক্ষতি ভেবেই হয়তো সেদিনের উন্মাদনা থেকে তিনি দূরে ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রগামী পরিচয় তাঁর ছিল। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে আইনসভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের নীতি প্রয়োগ করে বাংলার মুসলমানদের কাছ থেকে সাড়া পেয়ে 'বেঙ্গল প্যাক্ট্' নামে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। আইনসভা ইত্যাদিতে এবং সরকারি কর্মস্থানে মুসলমানের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে বাস্তবিকই তখন মুসমানদের চিত্ত জয় করেছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেসে অনেকের বিরোধিতাকে পরাস্ত করেও তিনি ১৯২৩ সালের শেষ দিকে কোকোনাদা কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বেঙ্গল প্যাক্ট্'-এর সমর্থন সংগ্রহ করতে পারলেন না। গোটা দেশের জন্য একটি অনুরূপ চুক্তি প্রণয়নের অজুহাতে 'বেঙ্গল প্যাক্ট্' শিকেয় উঠল। নাম-কা-ওয়াস্তে সর্বভারতীয় চুক্তির ভার দেওয়া হল লালা লাজপত রায় ও ডাক্তার আন্‌সারির হাতে, যদিও সবাই জানত যে দুজনের মতভেদ এত বেশি যে সবকিছু ভেস্তে যাবে, আর তাই হল।

ফজলুল হকের মতো প্রায় সবাই তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে দেশবন্ধুর সাফল্য চাইলেও দেশের দুর্ভাগ্য যে এভাবে বাংলায় হিন্দু মুসলিম মৈত্রী দেদীপ্যমান হয়ে উঠে গোটা দেশকে নতুন রাস্তার দিশারি হতে পারল না। হিন্দু জমিদার ও তাদের সহায়ক শ্রেণী কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটল। দেশবন্ধুর মোহনীয় নেতৃত্বও ব্যর্থ হল। 'জমি যার, লাঙ্গল তার' বলে আওয়াজ তখনও জোরদার হয়নি। কিন্তু বাংলার চাষী (যারা দেশের মেরুদণ্ড আর যাদের মধ্যে মুসলমান সংখ্যাগুরু) দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলল। আরম্ভ হল এরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথে বাধার পর বাধা। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলার স্বরাজ্য পার্টি 'বেঙ্গল প্যাক্ট্' বাতিল করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপুলভাবে ব্যাহত হল, আর স্বীকার না করে উপায় নেই যে ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষেরই বহু দুর্বলতা প্রকাশ হতে থাকার পরিণামে ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে খণ্ডিত করার অভিশাপ মাথা পেতে নিতে সবাই বাধ্য হলাম।

ফজলুল হকের মতো মানুষকে দেখলাম ১৯২৯ সালে নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা পার্টি নামে নতুন দল গঠন করতে। তাঁকে দেখা গেল 'নবযুগ'-এর মতো সংবাদপত্র পরিচালনা করতে, যেখানে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের মতো বিরল বিপ্লবী স্থান পেয়েছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে যে বহু সংখ্যক বাঙালি মুসলমানকে রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা

যায়, তাঁরা অনেকে কৃষক প্রজা পার্টির দিকে আকৃষ্ট হলেন। বর্তমানে প্রায় বিস্মৃত অথচ বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা, জনসেবায় আগ্রহী এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য গুণসম্পন্ন হুয়ায়ুন কবিরের মতো মানুষকে এঁদের মধ্যে ধরা যায়। আমার মনে হয় যে বর্তমানে ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলায় মুসলমানের অবস্থানে যে অদ্ভুত নিষ্প্রভতা দেখা দিয়েছে, সে তুলনায় প্রাক্ স্বাধীনতা অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানদের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। খুঁটিনাটি বাদ দিয়েই বলি যে পূর্বেকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ ছিলেন 'স্যর' সৈয়দ শামসুল হুদা, যিনি ছিলেন প্রমুখ কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদের আইন ব্যবসায়কালে তাঁর 'সিনিয়র' ('Senior'), এবং তাঁরই বাড়িতে (নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও) বাস করার অভিজ্ঞতা জীবনস্মৃতিতে বর্ণনা করে বহু গুণকীর্তন করেছেন। মনে পড়ছে 'স্যর' আজিজুল হক-এর কথা তিনি ব্যবস্থাপক সভার অধ্যক্ষ হয়েছেন, বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্যান্য পদ অলংকৃত করেছেন আর আজকের রাজনৈতিক জগতে চিন্তাহীনতার আবহাওয়াতেও ভরসা করি বিস্মৃত হবেন না অন্তত তাঁর লেখা (১৯৩৭/৩৮ সালে প্রকাশিত) 'The Man Behind the Plough' গ্রন্থের জন্য। আমার ব্যক্তিগত দুঃখ এই যে ফজলুল হক মুসলিম লিগে একই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত হয়ে একটা অদ্ভুত অবস্থানে ছিলেন বলেই হয়তো স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলায় মুসলিম লিগের সম্পাদক, চিন্তাশীল বিবেকবান সদাচারী আবুল হাশিমের সঙ্গে স্বচ্ছ মনে একযোগে কাজ করতে পারেন নি। এবং ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ; হক সাহেবের মধ্যে একটা অশান্ত অস্থিরতা; নীতি নির্ধারণে শৈথিল্য, দরাজ চরিত্রের মানুষ হয়েও কৌশলীদের হাতে পড়ে ভুল পথে যাবার প্রবণতা ছিল (সঙ্গে সঙ্গে মামুলি রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকার মানসিক সঙ্গতি সত্ত্বেও)। যা হাশিম সাহেবের মতো স্বভাবত সত্যসন্ধ জনসেবকের মানসিকতার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। এটাই দেখা গিয়েছিল যখন শরৎ বসুর সঙ্গে মিলে হাশিম সাহেব (এবং কতকটা হুসেন সোহরাবর্দিও) ভারত বিখণ্ডীকরণ সত্ত্বেও বাংলাকে অটুট রাখার যে অতি বিলম্বিত প্রচেষ্টায় নামলেন। হক সাহেবের মানসিক সাযুজ্য ছিল সেই প্রয়াসে, কিন্তু তা কার্যকরী হল না। এর বহু কারণ আছে, যা হয়নি তা নিয়ে হা হুতাশ বৃথা, তাছাড়া সেদিনের অগ্নিগর্ভ আবহাওয়ায় আর পাঁচ শতাধিক 'নেটিভ' রাজ্যে গণ্ডগোলের ভয় এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী কূটকৌশল সামলে ওঠা লড়াই বিনা সম্ভব ছিল না। সে লড়াইয়ের জন্য কংগ্রেস তৈরি ছিল না, ইচ্ছুক ছিল না। আমরা বামপন্থী বলে এ নিয়ে বড়াই করার অধিকারী নই; আমরাও দেশ বিভাগের যে অভিশাপ তাকে ঠেকাবার কাছে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারিনি; এর 'দায়ভাগে' আমরাও 'অংশীদার।'

মোটামুটিভাবে ফজলুল হকের সমসাময়িক এবং কতকটা তুলনীয় কয়েকজন মুসলিম নেতার কথা মনে পড়ছে। স্মৃতির উপর নির্ভর করে দ্রুত লিখে চলেছি। তাই বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না, ভুল ভ্রান্তিও থেকে যাবে। প্রথমে মনে আসছে আমার বিশেষ সম্মানীয় বন্ধু নওশের অলী সাহেবের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভাবি শামসুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশমি (প্রায় পঙ্গু হয়েও বেশ কিছুকাল ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি স্পীকার), তরুণতর 'লালা মিঞা' প্রমুখ স্মরণীয় সাংসদের কথা। মনে পড়ছে ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার অনুযায়ী ১৯৩৭-এর

নির্বাচনে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি প্রভূত সাফল্য পাবার পর তিনি হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে এলেন আর শরৎচন্দ্র বসু স্বয়ং উঠে এসে আলিঙ্গন করেন, সবাই উল্লসিত হয়ে দেখল। অনেকেরই আশা ছিল যে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে হক সাহেব মন্ত্রিসভা গড়বেন, কিন্তু তা হল না। কংগ্রেসেরই অনীহা এর মূল কারণ, আর শীঘ্রই দেখা গেল বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রায় অটল কৃষক স্বার্থবিরোধী মনোভাব। Bengal Agricultural Debtors Act-এর মতো আইনেও জমিদার মহাজনদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত কংগ্রেসের সায় ছিল না; বাংলার মেহনতী জনতার মধ্যে এভাবে এমন এক বিকট ব্যবধানের বীজ বপন করা হয়েছিল। (যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসুর মতো নেতা থাকা সত্ত্বেও) যে তারই কুফল ফুটে উঠল বাংলা আর পাঞ্জাবে (উভয় প্রদেশেই মুসলিম লিগ বেশ কিছুকাল দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও) আর দেশবিভাগের সাজা আমাদের মাথায় বাজের মতো পড়ে স্বাধীনতার আনন্দ আর উদ্দীপনাকেই ডুবিয়ে দিতে পারল।

একধরনের অদ্ভুত অস্থিরমতিত্ব সত্ত্বেও ফললুল হকের তেজস্বী আত্মবিশ্বাস আজীবন তাঁকে এক বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যে ভূষিত করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবে হৃদয়বত্তা ও আবেগপ্রবণতা ভুল পথে ঠেলে দিলেও তিনি কখনও নিজস্ব স্বকীয়তা হারাননি। মুসলিম লিগে থেকেছেন, আবার থাকেননি, লিগের ১৯৪০ লাহোর অধিবেশনে তিনিই পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের ভার পান (যদিও 'পাকিস্তান' বিষয়ে সেদিনের পরিকল্পনা পরে বিকৃত হয়ে যায়), অথচ জিন্নাহ্-এর অবাধ একনায়কত্ব মানতে পারলেন না বলে তার পূর্ণ আস্থা পেলেন না। দেশ ভাগের পর স্বভূমি বরিশালে গিয়েও চুপচাপ থাকেনি। জিন্নাহ্-এর মৃত্যু আর লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ডের পর দেশকে বাঁচানোর জন্য মওলানা ভাসানি প্রমুখকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়লেন আর লিগকে হারিয়ে মুখমন্ত্রী হলেন ১৯৫৪ সালে। তখনই উর্দু ভাষা বাংলার ওপর চাপাবার বিরাট লড়াইয়ের সূচনা আর সেজন্যই কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার হক সাহেবের মুখ্যমন্ত্রিত্ব খারিজ করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে তৎকালীন স্বৈরশাসন ফজলুল হক কিম্বা আবুল হাশিমের মতো মানুষকে সহ্য করতে পারল না, কিন্তু ওদেরই অলক্ষ্য প্রভাবে গড়ে উঠেছিল এমন পরিস্থিতি যা ঘটাল বাংলাদেশের 'তিমিরবিদার-উদার-অভ্যুদয়', দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও যা এই উপমহাদেশে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা নির্মাণ করল।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে (তখন বলা হত 'প্রধানমন্ত্রী'), ফজলুল হক নানাদিক থেকে ব্যর্থ মনোরথ হলেও এমন স্পষ্টবাদিতা ও সাহস দেখিয়েছিলেন যা আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। খুব সংক্ষেপে এখানে জানাই ২ আগস্ট ১৯৪২ তারিখে আভিজাত্যগর্ব জবরদস্ত লাট Sir John Herbert-এর ঔদ্ধত্যের জবাবে হক সাহেবের চিঠির কথা। সরকারি কাজে লাটসাহেবের হস্তক্ষেপ মানতে পারবেন না বলেছিলেন অকুণ্ঠে, উচ্চস্বরে। 'যুদ্ধের প্রয়োজনে' বাংলার জনজীবনে দুঃখ দুর্দশা বিকটভাবে বাড়ানো হচ্ছে বলে তাঁর প্রতিবাদ। দেশজুড়ে অসন্তোষের আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছিল, আর তারই প্রতিধ্বনি হক সাহেবের চিঠিতে : "As the head of the Cabinet I cannot possibly allow this attitude on your part to go unchallenged...I have detected your personal inter-

ference in alomost every matter of administrative detail. You sould allow Provincial Autonomy to function honestly rather than as a cloak for autocratic powers as if the province was being governed under section 93 of the Act" অনুবাদের দরকার নেই কিন্তু ভদ্র, সংসদীয় নীতিসঙ্গত ভাষায় এমন চপেটাঘাতে অহঙ্কারী শ্বেতাঙ্গ লাটসাহেবের গণ্ডদেশ যে রক্তিম হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। হক সাহেবকে এর মূল্যও দিতে হয়েছিল, তাঁকে অনতিবিলম্বে হটতেও হয়েছিল। কিন্তু পরাধীনতার যুগে এ ধরনের সৎ সাহস দেখাবার মতো মানুষ উচ্চপদস্থদের মধ্যে একান্ত বিরল।

এরই সঙ্গে মনে পড়ছে স্বাধীনতাপূর্ব যুগেই ২৯ মার্চ ১৯৪৫ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধ্যক্ষ (speaker) সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের অবিস্মরণীয় উক্তি যা এ দেশের সংসদীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত। ব্যবস্থাপক সভায় পরাজিত সরকারকে বাঁচাবার যে চেষ্টা লাটসাহেব তখন করেন, তাকে নাকচ করে দিয়ে তিনি অকুতোভয় ঘোষণা করেন : "The Ministry is the creature of the House; The House can make or unmake The Ministry and **the Governor is but the registering authority of the decision of the House**"। দেশ যখন পরাধীন, যুদ্ধকালীন কড়াকড়ি যখন কঠোর, তখন এই উচ্চারণ বাস্তবিকই দেশের মানুষকে বুকে বল এনেছিল। এই 'নির্দেশ' ছিল বলে স্বাধীনতা পরবর্তী বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের অনধিকার চর্চাকে বাধা দেবার নৈতিক সঙ্গতি পেয়েছিলেন। ফজলুল হককে স্মরণ করার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই শ্রদ্ধেয় বন্ধু নওশের আলী সাহেবকেও অভিবাদন জানাই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেল। তবুও অবশেষে আমার মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করতে চেয়েই একটি কথা জানাতে চাই। ফজলুল হকের মতো দেশব্রতী বাঙালির কথা আজকের ভারত রাষ্ট্রে এবং বামপন্থী শাসন পশ্চিমবঙ্গেও মুসলমানদের কেমন যেন সংকুচিত ও এখনও মূলত বঞ্চিত অবস্থান দেখে কষ্ট হয় আর ভয় হয় যে এখানে (বিশেষত বি জে পি কেন্দ্রে বহাল হাওয়ার ফলে) কার্যত 'ধর্মনিরপেক্ষতার' মুখোশ ছিঁড়ে গিয়ে 'হিন্দুত্ববাদে'-রই আধিপত্য যেন চলেছে। বিরল আনন্দ পেয়েছিলাম যখন বছর খানেক আগে কলকাতা কর্পোরেশন সংবর্ধনা জানায় পশ্চিমবাংলার গ্রামের ছেলে, অর্ধ পঙ্গু অবস্থায় দুটি কাঠের পা নিয়ে যে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার দিয়ে পার হয়েছে সেই মসুদুর রহমানকে। তার এই চমকপ্রদ সাফল্যে যেন দেখেছিলাম মুসলিম জনসাধারণেরই অগ্রগতির সূচনা। কিন্তু তারা এখনও অনেক পিছিয়ে; পাঁচজন বাঙালির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে একজন মুসলমান হলেও জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তারা যেন পশ্চাদপদ। এর সংশোধন কেমন করে হবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ, কিন্তু কেন এমন হতে থাকবে? সবাই যথেষ্ট ভাবিত হচ্ছি বলে তো মনে হয় না।

আসন সংরক্ষণ সমস্যার সমাধান নয় জানি, কিন্তু এটা কি চিন্তার বিষয় নয় যে ১৯৯৬ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন মাত্র ২১ জন মুসলমান? ১৯৫৭ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হন মাত্র ১৯ জন মুসলমান; ১৯৬২ সালে ২০; ১৯৬৭ সালে ২৮; ১৯৭১ সালে ২৪; ১৯৭৭ সালে ৩১; ১৯৮৪ সালে ৪৪; ১৯৮৯ সালে ২৭; ১৯৯১ সালে ২৫! 'টেলিগ্রাফ'

দৈনিকে ৭ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে একটি প্রবন্ধে দেখি যে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ওড়িশা, রাজস্থান আর তামিলনাড়ুসহ কুড়িটি রাজ্য থেকে একজন মুসলমানও জেতেননি। এটা ঘটেছে যদিও সারা দেশে শতকরা বারো হল তাদের জনসংখ্যা। শুধু মুসলিম নয়, এভাবে বঞ্চিত তফসিলি জাতি উপজাতির কম বেশি পরিমাণে 'দলিত' যারা। সরকারি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় মুসলিম অনুপাত হল ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে শতকরা মাত্র দুই; ডাক্তারদের মধ্যে তার শতকরা ২.৫; 'আই-এ-এস' শতকরা ২.৮৫; আই পি এস, শতকরা ২; ইনকাম ট্যাক্স অফিসার শতকরা ৩.০১; ক্লাস ওয়ান অফিসার শতকরা ৩.৩; ব্যাঙ্ক কর্মচারী শতকরা ২.৮। ব্যক্তিগত মালিকানায় এর চেয়ে একটু ভালো অবস্থা : শতকরা প্রায় চার! এটাই কি চলবে?

পশ্চিমবাংলায় লেখাপড়ায় মুসলিম ও অন্যান্য বঞ্চিতরা যে ক্রমাগত পিছিয়েই রয়েছে এটা কি ঠিক? আমি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বার হবার সময় বছরের পর বছর দেখে আসছি যে প্রথম পঞ্চাশ কি একশো সফল প্রার্থীরা প্রায় সকলে বর্ণ হিন্দু—মুসলমান ও হিন্দুদের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর দু'একজন ছিটকে-ছাটকে থাকতে পারেন। ভারি খারাপ লাগে যখন দেখি সাহিত্যিক শিল্পী প্রভৃতিদের সম্মেলনে বাঙালি মুসলিম উপস্থিতি একেবারে অত্যন্ত কম। বাংলা আকাদেমির দুটি প্রধান কমিটিতে ৭০/৭২ জনের মধ্যে মাত্র একজন মুসলিম।

রবীন্দ্র জন্মপক্ষ উপলক্ষে উৎসবে বাংলা আকাদেমি আমন্ত্রণ (১-৫-৯৮) করলেন দুদিনব্যাপী উৎসবে চল্লিশজন গুণীকে, যাদের মধ্যে মাত্র একজন মুসলমান আর বাকি সবাই বর্ণ হিন্দু শুধু নয়, 'দ্বিজ'! ১৪ মে ১৯৯৮ তারিখে আকাদেমি কবি সম্মেলন ডাকলেন ৪১ জনকে যারা সবাই উচ্চবর্ণের হিন্দু! পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ 'কমিটি' নিয়োগ করলেন (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭)। যার সভ্য সংখ্যা বত্রিশ, যার মধ্যে একমাত্র মুসলমান হলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ পদাধিকারী হাশিম আব্দুল হালীম! হাতের কাছে কাগজটা নেই কিন্তু মনে পড়ছে যে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গানের বিরাট আসরে হয়তো বাংলাদেশ থেকে নিমন্ত্রিত দু-একজন থাকলেও পশ্চিমবাংলায় মুসলমান একজন নেই। হয়তো—হয়তো কেন, এটাই 'বাস্তব'—কিন্তু কী ভয়ঙ্কর বাস্তব! এর সঙ্গে কত কথাই জড়িত রয়েছে যা কি আমাদের যন্ত্রণা দেয় না?

ঐতিহাসিক কারণেই গান্ধী কথিত 'heart unity' ('ছাতি সে ছাতি মিলানা') আজও ঘটেনি। এর আভাস দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তো কতবার সবাইকে ডাক দিয়ে গেছেন, কিন্তু (আজ, যখন লিখছি ৫ ডিসেম্বর, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের স্মৃতি মনে রেখে) জোর করে আশা করতে চাইছি রবীন্দ্রনাথ কথিত 'মহাভারতবর্ষে' একদিন আমরা সবাই বাস করব—ফজলুল হকের মতো দোষে গুণে ভরা অথচ বৃহৎ ও মহৎ মানুষকে এ জন্যই স্মরণ করছি, অভিবাদন জানাচ্ছি।

'পুরশ্রী' ফজলুল্ হক্ বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ২১, সংখ্যা ১০

ফিরে দেখা, সামনে তাকানো

সতত সঞ্চারমাণ এই সীমাহীন বিশ্বে অতি ক্ষুদ্র অথচ মনোহর এক গ্রহে মানুষের বাস। কাল নিরবধি, তার আদি অন্ত নেই। নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান এক নদীর মতো তার অবারিত গতি। কোথাও কোনো ছেদ সেখানে নেই। প্রকৃতির পরিচয় মানুষকে নিতে হয়েছে আর তার বিধান জানার প্রয়োজন ঘটেছে নিছক অস্তিত্বের তাগিদে আর দৈনন্দিন কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। জীবজগতে মানুষই তার চেতনা আর ক্রমশ আয়ত্ত কর্মকৌশলের কল্যাণে অর্জন করেছে জ্ঞান, যে-জ্ঞানই হ'ল শক্তি, প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করার প্রয়োজনে তার নিয়ত প্রয়াসের ভিত্তিভূমি। এই মানুষ "নিরবধি কাল"-কে ভাগ করেছে নিজের জীবনের প্রয়োজনে, 'মিল্লিসেকেন্ড' থেকে 'মিলেনিয়ম'-এর ধারণা উদ্ভাবন করেছে।

পৃথিবীর নিত্য বিঘূর্ণন-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন বদলায়, আসে সপ্তাহ আর মাস আর বর্ষের পর বর্ষ। এবার কোনো কোনো বিদ্বানের গাণিতিক আপত্তি সত্ত্বেও আসছে শুধু যে নববর্ষ তাই নয়, নব শতাব্দী আর নব সহস্রাব্দ। স্বভাবতই বহু অনুষ্ঠান হবে, বিত্তবানদের বিবিধ বিলাসব্যসনের ব্যবস্থা ঘটবে, নব সহস্রাব্দের প্রথম সূর্যোদয় দেখতে আন্দামান বা অরুণাচলে যাবার জন্যে আকুলতা অনেকের মনে আসবে। সচরাচর নববর্ষ উপলক্ষেই বিত্তবানদের নানা উৎসবে মেতে উঠতে দেখা যায়; এবার তা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবারই সম্ভাবনা। যারা নির্বিত্ত, যে মেহনতী মানুষ 'দিন আনে দিন খায়', গতর খাটিয়ে কোনোক্রমে জীবনের সংস্থান করে, তাদের কাছে বর্ষারম্ভ বা বর্ষশেষ নিয়ে আমোদপ্রমোদ হৈ-হল্লার প্রশ্নই ওঠে না, তবে সবাই দেখে এধরনের উপলক্ষে সমাজের আর এক চেহারা। এর একটা কল্যাণকর দিকও আছে। "নব বরষেথে করিলাম পণ/লব স্বদেশের দীক্ষা"—বাংলার 'স্বদেশী' যুগে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন। আজ শতাব্দী ও নব সহস্রাব্দের সূচনাকালে যারাই পারি তারা যেন সংকল্প গ্রহণ করি এমন কাজ সবাই মিলে করতে চাই যাতে দেশ আর দুনিয়া এগিয়ে চলবে। "সকল জন সুখী হোক", "সবাই সর্বত্র যেন আনন্দ করতে পারে", এধরনের সুপ্রাচীন মানবমন্ত্র যেন সার্থক হয়।

পরাধীন যখন আমরা ছিলাম, তখন আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে কবিকণ্ঠে শোনা গিয়েছিল "পরো দীপমালা নগরে নগরে/তুমি যে তিমিরে তুমি সে-ই তিমিরে।" এই সহস্রাব্দকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জগৎ জুড়ে অসংখ্য আনন্দ অনুষ্ঠান হবে, আলোকমালায় শহর সাজানো হবে, কিন্তু ভুলি কেমন করে যে বাস্তবিকই দুনিয়ার দুর্দশা বিশেষত সম্প্রতি আরও ঘনিয়ে এসেছে। সমাজবাদ-সাম্যবাদ নানা কারণে আপাতত রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়ার অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিকরূপে শুধু এদেশের নয় গোটা দুনিয়া জুড়ে নৈতিকতার অবক্ষয় বেড়ে চলেছে, রাজনীতি অর্থনীতি কেবল নয়, জীবনের সর্ববিধ স্তরে সুনীতির অন্তর্ধান দেখা দিয়েছে। স্বার্থ সাধনের মোহে নতুন প্রজন্ম যেন মজে যাবার উপক্রম ঘটেছে আর আদর্শ আবেগ-অনুপ্রেরণা প্রত্যয় নিষ্ঠা উদ্দীপনা সবই বুঝি হারিয়ে যেতে চলেছে। ঘনায়মান অন্ধকারে অন্তত

কিছু সুলক্ষণ যে নানা দেশে দেখা যায়নি তা নয়, কিন্তু এখন বুঝি দুর্লক্ষণগুলো অনেক বেশি। আজ যখন লিখছি তখন খবরের কাগজে দেখি যে, এশিয়ার বুকে সাম্রাজ্য শক্তির শেষ ঘাঁটি ম্যাকাও পর্তুগীজ অধিকার থেকে স্বভূমি চীনে ফিরে গেছে। কিন্তু তাইওয়ান এখনও কার্যত সাম্রাজ্যশক্তিরই অন্তর্গত, পশ্চিম এশিয়ায় কুর্দ-দের দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এখনও রয়েছে পরপদানত জনপদ। তাছাড়া সাম্যাবদী শক্তি পিছিয়ে পড়ার ফলে তারই স্বাভাবিক মিত্র যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম তা ব্যাহত হয়েছে। দুনিয়া জুড়ে আমাদের মতো কত সদ্যস্বাধীন দেশ অর্থনৈতিক চাপে বিত্তবান কয়েকটি দেশের সঙ্গে নতুন এক "Subsidiary Alliance"-এ আটক পড়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে, প্রকৃত গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ মিলছে না। আশির দশক থেকে আগের চেয়ে নির্লজ্জ ও স্পষ্টভাবে 'প্রতিবিপ্লবী' শক্তি মাথা তুলে এখন দাপিয়ে চলছে।

আমাদের বুকে ধাক্কাটা বেশি লেগেছে কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে প্রত্যাশা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। ফ্যাসিস্ত শক্তি সুকৌশলী গণতন্ত্রের মুখোশ পরা সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় প্রচণ্ড বলশালী হয়ে সোভিয়েতকে নিঃশেষ নির্মূল করার জন্য ইতিহাসে তুলনাহীন রক্তক্ষয়ী যে আক্রমণ করেছিল (১৯৪১) তা সোভিয়েট পরাক্রমের প্রত্যাঘাতে ১৯৪৫ সালে বিধ্বস্ত হ'ল। প্রায় সেই বিজয় মুহূর্তে আমেরিকা সন্ধান পেয়েছিল আণবিক বোমার মতো সর্বনাশী যুদ্ধাস্ত্র আর সেই ভরসায় ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুমান্ আর ব্রিটেনের দুর্দান্ত নায়ক উন্‌স্টন্ চার্চিল মিলিতভাবে চালাতে চান "শীতল যুদ্ধ" ("Cold War") যা সোভিয়েতের ধ্বংসসাধন বিনা ক্ষান্ত হবে না বলে দুর্ধর্ষ ঘোষণা দুনিয়া শুনেছিল ("Truman Doctrine") ইত্যাদি। "সে ভয়ে কম্পিত' হয়নি সোভিয়েতের হৃদয়। কারণ দুনিয়া এগিয়ে চলেছিল দুর্জয় বেগে। তখনই দেখা দিল সমাজবাদের সঙ্গে সর্বদেশে মুক্তিসংগ্রামের নিবিড় সম্পর্ক আর বহু পরাধীন দেশের স্বাধীনতা। ১৯৪৯ সালে ঘটনা ঘটল মহাচীনের বিপুল বিপ্লব যা ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পরিপূরকরূপে সর্বত্র নন্দিত হলো। পাঁচ হাজার বছর ধরে আমাদের এই প্রতিবেশী দেশের রূপান্তর ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে আলোড়িত করলো। চীনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝা যায় ১৯৫০ সালে স্তালিনের একটা মন্তব্য থেকে। তখন মস্কোতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলকে তিনি বলেন, সোভিয়েতকে 'গুরু' ভেবে পিছিয়ে থেকো না, 'শিষ্য-এর কর্তব্য হলো গুরুর কৃতিত্ব ছাপিয়ে যাওয়া! হয়তো স্তালিনের মনে জাজ্জ্বল্যমান হয়েছিল লেনিনের কথা যে সোভিয়েত, চীন আর ভারতবর্ষ মিলে তো জগতের অধিকাংশ, সেই মিলনই দুনিয়ার চেহারা বদলে দেবে। এসব কথা আজ আকাশকুসুমের মতো শোনালেও অগ্রাহ্য করার নয়। যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে জগতের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজবাদী (বা কাছাকাছি ধরনের) রাষ্ট্রের দেখা পাওয়া গেল। "আসিবে, সেদিন আসিবে" ধরনের প্রত্যাশা আমাদের মনে পুঁতে যেতে শুরু করলো।

বহু কারণ মিলে ধনতন্ত্রের গ্লানি আর অমানবিকতা শুধু নয় সমাজবাদের তুলনায় ধনসম্পদ ঢের বেশি অগ্রসর হয়েও বাস্তব বিচারে তার ব্যর্থতা জাহির হতে থাকল বলে

সেই প্রত্যাশা আরও বাড়ল। এটা এত দূর গিয়েছিল যে বিখ্যাত "লেবর মন্থলি" পত্রিকায় আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক রজনী পাল্‌মে দত্ত ষাটের দশকের শেষদিকে লিখতে পারলেন যে ১৮১৮ সালে মার্কস-এর জন্মের একশো বছর পরে ১৯১৭ সালে যেমন সোভিয়েত বিপ্লবের জোরে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ ধনিক কর্তৃত্বের শিকল ছিঁড়েছিল, তেমনই ভাবলে বাতুলতা হবে না যে, ১৮৮৩ সালে মার্কস-এর মৃত্যুর একশো বছর পরে হয়তো পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণে আসবে। আমার বেশ মনে আছে যে সত্তরের দশকে 'স্টেটসম্যান' কাগজে বিখ্যাত সাংবাদিক Russell Warren Howe মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন যে ভবিষ্যতের যে আভাস মিলছে তা থেকে অনুমান হয় যে দুনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ অংশে সমাজবাদের দ্রুত বিস্তৃতি একেবারে অসম্ভব নয়। আরও অনেকে কথা বলা যায়, কিন্তু আমরা যেন ভুলে গিয়েছিলাম আমাদেরই অজস্র দুর্বলতার কথা। বুঝতে পারিনি পরিস্থিতির জটিলতা, সস্তায় কিস্তিমাতের সহজ স্বপ্নে একটু নিজেদেরই ভুলেছিলাম, ধনতন্ত্রের বহুকাল ধরে সঞ্চিত শক্তিকে যেন উড়িয়ে দেওয়া যাবে ভেবেছিলাম আর অন্তত আশা করেছিলাম যে হয়তো বিপ্লবের ধ্বনি তুলে বিরাট সমাবেশ ('rally') ঘটিয়ে আস্তে আস্তে শত্রুদমন করতে পারব এবং তাই প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যে সংগঠন ও সংগ্রাম শক্তিকে সর্বতোভাবে সংহত করার কাজে 'ঢিলে' দিলাম। কিন্তু ইতিহাসই তো শেখায় যা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয় না"। এ ধরনের ভুল শুধু এ দেশে নয়, তা ঘটেছে জগৎ জুড়ে। সোভিয়েত পার্টির (যা ছিল সকলের চোখে 'আদর্শ') অধঃপাত এমনই ঘটেছিল (যা দেখেও হয়তো সে দেশে সবাই দেখেনি) যে ইয়েলৎসিন-এর মতো 'দুর্বৃত্ত' (কথাটা ইচ্ছাপূর্বকই ব্যবহার করছি) আশির দশকের গোড়ায় পার্টির সর্বোচ্চ কমিটিতে স্থান পেতে পেরেছিল। গরবাচ্যভ, যাকে 'প্রতিবিপ্লব'-এর 'পালের গোদা' বলা যায়, তার বেলায় তবু বোঝা যায়। কারণ অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সে এগিয়েছিল, কেবলই গড় গড় করে 'তত্ত্ব কথা' বলে যাওয়া আর ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তার ছিল, কমিউনিস্ট 'ছদ্মবেশ'। নিখুঁতভাবে পরতে সে জানত, আর সেজন্যেই ১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত ধ্বংসের পরিকল্পনা চালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে "Socialism, More Socialism, Always Socialism" আওয়াজ ('শ্লোগান') অসংকোচে তুলে দুনিয়ার অধিকাংশ কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ভাঁওতা' দিতে পেরেছিল (সৌভাগ্যক্রমে এদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি একটু বিচলিত হয়ে পড়লেও গরবাচ্যভী ফাঁদে অন্যান্যদের মতো পা দিয়ে বসেনি)। গরবাচ্যভ-এর এই জঘন্য ভূমিকা ('প্রতিবিপ্লব' হল এমন এক বস্তু যাকে 'জঘন্য' ছাড়া অন্য কোনো বিশেষণ দিতে পারি না) আবার যেন চোখে আঙুল দিয়ে ইতিহাস দেখাল যখন, এই সেদিন, ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর বার্লিনের 'প্রাচীর' (যেখানে ছিল তার পাশে দাঁড়িয়ে গরবাচ্যভ হাস্যমুখে জার্মান নেতা হেমলুট কহল্ আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন-এর পাশে দাঁড়িয়ে বলাবলি করতে থাকল কেমনভাবে একসঙ্গে বহু বৎসর ধরে চক্রান্ত চালিয়ে 'জি-ডি-আর'কে (জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক) নির্মূল করা হয়েছিল। অনেকেরই মনে পড়বে যে ১৯৮৯ সালের ৯ অক্টোবর জি-ডি-আর রাষ্ট্রের চল্লিশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গরবাচ্যভ সেখানকার কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে

অচ্ছেদ্য বন্ধুতার কথা সাড়ম্বরে জানিয়েছিলেন যদিও ভিতরে ভিতরে পশ্চিমী শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য ইউরোপে সর্বত্র বহুকাল ধরে কুখ্যাত হলেও আজও বিদ্যমান এবং বহুস্থলে বর্ধিষ্ণু 'সোশাল ডেমোক্রোসি'র সহায়তায় সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে সংলগ্ন দেশগুলির সমাজবাদী কর্তৃত্বকে ধূলিসাৎ করার আয়োজন তৈরি করা হয়েছিল। 'দেরিতে বোঝা'র মাশুল আমাদের জগৎজোড়া আন্দোলনকে দিতেই হবে এবং হয়েছে—এটা ইতিহাসের কাছে আমাদের ঋণ। সোভিয়েত থেকে শুরু করে সব দেশের পার্টিকেই এই দায়ভাগ বহন করতে হবে।

অজস্র কথা মনে আসছে বলে ঠিক গুছিয়ে লিখতে পারছি না। ১৯৮৭ সালে মস্কোতে সোভিয়েত বিপ্লবের সত্তরতম বার্ষিকীতে যেতে পেরেছিলাম এবং অনেক কিছু দেখেছিলাম বলেই আমার এত যন্ত্রণা, এত বিড়ম্বনা। মনে পড়ছে প্রথম দিনে ফিদেল কাস্ত্রোর অনুপস্থিতি দ্বিতীয়দিনে গোমড়া মুখে (যা তার পক্ষে অস্বাভাবিক) কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান ও অতিসংক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ ভাষণ। মনে পড়ছে কতকগুলো পশ্চিম দেশের কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তৃতায় গরবাচ্যভের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, যেজন্য আফগানিস্তানর নজীবুল্লাহ-এর (যাকে কাবুলে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়) বক্তৃতায় উৎফুল্ল হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আমার একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা। মনে পড়ছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট বাসিন্দারা মস্কোতে পার্টির কংগ্রেসকালে 'নিউএজ'-এর সংবাদদাতার (মসূদ আলি খান) ঘরে দেড়ঘণ্টা ধরে আমার মতো নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির গরবাচ্যভ-ভাষণে-অত্যন্ত ক্লিষ্ট হবার বর্ণনা দেবার অভিজ্ঞতা। (সেটা টেপ করা হয়, কিন্তু পাবো কোথায়?)। মনে পড়ছে পার্টিসভা চলাকালেই একবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতা অলিভার টাম্বোর সঙ্গে দেখা হলে তাকে আমার মনোবেদনা জানাবার পর তার জবাব, যা আজও আমার কানে বাজছে : "Comrade, we have to live with all this!" ঠিক যেমন কঠিন ব্যাধি শরীরে লুকিয়ে রেখে মানুষকে অনেকসময় বেঁচে থাকতে হয় তেমনই জগৎজোড়া এই ব্যাধি—বিপ্লবভীরুতা, যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে—একে নিয়েই সমাজকে বাঁচতে হবে, কিন্তু এ ব্যাধি এমন যে মানুষের মনুষ্যত্ব যতদিন আছে ততদিন কিছুতেই একে পুষে রাখা বা আমল দেওয়া চলবে না। এ ব্যাধি সারাবার দাওয়াই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনেরাই দিয়ে গেছেন, যার আমোঘ শক্তি বিষয়ে আশাকরি আমাদের বিশ্বাস হারিয়ে যায়নি।

রাহুগ্রাস থেকে সমাজবাদ-সাম্যবাদের মুক্তি যে কবে ঘটবে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চাই না। যদি প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যয়কে সমাদর করি এবং আন্তরিকভাবেই সে প্রত্যয় গ্রহণ করে থাকি, তাহলে আজকের দুর্দিনে (যা নানা দেশে, রাশিয়া সমেত, কিছু সুলক্ষণ সত্ত্বেও) সেই প্রত্যয়কে প্রাণ দেবার চেষ্টায় বিরত হলে চলবে না। 'তাৎক্ষণিক' ('instant') বিপ্লবে বিশ্বাসীরা ক্ষুণ্ণ হবেন। কিন্তু ইতিহাসকে চালাবে যে মানুষের প্রচেষ্টা সেই মানুষ যদি সত্যই 'তৈয়ার' না হয় আর সংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ চাওয়া মাত্র যদি না মেলে তো আশাভঙ্গ ঘটবেই। যদি না তৈরি থাকি বুঝে নিতে যে ইতিহাসকে ত্বরান্বিত করার ভার রয়েছে সংগঠিত জনতারই উপর। এজন্য ধৈর্য দরকার, আরও দরকার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ও চরিত্রবল। স্বভাবতই সবাই চাই যতশীঘ্র সম্ভব শোষণহীন সমাজ নির্মাণ হোক। কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকার মনোবৃত্তি

(সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী মানসিকতার অনির্বাণ উপস্থিতি) প্রয়োজন। এটা চমৎকারভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন মাও জে দঙ। মহামতি এই নেতার রহস্যবোধও ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী। তিনি একবার চীন-সোভিয়েত বিতর্ক সমাপনের সভা শেষে বলেন যে, সমাজবাদ জগজ্জয়ী হতে শুধু যে কয়েকদশক লাগবে তা নয়, লাগতে পারে বেশ কয়েক শতাব্দী। এই সূত্র ধরেই বলেন যে সোভিয়েত-চীন বিতর্ক চলবে "দশহাজার বছর"! বলার পরেই দেখলেন যে সোভিয়েত প্রতিনিধির মুখটা করুণ হয়ে উঠেছে আর তাই মাও যোগ দিলেন "আমাদের এই কমরেড কোসিগিন সোভিয়েত পক্ষের বক্তব্য এত সুন্দরভাবে বলেছেন যে, আমি ঐ 'দশ' থেকে 'এক' হাজার বাদ দিয়ে দিচ্ছি।" স্বভাবত তুমুল হাস্যধ্বনির মধ্যেই কথোপকথন শেষ হল, কিন্তু মাও কখনও গোপন করতেন না যে পর্বত লংঘনের মতো সমাজবাদ নির্মাণ ও সংরক্ষণ অতি দুঃসাধ্য কর্ম আর তা যে তড়িঘড়ি ঘটানো যায় তা নয়। অবশ্য ইংরিজি প্রবাদ বলে "In the long run we are all dead!" অনাগতে ভবিষ্যৎ যদি এমনই সুদূরপরাহত যে, কেউই আমরা সেই শুভদিন দেখতে পাব না। তাহলে তো 'চিত্তির'! তবু বলি মার্কসবাদী প্রত্যয় অনুযায়ী শোষণমুক্ত সমাজের সাফল্য সুনিশ্চিত, কিন্তু সবই নির্ভর করছে স্থানকালপাত্রের ওপর, মানুষকে নিজেদের তৈরি করতে হবে এই প্রকৃত মনুষ্যোচিত অন্বিষ্ট সাধনের জন্য। আমরা তৈরি হলে কেউ আমাদের রাস্তা রোধ করতে পারবে না।

এজন্যই আজ বহুবিধ কর্মোদ্যোগে নামতে হবে। অনেকে হয়তো জানেন না যে, সোভিয়েত বিপ্লবের (১৯১৭) পর বেশ কিছুকাল আমেরিকার অনেক অঞ্চলে বিদ্যালয়ের মানচিত্র থেকে সোভিয়েত এলাকাটাকে ফাঁকা দেখানো হ'ত। রাষ্ট্রসঙ্ঘে সে দেশকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বহুবৎসর আর পরে বাধ্য হয়ে ঢোকানোর পর আবার তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটা যুগ এল যখন সোভিয়েতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা অসম্ভব হল, অচিন্তনীয় শত্রুতা ও বহুমুখী আক্রমণ সত্ত্বেও সোভিয়েতের, অস্তিত্ব শুধু নয়, তার মর্যাদা (সোশালিস্ট বিপ্লবের 'pilot project' হিসাবে) দেশে দেশে নন্দিত হতে থাকল। হিটলারী ফ্যাশিজম্‌কে জগজ্জয়ের স্বপ্ন ছেড়ে যখন ভূমিসাৎ হতে হল তখন বুর্জোয়া ব্রিটেনের বিশিষ্ট বিদ্বানদের মুখে শোনা গেল যে সভ্যতাকে বাঁচিয়েছে, ভবিষ্যৎকে আবার উজ্জ্বল করেছে সোভিয়েত আর তার লালফৌজ। 'অ্যাটম বোমার' হুমকি থেকে নক্ষত্রযুদ্ধের ('Star war') আতঙ্কেও সোভিয়েতকে মাথা নত করানো যায়নি। প্রধানত সোভিয়েতের উদ্যোগে বিশ্বশান্তি আন্দোলন একদা বিপুল বিস্তার লাভ করেছিল। দুনিয়া বুঝতে শুরু করেছিল ১৮৬১ সালে মার্কস-এর উক্তি যে "যখন দেশে দেশে শ্রমশক্তি সার্বভৌমতার অধিকারী হবে তখনই ঘটবে দেশে দেশে যুদ্ধের (এবং অবিরাম যুদ্ধায়োজনের) অবসান।" সেই বিশ্বশান্তি আন্দোলন আজ নীরব, নিথর; মাঝে জাপানী শান্তিযোদ্ধারা কলকাতায় এসেও তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। সোভিয়েতের মহাকাশযাত্রা (যাতে গাগারিন, তেরেশকোভা প্রভৃতিরা বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন) আর সঙ্গে সঙ্গে কাজাক, কির্ঘিজ প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগুলিকে নিয়ে সোভিয়েত মহাসঙ্ঘের কল্যাণ প্রচেষ্টা এমন সুফল প্রসব করেছিল যাতে অর্থসঙ্গতির দিক থেকে পশ্চিমজগৎকে পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব না হলেও তাদের মনে ভয় ঢুকেছিল সোভিয়েতের প্রায় অবিশ্বাস্য অগ্রগতি দেখে। এজন্যই আশির দশকেও দেখি মার্কিন সোভিয়েত-বিরোধী নায়ক বলা হচ্ছে

সোভিয়েত জুজুকে ভয় না করলে চলে না কারণ তারা "এক এক জন দশফুট লম্বা না হলেও আট ফুট লম্বা তো বটেই"।

এটা বলছি এজন্য যে এখন, গত পনেরো বছর ধরে সাম্প্রতিক ইতিহাসকেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে (ভারতে মুরলীমনোহর যোশীও এদেশের ইতিহাস বদলাতে উঠে পড়ে লেগেছেন) কারণ কেবলই প্রচার চলছে শুধু যে কম্যুনিজমের পরাজয়ের কথা তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতের কীর্তিকলাপকেও "তুচ্ছ" প্রমাণ করে মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে। Solzhenitsyn, Pasternak, Shakharov প্রভৃতির কথা এখন বড়ো একটা কেউ তোলে না, যদিও গরবাচ্যভী আমলে সোভিয়েতের অতীত গৌরবকে কলঙ্কিত করার চেষ্টায় তাদের নাম খুব কাজে লেগেছিল। এখন জানাবার গুরুতর চেষ্টা হচ্ছে যে ফ্যাশিজ্‌ম-এর পরাজয়ে সোভিয়েতের অবদান যৎসামান্য (অথচ সেটাই ছিল জাজ্জ্বল্যমান বাস্তব) আর ব্রিটেন-আমেরিকাই (অর্থাৎ 'গণতান্ত্রিক'-এবং) বুঝি সেই সাফল্যের কারিগর। এ ব্যাপারে প্রাক্তন সোভিয়েতের নেতাদের দায়িত্বও রয়েছে, কিন্তু সমাজবাদের বৈরীশক্তি গত প্রায় একশতাব্দী ধরে মার্কসবাদী অনুপ্রেরণায় জগতের সাম্যবাদী শক্তির ব্যর্থতা শুধু নয় তার অকিঞ্চিৎকরতাকেই প্রতিষ্ঠিত 'সত্য' হিসাবে প্রচার করছে। মানুষের মনকে সমাজবাদ-সাম্যবাদের ঐতিহাসিক মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করবার প্ররোচনা প্রাণপণে সংগ্রহ করছে। এবিষয়েও আমাদের মতো দেশের বহু কর্তব্য রয়েছে। যা নিয়ে এখানে আলোচনার সাধ্য ও সময় আমার নেই।

যা বলতে চেয়েছিলাম তার অনেক কথা বাদ পড়ে গেল, তবু শেষ করি। ভবিষ্যতের আশা আর আমাদের প্রত্যয়ের নিশ্চিতি থেকে আমরা যেন সরে না আসি। "আসিবে, সেদিন আসিবে"—এ ধরনের কথা নতুন শোষণহীন সমাজ বিষয়ে কবিকণ্ঠ থেকে তো আবহমানকাল থেকেই শুনে আসছি সবাই। স্বয়ং Bertrand Russell-এর মতো কঠোর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনীষী "Roads to Freedom" গ্রন্থে বোধহয় ১৯২১-২২ সালে সমাজবাদ বিষয়ে লেখেন উপসংহারে যে, তিনি চেয়ে আছেন সেই দিনের জন্য যেদিন ধনতন্ত্র পুড়ে মরবে "With its own hot passions, and out of its ashes will rise a new world full of fresh hope, with the light of morning in its eyes"। তরজমা করছি না, শুধু বলি যে এ যেন আমাদের বাঙালি "আবেগ"-এরই প্রকাশ আর জানাই যে বহু সুকর্ম করলেও মার্কসবাদ ও সোভিয়েত বিষয়ে এই দার্শনিক একেবারেই প্রসন্ন ছিলেন না।

মনে পড়ছে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে জওহরলাল নেহরু এক জায়গায় লেখেন যে কমিউনিস্টরা তাদের মতবাদের 'কট্টর' প্রকাশে প্রায়ই 'বিরক্তি ঘটায় বটে। কিন্তু তাদের একটা 'গুণ' আছে যা লেনিন থেকে আরম্ভ করে সব কমিউনিস্টের ক্ষেত্রে কম বেশি দেখা যায়—তা হলো তাদের বিশ্বাস যে ইতিহাসের স্রোতের সঙ্গে তাদের বিশ্বাস যে ইতিহাসের স্রোতের সঙ্গে তাদের সংগ্রামের সঙ্গতি রয়েছে যেজন্য তারা অপরাজেয়। আমি মনে করি এত বড়ো 'প্রশংসা' কমিউনিস্টরা কোনো অ-কমিউনিস্ট মনস্বীর কাছ থেকে বোধহয় কখনও শোনেনি। সব কমিউনিস্টকে আজকের এই যুগসন্ধিকালে বলব কবি রাম বসুর লাইন ধার করে নিয়ে "আনো এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র।'

ইংলন্ডে সতেরো দশকের বিপ্লবে Oliver Cromwell-এর নির্দেশ ছিল যোদ্ধাদের কাছে : "Trust in God, but keep your powder dry" ("ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো, কিন্তু কামানোর 'পাউডার' যেন শুকনো থাকে"।) আমাদের কমিউনিস্ট প্রত্যয় যেন অটুট থাকে (সেটা যাদুমন্ত্র নয়। জীবনের বাস্তবতাপ্রসূত জ্ঞান) অথচ সব সময় তৈরি যেন থাকি বিপ্লবপ্রয়াসে, সর্ববিধ পরিস্থিতির জন্য।

আজ তাই নববর্ষ নবশতাব্দী নব সহস্রাব্দ নিয়ে বিত্তবানদের উৎসব চলতে থাকুক। "কত ধন যায় রাজমহিষীর একপ্রহরের প্রমোদে"—পড়িনি সবাই 'কথা ও কাহিনী'-তে? এই সমৃদ্ধির সমারোহে পাল্লা দিক না কেন যারা পারে এবং যারা সেভাবেই ভাবিত। আমরা না হয় বলি 'বর্বরস্য ধনক্ষয়ং'—হোক না যারা 'বর্বর' তাদের 'ধনক্ষয়'! তবে খারাপ লাগে বইকি যখন কাগজে আমোদ-প্রমোদের অঢেল ব্যবস্থার খবর দেখি—সম্ভবত এক দম্পতিই কয়েকরাতের প্রমোদে খরচ করবেন যে টাকা তা দশ বা তারও বেশি ভারতীয় গরিব পরিবারের এক বছরের রোজগারের চেয়েও বেশি। যাক একথা, এটাই আজকের 'বিশ্বায়নী' ব্যবস্থার অবদান। কিন্তু এরই বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে কমিউনিস্টদের চারিত্র্যকে। কৃচ্ছ্রসাধনে আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু শোষণভিত্তিক সমাজে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে যে নির্লজ্জ ব্যবধান তার মতো ঘৃণ্য আর কি আছে মানুষের ইতিহাসে? প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী শুনেছি "মা গৃধঃ" ("লোভ করো না")। সোভিয়েত দেশে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "সমাজ দেহে লোভ বলে যে রিপু মৃত্যুশালের মতো ঢুকে রয়েছে তাকে সমূলে উৎপাটিত করার তোমাদের প্রয়াসকে আরও অনেক বিঘ্ন বিপদ কাটাতে হবে। আমি আশীর্বাদ করি, তোমরা এই ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞে সফল হও।" স্বয়ং কার্ল মার্কস বহুবার বলেছেন যে, ধনতন্ত্র মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন (need) মেটাতে চায়নি, তাকে পুষ্ট করে রাখে 'লোভ' (greed), আর সেজন্যই "inhuman, sophisticated, unnatural and imaginary appetities" বেড়ে ওঠে। মূলগত কারণ হলো মার্কস-এর ভাষায় "Private property does not know how to change cruder need into human need" (বড্ড ক্লান্ত একটানা লিখে যাচ্ছি বলে, পাঠক তরজমা করে নিন)। ধৈর্যচুতি না করে এখনই শেষ করি শুধু মনে পড়িয়ে দিয়ে যা রয়েছে 'শ্রীম'-কৃত প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ কথামৃতে "দেশলাইয়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোনোরকমেই জ্বলবে না—কেবল এক রাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।" আজকের 'বিশ্বায়ন'-এর নামে যে বদমায়েসি আর ধনশক্তির কাছে মাথা নত করে থাকার যে "বিষয়াসক্ত" প্রবৃত্তি আমাদের দেশ আর দেশের মানুষের সর্বনাশ ঘটাচ্ছে তাকে ঠেকাতেই হবে। আশাকরি আমাদের অন্তত "বিষয়াসক্তি" নেই—তাই অত্যন্ত দুঃখের সময়েও যেন বলতে পারি ঃ 'মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় নেই, ভয় নেই, সমাজবাদ অপরাজেয়।

গণশক্তি ২ জানুয়ারি ২০০০

ইতিহাসের চাবুক খণ্ডিত 'স্বাধীনতার' বিড়ম্বনা

"দিল্ ধাই কর্ কাবা বানায় তো ক্যা কিয়া তো ক্যাকিয়া?" বিখ্যাত উর্দু কবি মীর-এর এই উক্তিটি মনে ঘোরে যখনই ১৯৪৭-র পনেরোই আগস্ট তারিখে আমাদের খণ্ডিত স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কথা ভাবি। "বুক ভেঙে দিয়ে এই 'কাবা' বানিয়ে করলেটা কি, করলেটা কি?" মীর-এর কবিতাটি (অন্য উপলক্ষে বহু পূর্বে লেখা) শুনেছিলাম প্রয়াত বন্ধু, একদা বিশ্বশান্তি আন্দোলনে অগ্রণী রশীদউদ্দীন আহমদ্ খানের মুখে। দেশভাগের মূল্য দিয়ে অতি সেয়ানা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে কেনা এই 'স্বাধীনতা' পঞ্চাশাধিক বছর কেটে গেলেও সার্থকতার আস্বাদ দিতে পারল না। "পর দীপমালা নগরে নগরে/তুমি যে তিমিরে, তুমি সেই তিমিরে"।

সন্দেহ নেই যে, চুয়ান্ন বছর আগে ১৫ আগস্ট তারিখের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে তাদের মন থেকে তা কখনও মুছে দেওয়া যাবে না। সেদিনের অভূতপূর্ব অকল্পনীয় আবেগ আর উদ্দীপনায় আমরা ভেসেছিলাম, মনের সংগোপনে কাঁটার মতো সে যন্ত্রণা ফুটতে থাকলেও। যে দাম দিয়েই হোক্, দেশ তো মুক্ত হল, আর তো ইংরেজের দাস আমরা নই, দুনিয়ার দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ তো পেয়েছি। সংস্কৃতে প্রবচন আছে যে "সর্বনাশ হাজির হলে বুদ্ধিমানের কাজ হল অর্ধেক ছেড়ে দেওয়া"—আর দেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও আমরা উভয়ে তো স্বাধীন। আবার তো এক হতে পারি (যা মওলানা আজাদ বললেন)।

তাই ইতিহাসের দণ্ড মাথায় পেতে ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধার চেষ্টা হবে এমন চিন্তা নিশ্চয়ই ছিল। যাই হোক, সন্দেহ নেই সেদিনের উদ্দীপনার আন্তরিকতা নিয়ে। আর আমাদের দুর্গত দুনিয়াতে এভাবেই আমাদের মতো হাজার হাজার বছর ধরে প্রায় স্বভাবস্থবির 'মান্ধাতাগন্ধী' দেশ যে আজও সঠিক রাস্তায় এগোতে পারেনি। তারও ইতিহাসসঙ্গত হেতু রয়েছে। "ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে/মেঘের সিংহবাহনে" রবীন্দ্রনাথের এমন কথা আমাদের অনেককে সান্ত্বনা পেতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ২০০১ সালে বসে ভাবি এমনই ভাবে দণ্ড পাচ্ছি ইতিহাসের বিচারে যে আজও বুঝি "বুক ভাঙা" অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। আজও তো দুনিয়ার ধনতন্ত্রীদের সঙ্গে প্রায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছি; পুরোনো "Subsidiary Alliance"-এর নতুন চেহারা দেখছি।

'৪৭-এর প্রায় অব্যবহিত পরে মোহভঙ্গ ঘটিয়ে আমরা আবার কতকটা আবেগাতিশয্যে "এ আজাদী ঝুটা হ্যয়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ" আওয়াজ তুলেছিলাম। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। লগ্ন পার হয়ে গেছে। ১৯৪৫-৪৬ সালে ঋণ হয়তো সেদিনের পক্ষে জুতসই 'বিপ্লবী' লড়াইয়ে (যা শুরু হয়েছিল) সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু খেদ করে লাভ নেই যে পারিনি, এবং সেজন্যই সেই অপরাধের মাশুল আজও দিয়ে চলতে হচ্ছে। আমার মনে লেগে রয়েছে ১৯৩৮ সালে তার আত্মজীবনীতে লেখা জওহরলাল নেহরুর বক্র কটাক্ষ

যে ভারতবর্ষের কম্যুনিস্টরা একটা 'ginger group' বই কিছু নয়, দেশ বদ্‌লাবার লড়াই পারে না, শুধু আন্দোলনে একটু "আদার ঝাঁঝ" আনে।

অস্বীকার করে লাভ নেই। আজও তার চেয়ে খুব এগোতে আমরা পারিনি। গত সত্তর বছর ধরে আমাদের প্রয়াস অশ্রদ্ধেয় তো নয়ই, নানাদিক থেকে তা গরীয়ান। কিন্তু ফলের বিচারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আজও আমরা পিছিয়ে। এটা শুধু আমাদের দৌর্বল্যের সূচক নয়। গোটা দুনিয়া জুড়ে, বিশেষত গর্বাচভ্-ইয়েলৎসনী বীভৎসতার পর সোশালিস্ট দেশগুলির বিপর্যয় ইতিহাসের আকাশে সূর্যগ্রহণ ঘটিয়েছে। কবে গ্রহণ মুক্তি ঘটবে কেউ বলার ভরসা রাখে না। এর একটা মূল কারণ অবশ্যই আমাদের যে জগৎজোড়া সংগ্রাম (যার গৌরবের দিক যেন কখনও না ভুলি) তার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও নানাবিধ দোষত্রুটি অপরাধের সংক্রমণ যা বহুদিন ধরে চলেছে। এর ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয় কিন্তু এটাই ঘটনা। আর এর মোকাবিলা নতুন যুগের পরিস্থিতি বুঝে যথা প্রয়োজন নীতি ও কৌশলের সন্ধানে সবাইকে থাকতে হবে। খুবই কঠিন যে এই কর্ম যা অপরিহার্য। কিন্তু তা ভুললে আমরা আজকের রাজনীতির প্রায় সর্বব্যাপ্ত ক্ষুদ্রতা হীনতা মালিন্য ও দৌরাত্ম্যের চাপে নিজের সত্তা ও মেহনতী মানুষের ঐতিহাসিক ভূমিকারই অসম্মান করে ফেলব।

বলতে না চেয়েও কথা বেড়ে গেল। তবে আশা করি আমার বক্তব্যের কদর্য ঘটবে না। এই অতি বৃদ্ধ বয়সে আর বহু বৎসর ইতিহাস চর্চার ফলে কেবলই মনে হয় যে, আমাদের মতো দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে যতটা সম্ভব গভীরে যাওয়া এবং তাতে প্রকৃত জনশক্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমাদের অনেক ঘাটতি বহুকাল ধরে চলে এসেছে। 'স্বাধীনতা' আমরা লড়াইয়ের জোরে 'অর্জন' করিনি, ইংরেজ প্রভুরা তাদের পার্লামেন্টে আইন করে 'ক্ষমতার হস্তান্তর' ঘটিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে কৃতার্থ করেছে (মনে পড়ছে জওহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি বড়লাট মাউন্টব্যাট্‌ন-এর কাছে তেসরা জুন ১৯৪৭-এর ঘোষণার ('Plan Balkan') জন্য 'কৃতজ্ঞতা' প্রকাশ করেছিলেন আর মওলানা আজাদ তার একটু আগে বলেন যে ইংরেজ স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছে, তাকে বেগ না দিয়ে সে যাতে স্বচ্ছন্দে নিজের মালপত্র বাক্সবন্দি ('Packing) করে নিয়ে যেতে পারে সেজন্য সাহায্য করাই দরকার! এক গান্ধীর মনের বেদনা একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত প্রশমিত হয়নি। কিন্তু তাঁর চিন্তা ছিল আধ্যাত্মিক, তিনি বারবার বলতেন শুধু রাজনীতি নয়, ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেই তাঁর সকল কর্ম। একথা বলে আমি নিছক বামপন্থার প্রশস্তি করছি তা একেবারেই নয়। বরং বলব যে ১৯৪৭-এর সেই অপরিমিত ব্যর্থতার 'দায়' কিছু পরিমাণে আমাদেরও নিতে হবে। ১৯৪৫-৪৬-এ যখন প্রায়-বিপ্লবী পরিস্থিতি তখনও আমরা বুর্জোয়া নেতৃত্বের 'পশ্চাদ্দেশ অবলোকন' করেছি (এখানে লেনিনকথিত 'লেজুড়বাদ', tailism-এর কথাই বলছি)। আমাদেরও নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে ভরসার অভাব এত ছিল কংগ্রেস-লীগ মিলনের ওপর ভরসা রেখে তখনও তুষ্ট হয়ে থেকেছি—"গান্ধী-জিন্না ফিন্ মিলেঙ্গে", "কংগ্রেস-লীগ-ঐক্য হবে" ইত্যাদি স্তোকবাক্য দেশবাসীকে (এবং নিজেদেরও) শুনিয়ে চলেছি।

কি করে ভোলা যায় যে মুম্বইয়ে ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে নৌবিদ্রোহকালে 'কংগ্রেস-

লীগ-কম্যুনিস্ট পতাকা' একত্র বেঁধে জনতা মিছিল করলেও কংগ্রেস-লীগ নেতারা আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাধ্য হয়নি (হয়তো মনের প্রেরণা ছিল না বলে প্রবৃত্তিও হয়নি) সেদিনের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে বিপ্লবের ঢেউয়ে রূপান্তরিত করার। হয়তো সেটা ধীরস্থির বিচারে হত অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা বা যাই বলা হোক্ না কেন, কিন্তু এই 'দুঃসাহস' বিনা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কখনও জয়ী হতে পারে না, 'বিপ্লব তো দূরের কথা।'

এ নিয়ে গোটা বই লেখার সাধ্য নেই—আমাদের মতো যারা নিজেদের কম্যুনিস্ট বলে আত্মপ্রসাদ পেয়েছি তাদেরই অপরাধ কি অল্প? কিন্তু যখনই খণ্ডিত ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতার' হ্রস্বতা আর খর্বতা আর প্রায় যেন এই 'মুনবাদী' দেশে জন্মগত দুর্বলতা মনের আয়নায় ধরা পড়ে, তখনই জানি আমরা ইতিহাসের ঋণ-শোধ করতে একেবারেই পারিনি। যথেষ্ট লড়াই করিনি। করার সাধ্য নেই ভেবে চেষ্টাও তেমনভাবে করিনি। এজন্যই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষফলে এই উপমহাদেশের 'স্বাধীনতা' অর্জনে যত মানুষের প্রাণ গেছে তার সংখ্যা গোটা ইতিহাসে সকল বিপ্লবের তুলনায় অনেক বেশি হলেও সার্থকতার সন্ধান আমরা পাইনি। ইতিহাসের কাছে এই দেনাশোধ করতে হবে আগামী দিনে আবার মেহনতী মানুষের লড়াইয়ে জয়যুক্ত করার প্রায় আশাহীন অথচ অপ্রতিরোধ্য অপরাজেয় কম্যুনিস্ট প্রয়াসে।

এবার শেষ করি। তবে হঠাৎ মনে এল প্রায়-বিস্মৃত হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যখন ১৯৪৩ সালে এখানে এসে সদ্যজাত গণনাট্য সংঘ-এর (আই-পি-টি-এ) কাজে নেমেছিলেন আর একদিকে বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য আর অন্যদিকে দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাস আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের মনে অপূর্ব উন্মাদনা জাগিয়েছিলেন তখন খুবই জনপ্রিয় তার একটি রচনা এখানে গাওয়া হলে হয়তো মনে হবে জম্‌ছে না, আজকের পরিবেশে বুঝি বেমানান, কিন্তু সেদিন তার দিলমাতানো গুণের অন্ত ছিল না। যতদূর মনে পড়ে কথাগুলো ছিল "নভোমে পতাকা নাচত্ হ্যয় নাচত্ হ্যয়/বারে উস্‌কা রং/জনতাকী অস্তিম জং...বারে আজাদী, আজাদী চীজ বহোৎ হ্যয় দামী/য়ো রক্ত বহাকে খরিদেঙ্গে/আজাদীকো হম্ জিতেঙ্গে .../ভারতকো হম্ বচানোওয়ালে/সৌরজগতমে মচানোওয়ালে/অপ্‌না শক্তিসে নচানেওয়ালে বিষধর শ্বেত ভুজঙ্গ..." হরীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় কণ্ঠের তেজস্বিতা আর অঙ্গভঙ্গির মোহনীয়তা মিলে তৈরি করত এক অনন্য আবহ যা আজ আর ফিরে পাবার নয়। "আজাদী চীজ বহোৎ হ্যয় দামী"—আজাদীর যোগ্য দাম দিতে পারিনি বলেই আজকের যন্ত্রণা।

তবু বলি আশা হারাব না, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাব না, লোভ জটিল মুনাফাসর্বস্ব ভোগলিপ্সাকলুষিত ধনতন্ত্রের "ক্লেদ আর লজ্জা আর অমানবিকতা" (মার্ক্‌স্-এর বাক্য) কিছুতেই মানুষ সহ্য করে চলবে না। বিপ্লব করার চেয়ে 'বিপ্লবী' সাংবাদিকতাই সহজ বলে যে প্রতিভাধর কবি সমর সেন হৃদয়ের বেদনা ব্যঙ্গ-এর ছলে প্রকাশ করেছেন তারই কণ্ঠ হল "আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে"।

গণশক্তি ১৫ আগস্ট ২০০১

সাহিত্য সমাজ ও সাংবাদিকতা

স্বনামধন্য সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর স্মৃতিতে প্রতি বৎসর যে ভাষণের ব্যবস্থা বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে প্রয়াত মহাজনের পরিবারের সহায়তায় করা হয়েছে তা শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, বাংলা ভাষাভাষী আমরা যে যেখানে আছি তাদের সকলকে আনন্দিত করবে। আমার সৌভাগ্য যে প্রথমবারের বক্তৃতাটি দেবার ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে। এজন্য বাংলা আকাদেমি এবং এই আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে না বলে পারছি না যে ইতিপূর্বে আকাদেমির কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন, ১ আগস্ট, এই সভাগৃহে বক্তৃতাটি দেব। হঠাৎ বেশ খানিকটা অসুস্থ হওয়ার ফলে প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব না হওয়ায় আকাদেমি কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি পরম উদারতা দেখিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা না করে সভা মুলতুবি করেন আর আমাকেই আবার ডাকেন। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করে আকাদেমি আমার কৃতজ্ঞতার বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই বহুবিধ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সানন্দে আমি আপনাদের সাম্‌নে আসতে পেরেছি।

বেশিদিন হয়নি, 'সাংবাদিকতা সাহিত্য স্বদেশমুক্তি' শীর্ষক রচনায় বিবেকানন্দবাবু সম্বন্ধে বলেছিলাম তিনি "আমার বহুদিনের বন্ধু, তিনি কবি-বাগ্মী-প্রাজ্ঞ-সাংবাদিক-মুকুটমণি আর আজও বাঙালি সাংবাদিকের অনুপ্রেরণা।" হয়তো বাঙালি সুলভ বাক্‌বিস্তার করে ফেলেছি, আর নবশতাব্দী শুধু নয় সহস্রাব্দপূর্তির প্রাক্কালে ভুলে গিয়েছি যে আমাদের যুগের কেউই আজকের 'বিশ্বায়ন' ও যন্ত্রদেবতার বহুবিচিত্র লীলাখেলার কালে বাতিল না হয়ে 'অনুপ্রেরণা' হতে পারেন না। তবু আমার এই বিলম্বিত স্মৃতিভাষণের মাধ্যমে শুধু যে বন্ধুকৃত্য পালনের স্বস্তি একটু পাচ্ছি তা নয়। বিবেকানন্দবাবু ও আমি একই প্রজন্মের মানুষ, তিনি আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়ো ছিলেন। সমসাময়িক আমরা, দেশ ও দুনিয়ার হালচাল নিয়ে ভেবে চলেছি। আর বিশেষ করে জগৎ জুড়ে অধিকাংশ মানুষের দুর্দশা নিবারণ ও সমসুযোগের সমাজ নির্মাণের আজও অসফল প্রয়াসে উভয়েই দীর্ঘকাল ধরে অংশীদারী করেছি। অধুনাতন বিশ্বপরিস্থিতির আপাত বিপর্যয়ে একই ভাবে না হলেও। কতকটা আমারই মতো যন্ত্রণাভোগ তিনি করতেন তা জানি।

পুরোপুরি একই পথের পথিক আমরা ছিলাম না, কিন্তু "সংগচ্ছধ্বং সংবদদ্ধং সংবো মনাংসি জানতাম" বলতে আমাদের বাধে নি। নিজেকে কম্যুনিস্ট বলার প্রকৃত অধিকার অর্জনে হয়তো আমার শুধু কেন, আমাদের অনেকেরই ব্যর্থতা ঘটে গেছে। কিন্তু তবুও সেটাই আমাদের গর্ব, আমাদের বড়াই। কিন্তু কার্ল্ মার্ক্স্ বহুকাল আগে এক লেখকবন্ধুকে "The Party in the grand historical sense of the term" বিষয়ে যা লিখেছিলেন তা মনে

পড়ছে। জগৎ জুড়ে নতুন সমসুযোগের জীবন প্রতিষ্টার যে সংগ্রাম অজস্র বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়েও চলেছে ও চলতে থাকবে। অহঙ্কার করে বলি যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বহুগুণান্বিত প্রতিভাদীপ্ত কর্মকাণ্ড সেই সংগ্রামেরই সহায় হয়েছে। বাঙালি কম্যুনিস্টদের মধ্যে একজন প্রধানের মুখে শুনেছি যে এখনও ষাটের দশকের খাদ্যসংগ্রামকালে বিবেকানন্দের প্রজ্বলন্ত সম্পাদকীয়ের কিয়দংশ তার কণ্ঠস্থ রয়েছে। এই উদ্ভট বিশ্বায়ন যুগে এমন কথা আর কখনও শোনা যাবে মনে হয় না। 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ' (সে সব দিন আর নেই) বলে বিলাপ করছি না—শুধু চাইছি ভবিষ্যৎ যেন সর্বজনের কল্যাণের আদর্শকে বিকৃত না করে, বিনষ্ট না করে।

বিবেকানন্দবাবু যার মন্ত্রশিষ্য বললে ভুল হয় না, যিনি বাস্তবিকই ছিলেন তাঁর "guide, philosopher and friend", সেই অবিস্মরণীয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বলেছিলেন "আমরা স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করার গৌরব দাবি করি না। লোকলোচনের অন্তরালে বসিয়া আমরা বিনিদ্র রজনীতে 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়' নানা পুষ্প চয়ন করিয়া বরমাল্য গাঁথি। প্রভাতে আমাদের উপাস্য গণশক্তির কণ্ঠে মালা দুলাইয়া দিই, সন্ধ্যায় তাহা ম্লান হইয়া ঝরিয়া পড়ে।" আনন্দবাজার পত্রিকার স্বর্ণযুগের নায়ক সত্যেন্দ্রনাথের তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ভুলতে পারা যায় না; ধর্মাবেগ থেকে দেশাভিমান থেকে স্বদেশ ও স্বকালের সমাজ পদান্তর সাধনকল্পে সর্ববিধ প্রগতি প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিত্বের গরিমা আমরা দেখেছি; সহজ সরল স্বাভাবিক ধারায় জটিল গভীর সমাজতত্ত্বকে আয়ত্ত করার যে ক্ষমতা তাঁর চরিত্রে ছিল (আমার চিন্তায় এর সঙ্গে তুলনীয় থেকেছে নাট্যজগতে 'মহর্ষি' বলে বন্দিত, গণনাট্য আন্দোলনের অবিসম্বাদী অজাতশত্রু নেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অবস্থান), সেই ক্ষমতা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও দেখেছি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা থেকে বাঙালি মনে সাহিত্যক্ষেত্রে সার্থকতার কামনা যে সর্বব্যাপ্ত তা বোঝা যায়—সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন অভিমান যে সাংবাদিকতা যেন সাহিত্যের অঙ্গনে থেকে দূরাবস্থিত। তবু উভয় ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও প্রখ্যাত সাংবাদিক এম. চলপতি রাও ('এম. সি' নামে সর্বত্র পরিচিত) বলতে পেরেছিলেন যে সাংবাদিকতা হল "literature (or history writing) in a hurry", দ্রুত লিখিত সাহিত্য আর ইতিহাস রচনাই সাংবাদিকের কর্ম। এরই প্রমাণ সর্বদেশের প্রকৃষ্ট সাংবাদিকতায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অবদান যে কত মহামূল্য আর বিস্তৃত পর্যালোচনা এখনও আমরা করিনি।

বিবেকানন্দবাবুর আয়ুষ্কাল হল ১৯০৪ থেকে ১৯৯৩। প্রায় নবতি বর্ষের এই জীবনে প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁর ছিল কবি-পরিচিতি। আমরাও তাঁকে সুকবি হিসাবে জেনেছি, সম্ভবত ১৯৩৭-৩৮-এ প্রকাশিত "প্রগতি" সংকলনে তাঁর কবিতা ছিল, অনেক কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে যা প্রকাশ করতে পারলে ভালো হয়। জানতাম না সেদিন পর্যন্ত যে "শতাব্দীর সঙ্গীত" নামে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। এটিকে সংগ্রহ করে ছাপানো

কঠিন কাজ নয়, রাজ্য সরকারের সম্মতি সহজে মিলবে বলেই তো আশা করি। এটা বলছি বিশেষত এজন্য যে এখন মুখবন্ধ লিখে দেবার জন্য আমার কাছে রয়েছে আমাদের অনেকেরই বন্ধুস্থানীয় এবং প্রায় বিস্মৃত হলেও "বিপ্লবের সন্ধানে" "সোভিয়েট দুনিয়া" ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা, বহু বৎসর বিপ্লব কর্মে নিরত ও নিগৃহীত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভাঁওতা" বলে একটি বই, যা ত্রিশের দশকের গোড়ায় (অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে) ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। নারায়ণবাবু শুধু সুলেখক নন, অত্যন্ত সুরসিকও ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য লাগে যে অতদিন আগে সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাতত্ত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা বুর্জোয়া সমাজের 'গণতন্ত্র' জাতীয় বাক্য ব্যবহারের মধ্যে যে বিপুল 'বুজ্‌রুকি' সুকৌশলে ঢেকে রাখা হয় তাকে জাহির করতে চেয়েছিলেন আর দূরদর্শী ফন্দিবাজিতে অদ্বিতীয় ইংরেজ শাসকরা তখনই তা বুঝে বইটি নিষিদ্ধ করে দেয়। একটু অবান্তর হল প্রসঙ্গটা, কিন্তু উল্লেখ করলাম এজন্য যে বিবেকানন্দবাবুরও 'নিষিদ্ধ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিতে যেন বিলম্ব না হয়।

সাংবাদিকতায় ছিলেন বলেন এবং তৎকালীন পরিবেশে নিজের পরিশীলিত মানসিকতার সহায়তায় কেবল স্বদেশ নয় সকল দেশের পরিস্থিতি নিয়ে শুধু চিন্তা নয় কর্মের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি কুণ্ঠিত হননি। তাই দেখি শুধু কবিতা নয়, আসামান্য বাগ্মীরূপে সমসাময়িক জগৎ এবং আমাদের এই বহুযুগ ধরে লাঞ্ছিত অথচ অপরাস্ত ভারতবর্ষের অবস্থান নিয়ে শুধু যে অক্লান্ত ভূমিকায় নামলেন তা নয়, প্রচুর পরিশ্রম ও চিন্তার ভিত্তিতে সম্পাদকীয় ব্যস্ততার মধ্যেই রচনা করলেন "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস," "রুশ-জার্মান যুদ্ধ" "জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী", "সোভিয়েট মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি", "এশিয়ার বন্ধনমুক্তি" প্রভৃতি পুস্তক যা বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। হালকা চালে লেখা "যখন সম্পাদক ছিলাম" উপাদেয় রচনা, যার স্বাদ তাঁর আবেগবাহী, মাঝে মাঝে জ্বালাময়ী বক্তৃতা থেকে ছিল পৃথক।

আমাদের ছেলেবেলায় 'স্বদেশী' করা, 'দেশের কাজ' ইত্যাদি কথা প্রায় শুনতাম, পরাধীনতার অপমান ও যন্ত্রণা থেকে নিস্তারের ভাবনা মনে ঢুকত। সেদিনের অপরিণত বিপ্লব প্রয়াসে হয়তো বিবেকানন্দবাবু কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। সন্দেহ নেই যে ১৯১৯-২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ সংগ্রামের দীপ্তি তাঁকে স্পর্শ করেছিল, "আগুনের পরশমণির" আভাস দিয়েছিল। ১৯২৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতায় হাতে-খড়ি আর ১৯৩৭ সালে, যখন দেশের রাজনীতিতে নতুন এক আবহাওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত ছিলেন "যুগান্তর" পত্রিকায়। বহু বৎসর তার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এবং "যুগান্তর"-এর সম্পর্ক যেন ছিল অচ্ছেদ্য।

বুর্জোয়া শ্রেণীকর্তৃত্বের কারসাজি যে কত কুটিল হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবশ্য অন্য সব সাংবাদিকের মতো তিনিও হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন। "বসুমতী" "সত্যযুগ" "ভারতকথা" প্রভৃতির সম্পাদনা করেছেন, ভারতীয় সাংবাদিক সংঘের পরপর পাঁচবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, Working Journalist-দের আন্দোলনে শামিল হয়েছে। মালিকশ্রেণীর "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছেন যথেষ্ট অথচ ব্যক্তিগত সম্পর্ক

অটুট রেখেও আত্মসম্মান বজায় রেখেছেন সাংবাদিক কর্মীরূপে। শুধু বাংলা নয়। গোটা ভারতবর্ষের প্রগতি আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন এই খর্বদেহ অথচ ঋজু, সাহসিক, ওজস্বী মানুষটি। বাঙালি সাংবাদিকতার যে গৌরবময় ঐতিহ্য আজ বিলীয়মান বললে অত্যুক্তি হয় না, তার এক জনচিত্তে স্থান পেয়েছেন।

আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কলমাকান্তকে উকিলের সওয়ালের জবাবে বলতে হয়েছিল "পেশা? আমি কি উকিল না বেশ্যা যে আমার একটা পেশা থাকতে হবে?" আমরা যখন সাংবাদিকতা নিয়ে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা করি তখন প্রলুব্ধ হই একটু যেন গলা কাঁপিয়ে বলতে যে এটা নিছক জীবিকার্জনের 'পেশা' নয়। সাধুভাষায় সাংবাদিকতা তাই কেবল 'বৃত্তি' নয় বরং একটা 'ব্রত'—কিছু পরিমাণে 'নেশা'-ও বলা যায় কারণ এর একটা নিজস্ব মোহ আছে বিশেষত তাদের কাছে যারা একই সঙ্গে চায় সাহিত্যচর্চার আনন্দ আর জনকল্যাণ প্রযত্নে উপস্থিতি। ইংলন্ডে সতেরো শতকে বিপ্লবকালে (১৬৪১-৬০) দেখা গিয়েছিল 'Mercurius Publicus,' কিম্বা অষ্টাদশ শতকে ফরাসী বিপ্লবকালে (১৭৮৯-৯৯) রব্‌স্‌পিয়ের-এর "Lami du Peuple"-এর মতো সংবাদপত্র। রুশবিপ্লবের সূচনা ও বিকাশে দেখা গিয়েছে 'প্রাভদা'-র মতো সংবাদপত্রের মুখ্য ভূমিকা। নানা কারণে ইংলন্ডের মতো দেশে সংবাদপত্রের দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম নয়। রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির আবির্ভাবের পর ও গণমাধ্যমের মধ্যে সংবাদপত্রের গৌরব কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হলেও বিলোপ পায়নি, সহজে হয়তো পাবে না। যে কোনো শিষ্ট সমাজে প্রয়োজনে দেশবিদেশের খবর সবাইকে যথাসম্ভব জানানো। সাধারণের জ্ঞান ভাণ্ডারকে পুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা সঙ্গীত অভিনয় ইত্যাদির বিবরণ মারফৎ কর্মক্লান্ত নাগরিকদের চিত্ত বিনোদনে তা করা। এ কাজ সংবাদপত্র এখনও যথাসাধ্য করে, অন্তত করা উচিত। এজন্যই গ্যাম্ভাবীরূপে জনমনকে প্রভাবিত করার শক্তি রয়েছে সংবাদপত্রের হাতে, গণমাধ্যমের দখলে। এজন্যই যখনই স্বৈরশাসন তার কর্তৃত্বকে কায়েম করতে চায় তখন সংবাদপত্রকে কব্‌জা করতে তারা ব্যগ্র। আর এজন্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সাথে জনসাধারণের স্বার্থ অতি ঘনিষ্ঠভাবেই সম্পর্কিত। বিবেকানন্দবাবুর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে যদি আমাদের দেশের সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আজও প্রকৃত প্রস্তাবে অনারব্ধ পর্যালোচনা বিদ্বজ্জন করতে এগিয়ে আসেন তো মঙ্গল।

অর্থের আধিপত্য শুধু আজকের ঘটনা নয়। এ যাবৎ সর্বত্র তার অস্তিত্ব হল অকাট্য। বর্তমানে বেশ একটু কটূভাবেই আর্থিক উন্নয়নের বিশ্বায়নী রূপ আমরা দেখছি। সবই যেন আজ পণ্য, মানুষের শুধু কর্মনৈপুণ্য নয় তার প্রতিভাও বুঝি এক ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী, খেলোয়াড় থেকে শিল্পী, এমনকি সমাজরূপান্তর প্রয়োসে লিপ্ত বলে একদা আদৃত রাজনীতিকেরা "আয়া রাম গয়া রাম" ধরনের "Commodity" মনুষ্য আকারে পণ্যসামগ্রী। এ হেন পরিবেশে সাংবাদিকেরা যে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'পেশা'দার হতে বাধ্য, অর্থাৎ নিছক অর্থের বিনিময়ে সমকালীন 'চাহিদা' মিটাবার উপকরণ বিশেষ, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভা ও মর্যাদার যে অপমান সহ্য করতে হয়েছে তা হল আবহমান কাল থেকে আমাদের সমাজজীবনে বিত্তবানদের প্রভুত্ব ও অনাবিল কর্তৃত্ব প্রবণতার প্রকাশ বললে খুব ভদ্র ও নম্রভাবে বাস্তবেরই বর্ণনা দেওয়া হয়।

অধুনা বৃহৎ পুঁজির সংবাদপত্র জগতে নোংরা দাপটের চিহ্ন পূর্বের চেয়ে বেশি প্রকট। তাতে সন্দেহ নেই। একদা অন্তত কিছু 'ডাকসাইটে' সম্পাদক নিজেদের জাহির করতে পারতেন। সত্যেনবাবু বা বিবেকানন্দবাবুর মতো ব্যক্তির মর্যাদা এমন ছিল যে তাদের অতিরিক্ত 'ঘাঁটাতে' মালিককে কিছুটা ইতস্তত না করে উপায় ছিল না। এখন তো দেখি, বিশেষত দিল্লি বা বোম্বাইয়ের মতো ধনকুবের অধ্যুষিত জায়গায় যে সাধারণের কাছে অকল্পনীয় টাকার টোপ দিয়ে সবচেয়ে উঁচু তাকের সম্পাদকদেরও দাবিয়ে রাখা যায়। সম্প্রতি প্রেস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সুরাহার কিছু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অর্থব্যবস্থার মতিগতি এমন যে আশান্বিত বোধ করা সহজ নয়। ইতিমধ্যে খবরের কাগজের চেহারা তার মেজাজ। তার মতামত, তার তথ্যবিনাস, তার বিজ্ঞাপন বাহুল্য, 'স্টক্ এক্স্চেঞ্জ'-এর মতো জাঁকালো জুয়ার আড্ডার মাহাত্ম্যপ্রচার আর বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির গহন গভীর বিস্তার ইত্যাদি এমন বদলাচ্ছে যে আমার মতো পুরানা ঘরানার মানুষ আর হদিশ্ পাই না।

তবুও বলব, বিবেকানন্দবাবুর মতো সাংবাদিককে স্মরণ করেই বলব যে হাল ছাড়লে চলবে না। তাছাড়া এখনকার সাংবাদিকদের মধ্যে অনেক নতুন পেশাগত (professional) গুণ আছে। আগে নানাকারণে যার অভাব ছিল। স্বয়ং লেনিন বলতেন যে প্রকৃত বিপ্লবকর্মীরা হবে 'Professional revolutionary''। এই পেশাদারী নৈপুণ্য মনে হয় এখন আগের চেয়ে বেশি। যদিও সম্পাদকীয় সাহস ও চিন্তাশীলতার দিক থেকে আজ প্রচুর ঘাট্তি দেখি।

'পেশা' কথাটা একটু কেমন কেমন মনে হলেও যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রয়োজন। যা কাজের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। সাম্প্রতিক সাংবাদিকতার 'রিপোর্টিং', ফটোগ্রাফি ইত্যাদি প্রকৃতই বিপুল সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করছে—তা খেলাধূলার হোক্ বা শিল্পকৃতির হোক্ বা কার্গিল-এর মতো রণক্ষেত্রেরই হোক, আর তরুণ সাংবাদিকরা সাহস ও সততা নিয়েই কাজ করছেন। দেশের মানুষের মতামত 'সৃষ্টি'তে সহায়ক হয়ে সম্পাদকীয় ও অন্য নিবন্ধ লেখকেরা হয়তো আগের চেয়ে অনেকেই শক্তিমান কিন্তু জনকল্যাণের নিরিখে তেমন বিবেকবান্ নয়। সংকোচের সঙ্গেই একথা বলছি। তবে বিবেকানন্দবাবুর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে গিয়েই এ কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে গেল।

পেশা হোক্ নেশা হোক্, সাংবাদিকতা শুধু যে 'বৃত্তি' নয়, জীবনধারণের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন, কিছু পরিমাণে অন্তত এটা যে একটা 'ব্রত'-এরই মতো ('Vocation', 'dedication', 'mission'), এ ধারণার মূল্য কম নয়। বাস্তবক্ষেত্রেও দেখা যায় যে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত উপকরণ দুর্লভ হলেও এই 'পেশায়' বহু গুণী সানন্দে ও বহু কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে এসেছেন। এই 'বৃত্তি'র পরিবেশে একই সঙ্গে সাহিত্যচর্চার সুযোগ আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের দুর্গত জীবনে রূপান্তর সংঘটনের প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট টাকার আনন্দ তারা

পেয়েছেন। আমাদের এই অতিপ্রাচীন ভারতবর্ষে প্রায় দুশো বছর যে নিছক্ নিপাট সর্বতোভাবে বিদেশীয় সাম্রাজ্যের শৃংখলে যখন বাঁধা থেকেছি। তখন আমাদের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা আর পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি অর্জনের প্রয়াসে সাংবাদিকতার অবদান আজকের মতো উপলক্ষে তাই সকলেরই স্মরণীয়।

পরাধীনতাকালেই আমাদের সাংবাদিকতার জন্ম ও বিকাশ বলেই বোধহয় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর সাহিত্য শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতিক্ষেত্রে অগ্রগতির সঙ্গে এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থেকে গেছে। সাংবাদিক বৃত্তিকেই যেন গৌরবমণ্ডিত করেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শুধু বাংলা নয় সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী উর্দু ফারসী সাংবাদিকতায় পুরোধা ছিলেন তাঁর যুগন্ধর ভূমিকারই অনুসরণে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যের "আড়াই জন ঋষি"-র কথা বলতেন—বঙ্কিমচন্দ্র এক, রবীন্দ্রনাথ এক, আর মাইকেল মধুসূদন আধ! বঙ্কিম আর রবীন্দ্রনাথকে সাংবাদিক বলবার তো অজস্র প্রমাণ রয়েছে আর মাইকেল মাদ্রাজে সাংবাদিকতার কল্যাণে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন বলে কল্পতরু সেনগুপ্ত মহাশয় তো তাঁকে এদেশের প্রথম 'working journalist' বলে বর্ণনা করেছেন। আমার সময় নেই নাম উল্লেখ করে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে যারাই অবদান রেখে গেছেন তাদের অধিকাংশই যে সাংবাদিকতায় সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন তা এখনই তুলে ধরার—তার প্রয়োজনও নেই। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল, সত্যজিৎ রায়, সমর সেন, সুকান্ত যে পরম্পরা চলে এসেছে, সেখানে তো দেখি যে প্রায় সবাই সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে একটা গোটা বই লেখা যায়। কিন্তু কেউ কি লিখবেন? আমার মনে পড়ছে ছেলেবেলায় 'বসুমতী' অফিসে দেখেছি ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বহু বৎসর মাসিক ভারতবর্ষ-এর সম্পাদক) কিম্বা বিশ্বপতি চৌধুরীকে, যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাংলা M.A. পরীক্ষায় পাশ করে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি নেন। এখনও দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যে নামজাদা অনেকেই লিপ্ত রয়েছেন (কিম্বা থেকেছেন) সাংবাদিক কর্মে। হাসি পাচ্ছে ভেবে, কিন্তু না বলে পারছি না যে ইস্কুল কলেজে শিক্ষকতা করে কিম্বা খবেরর কাগজে অনিয়মত এবং অল্প বেতনে গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ না পেলে বাংলা সাহিত্যের অনেক দিগ্‌গজ লেখককে পাওয়া যেত না!

আজকাল তো বাংলায় শুধু 'এম-এ' নয়, কাঁড়িকাঁড়ি 'ডক্টরেট' প্রতিবছর দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখনও সাংবাদিকতায় (বাংলা ও ইংরিজি) বাঙালি (এক্ ভারতীয়) কৃতিত্বের বিবরণ লেখা হচ্ছে না। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বাঙালি ও দক্ষিণ ভারতীয় সাংবাদিকদের যে প্রাধান্য একদা ছিল তা এখন অনেকটা বদ্‌লে গেছে। সঙ্গত কারণেই, কিন্তু এ ধরনের বিবরণ যদি অনুশীলন ও কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি ও পরিপ্রেক্ষিত বোধ নিয়ে লেখা হয় তো দেশের মঙ্গল। এখনকার সাংবাদিকের কাছে আবেদন করি এ কাজে এগিয়ে আসুন।

সাংবাদিকের পক্ষে কত বড় গৌরবের কথা এই যে পরাধীনতার অভিশপ্ত পরিবেশে এবং ইতিহাসের সবচেয়ে চতুর ও বিচক্ষণ-ও সঙ্গে সঙ্গে ভালোমানুষের মুখোস্‌পরা নির্মম

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কৌশলের সম্মুখীন হয়ে ভারতবর্ষ শুধু রাজনৈতিক নয় সকল অর্থে স্বাধীন সার্বভৌম ও স্বকীয় ভাগ্যনিয়ন্তারূপে গড়ে তোলার বহুমুখী সংগ্রামে যারাই নেমেছেন—দক্ষিণ, বাম, মধ্যপন্থী যাই হোক্ না কেন—তারা প্রায় সবাই সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী; শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ থেকে মুহম্মদ ইকবাল ও আবুল কালাম আজাদ; বিদ্যাসাগর থেকে রানাডে, মহাত্মা ফুলে আর আম্বেদকর; হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় থেকে রামস্বামী নায়কর; সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় থেকে চিন্তামণি ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী; কৃষ্ণদাস পাল থেকে সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা; মুহম্মদ আলী থেকে হস্‌রৎ মোহানি; মীর মোশারফ হোসেন থেকে মণিরুজ্জমান ইসলামাবাদী; শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় থেকে নজরুল ইসলাম ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('নির্বাসিতের আত্মকথা'); মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ থেকে সোমনাথ লাহিড়ী; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু—এই যে পরম্পরা একটু ভাবলে মনে ভেসে আসছে (একে সহজেই আরও পুষ্ট করা যায় কিন্তু ভাবছি তালিকা বাড়িয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি), তা শুধু 'অতীত গৌরব বাহিনী' নয়, বর্তমানে আমাদের সকলের, (শুধু, 'জনগণ পথ পরিচায়ক' হবার সম্ভাবনার অধিকারী সাংবাদিকদের অন্বেষণ, অনুশীলন, নিদিধ্যাসনও সর্বসমক্ষে প্রচারের বিষয় নয়?

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যুবরণে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছাপাল 'Panic in Calcutta'—সাহেবসুবোর সাঙ্গোপাঙ্গ পলায়নের হুড়োহুড়ি। অকুতোভয় হরিশ মুখার্জি লিখলেন এ হল 'Mutiny' নয় 'Revolt'—"যে বিদ্রোহ বিদেশী প্রভুত্বে অবশ্যম্ভাবী অনাচারেরই প্রতিফলন।" সেই সময় "সমাচার সুধাবর্ষণ"-এর সম্পাদক শ্যামানন্দ সেন ছ'মাসের কারাদণ্ড পেলেন। আর কলকাতার উর্দু পত্রিকা "পয়গম্-য়ে-আজাদী"-র সম্পাদক মির্জা বেদার বখ্‌ত-এর ফাঁসি হল, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের প্রথম সাংবাদিক শহীদকে ইতিহাস পেল।

বাংলা আকাদেমি, ঢাকা, থেকে কয়েকবছর আগে প্রকাশিত "সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা" বইটি দেখে এবং গ্রন্থের শিরোনাম থেকে বহির্ভূত বহু চিন্তাউদ্দীপক তথ্যের সম্ভারে পুলকিত বোধ করেছিলাম। আমি এখন খুব বেশি পড়াশোনায় অক্ষম। তবে একটা ধারণা হয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় এবম্বিধ গবেষণা তেমন হচ্ছে না। অথচ এই ক্ষেত্রে 'হিন্দু মুসলমানের যুগ্ম সাধনা' কত কি-ই অজানা রয়ে যাচ্ছে। বিবেকানন্দ-বাবুর স্মৃতিরক্ষা ব্যপদেশে এদিকে যদি আমরা উদ্যোগী হতে পারি, সেই আশা উপস্থিত সুধীবৃন্দকে জানিয়ে রাখলাম।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর দুনিয়া জুড়ে শোষণমুক্ত সমসুযোগী সমাজ নির্মাণ যে একই সূত্রে বাঁধা এক লড়াই। তা বিবেকানন্দবাবুর পূর্বোল্লিখিত বইগুলির নামেতেই ধরা যাবে। এ জন্যই তাঁকে দেখা গেছে একই সঙ্গে দেশাভিমানী এবং আন্তর্জাতিক চেতনায় ঋদ্ধরূপে। সময় নেই ব্যাখ্যা করে বলার। কিন্তু এজন্যই বিশ্বশান্তি আন্দোলনের একজন প্রধান ভারতীয় প্রবক্তা বিবেকানন্দবাবু নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন দেখে যে সোভিয়েটে প্রতিবিপ্লবের প্রাধান্যের ফলে বিশ্বশান্তি সংসদের (যার তিনি সদস্য ছিলেন) সুবিপুল সংগঠন কোথায় মিলিয়ে গেল

আর আমাদেরই স্বদেশীয়, 'Order of Lenin' ভূষিত কম্যুনিস্ট রমেশচন্দ্র হয়ে পড়লেন আজও প্রায় নিরুদ্দেশ, সংবাদপত্রে তার সন্ধান আর মেলে না। সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে যে বিশ্বব্যাপী প্রয়াস তা স্তব্ধ হয়ে রইল। এবছরের প্রথম দিকে জাপান থেকে আগত এক শান্তি সংগ্রামী দলের উপস্থিতিতে সি-পি-আই (এম)-এর উদ্যোগে কলকাতায় মস্ত সভা হল, সেখানে বক্তৃতা করে, যেন বুকে বল পেলাম যে বুঝি আবার নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুদ্ধবিরোধী লড়াই আবার চলবে। হিরোশিমার বার্ষিকীতে 'মানবশৃংখল' নাম দিয়ে বিরাট জমায়েত হল, কিছু বক্তৃতা ছাড়া প্রকৃত শান্তি আন্দোলনের প্রচেষ্টাও দেখা যায়নি। সাম্প্রতিক বহু বিড়ম্বনা ও বিচ্যুতির কথা তুলছি না, কিন্তু আশঙ্কা যে V.S.Naipaul-এর মতো ব্যক্তি "India A Million Mutinies Now" গ্রন্থে "the pious Marxist laziness and nullity of Bengal' বলে অসঙ্গত বিদ্রূপ করলেন, তার জবাব দিতে এগোলাম না। বিবেকানন্দবাবুর মতো মানুষের কাছে নিশ্চয়ই যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছে এই পরিস্থিতি।

সম্প্রতি আমাদের রাজ্য ও রাজধানীর নাম বদল নিয়ে একটা আলোড়নের আভাস দেখা দিয়েছিল আর এরই অবলম্বনে 'নবজাগরণ' নাম দিয়ে একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার এর প্রধান দাবি, যা এতদিন পূরণ না হয়ে থাকাটাই আমাদের, লজ্জা আমাদের অভিশাপ। কিন্তু গোড়ায় যে গলদ থেকে গেছে সেদিকে নজর পড়েছে কিনা বুঝি না। এটা যখন লিখছি (৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) তখন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে বামপন্থী এক আলোচনায় আহ্বান এল, ভুল ইংরিজিতে ছাপা এক নিমন্ত্রণপত্রে। 'আজকাল' পত্রিকা সোৎসাহে 'নবজাগরণ'-এর প্রচারে লিপ্ত। অথচ এই কাগজের ১৭ জুলাই '৯৯ তারিখে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় দেখি—"হঠাৎ মুখ ফস্‌কে দু'একটা বাংলা—বিধানসভা না কমন্‌স্ সভা?" শীর্ষক বিবরণ, যা নিয়ে পত্রিকায় বিচক্ষণ সম্পাদক এবং বাংলাভাষা নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত সাহিত্যিকদের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পাইনি। এই রিপোর্টে জানা যায় বিধান-সভাধ্যক্ষ (স্পীকার) মহোদয়ের আগমন ইংরিজিতে ঘোষিত হবার পর প্রশ্নোত্তরপালায় প্রথম প্রশ্ন ইংরিজিতে করলেন পঙ্কজ ব্যানার্জি নামধারী বিধায়ক এবং ইংরিজিতে জবাব দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে যাকে পরিশ্রমী বুদ্ধিমান পার্টিকর্মী বলে জানি। তারপর সওয়াল চল্‌ল (Supplementary প্রশ্ন) দুই পক্ষের ইংরিজি ভাষায়—কেমন যেন ন্যক্কারজনক লাগে না কি?

সামান্য ব্যাপার নিয়ে তিলকে তাল করছি হয়তো শুন্‌ব। কিন্তু আমি অন্তত কিছুতেই মানতে রাজি নয় "আ মরি বাংলা ভাষা/মোদের গরব মোদের আশা" ধ্বনি দিচ্ছেন যারা তাদের আন্তরিকতাকে। কেমন করে ভুলতে পারি যে ১৯৯৮ ডিসেম্বরে শেষাশেষি রাজ্যের পক্ষ থেকে ভারতগৌরব বঙ্গসন্তান অমর্ত্য সেন-এর সম্বর্ধনা সভায় রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমাবেশে বসে দেখলাম যে বিধানসভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন পাঠ করলেন স্পীকার হালীম ইংরিজি ভাষায়—এটা বাংলায় রচনা করার যে বাধ্যবাধ্যকতা শুধু নয়, একান্ত নৈতিক কর্তব্য ছিল যে বিধায়কদের, তা সবাই—মন্ত্রীরা, সবদলের বিধায়করা, সবাই।—

মিলে বিস্মৃত হলেন। হয়তো এমন বিচ্যুতি বিড়ম্বনাই স্বাভাবিক, যখন দেখি যে ভারতের অন্যান্য প্রায় সব রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় বিধানসভায় ইংরিজির চল বেশি (অদ্ভুত এক শৈথিল্যবশে গত বিশ বছরের বিবরণী যে বিধানসভা ছেপে ওঠার দায়িত্ব পালন করেনি তা ভিন্ন প্রসঙ্গ)। যাই হোক্ এ ঘটনায় সভাস্থলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পাশে উপবিষ্ট বহুদিনের কম্যুনিস্ট সতীর্থ বিনয় চৌধুরীকে বলেছিলাম যে 'বাংলায় বলুন' বলে চিৎকার করে উঠতে চাইছি আর তিনি বললেন 'ধৈর্য ধরুন, উপায় কি?' বৃদ্ধ বয়সে সভার গাম্ভীর্য ভঙ্গ করার অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত রইলাম। কিন্তু আজও ঘটনাটি মনে হলে কষ্ট হয়। ক্রোধ হয়। ক্ষোভ হয়, শুধু আদর্শ নয় সহজ সাধারণ সাবলীল স্বভাষানুরাগ এমনভাবে লংঘিত দেখে যন্ত্রণা হয়। বিবেকানন্দবাবু বিশ্বশান্তি সংসদে বাংলায় বক্তৃতা করেছেন; সত্যেন মজুমদার মহাশয় যখন ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে প্রগতি লেখকসংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভাষণ দেন তখন তার ইংরিজি তরজমা আমি করি। অমর্ত্য-সম্বর্ধনায় বিবেকানন্দবাবু উপস্থিত থাকলে আমার যন্ত্রণার ভাগ যে নিতেন তা জানি।

আরও অনেক কথা মনে ছুটে আসে যা বলার চেষ্টা করব না। তবু প্রয়াত বন্ধুকে স্মরণ করতে গিয়ে মনে ঘুরছে শতাধিকবর্ষ পূর্বে কবি সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-এর কথা "আর কবে ভাই মানুষ হবে/দেখে তোর আকার প্রকার আচার বিকার/মানুষ কবে, মানুষ কবে?" কী নিদারুণ বেদনা আজীবন বহন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো মহাভাগ না বলে পারেন নি যে "সাত পুরু চামড়া তুলে না নিয়ে।" বাঙালিকে মানুষ করা যাবে না। "আবার তোরা মানুষ হ"—এ ডাক তো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো মানুষ বড়ো দুঃখেই জানিয়েছেন। সবাই জটিল রবীন্দ্রনাথের অপরূপ আর্তনাদ "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী/রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করো নি"। আজও কি শুধু বাংলাভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা নয়। অন্য নানা বিষয়ে আমাদের চিত্তবৈকল্য সতর্ক করে দেয় না যে আমাদের সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক বাঙালি গর্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে কার্যক্ষেত্রে যে চিন্তারহিত, শৈথিল্য কণ্টকিত, আবেগ সর্বস্ব, কর্মকুণ্ঠ অসাফল্য আমাদের এই রাজ্যের বর্তমান পশ্চাৎপদতায় প্রকট সেই বিকলতাকে দূর করতে হবে—এ কাজ সহজ নয় আর সবাই তো জানি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ 'চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয় না'। বিশ্বায়নের জগৎজোড়া কালো ছায়াকে কাটাতে হলে কত দুরূহ চিন্তা ও কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে।

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা"—এ কথা প্রচলিত ছিল একসময়, কিন্তু এখন যেন হাসি অন্তর্ধান করেছে আমাদের জীবন থেকে, সাহিত্য থেকে, সাংবাদিকতা থেকে তো বটেই (হয়তো আমার ভুল, তবে জীবনান্তের দেরি তো নেই। সে ভুল কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি না।) আর তাই বোধহয় আমাদের অর্থাৎ বিবেকানন্দবাবু ও সমসাময়িক বহুজনের পক্ষ থেকে এই অধম আজ বছর বারো-তেরো ধরে বলে চলেছি "ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য/বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য/ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ/হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস।"

"সত্যমেব জয়তে" বড্ড বড়ো কথা, তার নাগাল সবাই পাই না, কিন্তু বিবেকানন্দবাবুর মতো যারা দেশ ও দুনিয়ার ভাবনা ছুড়ে ফেলে দিতে পারি না তারা আজ বোধহয় ঠেকে শিখছি যে 'ভাবের ঘরে চুরি করা', 'মনকে চোখ ঠারা' ইত্যাদি চতুর প্রক্রিয়া আমরা সবাই বহুদিন ধরে বুঝি করে আসছি বলে আজকের দুর্গতি এমন যন্ত্রণা দিচ্ছে। তবুও দিন বদলাবে, সমর সেন-এর মতো কবিও একদা লেখেন যে "আকাশগঙ্গা" আবার এ-দুনিয়ায় নামবে।" সেদিন না হয় নাই দেখলাম, "আসিবে, সে দিন আসিবে"।

বন্ধুকৃত্য-এর অজুহাতে আপনাদের নানা কথা শুনিয়ে বিরক্ত করেছি। এবার রেহাই দিচ্ছি। "পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহ ভাই/সবারে আমি প্রণাম করে যাই।"

(বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা)

রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী দৃষ্টিতে

লিখতে বসে একটু যে অস্বস্তি বোধ করছি, তা বলে নিতে চাই, আর আশা করি পাঠকদের কাছ থেকে মার্জনা পাব। শিরোনামা যদি হত 'আমার চোখে রবীন্দ্রনাথ' তা হলে নিশ্চিন্তে নিজেরই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথের কথা—যা তো আমাদের কাছে মহাভারতের মতোই 'অমৃতসমান'—বলার চেষ্টা করতাম। সেটাই অবশ্য করব, কারণ কেউ তো জন্মাই না মার্কসবাদী কি অন্য কোনও 'বাদী' হয়ে, আর যদি বাস্তবিকই একটা জীবনদর্শন (বা একটু রঙচঙে ভাষায় 'বিশ্ববীক্ষা', জার্মান weltanschauung-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।) অর্জনের স্পর্ধা রাখি তো তাতে সেই অভিজ্ঞতার ছাপ পড়তে বাধ্য। মুশকিল এই যে মার্কস-তত্ত্ব-সরোবরের সন্তরণ সহজ কর্ম নয়। জীবদ্দশাতেই স্বয়ং মার্কস প্রমাদ গণেছিলেন 'মার্কসবাদী' বলে স্বঘোষিত কিছু ভক্তের বাড়াবাড়ি দেখে। একবার তো বলেন তিনি : "Thank God, I'm not a Marxist!" আবার ক্রুদ্ধ হয়ে লেখেন "বীজ পুঁতেছিলাম যাতে জন্ম নেয় দৈত্য, আর ফসল তুলছি কি না একপাল পোকা!" ("I sowed dragons, but I reap a harvest of fless?") সবসময় এটা মনে থাকে বলে নিজের সম্বন্ধে একবার "যথেষ্ট ভালো মার্কসবাদী নই" ("not a good enough Marxist) বলার ফলে ছোটখাটো একটা ঝড় উঠেছিল (১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনকালে) যে 'হীরেন মুখার্জি নিজেই স্বীকার করছে সে মার্কসবাদী নয়'! ইংরিজী নবিশরাও কেউ কেউ মাতলেন এই রব নিয়ে—আজ ভাবতে গেলে হাসি পায়। 'দেশ' সম্পাদকমহাশয়কে ধন্যবাদ তিনি আমাকে অন্তত ধরে নিয়েছেন মার্কসবাদীদের একজন প্রতিনিধি বলে। বিশেষত বর্তমানে, মার্কসবাদকে পরিমার্জন করা শুধু নয় তাকে পরিহার করা, মার্কসতত্ত্বের বিশ্বাস নিয়ে অপ্রতিভ বোধ করা আর ইয়োরোপের নানা দেশে মার্কসবাদ বর্জন করার রেওয়াজ যখন প্রবল, তখন আমি কৃতজ্ঞ, বলবার সুযোগ পেয়ে যে সমাজবাদ-সাম্যবাদে আমার প্রতীতি অক্ষুণ্ণ, অনুশোচনার লেশমাত্র না নিয়ে আমি নিজেকে কম্যুনিস্ট বলে ভাবি এবং যথাসাধ্য কর্তব্যকর্মে লিপ্ত থাকার চেষ্টা করি। নিজেকে নিয়ে কৌতুকই করব এই নিয়ে, কারণ মনে পড়ছে বিশ্ববিদিত ইংরেজ লেখক ফিলডিংয়ের 'Tom Jones' উপন্যাসের এক চরিত্র 'Rev Mr. Thwackum' যিনি বলেছিলেন "আমি যখন বলি 'ধর্ম', তখন আমি বলতে চাই 'খ্রীস্টধর্ম' আর শুধু খ্রীস্টধর্ম নয়, 'প্রটেস্টান্ট ধর্ম', আর কেবল 'প্রটেস্টান্ট ধর্ম' নয়, 'চার্চ অফ ইংলন্ড'!" অনাকর্ষক এই পাদরি সাহেবটির মতোই বলি; "যখন নিজেকে কম্যুনিস্ট বলি, তখন বলতে চাই আমি মার্কসবাদী; আর শুধু মার্কসবাদী নই, সঙ্গে সঙ্গে লেনিনবাদী; আর কেবল তাই নয়, প্রায় পঞ্চান্ন বছর ধরে ভারতবর্ষের কমুনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমি জড়িত!" আমার মতো অভাজনের এবম্বিধ বাক্য শুনলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হতেন—তিনি তো ছিলেন ঋষি, ত্রিকালজ্ঞ, আর তাই কতদিন আগে, ১৯২৫ সালে, মুজফফর আহমদ-নজরুল ইসলাম-এর 'লাঙ্গল' পত্রিকাকে

আশীর্বাদ করেছিলেন, ডেকেছিলেন 'বলরাম'-কে তার 'মরুভাঙ্গা দল' নিয়ে সমাজক্ষেত্রকে উর্বর করে তুলতে, বিবিধ 'ব্যর্থ কোলাহল'কে 'স্তব্ধ' করে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ আজ নেই, গোটা দুনিয়াতে নেই তাঁর পরিত্যক্ত হরধনু ভঙ্গ করার মতো মানুষ যিনি বলেছিলেন আজকেরই প্রায় অনুরূপ দুঃসময়ে! "মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন বিচারক/শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে/কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী/নারীঘাতী শিশুঘাতী কুৎসিত বীভৎসা 'পরে/ধিক্কার হানিতে পারি যেন!" রবীন্দ্রনাথ মৃত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরঞ্জীব, মানবমহিমার প্রজ্বলন্ত প্রতীক এই পুরুষোত্তম। তাঁকে নিয়ে 'গর্ব' করি বলেই কখনও 'খর্ব' হব না আমরা।

সব কথা গুছিয়ে বলি কেমন করে, কিন্তু মার্কসবাদী হিসাবেই আনন্দ পেয়েছিলাম জেনে যে মাত্র কয়েক বৎসর আগে ভিক্টর হুগো-র মৃত্যুর পর থেকে শতাব্দপূর্তি নিয়ে ফ্রান্স যখন উত্তাল, তখন সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র সোল্লাসে সোৎসাহে উচ্ছ্বসিত সম্পাদকীয় বিবৃতি দিল যে ফ্রান্স "drunk with Victor Hugo"! আমাদের, অর্থাৎ বাংলা যাদের ভাষা তাদের কাছে ফরাসীদের মনে হুগোর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা যে বেশি তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রজয়ন্তী নিয়ে হয়তো আতিশয্য কিছু ঘটাই আমরা, কিন্তু তাতে বিস্মিত বা লজ্জিত হবার হেতু নেই। নিশ্চয়ই উচিত পরিমিতি রক্ষা করা, নইলে রবীন্দ্রনাথেরই অমর্যাদা ঘটে যায়, কিন্তু কম করে দেখি কেমন করে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের বাড়াবাড়ি বর্জনীয় হলেও না-হয় হোক, মাঝে মাঝে তো মনের আর মর্মের লাগাম ছাড়ার দরকার পড়ে। আমাদের এই "সার্বভৌম" কবি—শুধু কবি কেন, জীবনের সর্ববিধ শুভব্যঞ্জনায় ভারত-আত্মার হিমালয়সদৃশ প্রতীক যিনি, তাঁকে নিয়ে অহঙ্কার আমাদের রিক্ত জীবনে যে অনন্তপার সম্পদ তা মাথায় তুলে রাখব না?

লিখে চলেছি আর ভাবছি যে হয়তো কেউ খোঁটা দিয়ে উঠবেন যে রবীন্দ্র-দূষণের কলঙ্কের ভাগী কিছু পরিমাণে মার্কসবাদীরা, আর আমারও কোনও পুরনো মন্তব্য তুলে ধরে হয়তো লজ্জা দেওয়া হবে। রবীন্দ্রসমালোচনায় কেবলই প্রশস্তি থাকবে, একেবারেই কোনও অতুষ্টি প্রকাশ পাবে না, প্রয়োজনেও কিঞ্চিৎ কঠোর বাক্য উচ্চারিত হবে না, এমন শর্ত অগ্রাহ্য বলতে আমার দ্বিধা নেই। কিন্তু সজ্ঞানে সচেতনে কখনও তাঁর অমর্যাদা করিনি তা হলফ করে বলতে পারি। ১৯৪৮-৪৯ সালের জগৎজোড়া টালমাটালের যুগে আর আমাদের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার একটা বিরস, প্রায়-বিকট চেহারা সাধারণ মানুষের জীবনকে যখন ব্যতিব্যস্ত করছিল, তখন ছদ্মনামে একজন প্রধান বাঙালী কম্যুনিস্ট বাস্তবিকই বল্‌গা-ছাড়া রবীন্দ্র নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু নিন্দিত হয়েছিলেন নিজের দলের মধ্যেই, স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন যে চিন্তারহিত অবিমৃশ্যকারিতা ঘটিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া এবম্বিধ আতিশয্য যে অভাবনীয়, তাই বা মনে করব কেন? হাতের কাছে বইপত্র নেই, কিন্তু বেশ মনে আছে রুশদেশে বহুদিন আগে সম্ভবত লেরমন্টভ-এর সমাধিকালে সমাবেশ হয় যেখানে বক্তৃতায় ডস্টয়েভস্কি বুঝি মৃত কবির তুলনা করেন পুশকিন-এর সঙ্গে, যা অনেকেরই মনঃপুত হয়নি। কিন্তু সেখানে উপস্থিত থেকে তৎকালে তরুণ প্লেখানভ নাকি মন্তব্য করেন পুশকিন সম্বন্ধে যে তিনি তো শুধু গেয়ে গিয়েছেন "নৃত্যপটীয়সীদের পদাঙ্গুলি বন্দনা" ("sang of the toes of

ballerinas")! যে প্লেখানভ স্বয়ং লেনিনের সহচর যাকে মার্কসতত্ত্বে পারদর্শী বলে বর্ণনা করেছেন, সেই প্লেখানভ 'বিপ্লবী' উৎসাহাতিশয্যে পুশকিন-এর মতো রুশদেশে সর্বমনের পরম আদরণীয় কাব্যস্রষ্টার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ যদি করতে পেরে থাকেন, সর্বদেশে সমকালীন কর্তৃপক্ষীয়দের প্রতি প্রচণ্ড বিরূপতা যখন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য তখন প্রতিবাদের বহু বিচিত্র, এমন কি অশোভন, প্রকাশও সম্পূর্ণ মার্জনীয় না হলেও বোধগম্য হওয়া সমীচীন মনে করতে পারি, তো, '৪৮-'৪৯ সালে বহুনিন্দিত 'রবীন্দ্র গুপ্ত'-কৃত রবীন্দ্রনিন্দা এমন কিছু স্থায়ীভাবে স্মরণীয় ঘটনা হতে পারে না।

নিজের কথা যখন বলেই চলেছি তখন এখানেই বলে নিই যে ১৯৩৭ সালে সদ্যস্থাপিত প্রগতি লেখক-সংঘের পক্ষ থেকে প্রয়াত বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সহযোগিতায় 'প্রগতি' আখ্যা দিয়ে সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনা করি—বইটি উৎসর্গিত হয় 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বরণীয়েষু।" সুরেনবাবু নিজে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির হস্তে সেটি দেন, সুরেনবাবুকে রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে যে চিঠি দেন তা স্বচক্ষে দেখেছি। 'বরণীয়েষু' শব্দটি আমিই বাছাই করি—বলছি বিশেষত এ জন্য যে ১৯৩৯ নাগাদ সময়ে নিখিলভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের কলকাতা (১৯৩৮ ডিসেম্বর) অধিবেশনের প্রস্তাব অনুসারে আমার বন্ধু (পরে রবীন্দ্রচর্চায় স্বনামধন্য) আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর সঙ্গে সম্পাদনা করি 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলন, যেটিও পৌনঃপুনিকতা সত্ত্বেও আমরা উৎসর্গিত করি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বরণীয়েষু'। একটু মজা লাগছে ভাবতে যে অনেককাল বাদে যখন আমার 'তরী হতে তীর—পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত" (১৯৭৪) প্রকাশ হয়, তখন আবার সেটিকে উৎসর্গ করি রবীন্দ্রনাথকে— 'নিত্যস্মরণীয়েষু' অভিধায়। এতেও শানায়নি, কারণ উৎসর্গপত্রেই উদ্ধৃত করি এক শ্লোক : "ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ/তুভ্যমেব সমর্পয়ে।" গোবিন্দের এই উল্লেখ অবিশ্বাসীর মুখে অবশ্য বেমানান! মনে পড়ছে 'তরী হতে তীর' প্রকাশে যার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি আর কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে ছিল আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ সেই অকালপ্রয়াত স্নেহভাজন দিলীপ বসু এই 'গোবিন্দ' শব্দটি মানতে পারেননি। কিন্তু আমি পেরেছি এভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ-স্বীকার করতে। আমাদের মতো যারা রবীন্দ্র প্রভাবের যুগে মানুষ হয়েছি, তারা যা কিছু করি তা যেন হল রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিবেদন, তাঁরই বস্তু তাঁকেই যেন জানাবার অক্ষম অভিপ্রায়।

কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করছি না, কিন্তু হয়তো এ জন্যই ভালো লাগে ১৯৫৮ সালে দিল্লিতে প্রশ্নোত্তরে প্রাতঃস্মরণীয় হো চি মিন্-এর উক্তি "গান্ধীজীর সঙ্গে আমার তুলনা হল অসঙ্গত, কিন্তু বিপ্লবী হলেও আমরা সবাই মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, এর বেশি কিছু নয়, কমও কিছু নয়"। একটু বদলে নিয়ে বলি যে মার্কসবাদী হলেও আমার মতো ভারতবর্ষীয় মানুষের চোখে পুরুষোত্তম ("Hero") হলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। জীবনচিন্তার সামগ্রিকতা, মানবচেতনা প্রবাহের অখণ্ডতা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংহতিভিত্তিতে বিশ্ববোধের সহজ সত্যতা রবীন্দ্রনাথে সতত কীর্তিত এবং মার্কসবাদী চিন্তা ও প্রয়াসের শ্রেষ্ঠস্তরে তার নিয়ত ঘোষণা, বাস্তবতার কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষায় তার বিকৃতি ঐতিহাসিক কারণে আর মানুষেরই অনিবার্য অক্ষমতা হেতু যতই মর্মন্তুদ হোক না কেন।

সেদিন হঠাৎ দেখলাম রবীন্দ্রনাথের "গানের ভাণ্ডারী" দিনেন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠি, যাতে তিনি কোন একটা ঘটনাব্যপদেশে বলছেন "মঙ্গল কখনো মরতে পারে না। যদি তা মরে তো উচ্চতর মঙ্গলকে জীবন দিয়ে তবে মরবে। ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নেই"। চমকে উঠতে হল; ভাবলাম আজ যখন ইয়োরোপে সোসালিজম-এর বিপর্যয় নিয়ে বহু বিচিত্র বিচিন্তা, তখন মন গভীর উক্তি শুনছি না 'মার্কসবাদী' ছাপ-মার্কা মহলে। কিন্তু কী সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ যেন আশ্বাস দিচ্ছেন। আশীর্বাদ করছেন, পতন-অভ্যুদয়ের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করছেন। সাধে কি সবাই দেখেছি যে 'নোবেল'-পুরস্কৃত কবি Joseph Brodsky সাম্যবাদী বিশ্বাস হারিয়ে লিখছেন 'Lullaby of Cape Cod' : "Having sampled two/Oceans as well as continents/I feel that I know/ What the globe itself must feel/There's no where to go!" কোনও 'বাদ'-এর খাতায় কখনও নাম না লিখিয়ে রবীন্দ্রনাথ-জীবনান্তের সামীপ্যে এসে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকটে ব্যথিত ও শঙ্কিত হয়েও মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোকে মহাপাপ বলে ধিক্কার দেন, স্বমহিমার ভাস্বরত্ব নিয়েই তাঁর ঘোষণা যে, আমাদের এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই আবার ঘটবে মানুষের জয়যাত্রা। দুঃখ আজ যে, এমন বহ্নিমান ঋষিবাক্য থেকে অধুনা আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থশক্তি মার্কসবাদ প্রেরণা সংগ্রহ করে না।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চাক্ষুষ করি আমার দশবছর বয়সে। ১৯১৭ সালের শেষ দিকে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় আমাদের বাড়ির খুব কাছে ওয়েলিংটন (এখন রাজা সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে। গেটের কাছে ভিড়ে আমিও ছিলাম—মনে আছে যেন আওয়াজ উঠল 'ঐ রবি ঠাকুর!' আর আলখাল্লা-টুপিপরা দীর্ঘদেহ কবি নামলেন প্রবেশদ্বারে। আমাদের বইয়ে ঠাসা বাড়িতে মানুষ হয়েছি বলে তখনই 'রবি ঠাকুর' অচেনা ছিলেন না। 'কথা ও কাহিনী'র অনেক কবিতাই তখন মুখস্থ—আবৃত্তি করাতেন গুরুজন "নব বরষেতে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা"। কিশোর বয়সেই আবিষ্কার করলাম অপরূপ এক 'কাব্যগ্রন্থ'। সম্পাদনা করেছিলেন মোহিতচন্দ্র সেন—'বঙ্গবীর'-এর চেহারা তখনই পেলাম "তবে আর কিছু নাহি প্রয়োজন/সভাতলে মিলি বারো তেরোজন/শুধু তরজন আর গরজন এই করো অভ্যাস!" পরাধীনতার যন্ত্রণা বুকে খোঁচা দিতে শুরু করে তখনই, আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব" ধরনের ঘোষণায় যেন একটু উপশম ঘটত। দাদু ও বাবার কাছে শুনতাম রবীন্দ্রনাথের কথা—দাদু কিছুদিন 'হিতবাদী' পত্রিকায় ছিলেন, তাতে বুঝি "রবিবাবু"ও লিখতেন। পিতৃবন্ধুদের মধ্যে একজনের হৃদ্যতা ছিল কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর। যার তালতলাস্থ ডাক্তার লেনের বাসায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বুঝি হঠাৎ এক একদিন ছ্যাকরা গাড়ি চড়ে জোড়াসাঁকো থেকে আসতেন! বাড়িতে ডাঁই-করা বই আর মাসিকপত্র—'সাহিত্য' 'নারায়ণ' থেকে 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে খাতির ছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী'-র (সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজী 'মডার্ন রিভিউ') আর বড়োদের মতে কেমন যেন 'ন্যাকা ন্যাকা' ভাব সত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'-এর। একটু বড়ো হয়ে আলমারির মধ্যে খুঁজে পেলাম 'রবিয়ানা', রবীন্দ্রদূষণে ভরা এক পুস্তিকা, বোধ

হয় সরিয়েই রাখা হয়েছিল আমাদের নজর থেকে। ভালো লাগেনি সেই চটি বইটা। কারণ রবীন্দ্ররচনায় তখনই মন মজতে আরম্ভ করেছে। ঝাপসাভাবে মনে আছে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের 'নাইটহুড' পরিত্যাগ; বাবার কাছে শুনলাম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের রোগশয্যায় কবি স্বয়ং পড়লেন পদত্যাগপত্র আর সর্বজনশ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রবাবু তাঁর পদধূলি নিয়ে বললেন যে মরতেও আর যেন দুঃখ নেই। 'রবি ঠাকুর' আমাদের চোখে তখনই বিরাট এক মহাকবি শুধু নন, মহাপুরুষ বলে স্থান নিয়েছেন—সেই অনুভূতির রেশ আজও কাটেনি।

আমার ছেলেবেলার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ১৯২৩-২৪ সালে কলেজে বোলপুর ফেরৎ অধ্যাপকের বারণ না মেনে একবার চলে গেল জোড়াসাঁকোয়, অটোগ্রাফ খাতা নিয়ে। অবাক হয়ে দেখলাম পাতা-ভর্তি কবিহস্তে লেখা একটি কবিতা ('প্রবাহিনী'-তে পরে প্রকাশিত) নিয়ে এল, বিকেলের জলখাবার, পেট পুরে খেয়ে এল (ঠাকুর বাড়ি থেকে মিষ্টিমুখ না করে কেউ বুঝি ফেরে না)। মাঝে অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে (১৯২১ সেপ্টেম্বর) তখন তৎকালীন গান্ধী-অভিভূতির মেজাজে একটু আঘাত পেয়েছিলাম কারণ, গান্ধীর সঙ্গে কবির বিতর্ক চলেছিল—'সত্যের আহ্বান' ঘোষণা করে কবি গান্ধীর ভুল ধরিয়ে দিচ্ছিলেন, কয়েকমাসের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি যে ভুয়ো তা বলতে কুণ্ঠিত হননি, সবাই রোজ একঘণ্টা চরকা কাটলেই ইংরেজ পালাতে বাধ্য হবে বলে মানুষকে চাঙ্গা করাকে বুজরুকি বলে বর্ণনা করেন। যুক্তির পথ ছাড়ার বিপদ বুঝিয়ে দেন, বিলিত কাপড় পোড়ানর নিন্দা করেন আর গুরুবাদ ব্যাপারটারই অকল্যাণ দেখাতে গিয়ে বলেন যে গুরুপদভজনে স্বর্গলাভ সম্ভব হলে তেমন স্বর্গের জন্য তিনি লালায়িত নন। গান্ধীজীর জাদুকরী প্রভাব তখন এমনই যে এ-ধরনের কথা সবাই বুঝে উঠত না। তবে মহাত্মা নিজে বুঝতেন, আর বিতর্ক হয়েছিল অবিস্মরণীয় পরস্পর সৌজন্য সহকারে। এ বিষয়ে রম্যাঁ রলাঁর অপূর্ব সুন্দর বিবরণ রয়েছে—এখানে উল্লেখ করছি শুধু এ জন্য যে এই দুই মহামনার সম্পর্ক সহায় হয়েছিল আমাদের মনের অনেকগুলো দরজা খুলে দিতে। গান্ধী আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনকে রবীন্দ্রনাথ টানলেন যেন বেশি করে। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথই যেন শেখালেন গান্ধীজীকে তুচ্ছ করার মতো ক্ষুদ্রতা যেন কখনও না হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে উঁচু ক্লাসে যখন পড়ি, তখন ছাত্রদের উদ্যোগে "রবীন্দ্র পরিষদ" গঠিত হয়। বিরাট বিদ্বান দর্শনশাস্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে সভাপতি করে। তার পাণ্ডা না হলেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল আর দেখলাম যে প্রায় যেন পাল্লা দিয়ে 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' গঠিত হল। আমরা কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই আচ্ছন্ন, আর সে জন্যই বুঝি সৌষ্ঠব বজায় রইল, ঝগড়া বাধল না। বেশ মনে আছে একদিন কলেজ সভায় বন্ধু সুশীলকুমার দে (পরে আই-সি-এস) গাইল অতুলপ্রসাদের 'ওগো সাথী মম সাথী' আর রবীন্দ্রনাথের 'সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করবো নিবেদন'—তারপর দেখি ছটফট করছে, আমায় বললে 'তোমার কোনটা ভালো লাগল বলতো?' তার জবাব দিলাম 'কেন? সকল দুখের প্রদীপ-টাই তো'। সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ভয় হয়েছিল বুঝি অসম্মান করে ফেলেছে

রবীন্দ্রনাথকে। অনেকে হয়তো বুঝবেন না কি বলতে চাইছি। আসলে একটা আচ্ছন্নভাবই ছিল আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। এটা কেটে গেল সহজেই, একাধিকবার কবির কাছে যেতে পারার ফলে। একদিনের কথা বেশ মনে আছে তিন চারজন আমরা গিয়েছি কি যেন জানাতে। তিনি সহজ সরসভাবে কথা বললেন আর বোধহয়, তখন সদ্যলেখা গান গাইলেন; "একটুকু ছোঁওয়া লাগে। একটুকু কথা শুনি"—সেদিনই গেয়েছিলেন, একটু যেন কাংস্য কণ্ঠে, বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে, "তবু মনে রেখো"—এটা তেমন ভালো লাগেনি। কিন্তু "একটুকু ছোঁয়া লাগে" যেন কবিকণ্ঠে আজও শুনতে পাই! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের গলায় এটি শুনি—তাঁরই একটি রচনায়, দেখেছি রবীন্দ্রনাথ একদিন হঠাৎ তাঁকে এবং অল্প কয়েকজনকে মৃদুস্বরে শুনিয়েছিলেন "সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে/সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে", আর কেমন যেন উদ্বেল হয়ে বলেছিলেন : 'তোমরা বুঝবে না আমার দেশকে আমি কত ভালোবাসি!" স্মৃতি থেকে লিখছি বলে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাণপণে চাইব আমার মূল বক্তব্য যেন পাঠকদের এড়িয়ে না যায়।

আমার সৌভাগ্য যে অক্সফোর্ড বাসকালে দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে ১৯৩০ সালে—বাইবল-এর ঋষিমূর্তি নিয়ে Hibbert Lectures দিলেন, কলেজের প্রকাণ্ড রঙিন কাঁচ-এর জানলা থেকে অপরাহ্নের রৌদ্র এমন আভা দিল সেই মূর্তিতে যে বিদেশী বিভাষী বিরূপমতি শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইল। কবিকে যে বেশ কয়েকজন পার্শ্বচর একটা গণ্ডীর মধ্যে আটকাচ্ছেন তা বুঝতে কিন্তু দেরি হল না। তবে দেখলাম তাঁকে সহজ স্বস্তিতে যখন এলেন ভারতীয় ছাত্রদের 'মজ্‌লিশ্‌'-এ। সেই সংবর্ধনাকালে একটু বিচলিত হতে হল তাঁকে। কিন্তু দেখলাম প্রতিভার বিভূতির এক অবিস্মরণীয় আভাস। আমাদের মধ্যে একজনই তখন পাতে দেওয়ার মতো গান করতে পারতেন আর আমার সেই বন্ধু মহীন্দ্রলাল মিত্র দুরূহ কর্মটি করতে গিয়ে উদ্বোধনী গাইলেন : "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী", সেটা শুনে রবীন্দ্রনাথ (রক্তমাংসের মানুষও তো তিনি) একটু হেসে বললেন "এটাকে স্বদেশী গান বলো তোমরা?" সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে মজলিশ-সভাপতি (উত্তরপ্রদেশের মুসলমান) বলে ফেললেন : "কবি, তোমাকে পেয়ে আমাদের কত আনন্দ, কত গর্ব। কিন্তু দেশে আজ তুমুল লড়াই চলছে, আমাদেরও মন চঞ্চল, তুমি এখানে কেন, গান্ধীজির পাশে কি তোমার স্থান নয়?" একটু আমাদের দিকে ঝুঁকে কবি বললেন "আমার কোনো বই কাছাকাছি আছে?" ছুটে গিয়ে একখণ্ড 'চয়নিকা' (বিলেতযাত্রার পূর্বে পাওয়া বন্ধুদের উপহার) নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। যেটি হাতে নিয়ে প্রথমে বললেন "তোমরা বুঝবে না, কিন্তু গান্ধীজি জানেন আমার নিজস্ব হাতিয়ার নিয়ে একই লড়াইয়ে আমি রয়েছি, দেশ থেকে দেশান্তরে ভারতবর্ষের চারণ আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি"। আর পড়লেন "দুঃসময়" কবিতাটি "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে/সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া/যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে/যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া/মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন-মন্তরে/দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা/তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর/এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা!"

সেই "চয়নিকা" আজও সযত্নে রয়েছে আমার মেয়ের কাছে। আবৃত্তি যে কত অর্থঘন

হতে পারে, তা আগে জানিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠ থেকে পূর্বে শোনা সত্ত্বেও। অনন্য কালজয়ী প্রতিভার সেই উদাত্ত উচ্চারণ কখনও ভুলতে পারব না। কবির সেই দৃপ্ত প্রজ্ঞালোকিত দেশাভিমানী মূর্তি বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। তখনও জানি না, তিনি যাবেন সোভিয়েট দেশে, "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ" দেখবেন, সমাজদেহ থেকে লোভ-রূপী "মৃত্যুশেল" উদ্‌ঘাটিত করার প্রবল প্রয়াসকে আশীর্বাদ করবেন। স্বদেশ ও বিশ্বের হিতকল্পে অবিকল প্রব্রজ্যায় আমৃত্যু প্রবৃত্ত থাকবেন। চোখের আর মনের সামনে সেদিন প্রতিভাত হয়েছিল শুধু মহাকবি নয় এক মহামানবের মূর্তি, যাঁর জীবনব্রত হল "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো," তত্ত্বের গণ্ডীতে যাকে বাধা যায় না অথচ সর্ব শুভ তত্ত্বের সারাৎসার তাঁর আয়ত্ত, "মনুষ্যধর্মের" যিনি প্রোজ্জ্বল প্রবক্তা যাঁর মূল অধিষ্ঠান স্বদেশেরই ভিত্তিভূমিতে, কিন্তু চিত্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত সর্বজনের অন্তরে।

১৩৪৭ সালের ১ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে এক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন ঋগ্বেদের এক আশ্চর্য বচন "অগুনী তো পুনরস্মাসু চক্ষুঃ/পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্/জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্/অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি"। ("প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ আবার দিয়ো ভোগ। উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো")। একই উপলক্ষে তিনি বলেন : "আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" এখানে সন্ধান মিলবে এক বৈপরীত্যের সহাবস্থানের। অত বড় চক্ষুষ্মান ("হে সূর্য, হে আমার বন্ধু") হওয়া সত্ত্বেও এ দেশের বহুযুগব্যাপী চিন্তায় পরম সৌকর্যে লালিত নির্লিপ্তি সতত আকর্ষণ করেছে। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় যে, বর্হির্দৃষ্টিকে হ্রস্ব করে দিয়েছে, হয়তো অগোচরে অনুভূতির নিছক মানবীয় অন্তঃসারকে শীর্ণ করে দিয়েছে। হয়তো বা কিছু পরিমাণে কাব্যসত্যের লঙ্ঘন ঘটিয়েছে। ভারতবর্ষে চিত্তবৃত্তির পরম্পরা এমনই ঐশ্বর্যের অভিসারী যে তার কল্যাণে সত্তার সন্ধান ও 'বিশ্বসাথে যোগে'র সূত্র আবিষ্কারের দুরূহতা হ্রাস পায়। তুলনার কথা নয়, তবে মনে পড়ছে ফ্রান্সে কবি রাসিন্ (Racine)-কে বোয়ালো-র (Boileau) পরামর্শ "অনায়াস কবিতা কষ্ট করে লিখতে হয় সেটা শেখা চাই"। ভারত মহিমার কল্যাণে আমাদের কাছে এই দুরূহতার পরিমাণ কমাতে আমরা পারি, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ বিপদও থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ অন্তত সহজ পথে চলতে চাননি। যদিও হাতের কাছে প্রায় স্বতঃসৃষ্ট ঐতিহ্যগত সুবিধা তিনি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানসক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব চলেছে এমনভাবে যাতে খর্বতা সর্বদা বিলীন হতে পেরেছে। কীর্তনানন্দের মতো বস্তুকে বিদ্রূপ সহজ হলেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো ব্যাপার নয়, কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথ অন্তত কখনও নিজেকে মাতোয়ারা হতে দেননি। তবে হয়তো কিঞ্চিৎ কৌতুকসহকারেই বলা যায় যে, অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টি (কিংবা অনুরূপ চিত্তকল্প) বিষয়ে তাঁর মায়া একটু বেশি ছিল। অভিজাত শব্দটি দ্ব্যর্থক বলে ব্যবহারে বিপদ আছে। তবে কেমন যেন আপনা থেকে সুসংস্কৃত পরিমিতিবোধ থাকার ফলে তাঁর কাছ থেকে সবাই পেয়েছি (ব্যতিক্রম ঘটে গেলেও) এক বিশিষ্ট মহিমা যার দেদীপ্যমান সৌন্দর্য আমাদের সাহিত্যের গৌরব।

পৌষ ১৩৩৮-এ ছিদ্রান্বেষীদের অপ্রতিভ করেই যেন এক ভাষণে কবির অভিমান ও সঙ্গে সঙ্গে অমিত অথচ শোভন শ্লাঘা প্রকাশ পেয়েছিল

"আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে। আমি প্রণাম করেছি মহৎকে। আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে। আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি, অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

শ্রদ্ধাস্তব্ধ মনে অনুধাবন করতে হয় এমন উক্তি যা নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যেই আপাতবিচারে কবিগুণান্বিত বহুজনের মুখে স্মিতহাস্যের উদ্রেক ঘটাবে, কিন্তু ক্ষতি নেই। 'গুরুদেব' বলে প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে রবীন্দ্রভজনের সব চেয়ে সজোর প্রতিবাদী তো ছিলেন কবি নিজেই। তবে কষ্ট হয় বইকি দেখে যে প্রতিষ্ঠিত ('মার্কসবাদী' নয়!) বাঙালী কবি হয়তো বা আত্মপ্রচারের অচেতন প্ররোচনায় ঘটা করে বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন না "রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমায় টানে না, সেখানে হাড়মাংসসহ যে-জীবন তা বিশেষভাবে অনুপস্থিত"। সূত্র উল্লেখ করব না, অহেতুক অপ্রসন্নতার বৃদ্ধি নাই বা ঘটালাম। আর তা ছাড়া, এ নিয়ে অতিরিক্ত মস্তিষ্কপীড়া নির্বুদ্ধিরই পরিচয় দেবে। মস্ত কেতাব লিখে রবীন্দ্রকীর্তির পরিচয় দেওয়া যায় না। প্রবন্ধের পরিসরে সে-চেষ্টা তো বাতুলতা। কিন্তু মনে পড়ে যে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রতিভার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছে আবার মাঝে-মাঝে শুধু যে বিপরীত মেরুতে অবস্থান তাই নয়, থেকে থেকে ক্বচিৎ কদাচিৎ হলেও লক্ষ করার মতো অপরুচিতে অবতরণ—এতে কোনো ক্ষতি হয়নি কারণ, ভারসাম্য ফিরে এসেছে, সুশালীন সিদ্ধান্তে উভয়েরই আত্মিক স্বস্তি পাঠকদের আশ্বস্ত করেছে। মার্কসবাদীদের সম্পর্কেও দেখা যাবে ভিন্ন কালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন মত— দেখা যাবে হয়তো জ্ঞানের স্বল্পতা বা বিচারের বিপত্তি বা রুচির স্খলন, কিন্তু সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে রবির কিরণের মতোই স্পষ্ট হবে যে তত্ত্ব কর্ম নিয়ে সর্ববিধ বিতর্ক ও বিস্ফোরণকে ছাপিয়ে আমাদের সকলের গর্ব রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কেমন করে ভুলি মার্কসবাদে সহজ সরল বিশ্বাসী কবি দিনেশ দাস অজস্র পরিপ্রশ্নকে ছাপিয়ে প্রণিপাতের ভঙ্গিতে লিখে গেছেন মধুর-মহৎ পংক্তি "তোমার পায়ের পাতা/সবখানে পাতা/কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম?"

মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা আজও আমাদের রীতিমতো দুর্বল, অপরিণত, লঘু। কারও নাম ধরে কিছু বলতে অরুচি। তবে নাম করব দুজনের যারা চলে গেছেন আর কখনও ঠিক কোনও দলের চাপরাশ গায়ে না দিলেও ছিলেন মূলগত বিচারে মার্কসবাদী বিশ্বাসে

অবিচল। একজন একেবারে অপরিচিত ও বিস্মৃত, কিন্তু আমার গুরুস্থানীয় বন্ধুরূপে আমার কাছে নিয়ত সমাদরণীয়—জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, অক্সফোর্ডে ইংরিজি সাহিত্যে বহুমূল্য গবেষণা করেছেন, এডোয়ার্ড টম্সন-এর পর সেখানে বাংলা পড়িয়েছেন, বিলাতের অন্যত্রও অধ্যাপনা করেছেন, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর প্রবাসী থেকে সেখানেই ১৯৭৫ সালে দেহরক্ষা করেছেন। স্বদেশের প্রতি একান্ত ভালোবাসা নিয়ে অভিমান ভরে এই যে প্রবাস-জীবন, তাতে তার দুঃখ কম ছিল না—আমায় বলতেন "এই বর্ণবিদ্বেষী দেশের পোকাগুলোও আমার মরা হাড়ে মুখ দেবে না। তবুও এখানে মরতে হবে"। যাই হোক, ১৯৩৫ সালে লণ্ডন থেকে প্রচারিত ভারতীয় প্রগতি লেখকসংঘ বিষয়ে ইশতেহারটি রচনায় তাঁর হাত ছিল অনেকটা, আর হয়তো খানিকটা প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করেছিলেন "Bengali Literature" (Oxford University Press, 1948) রচনা করে, যাতে ফাঁক এবং ফাঁকি (আমাদের প্রায় সকলেরই স্বভাব অনুযায়ী!) থেকে গেলেও (খানিকটা দীর্ঘায়ত প্রবাসের অনিবার্য ফলে) বোধহয় ইংরিজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মার্কসবাদী বিশ্লেষণ মিলবে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা এতে নেই। কারণ, বিংশশতকের দ্বিতীয় দশকের পরবর্তী তথ্য আলোচিত হয়নি। তবুও রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনিবার্যভাবে অনেক কথা আছে, পশ্চিম জগতে রবীন্দ্রনাথকে একদা প্রায় যেন মাথায় তুলে নৃত্য এবং তারপর অনেকটা অসূয়া ও অবিদ্যা-জনিত অবজ্ঞার ব্যাখ্যা কিছুটা আছে ওই গ্রন্থে, কিন্তু বেশ বোঝা যাবে প্রখর শাণিত সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ বিতর্কাতীত গৌরবের মহিমা সানন্দে স্বীকৃত। বহুদিন আগে 'পরিচয়' পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনা করেন আমার অতুলন সুহৃৎ বিষ্ণু দে, যিনি মার্কসবাদী তক্‌মা লাগিয়ে পার্টিতে নাম লেখানো অকাট্য ভাবেননি কিন্তু আমৃত্যু ছিলেন চিন্তার গভীরে মার্কসতত্ত্বের মহিমায় সুস্নাত। যাকে স্বয়ং মার্কস বলতেন, "The Party in the grand historical sense of the term", তারই শিরোভূষণ তাঁকে বলতে ইতস্তত বোধ করি না।

হয়তো বহু সদভিসন্ধিভিত্তিক অথচ অক্ষম ও অপ্রতুল মার্কসবাদী সমালোচনার ত্রুটি অনেকটা স্খালন হবে যদি এখানে বিষ্ণু দে-র কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরি "একটু শ্রমস্বীকার করলে আমরাই উপলব্ধি করতে পারব 'কবিকাহিনী'-র আশ্চর্য বালক নিবিষ্ট কিন্তু স্বাভাবিক মননে ক্রমান্বয়ে নিজের অখণ্ড বিকাশে গভীরতা ও প্রসার অর্জন করেছেন, বাস্তব জীবনের সব দিকের সমস্যায় সঙ্কটে লগ্ন হয়ে বিরাট রাষ্ট্রবিদের মতোই সমাধানের পথ ভেবে ভেবে আবার ক্রমান্বয়ে শিল্পসাহিত্যে সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে জীবনসংলগ্ন অভিজ্ঞতার ধাক্কাতে রূপান্বিত করে বিজেতা শিল্পকীর্তিতে। ক্রমান্বয়েই, কোনও সিদ্ধি-সাফল্যেই আবদ্ধ না থেকে। সমাজ-উত্তরণ ও বিকাশ ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে, ক্রান্তি পরম্পরায়, মৃত্যুকাল অবধি"। "প্রতিভাধর আরও কেউ কেউ থাকলেও এই অন্তরঙ্গ ব্যাপ্তি ও গভীরতায় গোটা দেশে নিত্য প্রভাবের এবং বহুবিধ সংবেদনের দিক থেকে কেউ রবীন্দ্রনাথের তুল্য নয়।"

চিন্তাঘর এই বাক্যসমষ্টির টীকা প্রয়োজন হতে পারে সাধারণ পাঠকের পক্ষে, কিন্তু তা আমার পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভবও। তবে ধরে নিতে পারি 'দেশ'-এর মনোযোগী

পাঠকেরা চাইবেন সেই মানসিক পরিশ্রম করে নিতে। এমন সংহত বাক্য ব্যবহারে, আমাদের সর্বগরিষ্ঠ কবি (স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাকে মহাভারতকার ব্যাসদেবের পার্শ্বে স্থান দিতে চেয়েছিলেন) সম্পর্কে অধুনাতন কালের একজন প্রমুখ কবি-মনীষীর চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে যে উদ্ধৃতি দিয়েই আমি তুষ্ট।

'তুষ্ট' শব্দটি লিখেই ভাবছি যে, বলতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এত বিপুল, এত বিচিত্র, এত সীমাহীন যে নানাদিক থেকে অপরিতুষ্ট আমরা থেকেছি আর সেজন্যই যেন কতকটা অবিবেকবশেই কখনও কখনও উষ্মা প্রকাশ করে বসেছি। হয়তো এটা ঘটেছে যে, স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে একটা যেন বিমূর্ত ধারণার পটভূমিতে বিচার করতে লেগেছি। ভুলে বসেছি কী ধরনের নিঃস্বতার পরিবেশে, চিত্তৈশ্বর্যের ক্ষুদ্রতার মধ্যে, নিষ্প্রাণ নকলনবিশীর আবহাওয়ায়, ভারতজীবনের এক অত্যন্ত দুঃস্থ অবস্থায় (মনে আসতে পারে 'The Legacy of India' গ্রন্থে সংকলক G. T. Garwatt-এর মন্তব্য যে ইংরেজ শাসনকাল হল ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে অনুর্বর অধ্যায়) তিনি জীবন কাটিয়েছেন। বহুকাল আগে মহাকবি গ্যেটে খেদ করেছিলেন পরিবেশ "নোংরা" ("Shabby") আর "নিরীহ" ("tame") বলে প্রতিভার কী পরিমাণ অপচয় ঘটে থাকে। সব কিছু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, অসূয়া আর নির্বুদ্ধিতার গঞ্জনা ক্রমাগত সইতে হয়েছিল, সমকালীন সমাজজীবন থেকে সহায়তা মিলেছে অতি অল্পই (আর কিছুটা মিললেও স্বদেশীযুগের মতো আবার তাঁকে ক্লিষ্টমনে কক্ষচ্যুতির বেদনা পেতে হল)। এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কীর্তি, শুধু সাহিত্য নয় শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত অর্থে নবজীবন নির্মাণের বাস্তব ব্যাপৃতিতে, এমনই ভাস্বর যে, বিশেষণকে ব্রীড়ানত হয়ে সরে যেতে হয়।

তবুও বলতে হয়, শুধু মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, অন্যদিক থেকেও বেশ কিছু অতুষ্টি আমাদের রয়ে গেছে। হয়তো অকিঞ্চিৎকর একটা অনুযোগ এই যে ইয়োরোপের সত্তার মধ্যে যে মহিমা তা তিনি সবচেয়ে ভালোভাবে আমাদের জানিয়েছেন, কিন্তু ফাঁক বেশ কিছু থেকে গেছে এবং তারই ফলে দেখি যে, সাহিত্য গবেষণার নামে মাদাম ওকাম্পো-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য ও সামীপ্যের উদ্ভট চর্চা ঘটতে পারে, এমন পণ্ডিতম্মন্য চর্চা যা কবিমানসের গহনে প্রবেশের অক্ষম, আর পাশ্চাত্য জীবনচর্যার কল্যাণে পরস্পরসখ্যের মধ্যে যে অনাবিল মধুরিমা কবিচিত্তকে স্পর্শ না করাই এক অভিশাপ, তাকে বুঝতেই অপারগ। এ নিয়ে বাক্‌বিস্তার বিরক্তিকর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যখন আমরা পেয়েছি যাকে Dryden-এর ভাষায় বলা যায় 'God's plenty', যখন তাঁর 'স্বদেশী গান' হল এমন যার তুলনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নেই, যখন তিনিই জগতের একমাত্র কবি যিনি হলেন দুটো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের (ভারত, বাংলাদেশ) জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা, যখন তাঁরই গান আর কবিতা কণ্ঠে নিয়ে বহু বিপ্লবী ফাঁসিকাঠে উঠে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন, যখন দেশের মানুষের মুক্তিপ্রয়াসে তাঁর অবদান হল তুলনাহীন, তখন তিনিইবা কেন লিখলেন "চার অধ্যায়"? ক্ষুব্ধকণ্ঠে একজনকে বলতে শুনেছি যে, না হয় বিরক্ত হয়ে "ঘরে বাইরে" লিখলেন (ওতে ভালো বস্তুর অভাব নেই) কিন্তু "চার অধ্যায়" বরদাস্ত করা যায় কি? এখানে জবাব

চাইছি না, শুধু প্রশ্নটি—জবাব অবশ্য আছে, তা সত্ত্বেও। আর এর থেকে জোর দিয়ে ওঠে একটা কথা যা অধুনাসৃষ্ট বাংলাদেশের একজন প্রমুখ মনস্বী, আহ্‌মদ শরীফ সাহেব তুলেছেন। বিশেষ করে নামোল্লেখ করছি এ জন্য যে, আহ্‌মদ শরীফ্ বাংলা সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে মুক্ত মন নিয়ে বহুমূল্য গবেষণা বহুদিন ধরে করেছেন, স্পষ্টবক্তা অকুতোভয় বিদ্বান বলে তাঁর খ্যাতি। রবীন্দ্রমাহাত্ম্যে কারও চেয়ে কম মুগ্ধ না হয়েও একবার লিখেছিলেন "যে রবীন্দ্রনাথ প্রমত্তা পদ্মায় জেলে-মাঝিকে ডুবে মরতে দেখেছেন, পদ্মার যমুনার তীর ভাঙনে হাজার হাজার গরীব চাষীমজুরকে নিঃস্ব হতে, উদ্বাস্তু হতে দেখেছেন, দেখেছেন সচ্ছল চাষীকে সপরিবারে পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে, প্রত্যক্ষ করেছেন দুর্ভিক্ষে অনাহারে-অপুষ্টিতে তুচ্ছ রোগে ভুগে-ভুগে অকালে অপমৃত্যু কবলিত হতে হাজার হাজার নিঃস্ব-নিরন্ন-নিরক্ষর-নির্বিরোধ মানুষকে। আরও দেখেছেন, তাঁরই হুকুমে বা সম্মতিতে তাঁরই গোমস্তাদের খাজনার দায়ে তাঁরই প্রজার ঘটি-বাটি ক্রোক করতে, প্রজাকে ভিটে-ছাড়া করতে, বারবার দেখেছেন ঝড়-খরা-বন্যাতাড়িত মানুষের চরম দুঃখদুর্দশা ও অপমৃত্যু—সেই রবীন্দ্রনাথের বিপুল-বিচিত্র রচনায় এদের নাম-নিশানামাত্র নেই কেন?..." ('এবং আরো ইত্যাদি' ঢাকা ১৩৯৩, পৃ. ১৫৪) । জানি এর জবাব আছে, তবে ভুলি কেমন করে যে, শ্রেণীসমাজের ক্লেদ থেকে যাঁকে পুরুষোত্তম বলে বন্দিত করেছি এই প্রবন্ধে, সেই রবীন্দ্রনাথও নিস্তার পান না। কেমন করে ভুলি আজও যা প্রবলভাবেই প্রকট—মহাচীনের নায়ক মাওৎসে-তুংয়ের বাক্য "Never forget the class struggle" ("কখনও শ্রেণীসংগ্রামকে যেন ভুলি না!")? রবীন্দ্রনাথের তো অজানা ছিল না শ্রেণীস্বার্থে সঞ্চালিত সমাজের চেহারা—আজও তো বড়াইয়ে—ভরা কলকাতা শহরে দেখি একদিকে একদিনের হোটেল-বিহারে একজনের খরচ কয়েক হাজার টাকা আর দোকানের ধারে ফুটপাথে ফেলে-দেওয়া আইস্-ক্রীমের কৌটো সাগ্রহে চাটছে নিঃস্ব ঘরের নিষ্পাপ বুভুক্ষু শিশু!

শেক্‌স্‌পীয়র-এর মতো সাহিত্যসৃষ্টির তুঙ্গনাথকে নিয়ে ভল্‌তেয়ার থেকে বার্নাড শ'-এর বিরূপোক্তি অনেকেরই জানা, তবে মনে হয় এটা যেন কিছু পরিমাণে বৈরিভাবে ভজনারই প্রকাশ। আহ্‌মদ্ শরীফ্ সাহেবের বক্তব্যকে হয়তো সেভাবে দেখা যেতে পারে। যারা "রবীন্দ্রনাথ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবসুলভ আবেগে ভক্তিতে বিগলিত হন", তাদের "মন-বুদ্ধি, রুচি-চিন্তা চেতনা-বিবেক-বিবেচনার পরিপক্কতায় আস্থা অটল রাখা সম্ভব হয় না", যখন তিনি বলেছিলেন তখন এই সতর্কবাণীর প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই থাকতে পারে কিন্তু সম্ভবত নিজেই তিনি সামগ্রিক বিচারে মানবেন যে "রবীন্দ্রনাথের শক্তির ও রচনার অসামান্য গুণমান-মাত্রা ও মাহাত্ম্য" (যা তিনিই অকুণ্ঠে অভিবাদন করেছেন) ছিল এমনই যে ছিদ্রান্বেষিতা ক্ষুদ্রজনের জন্য ছেড়ে রেখে সেই মহাজীবন ও আশ্চর্য কর্মব্যাপৃতি ও চিত্তৌদার্য ও মানবমমতাকে অতুল সম্পদ নিয়ে গর্বোচ্ছ্বাসও অসঙ্গত নয়—কেবল সাবধান থাকা চাই যাতে আমাদের স্বভাবশৈথিল্য উস্‌কানি পেয়ে বিকৃতি সৃষ্টি না করে। রবীন্দ্র প্রতিভার সামনে প্রণিপাতে ক্ষতি নেই কিন্তু যথাযথ পরিপ্রশ্ন বিনা তা ব্যর্থ হবে। রবীন্দ্রগরিমারই অবমাননা ঘটবে।

জন্মদিনের অভিনন্দনের উত্তরে ১৯৩১ সালে কবি পরম দুঃখে না বলে পারেননি

"খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে, আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি"। মার্কসবাদী বলে পরিচিতদের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কটূবাক্য উচ্চারিত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু সেটাকে ব্যতিক্রম ও বিচ্যুতি বললেও ভুল হবে না। যে "অসম্মাননা"-র কথা অভিনন্দন মুহূর্তেও তিনি বলেছিলেন তাতে মার্কসবাদীদের অংশীদারী নেই এবং থাকলেও একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। বরঞ্চ যতদূর জানি, প্রথম থেকেই এ দেশের মার্কসবাদ রবীন্দ্রসৃষ্টি থেকে প্রভূত নৈতিক উদ্দীপনার সন্ধান পেয়েছে, কবির কিশোরকালের রচনা থেকে শুরু করে অজস্র রত্নের দ্যুতি থেকে তাদের বহুবিস্মিত পন্থা আলোর খোঁজ পেয়েছে। রাজশেখর বসু মহাশয় একবার বলেন যে ধর্মগুরু বা জননেতা না হয়ে যদি কেউ বাঙালীর হৃদয়ের পূজা পেয়ে থাকেন তো তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬১ সালে কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত অবিস্মরণীয় রবীন্দ্রমেলা সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রতি তাদের সানন্দ সম্মাননা।

আবার একটু ফিরে যাই আহ্‌মদ শরীফ সাহেবের প্রখর মন্তবের দিকে! আশা করি তিনিও মানবেন সেই মন্তব্যে রয়েছে আতিশয্য, অসঙ্গতি, বেশ একটু বিভ্রমও। রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরিসীম প্রত্যাশা বলেই অতুষ্টিতে আমরা ক্লিষ্ট হই, কিঞ্চিৎ রুষ্টও হতে পারি, কিন্তু সমসাময়িক জীবনের অবস্থান থেকে তাঁকে মহাদেবের ত্রিশূলে রাখা বারাণসীর মতো বিচ্ছিন্ন করে দেখি কোন্ যুক্তিতে? ইতিহাসের বাধা অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ শিল্পস্রষ্টাও কি অসাধ্যসাধনে সমর্থ? বিপ্লবী প্রয়াসের পরিবেশ নির্মিত হওয়ার চিহ্ন মাত্র খুঁজে পেতে যখন দিবালোকেই প্রদীপের প্রয়োজন ঘটে, তখন মহাকবিপ্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই কি সর্ববিধ প্রতিবন্ধকের ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন? "দেবতার দীপ হস্তে" এই ভবধামে যিনি আসেন, সময়ের "কারাগার" তাঁকে "অভ্যর্থনা" জানাতে পারে কিন্তু পূর্ণ নিস্তার তো দিতে পারে না। বিপ্লবী ও পরা-বিপ্লবী সাহিত্যসৃষ্টি তবুও যে আমরা চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের শ্রীহস্ত থেকে। তাহলে তাঁকেই প্রণাম জানাবার এক ভঙ্গীমাত্র। Unacknowledged legislators of the earth" বলে যে কবি-সংজ্ঞা শেলী দিয়ে গেছেন বহুদিন পূর্বে। তার অর্থভেদ তো কর্তব্য। তাই বলি আহ্‌মদ শরীফ-এর কথায় রূঢ় তা সন্দেহ করে ভ্রান্তি যেন না ঘটে। অবশ্য তিনি নিজেই নিজের কথা জানাবার অধিকারী। আমি শুধু এই উপলক্ষে কিছু না বলে পারলাম না।

শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে যেমন "সহস্রমনা" মহাসমুদ্র সদৃশ" ইত্যাদি শব্দপ্রযুক্ত হয়েছে। ভিন্নতর মাত্রায় তাই কেবলই মনে আসে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। কিশোর বয়স থেকে প্রায় মৃত্যুদিবস পর্যন্ত কী অনন্য সৃষ্টিময়তা—সাহসের কী স্পষ্টতা, কী সমাজচেতনার সাক্ষ্য, কী দেশাত্মবোধ আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববোধের মধুনিষ্যন্দ আভাস, কবিসুলভ "সুরভিত অবসর" সম্পর্কে কী অনীহা, কর্মোদ্যোগের কী অপরাজিত অভীপ্সা! ছেলেবেলা থেকেই দেশাত্মবোধ প্রাণিত, "আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির" রাজনীতিতে অস্বীকৃত কংগ্রেসের মতো প্রয়াসে সহযোগী অথচ সন্দিগ্ধ ("একী শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা, ছলনা!") "বাংলার মাটি বাংলার জল"-এর মায়ায় বাঁধা আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতচেতনায়

অন্তরঙ্গ, যে-কারণেই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা সময়ে "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্" বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল সহজ সৌষ্ঠব নিয়ে, (গান্ধী-নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানের তুঙ্গ মুহূর্তে)। আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ দলনের পাশবিকতাকে ধিক্কার দিলেন কবি ১৮৯৩ নাগাদ সময়ে—"বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা" যে সংসারে সেখানে ডাক দিলেন বঞ্চিত নিষ্পিষ্ট মানুষকে : "মুহূর্ত তুলিয়া শির/একত্র দাঁড়াও দেখি সবে/যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে/যখনি দাঁড়াবে তুমি। তখনই সে পলাইবে ধেয়ে, পথ কুক্কুরের মতো"। অবশ্য তখনও তিনি সমাজের ধীর স্থির প্রসন্ন অগ্রগতিতে আস্থা রাখেন আর না বলে পারলেন না। "এ দুঃখ-মাঝারে কবি/একবার নিয়ে এসো স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি"। চলতে লাগল জগৎ জুড়ে মানুষের পরীক্ষা, পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে, আর আমাদের কবিও এগিয়ে চললেন, গেলেন দেশদেশান্তরে ভারতবর্ষের অপরাজেয় বীণাহাতে নিয়ে, সাম্রাজ্যতন্ত্রের কখনও লুক্কায়িত কখনও উলঙ্গ দানবিকতার তাৎপর্য বুঝলেন। রম্যাঁ রলাঁর মতো পাশ্চাত্য মণীষীর সাহচর্যে হৃষ্ট হলেন। তাই একটা গোটা যুগের নির্যাস যেন প্রকাশ পেল "স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি" হারিয়ে ফেলে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' : "যাহারা তোমার বিষায়েছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো/তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো?"

নিজের কথা বলতে দ্বিধা কিন্তু বলবার কথা স্পষ্ট করার জন্যই জানাই কিছু পুরোনো তথ্য। ১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখক আন্দোলনের পক্ষ থেকে তদানীন্তন ফ্যাশিষ্ট অমানুষিকতাকে ধিক্কৃত করার জন্য একটি বিবৃতি প্রস্তুত করতে হয় আমাকে। 'পরিচয়' পত্রিকার শুক্রবাসরীয় আড্ডায় সমবেত সুধীদের পরামর্শ নিতে যাই আর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যধন্য একজন সুবিদিত (এবং আমার শ্রদ্ধেয়) সুধী বললন বিবৃতির সুরটা একটু নরম করে দিতে। নইলে কবি অপ্রসন্ন হতে পারেন! তাই করলাম, অনিচ্ছায়। আর যখন আমার প্রয়াত বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিয়ে গেলেন কবিগৃহে তখন দেখলাম তাঁর কথায় ও ব্যবহারে যে আরও বেশি, সুস্পষ্ট বিবৃতিতেই তিনি সানন্দে স্বাক্ষর দিতেন এবং প্যারিসে রলাঁ-আহুত সম্মেলনে তা পড়া হলে আমাদের বুক আরও ফুলে উঠত। এর পরে আবার যখন ১৯৪১ জুন মাসে সোভিয়েত আক্রান্ত হবার পর পার্টির পক্ষ থেকে অগ্রণী হয়েছিলাম এখানে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠনে। আর আমার পূর্বোক্ত সুহৃদ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী গেলেন বোলপুরে কবিকে সমিতির পৃষ্ঠপোষক পদ গ্রহণের অনুরোধ করতে। রাজি তো হলেনই রবীন্দ্রনাথ, অনেক আলোচনা করলেন সুরেনবাবুর সঙ্গে । বললেন, 'দেখো, তোমরা কম্যুনিস্টরা ভুল কোরো না, যুদ্ধের-চাপে ইংরেজ যাই বলুক, তাকে বিশ্বাস করো না। সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বাসঘাতকতা করবেই।' অপ্রতিভ হতে হয়নি সুরেনবাবুকে। কারণ, সে সময় পার্টি সংকল্প ছিল একই সঙ্গে ফ্যাসিস্ট আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াই (যা কতকটা বদলানো পরে ঘটে অনেক বিপত্তির হেতু হয়ে পড়ে)। এখানে জোর দিয়ে বলতে চাই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি বিষয়ে। জীবনের শেষ পত্রে (Eleanor Rathbone-কে লেখা) তিনি অস্বীকৃত হন ইংরেজ শাসন বিষয়ে লেশমাত্র প্রশস্তিজ্ঞাপনে—বলেন দৃপ্তকণ্ঠে যে শুধু অশিক্ষা নয়, যে-শাসনে গ্রামে পানীয় জলের একান্ত অভাব, যেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ পার হয়ে কাদা ঘেঁটে জল কলসীতে ভরে মেয়েদের আনতে হয়। শিশুর মুখের জল

এভাবে না আনলে চলে না, সেদেশে শাসন করে যে ইংরেজ তার সুখ্যাতি সম্ভব নয়। অখণ্ডমণ্ডলাকার এই চরাচর ব্যাপ্ত প্রতিভার মহিমাকে আমরা ধরি কেমন করে? মাঝে মাঝে ভাবি যারা তাঁর শারীরিক উপস্থিতির সঙ্গে পরিচিত 'Ah' did you see shelley Plain? And did he speak to you?" হতে পেরেছি কিছু পরিমাণে তারা তো বন্য বোধ করতেই পারে। বাক্‌বাহুল্য এড়াতে পারলাম না বলে ক্ষমা চাই।

রিক্ত, দুর্গত, বহুধাবিভক্ত, কলহকলুষিত, কর্মকীর্তিহীন বাঙালি জীবনের ব্যর্থতা (যা আজও বিপুল, আর কষ্ট পাই দেখে যে V. S. Naipal-এর মতো ব্যক্তি 'India; A million Mutinies Now' গ্রন্থে লিখতে পারেন; "the pious Marxist idleness and nullity of Bengal"?) কাটিয়ে উঠতে রবীন্দ্রনাথের মতো মহাত্মাকে স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। মার্কসবাদী বিচার আজও দুর্বল, এখনও যথোপযুক্ত নিদিধ্যাসনের উপর তা প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু আমরা কবিকে প্রণিপাত জানাই, পরিপ্রশ্নের পূর্ণ অবিকার ও প্রয়োজনের কথা না ভুলে আর কীর্তির গভীরতা ও ব্যাপ্তির দিক থেকে রবীন্দ্রসৃষ্টি আমাদের গর্ব, আমাদের পুলক কারও চেয়ে ন্যূন নয়। দারুণ অস্বস্তি বোধ করি তাদের সম্পর্কে যারা বলেন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন কবিতায় নয়। থাকবেন শুধু গানে—গানে তো থাকবেনই। অমন অপরূপ কীর্তিকে কোন্ বিশেষণ দেবার চেষ্টা করব? 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে"—সাতটা শব্দ যেন সাত সমুদ্রের ধনের কথা তুলে ধরে। তবে অমর্যাদা করব তাঁর কবিতাকে, পরিমাপেও গুণ সন্নিপাতে যা বিশ্বজনের বৈভব? ভুলে যাব সাহিত্যের সর্ব বিভাগে তাঁর উৎকর্ষ—গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর নিরুপম সৃষ্টির ঐশ্বর্য? ফ্রান্সে আঁন্দ্রে জিদ্ যেমন দেশের শ্রেষ্ঠ কবিকে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন 'Helas, Victor Hugo", কতকটা তেমনই কি বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের নাম করতে হলে বলব না "গোরা"-র লেখক রবীন্দ্রনাথ"? মাঝে মাঝে দেশিবিদেশী সংস্কৃতি-মুরুব্বিরা বলে থাকেন যে রবীন্দ্রনাথ মস্ত লেখক সন্দেহ নেই কিন্তু সব চেয়ে দামী স্মৃতি তাঁর হল ছবি। জীবনের শেষভাগে আঁকা ছবি। নিশ্চয়ই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ দেশের ও অঙ্কনশিল্পেরই গর্ব, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির এই বক্র ও উন্নাসিক অবমূল্যায়ন তো সহনীয় নয়। অশীতিবর্ষব্যাপী সাধনা যে সুমহান অখণ্ডতা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মে। আর আমাদের মানসে এনেছে যে পবিত্রতার ক্ষেত্র, যে পুণ্যগন্ধ তাকে ভাষার পোষাকে আনতে পারেই বা ক'জন? কোথায় পাব এমন মানুষ যার সম্বন্ধে গোটা একটা জাতির বলতে কুণ্ঠা নেই! "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়"? হোক্ না কিছু অতিকথন, হোক্ না কিছু উচ্ছ্বাস, তবু আজও লোভজর্জর জগতের অজস্র বিড়ম্বনা ও দুর্বৃত্তি দূরীকৃত না হলেও (হবে কেমন করে যখন ইতিহাস নির্মম আর মানুষের অন্তহীন অগ্নিপরীক্ষা) একটু উপশম ঘটবে, স্বস্তির আস্বাদ মিলবে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে। যেন বলতে পারি সবাই বাঙালী "নিত্য তোমাকে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি"। "প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়তমম্ হবামহে, নিধীনাম্ ত্বা নিধিতমম্ হবামহে"।

জগৎ জুড়ে লাল ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে

নিজের ওপর বেশ খানিকটা জোর খাটিয়ে লিখতে বসেছি। আসন্ন পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে পশ্চিমবাংলায় পার্টির ২১তম রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে। পার্টির রীতি হল যে এমন উপলক্ষে পার্টির সবাই যথাসাধ্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অর্থে আত্মসমীক্ষা করব, দেশ আর দুনিয়ার দুর্দশা নিয়ে সবাই মিলে চিন্তা করব, আলোচনা করব আর যতদূর পারি পথের সন্ধান করে আগামী দিনের কর্মপদ্ধতি স্থির করার চেষ্টা করব। এ কাজটি যেন এমন ভাবে হয় যে আজকের দুর্দিন কাটাতে খুব বেশি দেরি হবে না। দুর্দিন যে এসেছে এবং চলেছে তা নিয়ে তো সন্দেহ নেই। এক দশকের বেশি কাল ধরে সমাজবাদ-সাম্যবাদ যেন রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রহের বেলায় রাহুগ্রাস অল্পস্থায়ী হলেও ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাহুমুক্তি যে কত কাল নেবে তা বলা যায় না। এখানে অকাট্য নিয়তির কথা নেই। 'নিয়তি' বলে তো কেউ মানুষের ভবিতব্য নির্ধারণ করছে না (যদি না অবশ্য কেউ মন্ত্রীপ্রবর মুরলীমনোহর জোশীর মতো জ্যোতিষে বিশ্বাস করি!)। আমরা প্রায়ই বলি 'ইতিহাসের গতি' 'ইতিহাসের ধারা'—কিন্তু 'ইতিহাস' বলেও কেউ নেই, কারণ যা কিছু করার তা মানুষকেই করতে হয়। মানুষ একক নয়, সম্মিলিত মানবশক্তিই পরিবর্তন আনে, সমাজরূপান্তর ঘটায়। তাই বিশ্বসংকট ঘোচাতে পারে মানুষেরই সদ্বুদ্ধি, সংকল্প, সংগঠন, সংহতি, সংগ্রামশক্তি যা অন্ধকার কাটিয়ে আলো দেখাবার সামর্থ্য রাখে। এজন্যই দেশে দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের প্রয়োজন এত বেশি। কম্যুনিস্ট চিন্তা ও বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের এত অপরিসীম প্রয়োজন ও গৌরব। এ বিষয়ে যতটা পারি তলিয়ে ভাবার চেষ্টা যেন সবাই মিলে আমরা করতে পারি। এখানেই তো পার্টি সম্মেলনগুলির সার্থকতা। এদিক থেকে আমার এই অতি বৃদ্ধ বয়সের বহু যন্ত্রণা নিয়ে আমার মতো এখন প্রায়-অপটু কম্যুনিস্টকে কলম ধরতে হচ্ছে।

একটু সামলে নিয়ে বলি যে আমার এমন ধৃষ্টতা নেই যে একেবারে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান"-এর মতো না হলেও পার্টিতে এবং পার্টির বাইরে আমার কর্মসহচরদের মূল্যবান কিছু উপদেশ দেবার এক্তিয়ার আমার আছে। তা নেই, কারণ অন্য বহুজনের মতোই প্রকৃত 'কম্যুনিস্ট' হবার যোগ্যতা প্রায় আজীবন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আয়ত্ত করতে পারি নি। আমার এমন অহঙ্কার লেশমাত্র নেই যে দেশবিদেশের খবরাখবর বিশ্লেষণে আমার বিশেষ অধিকার আছে আর সঙ্গে সঙ্গে জানি যে আমার দেশের মানুষের প্রকৃত জীবনযাত্রা ও মনস্তত্ত্ব আমরা অনেকেই এত কম জানি যে তাদের নাড়ির খবর দূরে থাক তাদের আসল পরিচয়ও আমাদের (অন্তত অনেকের) খুবই অল্প। যাক্ সে কথা—শুধু বলব যা কিছু লেখার চেষ্টা করছি (কোনোরকমে 'পাতে দেবার মতো' করার আশায়) তা করছি একান্ত সুবিনীত ভাবে। আমি চাই যে আজকের এই দুরূহ পরিস্থিতিতে 'ভালো' করতে গিয়ে 'মন্দ' কিছু করে না ফেলি! একটা অজুহাত শুধু এই যে আমি নিজে থেকে এই

লিখে ওঠার চেষ্টা করতাম না। কিন্তু আমার বহুদিনের স্নেহভাজন কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য-এর সনির্বন্ধ অনুরোধে (প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তারই ভাষায় আমার কাছে তার 'আবদার'!) সাড়া না দিয়ে পারছি না। ভরসা করি আমার লেখা মাঝে মাঝে হয়তো একটু কটু আর কর্কশ হলেও কেউ আহত হবেন না। এটুকু প্রত্যাশা করব যে পাঠকেরা বিশ্বাস করবেন যে আমার মনে আত্মম্ভরিতা আর যাকে বলা যায় 'অসূয়া' তা একেবারেই নেই। পার্টির একজন বহুকাল ধরে একনিষ্ঠ সদস্য হিসাবেই কতকগুলি মনের কথা তুলে ধরছি।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে 'তরী হতে তীর পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত' বইটিতে এক জায়গায় লিখি আমাদের পার্টি বিষয়ে : কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ড টেনেছে হাজার হাজার নাম না জানা মানুষকে যাদের দুঃখবরণ সম্বন্ধে বলা যায় "Upon such sacrifices the gods themselves throw incense" ("দেবতারাই তাদের আত্মবিসর্জন দেখে ফুল চন্দন দিয়ে অভিবাদন করে")। এটা নিছক বড়াই নয়, এটা নানা দেশের কম্যুনিস্ট কার্যকলাপে কখনও কখনও কিছু কলঙ্ক কলুষ ঢুকে গেলেও মূলগতভাবে তার বাস্তব মূল্যায়ন। এদেশের ব্রাহ্মণ জীবনে পুরুষদের উপনয়ন হয় (যাকে 'পৈতে' বলা হয়) যা বুঝি দেয় 'দ্বিতীয় জন্ম', তারা তখন হয় 'দ্বিজ'। যে-কোনো দেশে কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে 'কম্যুনিস্ট' হয়, তখন তার ক্ষেত্রে প্রকৃতই ঘটে, 'পুনর্জন্ম'। যথার্থ কম্যুনিস্ট হতে হলে কায়মনোবাক্যে নিজেকে বদলাতে হয় আর বিশেষত পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের মধ্যে যারা সচেতন তাদের বেলায় স্বাভাবিকভাবেই এটা ঘটে, তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা থাকে না। মানুষের বহুযুগব্যাপী লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার অবসান ঘটাবার লড়াইয়ে এভাবেই এসেছে কম্যুনিস্টরা। এ নিয়ে বড়াই করতে চাইছি না। কারণ এটা হল আদর্শ এবং আমরা অনেকেই পারি না এর ধারে কাছে আসতে। তবু এই আদর্শের টানেই মানুষ কম্যুনিস্ট হয়, সবাই আদর্শের মর্যাদা রাখতে যে পারি না তা ভিন্ন কথা। কিন্তু একথাটা ভুলে থাকা আমাদের পক্ষে অপরাধ। আমাদের যে জীবন দর্শন, যে বিশ্ববীক্ষা সর্বমানবের কল্যাণসাধন যার মূল অন্বিষ্ট, তা থেকে বিচ্যুতি ঘটলে আমাদেরই মনুষ্যত্বের অপমান। এটা বলে সাধারণ মানুষ থেকে আমরা আলাদা আর সরেস, তা একেবারেই বলছি না। সাধারণ মানুষের মধ্যেই অসাধারণ সম্ভাবনা আছে, তারাই নতুন সমাজ নতুন দুনিয়া গড়ার সাধ্য রাখে। এজন্যই প্রত্যেক কম্যুনিস্টেরই মনে রাখা উচিত যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দল থেকে গুণগতভাবে তারা পৃথক। কেবল সমাজে ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা কিম্বা তার ভগ্নাংশ নিয়ে লড়ালড়ি তার কর্ম নয়। সাময়িকভাবে প্রয়োজন হলে তেমন ধরনের 'টেক্কাটেক্কি'-তে কতকটা জড়িয়ে পড়তে হতে পারে, কিন্তু নিছক ক্ষমতার জন্য রেষারেষি যে আমাদের বিকৃত না করে। কখনও যেন আমরা ভুলি না কার্ল মার্কস-এর কথা "দর্শনশাস্ত্রীরা নানাভাবে জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের অন্বিষ্ট হল জগৎটাকেই বদ্‌লে দেওয়া।" এরই যেন প্রতিধ্বনি ১৯৩০ সালে সোভিয়েট দেশে রবীন্দ্রনাথের বিদায় বাণী "তোমরা লোভ নামে যে 'মৃত্যুশেল' মানুষের সমাজ দেহে প্রোথিত তাকে

সমূলে উৎপাটিত করতে চেষ্টা করছ। এটা অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু এটাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো কাজ। আমরা শুভেচ্ছা রইল যেন তোমরা সফল হতে পারো"।

(ঠিক এই ভাষা নয়। কিন্তু আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি)

জানি অনেকে উপহাস করবেন, বিদ্রূপ করবেন-এসব হল উচ্ছ্বাস, কাগুজে আদর্শ নিয়ে কচ্‌কচি-তাছাড়া খাস সোভিয়েট ভূমিই তো এখন লোপাট, সমাজবাদ-সাম্যবাদের বারোটা বেজে গেছে। এখন আর এই ভাববিলাস চলবে না। শুনতে হবে আরও অনেক কটুকাটব্য। শুনেও আমরা চলেছি। বি-জে-পির শাসনে আমাদের দেশের ইতিহাসকে যেমন নোংরা সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বদ্‌লাবার চেষ্টা চলেছে, তেমনই জগৎ জুড়ে ইতিহাসের পাতা থেকে গত একশো বছরের বেশি ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। আমাদেরও এই দুরবস্থার দায়িত্ব কিছু পরিমাণে নিতে হবে, কারণ সোভিয়েট সমেত কম্যুনিস্ট দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র আমাদেরই পুঞ্জীভূত দোষ ও দুর্বলতা দূর করতে পারিনি বলে অবলীলাক্রমে গর্বাচভ-ইয়েলৎসিনের মতো চতুর ছদ্মবেশধারী প্রতিবিপ্লবীদের দুষ্কর্ম ঠেকাতে পারা যায় নি। আবার যদি আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি (যার কিছু লক্ষণ আজ স্পষ্ট) তাহলেই প্রমাণ হবে যে "ইতিহাসের অবসান" ঘটে নি, শোষণভিত্তিক পুঁজিশাহীর "ক্লেদ, লজ্জা ও অমানবিকতা" (কথাগুলি মার্কস-এর) মানুষ কখনও চিরকাল বরদাস্ত করবে না। আর আমরা তো শিরোধার্য করে রাখব রবীন্দ্রনাথের অন্তিম নির্দেশ যে "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোর মতো পাপ" আমরা করতে পারি না।

এত কথা টেনে ফেললাম কারণ আমার সুযোগ হয়েছিল কমরেড রাজেশ্বর রাও-এর সঙ্গী হয়ে ১৯৮৭ সালে মস্কোতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সপ্ততিতম বার্ষিকী (নভেম্বর ১৯৮৭) অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে এবং তখন থেকেই গর্বাচভের অতি সুকৌশলী ঘোষণা "For Socialism, More Socialism, Always Socialism" (তারই লেখা পুস্তিকার শিরোনাম) যে কত গভীর প্রবঞ্চনাকে লুকিয়ে রাখছিল তা নিয়ে সন্দেহ জেগেছিল যা আমি রাজেশ্বর রাও ছাড়াও আফগানিস্তানের কমরেড নজীবউল্লাহ (যাকে বিপ্লব-শত্রুদের হাতে অতি পৈশাচিকভাবে মরতে হয়) আর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়াত কমরেড অলিভার টাম্বো এবং আলফ্রেড নজো-কে মস্কোতেই জানিয়েছিলাম। পার্টির 'নিউএজ' পত্রিকার বহুকাল ধরে মস্কোবাসী সংবাদদাতা কমরেড মসুদ আলী খান-এর ঘরে তৎকালে মস্কোবাসী ভারতীয়, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, নেপালী ও শ্রীলঙ্কার কম্যুনিস্টদের সামনে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করি, যার 'টেপ' নেই কিম্বা হারিয়ে গেছে। আমার মনে একটা যন্ত্রণা তখন থেকে খচ্‌খচ্‌ করে চলেছে। আমার পার্টি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি—যাকে আমি ১৯৩৬ সাল থেকে কখনও ছাড়িনি, ছাড়তে পারিনি, ছাড়লে নিঃশ্বাস ফেলতে পারব না বলে ছাড়িনি, সেই আদি পার্টির নেতৃত্বে এবিষয়ে টালবাহনা (যা কতকটা সংশোধিত হয়েছে) আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি যে নির্ভুল, সবজান্তা-এমন দর্প লেশমাত্র নেই, কিন্তু আশা করি কমরেডরা আমার বেদনা অন্তত একটু বুঝে আমার কথার কদর্থ করবেন না। বেশ কিছুকাল ধরে ফিদেল কাস্ত্রোর তেজস্বী

ঘোষণা থেকে সান্ত্বনা পাচ্ছি আর সম্প্রতি Seattle থেকে Genoa পশ্চিম জগতের জনশক্তির আলোড়ন দেখে উৎসাহ সঞ্চয় করছি। জীবনান্তের আগে দেখতে পাব না, কিন্তু অনেক কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে রয়েছি।

* *

আমাদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বিদেশ থেকে ধার করা বলে এদেশের মাটিতে মিশতে পারে না বলে নালিশ বহুকাল ধরে চলে এসেছে। আজও চলছে। আমরা দেশকে ভালোবাসি না, সোভিয়েটকে আমরা 'পিতৃভূমি' ভাবি ইত্যাদি একেবারে তুচ্ছ অথচ মারাত্মক নিন্দা শুনে আসতে আমাদের অভ্যস্ত হতে হয়েছে। একটা সময় (বিশেষত ১৯৪২-৪৫-এর সময়) আরও নিদারুণ মারাত্মক গালাগাল শুনেছি যে আমরা দেশদ্রোহী, এমনকি ইংরেজের চর হয়ে পুলিশকে সাহায্য করি ইত্যাদি ইত্যাদি। আশ্চর্য কি যে তখন তিক্তবিরক্ত হয়ে আমরাও ভুল করে বসেছি আর সুভাষচন্দ্র বসুর মতো দেশভক্তকে কটু ভাষায় নিন্দার মতো অপকর্ম করে ফেলেছি। এখানেই বলে রাখি যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরস্পর মতভেদ সত্ত্বেও আমাদের সুসম্পর্ক ছিল (একত্র আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি)। তাঁর দেশত্যাগকালে কম্যুনিস্ট কমরেড তলোয়ার তাঁর সঙ্গে ছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তাঁর একান্ত অনুগামীদের সঙ্গে আমাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছিল আর স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র সঙ্গে আমাদের একত্রে কাজ করেছি। ১৯৪২ সালের দেশজোড়া আলোড়ন যখন ঘটে তখন কিছুকাল 'স্বাধীন' বলে ঘোষিত মহারাষ্ট্রের সাতারা অঞ্চলের নেতা নানা পাতিল আমৃত্যু কম্যুনিস্ট পার্টিতে ছিলেন। মেদিনীপুরে কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয় নেতা সতীশ সামন্তের সর্বাধিনায়কত্বে যখন 'স্বাধীন' অঞ্চল স্থাপিত হয় তখন ভূপাল পাণ্ডা প্রমুখ আমাদের কমরেডদের ভূমিকা কম ছিল না। উত্তরপ্রদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সরযূ পাণ্ডে, ঝাড়খণ্ড রাই প্রভৃতি কম্যুনিস্টদের কথা ভুলবার নয়, যেমন বলা যায় বিহারে কিশোরীপ্রসাদ সিংহের কথা। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে আরও অনেক কথা মনে আসছে, কিন্তু ক্ষান্ত হই। শুধু এইটুকু বলি যে বিয়াল্লিশ-এর অভ্যুত্থানে প্রধান নেত্রী অরুণা আসফ আলী যুদ্ধোত্তর কালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান শুধু নয় তার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে কুণ্ঠা বোধ করেননি আর আজও কানপুরে রয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাই বাহিনীর' যশস্বিনী নেত্রী লক্ষ্মী স্বামিনাথন (পরে সায়গল) যিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য।

কথার উপর কথা বেড়ে যাচ্ছে তবু বলি যে এই সম্প্রতি কম্যুনিস্টদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ দেখে বলেছিলাম একবার যেতে কলকাতার 'এস-এস-কে-এম' হাসপাতালে যেখানে বামফ্রন্ট সরকারের কল্যাণে রয়েছেন তিন প্রায় যেন প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ গণেশ ঘোষ, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল হালদার যারা তিনজনই কম্যুনিস্ট। তিনজনেই আমৃত্যু উৎসৃষ্টপ্রাণ কম্যুনিস্ট, দেশাভিমানীদের মধ্যে যাদের নাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। মনে পড়ে যাচ্ছে যে ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কলকাতায় পার্টির যে দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তার Credentials Commitee-তে ছিলাম বলে আজও মনে গেঁথে রয়েছে

যে উপস্থিত ছয়-শো প্রতিনিধির পরিচয়পত্র থেকে জানা যায় যে তখন সেই সদ্যস্বাধীন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে যে কর্মীরা এসেছিল তারা ইংরেজ শাসনকালে সর্বসমেত দেড় হাজার বছর কারাবাস করেছন, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকে আড়াই বছর জেল খেটেছেন। আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামে কম্যুনিস্টরা সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের অবদান, তাদের আনুপাতিক অংশগ্রহণ যে একেবারেই অল্প নয়, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এ নিয়ে বাক্‌বিস্তার করতে চাই না, কারণ তা স্বতঃসিদ্ধ, নিতান্ত শত্রুপক্ষীয়দেরও তা মানতে হবে যদিও তা তারা মানেন না।

জওয়াহরলাল নেহরু যখন ১৯৩৬ সালে আত্মজীবনী প্রকাশ করেন তাতে একটু যেন ঈর্ষান্বিত ভাবে লিখেছিলেন যে কম্যুনিস্টরা ব্যক্তিগত ব্যবহারে কেমন যেন মাঝে মাঝে বেয়াড়া ভাব দেখালেও তাদের কর্মশক্তি আর নীতি প্রচুর আর তাই লেনিন থেকে শুরু করে তাদের সবাইয়ের মনে একটা দৃঢ় ধারণা যে সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রবাহে সমাজবাদ-সাম্যবাদের অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী। এজন্য তারা সর্বদাই আশাবাদী এবং সেজন্যই উৎসাহ হারায় না। মাঝে মাঝে জওয়াহরলালের কাছ থেকে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সহায়ক কিছু উক্তি পাওয়া গেলেও তার লিবারল-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তিনি ছাড়তে পারেননি আর ১৯৪৮-৪৯ সালের মতো জটিল সময়ে বলতে পেরেছিলেন যে কম্যুনিজ্‌ম আর কম্যুনালিজ্‌ম'-এর (সাম্প্রদায়িকতা) মধ্যে তফাৎ হল শুধু এই যে একটা হল জলে ডুবে আর একটা হল পাহাড় থেকে পড়ে মরার মতো। অথচ ১৯৩৬ সালে আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে ঐ দুটো শব্দের মধ্যে মাত্র একটা অক্ষরের তফাৎ হলেও প্রভেদটা হল বিরাট। সংকটকালে দোদুল্যমান এই দেশনেতা তাই ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'The discovery of India' গ্রন্থে নিশ্চিন্ত মনে লিখলেন যে ভারতবর্ষে কম্যুনিস্টরা বামপন্থী হিসাবে একটা "ginger group"-এর বেশি কিছু হবে না! অর্থাৎ "আদার ঝাঁঝ"-এর মতো একটা বস্তু তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে আমদানি করতে পারে মাত্র। বুর্জোয়াদের মধ্যে সবচেয়ে মার্জিত চিত্ত ও অগ্রসর বলে খ্যাত তাদের মুখে এমন বাক্য শুনে একটু মজা হয়, ক্রোধও যে হয় না তা নয়। তবু আজও আমার আশঙ্কা যে দেশের আধুনিক ইতিহাসে যোগ্য ভূমিকায় নামবার সুযোগ পেয়েও বুঝি আমরা নামতে পারলাম না। মনে ঘুরছে অতি সম্প্রতিকালের 'তৃতীয় মোর্চা' ("Third Front") গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে সংবাদপত্রে আলোচিত প্রসঙ্গ। এখনও আমরা যেভাবে এগিয়ে যাবার লক্ষণ দেখাতে পেরেছিলাম, সেভাবে এগোতে পারিনি—কতকটা নানাবিধ ঘটনার চাপে আর তার চেয়েও বেশি নিজেদের অনৈক্যের কারণে। সে প্রসঙ্গ হল আলাদা, এখন শুধু বলছি যে বুর্জোয়া মহারথীদের এ ধরনের বাগাড়ম্বর অন্তত প্রমাণ করে যে দেশের মানুষের সমর্থনে সংগঠন শক্তিতে কম্যুনিস্টদের অগ্রগতি আমাদের শত্রুশ্রেণীকে কতদূর ভুগিয়েছে, ভাবিয়ে তুলেছে। 'শত্রুশ্রেণী' শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি উঠতে পারে; বিশেষত নিছক 'গণতন্ত্র'-এর (যে বস্তুটির অস্তিত্ব নেই, আছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, যেখানে সর্বহারারা বিপর্যস্ত আর 'প্রোলেটেরিয়ন' গণতন্ত্র, যেখানে বুর্জোয়াদের বেশ কিছু পরিমাণে বঞ্চিত হতে হয়) জয়গানে মাতিয়ে

'বিশ্বায়নী' অর্থনীতির দাপট চলেছে, তখন 'শ্রেণীশত্রু' কথাটিতে বিরক্ত হবেন অনেকেই। তবু বলব, কখনও যেন না ভুলি মহাচীনের বিপ্লবনায়ক মাওৎসেডুং-এর শিক্ষা "শ্রেণীসংগ্রামকে যেন কখনও না ভুলে বসি" ("Never forget the class struggle")। বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে তার রূপ বদলায় নিশ্চয়ই, কিন্তু আজও চলছে এবং চলতে থাকবে মূলগতভাবে যা হল 'শ্রেণীসংগ্রাম', আজকের 'বিশ্বায়নী' বদ্‌মায়েসিকে জব্দ করার লড়াই শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, তা যেন আমরা ভুলে না যাই।

* * *

দেশে দেশে স্বাধীনতার সঙ্গে কম্যুনিজ্‌ম-এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে মার্কসীয় চিন্তায় অনেক মূল্যবান তত্ত্ব ও কর্মের নিশানা পাওয়া গেছে। কতকাল আগে—১৮৫৮ সালে মার্কস্ আর এঙ্গেল্‌স-এর পত্রালাপে দেখা যায় তাদের উদ্বেগ : সমাজবাদী বিপ্লব শুধু উন্নত দেশগুলিতে হলে তো বাকি গোটা দুনিয়াতে বুর্জোয়াদের প্রভুত্ব টিকে থাকবে যার জোরে ইয়োরোপের মতো ভূখণ্ডও তাদেরই পদানত থাকবে। সেজন্যই বিপ্লবকে হতে হবে জগজ্জয়ী এবং সে জন্যই দেশে দেশে লড়াই চালাতে হবে। পুঁজিশাহী যেমন আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সমাজবাদ-সাম্যবাদকে আন্তর্জাতিক চেহারা নিয়ে এগোতে হবে। দুনিয়ার শ্রমজীবীকে এক হবার উদাত্ত আহ্বান তাই ১৮৪৮ সালের কম্যুনিস্ট ইশ্‌তেহারে। পরে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লেনিন সমাজবাদ-সাম্যবাদ ও জাতীয় স্বাধীনতার অকাট্য সম্পর্কের নীতি ঘোষণা করলেন। সোভিয়েট বিপ্লব (১৯১৭) হল কম্যুনিজ্‌ম আর জাতীয় মুক্তির একাত্মতার প্রতীক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে (১৯৩৯-৪৫) সোভিয়েটের বিজয়েরই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেশে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়, ১৯৬০-এর দশকে দুনিয়া দেখ্‌ল এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার জনশক্তির অগ্রগতি।

ইতিহাসের এই ধারার সঙ্গে পা মিলিয়েই আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিস্টদের একান্ত আত্মীয় সম্পর্ক। এটা বলে 'শ্রেণীসংগ্রামকে' অস্বীকার করা হয় না, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে বহু ব্যাপারে আমাদের বিরোধকে চাপা দেওয়া হয় না। পরাধীন দেশের মানুষের কাছে সেই শৃংখলমোচন যে সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য, তাকেও অস্বীকার করা হয় না। এ নিয়ে হাজার তর্কাতর্কির কচ্‌কচির মধ্যে ঢুকছি না, কিন্তু স্বাধীনতা (সাম্রাজ্যতন্ত্রের শিকলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা) যে একেবারে প্রাথমিক কর্তব্য তা কম্যুনিস্টদের মতন কে বুঝতে পেরেছে? ভেবে দেখা হোক্, ১৯২১ সালের শেষদিকে আহ্‌মদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন, যেখানে কারারুদ্ধ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর অনুপস্থিতিতে সভাপতির আসনে হাকিম আজমল খান সেখানে, এদেশে কম্যুনিজ্‌মের সেই শৈশবকালে, কম্যুনিস্ট চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে মওলানা হস্‌রৎ মোহানি দাবি করলেন দেশের 'পূর্ণ স্বাধীনতা', ইংরেজ সাম্রাজ্যের অবসান, দাসত্ব শৃংখলকে চূর্ণ করে নবজীবন নির্মাণের প্রয়াস। কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে 'স্বরাজ'-এর যে লড়াই মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করে অপূর্ব মহিমায়, জনগণমন অধিনায়ক রূপে চালিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের যে ভাস্কর সংগ্রামশক্তি তখন দেখা গিয়েছিল, তারই প্রস্ফুটন চাইলেন হস্‌রৎ মোহানি, কিন্তু গান্ধীজীই বাধা দিলেন

বলে যে অমন দুঃসাহসী পদক্ষেপ হবে অবিমৃষ্যকারিতা, তিনি কিছুতেই দেশকে সাঁতার কাটতে সম্পূর্ণ পটু হবার আগে গভীর জলে নামাবেন না, আর তাছাড়া 'অহিংসা' নীতি অনুসরণে আমরা নাকি সফল হতে পারিনি! যাই হোক্, এর মাস দুয়েক পরে উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরায় একটি থানা জ্বালিয়ে গ্রামবাসীদের পুলিশী অত্যাচারের বদ্‌লা নেওয়ার 'অপরাধে' গান্ধিজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন, বিরাট এক সংগ্রামের নিরীহ পরিণতিতে দেশবাসী মুষড়ে পড়ল আর অনিবার্যভাবে সংগ্রাম পিছিয়ে গেল বহুদূর। একদিকে এই মর্মন্তুদ ঘটনা, কিন্তু ১৯২২ সালের মার্চ মাসে ইংরেজ আদালতের বিচারে মহাত্মা গান্ধী যখন পেলেন ছয় বৎসরের কারাদণ্ড তখন তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দিই (যা এত কাল আমার কণ্ঠস্থ হয়ে রয়েছে)

"The government established by law in British India is carried on for the exploitation of the masses. No sophistry, no jugglery in figures, can explain away the evidence that skeletons in the villages present to the naked eye. The miserable little comforts of the town dwellers in India represent the brokerage they get for the work they do for the foreign exploiters, and the profits and the brokerage are sucked from the masses. I have no doubt whatsoever that both England and the town dwellers in India will have to answer if there is a God above, for this crime against humanity which is perhaps unparalleled in history."

"আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে চলছে জনগণের শোষণের ভিত্তিতে। গ্রামাঞ্চলে অনাহারে কঙ্কালসার মানুষকে দেখলে কোনোরকম বাক্‌বৈদগ্ধ্য আর সংখ্যাতত্ত্বের জাদুকরির জোরে তার ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া যায় না। ভারতবর্ষে শহরবাসীরা যে অতি তুচ্ছ কিছু আরামের উপাদান পেয়ে থাকে তার অর্থ হল যে তারা বিদেশী শোষণকারীদের কাছ থেকে দালালি হিসাবে কিছু পাচ্ছে। পুরো মুনাফা আর এই দালালির টাকা অবশ্য জনগণের কাছ থেকে শুষে নেওয়া হচ্ছে। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে যদি ভগবান থাকেন তো ইংলন্ড এবং ভারতবর্ষের নগরবাসী উভয়কেই মানবিকতার বিরুদ্ধে এই মহাপাপের জবাবদিহি করতে হবে। এই মহাপাপের তুলনা হয়তো পৃথিবীর ইতিহাসের কোথাও মিলবে না।"

বিশেষ করে এই উদ্ধৃতি আমার মনে ঘুরছে আজকের "বিশ্বায়নী" অর্থনীতির মায়াজালে আচ্ছন্ন হতে চলেছি বলে। 'বুর্জোয়াজি' শব্দের অবিকল অনুবাদ হল 'শহরবাসী'। ১৯২২ সালে 'বুর্জোয়া' শব্দটি প্রায় অজানা ছিল। গান্ধীজীর কাছে তো বটেই। গত দশ বছরের অর্থনৈতিক ওলটপালটের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে (যার সাক্ষ্য হল বছরের পর বছর United Nations Development Report যে জগতের ওপর তলার পনেরো শতাংশ মানুষ আরও ধনশালী হয়েছে আর নীচে রয়েছে পঁচাশি শতাংশ যাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে)। মার্কস্‌বাদী ভাষায় যে বহুবার বলা হয়েছে তার সত্যতাই প্রমাণ হচ্ছে "ধনী আজ আরও ধনী, গরীব আজ আরও গরীব'। ইংরেজ কবির কথায়, "wealth accumulates and men decay" ("ধনসম্পত্তি

বাড়ে আর মানুষ শুকিয়ে পড়ে")। জগৎ জুড়ে সোশালিজ্‌মের নিধন ঘোষণা করে সভ্যতাকে এই পর্যায়ে আজ নামানো হয়েছে। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর সত্যেরই আভাস মিলছে ১৯২২ সালে গান্ধীজীর ঘোষণার। এর অর্থ নয় যে তিনি ছিলেন ত্রিকালদর্শী। বরঞ্চ তিনিই সাম্যবাদী বিপ্লবকে ধিক্কার দিয়েছেন, তাকে রোধ করে চলেছেন বহু বৎসর ধরে। তবু আমার উদ্দেশ্য হল বলা যে দেশের মুক্তি চাইতে গেলে দেশের মানুষের বঞ্চনা আর যন্ত্রণার কথা ভোলা যায় না, জাতীয় স্বাধীনতা তখনই সার্থক যখন তার পরিপূরণ ঘটে সমসুযোগের শোষণ মুক্তসমাজ প্রতিষ্ঠায়। এ জন্যই ১৯২২ সালের শেষে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উদাত্ত ভাষায় "শতকরা ৯৮ জনের স্বরাজ" তাঁর মূলনীতি বলে ঘোষণা না করে পারেন নি। এটা শুধু মহাত্মা গান্ধী বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক কলাকৌশল বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। গান্ধীজী যখন আমাদের বলতেন যে তিনি ঢের বেশি 'কম্যুনিস্ট', তখন সেটা শুধু রহস্য নয়। আমরা যেন না ভুলি যে কম্যুনিজ্‌ম-এর সঙ্গে মানবিকতার ("humanism") একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। যাকে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিন কখনও তাচ্ছিল্য করেননি। একটা জায়গায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সবাইয়ের একযোগে কাজে নামার বিরাট অবকাশ আছে, এ কথা একান্ত সংকটকাল ভিন্ন অন্য সময়ে ভুলে যাওয়া কম্যুনিস্টদের অকর্তব্য। মার্ক্‌সীয় "কথোপকথন" ("dialogue") যে গুরুত্ব নিতে পারে, তা জানি। মস্কোতে কথা হয়েছিল নিকারাগুয়ার 'কম্যুনিস্ট' বিদেশমন্ত্রী Father d'Escoto-র সঙ্গে। তিনি পেশায় ছিলেন ক্যাথলিক গির্জার পাদরী! সোভিয়েট বিষয়ে সবচেয়ে সহৃদয় ও প্রাণবন্ত গ্রন্থ হল The Very Rev, Hewlett Johnson (Dean of Canterbury Cathedral)-এর "The Socialist Sixth of the Earth" যা 'সোভিয়েট দুনিয়া' নামে বাংলার তরজমা হয়েছিল।

* * *

এলোমেলো হয়ে গেলেও মনের কয়েকটি কথা সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। বলতে চাইছি যে সব দেশের মতো এখানেও কম্যুনিস্ট পার্টি আর আন্দোলনের মূল শক্তি আর প্রেরণা হল দেশেরই মানুষ, অন্য কোথাও থেকে ধার করে আনা বা অনুকরণ করা কিছু নয়। ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতা সংগ্রামের সুপরিণতির পরিচয় মেলে দেশের মেহনতী মানুষকে রাজনীতি অর্থনীতিসহ সর্বব্যাপারে টেনে এনে জীবনকে "শোষণের কারাগার" থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াসে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিতে তাই দেখা গেছে তাদের যারা 'স্বদেশী' করেছেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যকে হটিয়ে দেবার লম্বা লড়াইয়ে নেমেছেন, প্রয়োজনে 'সন্ত্রাসবাদী' হয়েছেন, শ্রমজীবীদের লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা অবসানের জন্য মজুর কিষাণদের নিয়ে সংগঠন করেছেন, নতুন শ্রেণীহীন সমসুযোগ নির্মাণের দীর্ঘায়ত, "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' অবলম্বন করেছেন, সকল দেশপ্রেমিক দেশাভিমানীকে নিয়ে শোষণ মুক্ত নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েছেন। এমনই কঠিন এই ব্রত, আমাদের মতো সুপ্রাচীন সমস্যাসংকুল জটিল পরিস্থিতির দেশে এই সংকল্প সাধন এমনই দুঃসাধ্য যে দুর্বল মানুষকে দিতে হবে চরিত্রের অতি কঠোর পরীক্ষা। সহজ সাফল্য আশা করাই হল নির্বুদ্ধিতা, অথচ এরই মধ্যে আশার আলো জাগিয়ে রাখতে হবে আমাদেরই। এ কাজে কম্যুনিস্টরা ছাড়া আর কেউ কায়মনোবাক্যে এগিয়ে আসতে পারবে না। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও 'একা' আমরা নই। সকল

শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জড়ো করে নতুন ইতিহাস নির্মাণে অগ্রণীর ভূমিকা আমাদেরই।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বিষয়ে ১৯২২-এর মার্চ মাসে গান্ধীজীর বিবৃতি উদ্ধৃত করেছি। আমাকে বেশ কিছুকাল গান্ধী চরিত্র প্রায় আচ্ছন্ন করেছিল, তা নিয়ে গোটা বইও লিখেছি। তবে গান্ধী চিন্তা থেকে মার্কস তত্ত্বে সাধ্যমতো উত্তরণও আমার—শুধু আমার নয়, অন্য বহুজনের জীবনের ঘটনা। গান্ধীজীকেই বারবার অবশ্য দেখা গেল আসন্ন প্রায় 'বিপ্লবী' অভ্যুত্থানের রাশ টেনে ধরে ধরে লড়াইকে স্তব্ধ করে দিতে (যা ঘটেছে ১৯২২-এ, ১৯৩০-৩২-এ ১৯৪২ আগস্ট আলোড়নের পর বা ১৯৪৫-৪৬ এও ইত্যাদি)। তিনি ১৯২৮ সালের পয়লা এপ্রিল তারিখের চিঠিতে লেখেন জওয়াহরলাল নেহরুকে "আমি তোমার সঙ্গে একমত যে ধনী আর শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়েই ("without the rich and the educated class") আমাদের লড়াইয়ে নামতে হবে। কিন্তু তার সময় এখনও আসেনি ("the time is not yet")।" তখন সদ্য ১৯২৭ সালে সোভিয়েট ফেরত জওয়াহরলাল একটু মেতেছিলেন সমাজবাদ নিয়ে, আর গান্ধীজী তাকে 'সামাল' দিচ্ছিলেন। ১৯২৯ সালেই উত্তরপ্রদেশে (এবং অন্যত্র) কৃষকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ আন্দোলনের পথে চলেছিল তখন গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন যে কেউ যেন প্রত্যাশা না করে যে তিনি "বিপ্লব আর লাল সর্বনাশ" "revolution and red ruin") ধরনের ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবেন। তখন নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এমন কথা উঠেছিল আর এরই মধ্যে কম্যুনিস্টদের কাজ করতে হয়েছিল। ভুল ভ্রান্তি যে ঘটেছিল তা আশ্চর্যের কিছু নয়। আমরা প্রায় অনিবার্যভাবে দু'রকম ভুল করে চলেছি। কখনও দেশের মানুষকে সঙ্গে না পেয়ে বেশি এগিয়েছি কিম্বা আমরা দেশের জাতীয় নেতাদের পিছন পিছন ধাওয়া করেছি (হয় sectarianism নয় tallism)। এর জন্য লজ্জিত নই; এটা বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন। এটা বারবার ঘটেছে। আর মূলগতভাবে এজন্যই ঘটেছে স্বাধীন ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাবার মতো সর্বনাশী কাণ্ড, যার কুফল শুধ্‌রে না নিতে পারলে আমাদের (এবং দেশের) নিস্তার নেই।

* *

শুধু শত্রুরা নয় আমাদের নিজেদের মধ্যে গুঞ্জন মাত্র নয়, রীতিমতো আওয়াজ মাঝে মাঝে ওঠে যে কম্যুনিস্টরা কেবলই বারবার "ভুল" করে চলেছে আর ক্রমাগত "ভুলের" এই বোঝা যাদের মাথায়, তাদের ওপর জনগণ নির্ভর করবে কেন? ব্যাপারটা একেবারেই অত সহজ নয়। এদেশেরও সকল দেশেরই ইতিহাসে সংগ্রামী শক্তির 'ভুল' করার উদাহরণ অজস্র। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির মতো বিরাট ঐতিহ্যসমৃদ্ধ, নবসমাজ গঠনের গৌরবমণ্ডিত পার্টি কতবার 'ভুল' করেছে তার সংখ্যা কম নয় (সবচেয়ে সাম্প্রতিক যে 'ভুল' এর ফলে জগতের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে সফল সমাজবাদ-সাম্যবাদ যে 'প্রতিবিপ্লবী' ধাক্কা খেয়েছে সেটা সবচেয়ে টাটকা উদাহরণ)। আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রভাবশালী আর মাঝে মাঝে অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'লড়াকু' পার্টি বলে যার নামডাক ছিল সেই কংগ্রেস যে কতবার কত মারাত্মক ভুল করেছে আর দেশ স্বাধীন হবার আগে ইংরেজকে সেই 'ক্ষমতা' হস্তান্তরের মূল্য হিসাবে দেশভাগে সম্মত হয়ে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করেছে তা কি ভুলে যাব?

অবশ্য সবাই ভুল করি বলে আমাদের ভুলকে মার্জনা করা হোক্ বলছি না। শুধু বলি একটু ঐতিহাসিক মানদণ্ডে বিচারটা হোক্।

১৭৮৯-৯৫ যখন "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" মন্ত্র নিয়ে ফরাসী বিপ্লব ঘটে তখন থেকে নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু আজও তার প্রতিশ্রুতি সর্বমানবের জীবনে বাস্তবায়িত হয়নি। তারই প্রধান প্রতিপূরকরূপে অক্টোবর বিপ্লব (১৯১৭), মহাচীনে বিপ্লব (১৯৪৯) এবং এদেরই অনুসারী বহু জাজ্জ্বল্যমান ঘটনা সত্ত্বেও সমাজবাদ আজ রাহুগ্রস্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) লড়া হয়েছিল "যুদ্ধের অবসান ঘটাতে" ("a war to end war") বলে যে বাণী একদা আওড়ানো হত, তা একটা ঠাট্টা বই আর কিছু নয় বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েটের হাতে (১৯৪১-৪৫) ফ্যাশিজ্‌ম-এর পরাজয়কে একটা চূড়ান্ত ঘটনা মনে করা গিয়েছিল, ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল জগৎ জুড়ে সমাজবাদের প্রসার, কিন্তু এই যে ঐতিহাসিক পথপরিক্রমা তা তখন ব্যাহত, 'বিশ্বায়নী' দৌরাত্ম্য আজ জগৎ জয় করার দিকে আগুয়ান। পবিত্র 'গণতন্ত্র' (যার কোনো অস্তিত্বই নেই, আছে হয় বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেখানে দলিত মানুষ দলিতই থেকে যায়, নয় প্রোলেটেরিয়ন গণতন্ত্র যেখানে বুর্জোয়ারা বিপন্ন) এখন বুঝি সর্বত্র বিরাজমান (আফগানিস্তানে নিরস্ত্র মানুষের মাথায় বহু বিচিত্র বোমাবর্ষণকারী আমেরিকা যার 'পথচারিচায়ক'!)-এই পবিত্র গণতন্ত্রের গুণগান সর্বত্র, তার নামাবলী কম্যুনিস্টদের অনেকেই স্বচ্ছন্দে পরিধান করেছেন, কিন্তু মনুষ্যজীবনের কষ্টিপাথরের বিচারে তার মূল্যায়ন কি হবে? গণতন্ত্রের নামে দুর্বৃত্তি চলছে বলে গণতন্ত্রের গরিমা কি অস্বীকৃত হবে, তার মূলীভূত মহিমা বাতিল হবে?

ইতালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ ফ্যাশিজম্ যখন দেখা দিল, তখন দার্শনিকপ্রবর বেনেদেত্তো ক্রোচে-কে (Croce) জিজ্ঞাসা করা হয় 'গণতন্ত্রের কি ভবিষ্যৎ আছে?' উত্তরে মহামনীষীর জবাব ছিল "গণতন্ত্রের পরিপূরক যে সমাজবাদ-সাম্যবাদ, সমসুযোগের ভিত্তিতে যে নবজীবন মানুষের প্রায় চিরকালের কাম্য, তারও (ক্রোচের অনুপম ভাষায়) শুধু ভবিষ্যৎ নেই, রয়েছে অনন্ত কাল। কে পারে তার জয়যাত্রা রোধ করতে? 'বিশ্বায়নী' শক্তির কর্ণধারেরা তো সম্প্রতি বাধ্য হয়েছেন সুইট্‌সারলাণ্ডের 'দাভস'-এর মতো পর্বতশিখরে অবস্থিত শহরে তাদের বহুখ্যাত বার্ষিক জমায়েত বাতিল করে অন্যত্র আয়োজন করতে। Seattle থেকে Genoa এবং অন্যত্র পশ্চিম জগতের মানুষের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ হতে দেখে তারা সন্ত্রস্ত। ফিদেল কাস্ত্রো রহস্য করেছেন যে এবার হয়তো মহাশূন্যে এই কুবেরদের জমায়েত বসাতে হবে! মানুষ তার মনুষ্যত্ব না হারালে লোভ আর লালসার অবাধ কর্তৃত্ব মানতে পারবে না—এটা পশ্চিম জগতেও স্পষ্ট হতে দেখা দিয়েছে।

* *

এত কথা মনে ভিড় করে আসছে বলে বার বার পাঠকের কাছে ক্ষমা চাইছি। কবে কমরেড নন্দগোপাল ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন যে যা মনে আসে তা যেন জানাই। ভরসা করি যে একেবারে অবান্তর কিছু বলছি না। হয়তো বা কিছু বলছি যা পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে ভাবার একটু দাম আছে।

না বলে পারছি না যে আমাদের এই অতি বৃহৎ বিচিত্র জটিল দেশের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রামী মূল্য দেওয়া দরকার ছিল তা আমরা দিতে পারি নি এবং শেষ পর্যন্ত সে জন্যই দেশবিভাগের মতো বিকট মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছি। অবশ্যই আমাদের শহীদদের নিয়ে গর্ব করা সঙ্গত, কিন্তু আমি অন্তত ভাবি যে আমাদের সংগ্রামে ফাঁক আর ফাঁকিরও পরিমাণ অনেক থেকে গিয়েছে। আর কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সাহস ও শৌর্য সত্ত্বেও গাফিলতি কম থাকে নি। বুর্জোয়া রাজনীতির সীমিত সংসদীয় ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেন আমরা মূলগতভাবে আজও আমাদের পিছিয়ে থাকাটা না ভুলে বসি। একটু আগে জওয়াহরলাল নেহরুর পুরোনো শ্লেষবাক্য শুনিয়েছি যে আমরা বুঝি "ginger gruop" বই কিছু নই! কথাটা কটু কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি কি? স্বাধীনতার পর পঞ্চাশধিক বছর কেটেছে, অথচ পশ্চিমবাংলা, কেরালা এবং ত্রিপুরায় প্রশাসনের বড়াই কিম্বা দিল্লিতে অধুনা 'বহু দলের জোট সরকার চালু হওয়ায় সংসদে বামপন্থীদের গুরুত্ব' কি আমাদের তুষ্ট রাখতে পেরেছে? বি-জে-পি-র মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদী দলের প্রায় আশ্চর্য সংসদীয় অগ্রগতির (এবং তাদের বর্তমান কর্তৃত্ব) তুলনায় আমাদের অসাফল্যের বেদনা কি বিঁধছে না? বামপন্থীরা এখন 'তৃতীয় ফ্রন্ট' গঠনের অতি সঙ্গত ও একান্ত প্রয়োজন প্রযত্নে রত, কিন্তু কম্যুনিস্ট শক্তিবৃদ্ধি না ঘটলে পথের কাঁটা সরানো যাবে না তা কি আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝি না? এজন্যই একটু পিছনে তাকিয়ে আত্মসমালোচনা আজ দরকার। নানা ঐতিহাসিক কারণে সংসদীয় ব্যবস্থার মায়াজালে বাঁধা পড়ে আমাদের আন্দোলনে অনেক ক্ষতি হয়েছে; বিশাল জমায়েত জড়ো করার ('র‍্যালি') অসামান্য নৈপুণ্য (যা বিদেশী কম্যুনিস্টদের অবাক করেছে) আর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের প্রস্তুতিতে সাংগঠনিক ব্যাপারে শৈথিল্য স্বাধীনতার পরবর্তী কালে দেখা গিয়েছে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই গোটা দেশকে পথ দেখাবার 'দুঃসাহস' ও চরিত্রবল দেখাবার সাধ্য আমাদের হয় নি, আজও আমরা মোটামুটি সব কম্যুনিস্ট একত্র হয়ে সেই সংহতির জোরে এগোবার সঙ্গতি সংগ্রহ করতে পারিনি। এটা দ্বিধা, ত্রিধা শুধু কেন, বহুধা-বিভক্ত কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যারা আছেন তাদের আলাদা করে সমালোচনা নয়। এটা হল স্বীকার করা যে আমাদের সকলেরই চিন্তায় আর কাজে অনেক ঘাট্‌তি থেকে গেছে, যাকে সরানো খুবই দরকার অথচ সেদিকে তেমন নজর যেন নেই।

* *

দেশভাগের জন্য আমরা সঙ্গত ভাবেই প্রধান দায়িত্ব চাপিয়ে থাকি কংগ্রেসের নেতৃত্বের ওপর। কিন্তু যদি না ধরে নিই যে তখন আমরা একান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিলাম, আমাদের দায়িত্বও যে কিছু পরিমাণে থেকেছে তা মানা দরকার। দেশভাগের কিছু আগে ১৯৪৩ সালে বাংলায় যে দুর্ভিক্ষের (পঞ্চাশের মন্বন্তর) আমরা সাক্ষী তা ছিল সাম্রাজ্যশাহীর সৃষ্টি—একথা নিয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু সেই বুকভাঙা অভিজ্ঞতার পরেও (কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' লড়াই যখন স্তিমিত হয়ে আসছে) আমরা 'জনযুদ্ধ'-এর নীতিকে কালোচিত সংগ্রামী পরিবর্তন ঘটিয়ে (স্টালিনগ্রাদ যুদ্ধের পর সোভিয়েটের বিপদ তখন কাট্‌তে শুরু করেছে)

আন্দোলনে নামার সাহস রাখিনি। অজুহাত অবশ্য ছিল, কারণ জাপান তখন বীর বিক্রমে এগিয়ে আসছিল আর মনে রাখতে হবে যে ১৯৪২-এর জুন জুলাইয়ে স্বয়ং জওয়াহরলাল নেহরু প্রকাশ্য ঘোষণা করেন যে সুভাষচন্দ্র যদি ফ্যাশিস্ট জাপানকে নিয়ে আসেন "আমি খালি হাতে লড়াই করেও বাধা দেব"। (এখানে স্মরণীয় যে 'জনযুদ্ধ' নীতি বাবদ কম্যুনিস্টদেরই 'সবদোষ নন্দ ঘোষ' বানিয়ে প্রচার আজও শুনি!) কিন্তু অজুহাতটা অকাট্য নয়; স্থানকালপাত্র নিয়ে মতভেদ সম্ভব কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালেই আমাদের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের অবসর যে মেলেনি তা বলা যায় না। যুদ্ধান্তে সারা দেশ যখন সংগ্রামের জন্য উন্মুখ তখন সেই মানসিকতার সাথী হয়েও আমরা কেমন যেন গুটিয়ে থেকেছি, একধরনের 'লেজুড় বৃত্তি' ("tailism") করেছি, মূলত কংগ্রেস আর কিছুটা মুসলিম লীগেরও মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছি। দুটো ব্যাপারে আমাদের শৈথিল্য ঘটেছে মনে করি, আর হয়তো তার মূল কারণ বিপ্লবের 'মূল্য' নিয়ে একটা ভীতি, একটা সংকোচ, যা হল আমাদের মতো বুর্জোয়া ঘেঁষা কম্যুনিজ্‌ম-এরই লক্ষণ। হয়তো কথাটা ঘুলিয়ে ফেলেছি কিন্তু বলতে চাই যে কংগ্রেসের তো দেশব্যাপী শক্তিধর সংস্থা যেমন সংগ্রামভীরুতার দরুন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যথাযোগ্য লড়াইয়ের 'দাম' দিতে প্রস্তুত ছিল না এবং দেয়নি, অনেকটা তেমনই আমরাও দেশের পরিপূর্ণ সার্বিক স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য সংগ্রামের উপযুক্ত মনোবৃত্তি ও শক্তি ও দুঃখবরণের সামর্থ্য দেখাতে পারিনি। তেলেঙ্গানা, তেভাগার লড়াই আর দেশের বহু স্থানে আমাদের অগণিত খণ্ডযুদ্ধের কথা ভুলছি না, কিন্তু পরাধীনতার নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলার প্রকৃত সঙ্গতি ও সংকল্প আমাদের ছিল না। শেষ পর্যন্ত দেশ ভাগ হয়ে গেছে আর তারই আনুষঙ্গিক দীর্ঘব্যাপী রক্তক্ষয় ও অন্যান্য নির্মম বিপর্যয় দেশের মানুষের জীবনে এমন ভাবে ঘটেছে যে ইতিহাসের বহু বিরাট বিপ্লবেও তেমন ঘটেনি। গান্ধীজীর 'অহিংসা' ব্রত এই অভিজ্ঞতার ফলেই যে আঘাত পেয়েছিল তাতেই তাঁর মৃত্যু, গোডসে নামে এক হিন্দুবাদী দুর্বৃত্ত তো উপলক্ষ মাত্র।

ইতিহাসের কশাঘাত আমরা পেয়েছি, তার জ্বালা আজও মেটেনি। সেজন্যই এমন কথা মনে ঘুরছে। ভাবতে না চাই তো ভিন্ন কথা, কিন্তু একটু ভাবতে বসলেই মনে হয় ১৯৪৫-৪৬ সালে যখন দেশ সংগ্রামের উন্মাদনার উদ্‌গ্রীব এবং সেই উন্মাদনায় ইন্ধন দিয়েছি আমরাই আর কংগ্রেস পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে তখনও আমরা আত্মশক্তিতে ভরসা হারিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি বুর্জোয়াদের হাতে। ১৯৪৬-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৭-এর জুলাই পর্যন্ত গোটা দেশ ছিল অগ্নিগর্ভ আর 'জনযুদ্ধ'-এর সুবাদে বহুনিন্দিত কম্যুনিস্টরাই যেন অগ্রণী। এই সময়টাকে গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "The Almost Revolution"। এই সময়েই কলকাতায় ছাত্র অভ্যুত্থানে, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে অপূর্ব উদ্দীপনা, সৈন্যদলে বিস্তৃত বিক্ষোভ, দেশজুড়ে শ্রমিকশ্রেণীর তেজস্বী আন্দোলন, বহু প্রদেশে কার্যত কৃষকবিদ্রোহ, আর সংক্ষেপে বলতে গেলে সবকিছু ছাপিয়ে বোম্বাইয়ে নৌবাহিনীর বিদ্রোহ (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। এই বিদ্রোহ দমন ইংরেজ করতে পারেনি, করেছিল আমাদেরই রাজনৈতিক নেতৃত্ব। মুসলমানদের এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ এমন

একটা জাজ্জ্বল্যমান ঘটনা যা কেমন করে সবাই ভুলে আছি জানি না। বোম্বাই শহরে তখন ইংরেজ শাসন যেন খতম, শহরের পথে চলছে মিছিলের পর মিছিল; তারা কংগ্রেস, লীগ আর কম্যুনিস্ট পতাকা একসঙ্গে বেঁধে চলেছে। আলাদা রাজনৈতিক চেতনা যে উবে গেছে তা নয়, কিন্তু দেশের মেজাজ এমন যে জনতাই ডাক দিয়েছে "সবাই এক হও"! হয়তো অবিচার করছি কিন্তু আমার কি অনেকটা অসহায়ের মতো হাল ছেড়ে দিলাম না, যখন কংগ্রেসের বল্লভভাই পটেল আর এস কে পাতিলের মতো নেতা নয়, স্বয়ং জওহরলাল নৌবিদ্রোহীদের দমন ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা দিলেন আর মহাত্মা গান্ধী (যিনি ১৯৪২-এ "করেঙ্গে য়া মরেঙ্গে" ডাক দিয়েছেন) নির্দেশ দিলেন অরুণা আসফ আলিকে রাস্তার লড়াই ছেড়ে আসতে। হয়তো আমাদের 'এলেম' ছিল না, কিন্তু অমন আগুন ঝরা পরিস্থিতিতে জনতার নিজস্ব অস্ত্র সংবরণের মতো ভীত ত্রস্ত নিরীহ পদক্ষেপে আমরা বাধ্য হলাম। এমন এক বৈপ্লবিক 'মুহূর্ত'কে হেলায় হারালাম! হয়তো এটা ছিল অনিবার্য, আমাদের হাতিয়ার যথেষ্ট ছিল না, কিন্তু খটকা লাগে, বাস্তবিকই কি 'বিপ্লবী' হতে পেরেছি আমরা?

আর একদিক থেকেও আমরা পঙ্গু হতে দিয়েছিলাম নিজেদের এবং সেটা হল হিন্দু মুসলিম সৌহার্দ্য বজায় রাখা আর দেশভাগের কলঙ্ক নিবারণ বিষয়ে। চল্লিশের দশকে, পাকিস্তান প্রস্তাব জোরদার হবার পর কংগ্রেসেরই এক প্রধান রাজা গোপালাচারী ধিক্কৃত হলেন এজন্য যে তিনি চেয়েছিলেন আপাতত আমরা এক হয়ে লড়ি আর স্বাধীনতার পর 'পাকিস্তান' প্রস্তাব নিয়ে সবাই সিদ্ধান্ত করব। সারা দেশে মুসলমানদের মধ্যে এর সমর্থন বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু কংগ্রেস রুষ্ট হয়ে এমতের প্রবক্তাকে 'একঘরে' করল (যদিও পরে তাকে ঘরে ফিরিয়ে 'স্বাধীন' ভারতের প্রথম বড়োলাট বানাতে কসুর করেনি) আর আমরাও চুপচাপ রইলাম। আমাদের পক্ষ থেকে কমরেড গঙ্গাধর অধিকারী যখন অনেক চিন্তার পর পার্টিরই পক্ষ থেকে একটা সুনিশ্চিত নকশা দিলেন যাতে দেশটাকে অটুট রেখেই সতেরোটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের ব্যবস্থা ছিল অথচ ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের নীতি স্বীকৃত হল না। হয়তো এতে ভুল ভ্রান্তি ছিল কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে অনেক স্ববিরোধী কথাবার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অধিকারীর মতো মনস্বীর চিন্তাটাকেই সরিয়ে দেওয়া হল। সংযুক্ত বাংলা নিয়ে মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম ১৯৪৭ সালে শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলে ঐকান্তিক প্রয়াসে নেমেছিলেন। তাঁর মতো ব্যক্তির সঙ্গে কমরেড অধিকারীর যে কোনও যোগাযোগ পার্টির পক্ষ থেকে ঘটানো হয়নি তা জেনেছি আবুল হাশিমেরই স্মৃতি কথা থেকে। এটা আমাকে বাস্তবিকই আশ্চর্য করেছে। যাই হোক্, পাকিস্তান প্রসঙ্গে আমাদের মনের জড়তা ও বিভ্রান্তি যে ঠিকভাবে তখনই কাটাতে পারিনি এটা দেখে সত্যই কষ্ট হয়। তখন কী এমন মনোবৃত্তি চাপ্‌ল আমাদের যে গান্ধী জিন্নাহ্ আলোচনার ওপর দেশের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেবার মতো দুর্মতি আমাদের হয়েছিল। বুর্জোয়া চক্রান্তকারীরা 'আটঘাট বেঁধে' এমন ব্যবস্থা করেছিল যে ঐ দুজনের মিল হল না, হতে দেওয়া হল না। আমরা কিন্তু তাদের আলোচনা ব্যর্থ হবার পরও পথে ঘাটে "গান্ধী জিন্নাহ্

ফিন্ মিলেঙ্গে" আওয়াজ তুলে তুষ্ট থাকলাম, হয়তো ভাবলাম এটাই-তো আন্দোলন! স্বীকার করছি আমরা অনেকে তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু ভাবতে গেলে কষ্ট হয়। এটা নিজের জোরে বিপ্লব না হোক্ প্রাক-বিপ্লবী আলোড়ন ঘটাবারও সামর্থ্য নেই ভেবে আত্মবিশ্বাসের অভাবকেই তুলে ধরছে না? কংগ্রেসকে এবং স্বয়ং গান্ধীকে শেষ পর্যন্ত দেশভাগের অপরাধের জন্য দায়ী বলে কতটা তুষ্টি আমরা পেতে পারি? আমাদেরও দায়িত্ব আছে, তুলনায় কম হলেও আছে—"এ আমার, এ তোমার পাপ!"

আমাদের বাস্তবিকই বহু গর্বের পার্টি এবং আন্দোলনের কুৎসা একেবারেই আমার কাম্য নয়, শুধু কতকগুলো ভাবনা তুলে ধরছি। ব্যক্তিগতভাবে নিজেও যে বিপ্লবী বিচারে কত অপরাধী তা মনে সর্বদা ঘুরছে। সর্দার পটেল একবার রহস্য করে বলেন যে কম্যুনিস্ট কর্মীরা "সোনার চাঁদ" ছেলে বলে স্বীকার করি কিন্তু সোনা দিয়ে ছোরার মত অস্ত্রও তো তৈরী হয়। বুর্জোয়া দুঃশাসন দমনে সেই 'অস্ত্র'-এর ভূমিকায় আমাদের অনেক গলদ থেকে গিয়েছে।

এই গলদ দূর করার চেষ্টা হল পার্টির কলকাতা কংগ্রেসে (১৯৪৮)। দেশবিভাগের মূল্য দিয়েও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ প্রথমে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের উল্লসিত করেছিল। অথচ পরাধীনতার বন্ধন থেকে তো মুক্তি পেয়েছি, বিজেতার পদানত হয়ে থাকা থেকে তো নিস্তার মিলেছে, এবার নতুন করে দেশ গড়ব। ভাঙা দেশকে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে জোড়া দিতে পারব। এই যে অনুভূতি তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না, দেশবাসীর মনস্তত্ত্বে আঘাত দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথেরই কথায় বলি যে আমরা বুঝি ভাবলাম "ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে", মেঘ কেটে যেতে দেরি হবে না। কিন্তু দেখা গেল স্বাধীন ভারত শাসনের স্বৈরাচারী চেহারা, তাই ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আওয়াজ তুললাম "ইয়ে আজাদী ঝুটা হয়," পথে পথে রব উঠল "ইয়ে সরিগলি সরকার কো এক ধক্কা আওর দো"। পার্টি নিষিদ্ধ হল, সরকারি অত্যাচার তুঙ্গে উঠল, বৎসরাধিক কাল চল্‌ল 'কশ্‌মকশ্'-পার্টি যেন পূর্বতন "শোধনবাদী" ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করতে তখন উত্তাল। এক্ষেত্রেও আবার আমরা আবিষ্কার করলাম (এবং সোভিয়েট পক্ষ থেকে পরামর্শও এল) যে আমাদের 'বাড়াবাড়ি' হয়ে যাচ্ছে, গভীর চিন্তা ও দেশের বাস্তব পরিস্থিতির যথাযথ পর্যবেক্ষণ বিনা কতকটা যেন 'হঠকারিতার' পথে নেমেছি। আর তাই ১৯৫০-৫১ সালে পার্টি যেন করল আত্মসংবরণ এবং নিছক সদাসংগ্রামী পথ ছেড়ে গোটা দেশের রাজনৈতিক স্রোতে ফিরে এল। তখনও দেখা গেল যে দেশবাসীর আনুকূল্য আর ভালোবাসা আমরা হারাই নি। যেখানে আমরা সক্রিয় থেকেছি সেখানেই জনতা আমাদের পরিত্যাগ করেনি। যুদ্ধকাল থেকে আমাদের বিরুদ্ধে যে কটূ কর্কশ শুধু নয়, নোংরা মিথ্যা অপবাদ বর্ষিত হয়েছিল তাকে অগ্রাহ্য করে দেশবাসী (যেখানেই আমরা তাদের সেবায় থেকেছি) আমাদের সমর্থন করে চললেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে দেখা গেল পশ্চিমবাংলা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশে (এবং অন্যত্রও) কম্যুনিস্টদের প্রভাব ও মর্যাদা অটুট রয়েছে।

নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে (সে নির্বাচন যতই অর্থবানদের দাপটে কলুষিত হোক্ না কেন) প্রমাণ করল যে শত্রুশ্রেণীর অতি কুশলী আক্রমণকে কম্যুনিস্টরা অন্তত কিছু পরিমাণে প্রতিহত করতে পারল। সংসদীয় নির্বাচনে সংখ্যায় কম হলেও শাসক কংগ্রেস দলের বিরোধী পক্ষে আমরাই হলাম প্রধান। 'স্বাধীন' দেশে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে রাজনীতির প্রধান মঞ্চে তখন থেকে আমাদের ভূমিকা পরীক্ষিত হয়ে চলেছে, আজও চলছে।

*

লেনিনের নির্দেশ ছিল যে শত ত্রুটি সত্ত্বেও বুর্জোয়া 'গণতন্ত্রে' পার্লামেন্টের মতো সংস্থায় কম্যুনিস্টরা গিয়ে 'বাক্যবাগীশদের ডেরা'-কে একটা "আসল কাজের জায়গা বানিয়ে" বিপ্লবেরই বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে পারে। পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে এই কথার খুবই তাৎপর্য রয়েছে, কিন্তু সে হল অন্য প্রসঙ্গ। এদিক থেকে বিচারে কম্যুনিস্টদের সাফল্য ও অসাফল্য দুই-ই দেশে দেখেছে এবং আজও দেখছে। যাই হোক্, মূলগতভাবে আমাদের দেশে বিপ্লব সম্ভাবনা পিছিয়ে যাচ্ছে এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলন সঠিক রাস্তায় চলছে না ভেবে আমাদেরই পার্টির একাংশে একটা যেন 'বিদ্রোহ' দেখা দিল। সংসদীয় মোহে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলছি, পার্লামেন্টের মতো "শূয়োরের খোঁয়াড়ের" মায়ায় মজে বসেছি এই আশঙ্কায় শুরু হল একটা ধারা যাকে 'নক্শালবাড়ি' নামে দেশ জেনেছে। সন্দেহ নেই যে ১৯৬৪ সালেই পার্টি ভেঙে দু'ভাগ (সি-পি-আই/সি-পি-আই-এম) হবার পর এল তার ত্রিধা বিভক্তি। অনিবার্যভাবে গোটা আন্দোলনের মস্ত ক্ষতি হল। অতি উগ্রপন্থায় যারা এগোলেন তারাও পরে বুঝলেন নিজেদের ভুল। কিন্তু তাদের সেই অভ্যুত্থান (যাকে কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে একটা সমুজ্জ্বল অধ্যায়, ব্যর্থতা সত্ত্বেও আদরণীয় অধ্যায় পরিগণিত করা সমুচিত মনে করি) আবার পুরোনো মূলগত প্রশ্নটিই তুলে ধরেছিল।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে "It is better to have loved and lost than never to have loved at all" ("কখনও কাউকে না ভালোবাসার চেয়ে ভালোবেসে হেরে যাওয়া ভালো")। অতি-উগ্র বামপন্থা কালিক প্রতিবন্ধকসমূহকে অগ্রাহ্য করে হঠকারিতার আতিশয্য করে থাকলেও যেন আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে বহু অমূল্য তরুণ বিপ্লবী জীবন বিসর্জন দিয়ে জানাল যে "কখনও বিপ্লব না করার চেয়ে বিপ্লবের চেষ্টা করে হেরে যাওয়া ভালো"। তাদের যেন অবজ্ঞা না করি; "মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ, ন চ ধূমায়িতং চিরং"।

সংস্কৃত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অপ্রতিভ নই। "চিরকাল ধিক্‌ধিক্ আগুন থেকে ধোঁয়া বেরোনোর চেয়ে মুহূর্তের জন্যও জ্বলে ওঠা ভালো"-একথাই যেন এই "নক্শাল" অধ্যায়ের মর্মবাণী (তার বর্তমান চেহারায় সাহসের অভাব না থাকলেও সুবুদ্ধির অভাব দেখে ক্ষুব্ধ হয়েও এটা বললাম)। ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বৃত্তান্তে এদের যেন কিছুতেই ছোটো করে দেখা না হয়।

আজ যখন সি-পি-আই আর সি-পি-আই (এম) উভয়েরই মহাসম্মেলন হতে চলেছে তখন আমার মতো 'আদ্যিকালের' পুরোনো বাতিল, অপুট, অসহায় কম্যুনিস্টের চিৎকার

করে বলতে ইচ্ছা জাগে—"আজকের দুর্দিনে আমাদের বৈরীশক্তি যখন একজোট আর নিজেদের ঝগড়া ভুলে 'বিশ্বায়নী' ফাঁদে দুনিয়াকে ভুলিয়ে রাখার সব আয়োজন করেছে, অন্তত বেশ কিছুকালের জন্য সমাজবাদ-সাম্যবাদকে যখন রাহুগ্রস্ত হতে হচ্ছে, নতুন দুনিয়াতে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের দৌলতে নতুন ঢঙে লড়াই যখন দরকার, সঙ্গে সঙ্গে দৌলতশাহী দেশগুলিতেও সাধারণ মানুষের দুর্গতি দূর না হওয়ায় জগৎজোড়া নতুন লড়াইয়ের সম্ভাবনাও যে ফুটে উঠছে তখন আমরা সবাই (যারা নিজেদের কম্যুনিস্ট ভেবে গর্ববোধ করি) তত্ত্বের কচ্‌কচির মধ্যে না গিয়ে সাম্যবাদের মূল আদর্শ মনে রেখে একজোট হব না কেন? বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে তো লড়াই, তাতে 'এক' না হলে তো দাঁড়াতেই পারব না। জানিনা কি যে ১৯৬৪ সালে পার্টিভাগ না হলে যে সংসদীয় ক্ষেত্র আজও সংগ্রামের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেখানে আমরা কত বেশি শক্তিশালী হতাম। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে একত্র থাকলে সংসদে আমাদের শক্তি ২০০১ সালের তুলনাতেও বেশি হত। কমরেড রণেন সেনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি; "কানু ছাড়া গীত নেই—সব কম্যুনিস্ট বিনা শর্তে আলোচনা করে একজোট হয়ে দাঁড়াক, "রাম লক্ষ্মণ পাশাপাশি না লড়লে জিত্‌ব কেমন করে?" এই শেষ মিনিত জানিয়ে বিদায় নিই; আমাদের তত্ত্বে প্রত্যয় রেখে পার্টির চরিত্র, তেজ, সাহস, কর্মশক্তি পুনরুদ্ধার করে দেশ ও দুনিয়াকে রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে যেন পারি।

Dire Damage to Our Civilisational Entity

On December 6, 1992, when the 500 years old Babri mosque in Ayodhya was brought down with devilish glee by contingents of frenzied religio-fascists mobilised by the notorious Sangha Parivar, with its political flagship the BJP and odious outfits like Vishwa Hindu Parishad, Shiv Sena, Bajrang Dal, etc, it was not only our fleeting image as a 'secular state' but our historically involved civilisational entity which lay nearly shattered. Other events followed, helping the BJP to rise from near-inconsequentiality in Lok Sabha (where its membership was reduced to two!) to its present position of power. This piteous predicament from the common people's point of view was cruelly compounded earlier this year when a suspiciously incendiary enormity in Godhra presaged an unprecedented, government-condoned, unspeakably cruel, four-month program, reminiscent of Balkan style "ethnic cleansing" that delighted the gloating 'globalisers' of the West that has found the going so good in the post-Gorbachev period of moral-ethical atrophy all over the earth.

LOWEST POINT IN RECENT HISTORY

"Hey Ram!' were the last words from the lips of Gandhiji as, on January 30, 1948, he fell to bullets fired by a Hindutva fanatic. *'Jai Shri Ram'* ('Hail Shri Ram'), said the 'volunteers' *(karsevaks)* breaking the Babri mosque, not only a place of worship but a massive edifice adorning the skyline of a city of shrines, Ayodhya. As the structure came down, the BJP's national leaders watched and cheered, so very unlike an old-style Congress leader and priest to boot, the late Kamlapati Tripathi, who once said (I remember distinctly) that if a brick of the mosque was broken he would go there and fast till death.

The Congress, of course, had changed; it was Congress leaders from Govind Ballabh Pant to Rajiv Gandhi who had queered the pitch for a peaceful settlement at the site of the mosque. The day after

the vandalism, on December 7, 1992, the parliament met, in an outwardly stormed (but perhaps with many who really rejoiced but concealed their glee!), and while Vajpayee looked sad beyond words and Advani appeared dazed, the Congress prime minister P V Narasimha Rao sat pouting his lips, the very picture of melancholy. However, the parliament, in spite of the usual hullabaloo, remained supine, discarding even the then speaker's reported advice that a resolution of national sorrow be communicated to the world, especially to heal the would in Muslim hearts. It was perhaps the lowest point in our recent history.

How ironic in this context is recollection of the verse in Valmiki Ramayana where Ram tells Lakshmana that "this golden Lanka" *(iyam swarnamoyee Lanka)* was "not to his liking" and went on to add that "the mother and motherland were more glorious than heaven" *("jananee janmabhoomischa swargaadapi gareeyashi").* Such words seem to be anathema today in Hindutva-touting India!

HIDEOUS SLUR ON INDIA'S IMAGE

Field Marshal Lord Wavell, India's viceroy preceding Mountbatten with his 'Plan Balkan" (1947), noted in his 1946 diary that he was surprised at Labour foreign minister Ernest Bevin's venomous hostility towards India's freedom, and also his anxiety that the 'West' must continue to be in control of 'the middle of the earth, the Indian subcontinent. Britain, never conceding independence, agreed to the "transfer of power" to India and Pakistan, extracting in exchange the partition of our country. For historic reasons the region comprising Pakistan would be made easily to slide into the pocket of imperialists and serve, as a time bomb, to be switched at will against India—a role Pakistan has been playing even today.

But India, for all her debility and degeneracies, has been more intransigent and during the Cold War period could have the gumption to spout the concept of non-alignment and was accused of 'tilting' towards the Soviet Union. Thanks to the 'contrived' eclipse of socialism since 1987-89, the world is 'safe' again for a rejuvenated capitalism—or rather 'corruptalism', in view of its innate link with corruption and crime—and we have today in India a party in power, though more than precariously, the BJP, with its peculiar adherence

to a sort of religio-fascism whose depredations from Ayodhya (1992) to Gujarat (2002) have been and are such a hideous slur on India's image.

A clever ruse is being attempted at present to show us all a cleaner face of the BJP, projecting its leader, Atal Behari Vajpayee, as a humane and sensitive person (even his deputy, the already tainted Advani poses as a 'liberal') running a "secular" government that the constitution requires it to be. The Savarkar-Golwalkar 'doctrine' that Muslims (and presumably other religious minorities) are "only territorially Indians" in a virtually Hindutva state is the sheet-anchor of the BJP's perverted ideology. What is known as the 'Sangh Parivar' ensures that the team, including the so-called National Democratic Alliance (NDA) in whose name the union government is run, toes the same line of policy. The Bal Thackerays and Ashok Singhals and others, whose noxious names one hates to mention, are thus having the time of their lives. While the law of the land remains discreetly frozen, the unspeakable Gujarat inhumanities could happen and continue for months, and these neo-fascist incendiaries gloat openly about their "unfinished agenda" of performing before long in holy cities like Mathura and Varanasi enormities similar to what they have so egregiously done in Ayodhya (1992).

CATEGORICAL IMPERATIVE

This is why there is anxiety over what might happen on the tenth anniversary of the Babri mosque demolition. When Gujarat happened, the prime minister Vajpayee could only express abroad a small part of his dismay over the demonisation of politics that had sullied India's reputation but he could do it stealthily. In parliament he defended his heinous goons in Gujarat and elsewhere. Putting on the regulation RSS shorts, he repeatedly affirmed loyalty to the Golwalkar line. No wonder the Bush-Blair duo and other blackguards pat on the back just as more blatantly as they patronise their stooge who runs Pakistan. It has been our failure, the failure of the multifurcated communist movement, and of the Left generally, which will be listless in the absence of communist unity, that has in some way facilitated the BJP and its usually amoral allies to surge on sensationally to seize power in New Delhi. It will be more calamitous we fail again

to stop their blackguard advance.

That must not be allowed to happen. There are many signs of our people resenting and resisting the religio-fascist turn in our politics. On the tenth anniversary of the Ayodhya infamy, if some of us find it difficult to overcome that pessimism of the mind that has set in (whether we know it or not) since the Gorbachev excrescence and the atrophy of morals and ethics in public life, we must mobilise optimism of the will and unitedly call upon our people to rise to the occasion and throw out, as soon as possible, the BJP's neo-fascist regime. The basic good sense of our people was seen in the fact that the Gujarat epidemic of the demonisation of man could not spread in spite of the nefarious government being in power. This task—helping our "mother and motherland who are more glorious than heaven" to emerge again in a new lustre—is a categorical imperative.

SYNTHESIS OF CULTURES

It is more than time for us to remember with pride that for all our defaults and debilities, this old country of ours has been from time immemorial hospitable to religions and races, always nurturing the idea of Unity in Diversity, a co-existence of differences, an almost infinite eclecticism that could come to terms with militant affirmations (like that of some Muslim rulers), some capacity also of achieving not only commingling but also a kind of synthesis of divergent cultures.

We have had nothing like the Christian Crusades against Islam, the persistent religious wars as in Europe, whence Islam had been ejected with merciless cruelty from Spain, south Italy, Sicily, etc; nothing like the Thirty years' War (1618-48) and the *auto da fe'* and burnings at the stake of Christian dissidents, no such concepts as the monarch's religion to be compulsorily followed by the subjects *("Cujus regio ejus religio").* We have absorbed Persians, Greeks, Scythians, Sakas, Pallavas, Huns, etc, who found shelter in India's bosom. Long before Muslim invaders came, we had contacts with pious men as well as traders from Arabia whose tombs near Madurai and Tiruchi and elsewhere in south India pre-date the celebrated Khwaja Moinuddin Chishti, laid to rest near Ajmer where Muslims

and Hindus have been paying homage for seven hundred years.

Unlike the marauders from Europe—Portuguese, Dutch, French, English *et al*—Muslims proved they were niether 'birds of prey' nor 'birds of passage' and settled in this country. This was clear by the 14th century when, says Rabindranath Tagore, the new *Mahabharatvarsha* began, with Muslims as part of the soil, its life and culture. May I add that around 1940, at a Calcutta debate on the then new-fangled idea of Pakistan, I shared the platform with the Muslim League spokesman, Abdur Rahman Siddiqui, the mayor of Calcutta? This former Congressman said that though Calcutta, his home, could not be in Pakistan, but he did not mind. When a Hindu dies, he added, his body is burnt and the ashes are thrown into the river to be carried by the current the devil know where, but when a Muslim dies he wants six feet by three of the country's earth, showing that he "he belongs to this country in life and in death." It thrills me even now to recollect this and I know that the great Muhammed Iqbal, *Brahmanzada-e-Kashmir* as he proudly called himself, not only wrote some of our loveliest patriotic hymns but also on "this land where Chishti brought the gospel of truth, this garden where Nanak taught the unity of all religions," adding that here "the habitations of the heart" *(dil ki basti)* are becoming "empty" He said "Let us together build a new temple of ours *(naya shivala)*."

I know I am being tiresome. But how can I keep out repeated mention of that stupendous genius, Amir Khusrau, court poet of the Khiljis 700 years ago, who could write that "every pearl in the royal necklace congeals the tears in the eyes of the oppressed peasantry"! A disciple of the great syncretist, Hazrat Nizamuddin, he called himself 'Hindustani Turk', Khusrau was one of the makers of Hindi and a creative contributor to music and the arts. How can one forget the great Nanak, "Guru to Hindus and Pir to Muslims", or Mahatma Kabir who preached what he called *'Bharatpanth'*, or Baba Fareed and Shah Lateef, virtual makers of Punjabi and Sindhi, or Ramananda and Ravidas, or Meera Bai and Chaitnya (with his Muslim disciple Haridas), or other gentle giants of the Bhakti movement, emanating with the saints of Tamilnadu and of Maharashtra, and in amity with the Sufi trend in Muslim thought (Shah Kalandar, Bahruddin Zakaria and others) which spread over all India an aura of sweetness and

light! How wonderful was Prince Dara Shikoh's presentation of the Upanishads "a moment," wrote K N Panikkar, "in universal history!" How inspiring it is to remember that in spite of the most virulent politico-military Sikh-Muslim hostility, Guru Arjun who built in the Golden Temple the 'holy of holies' called "Hari Mandir Saheb" (damage to which cost Mrs Indira Gandhi's life in 1984) and at its inauguration brought in as chief guest the most revered saint of the time, Miyan Mir! What a phenomenon has been the Indo-Muslim synthesis in architecture, music, literature, painting, philosophic reflection, jurisprudence, even cookery and dress habits and ways of living that have a luminous quality! No wonder we have the second largest Muslim population in the world, much larger than Pakistan's! No wonder that we cherish the fact of our Kerala having the world's record mix of various Christian denominations apart from Muslims, Jews, etc, and Christians forming today a sizeable part and even a majority in Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Goa—all being states of the Indian Union! Even more, we cherish Kashmir, that lovely slice of earth, which has a dominant Muslim majority and yet with her own Kashmiriyat that gells better with India (with her Unity in Diversity) than with Pakistan.

NO TIME TO DESPAIR

At ninety-five plus, doubtless at the end of my tether, I pen this rigmarole to justify myself to myself as a communist who joined the party, then legally banned in British India (1936). I confess I am in torment to see our movement at home and abroad going through a troubled timespan. But as a communist, however unworthy, I cannot despair I prefer, in Shelley's words, "to hope till hope creates out of its wreck the thing it contemplates." And as I see bright signs of people's mobilisation against the fraudulent, so called 'globalisation' claiming for ever to demolish socialism, I remember what some seventy five years ago, a great teacher of mine, Kuruvila Zachariah, told me when I was agonised by things happening in the then world. In life, he told me, certain things happen that are "ineluctable" and you cannot prevent them, but you must "learn to see the rainbow in the rain."

That rainbow, today as in modern history, has been communism,

"the gospel according to St Marx," as some witty critics have said. But that is the message—that the workers of the world, the salt of the earth, will rise again to uphold and never let it down in India as well as elsewhere. This petty and putrid menace of neo-fascism (of Hindu or other vintage) will go, burnt in the fire of its own evil passions, and out of its ashes will rise, slowly but steadily, a new humanity. Let us pledge we will do all we can to assure the future and get rid of the demonising blackguards of religio-fascism in our land.

People's Democracy, December 2-8, 2002

'Hey Ram'!

Remembering Tees January 1948

Roman Rolland dedicated his memorable study of *Mahatma Gandhi* (1924) "to the land of glory and of servility, to the land of impermanent empires but of eternally glorious thoughts, to the people who bid defence to Time, to renovated India" That renovation has not come, even after more than half a century of freedom, and seems unsure in the near future. This country lives in hope, however—for "Hope, till Hope creates/From its own wreck the thing it contemplates"

Perhaps the recent BBC polls to find out popular perception of the greatest figures of the last century and the last millennium, where Mahatma Gandhi evoked unexpectedly high estimation, will help to rectify the prevalent fashion of denigrating most, it not all, our national "heroes" Not that such polls matter a lot, but accustomed as we are to being virtually among "the wretched of the earth" we tend to find them a sort of salve to our pride as a people. For myself I remember the agonies of subjection—forty years of my life have been spent when India was unfree and tormented by an anguish inconceivable to the present generation. We used at one time to find some flattering unction to our soul in pronouncements, for example, of the American missionary, the Rev JH Holmes who said (in 1921) about Gandhi "When I think of Romain Rolland, I think of Tolstoy.

FASCINATION

When I think of Lenin, I think of Napoleon. But when I think of Gandhi, I think of Jesus Christ. He lives His life; he speaks His word; he suffers, strives and will one day nobly die for His Kingdom on earth."

It is nearly 70 years ago that I began to shed my early fascination for Gandhiji (I have written a whole book on him and umpteen essays), but I have never hesitated to give him his due and if only to irritate (and I hope, also amuse) those inclined to pour idelogical obloquy on me on this account, I quote what the Times of India (Delhi edition, 7 April 1958) reported as having been said by that impeccable Communist Ho Chi Minh, that great and good man,

resenting any "comparison" as "a wrong formulation" did not hesitate to add "I and others may be revolutionaries, but we are disciples of Mahatma Gandhi, directly on indirectly, nothing more, nothing less." Not that this obviously extempore statement clinches the matter, but I leave it at that.

The last great days of Gandhi's life (January 1948) could well be a sort of passion play—his fasts, the indomitable espousal of guarantees that a secular state must give to all citizens irrespective of religious persuasion, his successful insistence that India, inspite of Pakistan's demonstrative hostility, hand over Rs 45 crores that were rightfully due, his prayer meetings (which he refused to hold without recitations from the Quran) "I am late by ten minutes," he murmured as he came for his last appearance, "I should be here at the stroke of five," and in a matter of seconds he was shot at by a fanatic and he was dead.

As I write, I think of a report in *Time*, the US news magazine which, during IK Gujral's rather fatuous tenure as Prime Minister, asked him, ironically, if he had any hopes of rapprochement with Pakistan, and for once Gujral replied with unwanted spirit that between our two countries there was a basic bond of amity. He recalled that he had been in Karachi the day Gandhi was killed and has seen every shop shuttered up and every eye in tears. Would that, remembering "Tees January", our two countries begin building the basis for an *entente* which is history's imperative!

Sophisticated strictures of Gandhi's mistake in espousing the *Khilafat* movement as integral to our freedom struggle (the aim of non-cooperation, 1919-22, was redressal of *Khilafat* and Punjab "wrongs" and for *Swaraj*) notwithstanding, it must not be forgotten how he had, with thoughtful colleagues like Maulana Azad and so many others, forged a massive communal fraternity that marked an unforgettably ecstatic period and he had touched the Muslim heart as never before or since and had persuaded all Indians to share the agony of fellow-citizens tortured by the British government's declaration (through Prime Minister Lloyd George's proud claim) that in the Great War of 1914-18 they had not only taught Turkey a lesson but had won "the last and most triumphant of the Crusades" and humiliated the Muslim *jehan*. It was the moment of opportunity for consolidating

Hindu-Muslim unity which Gandhi eagerly seized when Muslim emotion had been most deeply stirred and was aching for response.

OPPORTUNITY

Post facto political wisdom may scoff at Gandhi's sociological naivete, but he and Azad and others could not let that moment of opportunity slip out of their hands. This part of out history is being misinterpreted and virtually obliterated, which is one reason why at the present moment a chauvinist orientation perverts our politics and even after the Babri mosque demolition unhealed wounds are allowed to fester and the best traditions of our freedom struggle glibly forgotten.

In March 1922, sentenced to six years' jail for sedition, Gandhi in his statement to the court said he had "played with fire and would do so again if he was free", and in a superb formulation affirming that "the government established by law in British India is carried on for the exploitation of the masses", added flaming words "The miserable little comforts of the town-dwellers in India represent the brokerage they get for the work they do for the foreign exploiter, and the profits and the brokerage are sucked from the masses." These are Gandhi's words, stuck in my memory for close on 78 years, and mind you, town-dwellers is the synonym of *bourgeoiseie* (a term perhaps unknown then to Gandhi).

How aptly the description applies to the current "golbalising" days when, in "free India", only an affluent minority of 10 per cent or so would lord it over the submerged majority, with "socialism" in retreat and a comfortable "democracy" for the fortunate few assured! Gandhi, of course, had a horror of "revolution and red ruin" as he said himself in 1928 and many other times, but perhaps he had a point when he claimed to be a better "Communist" than those who have gone by that name!

In any case I have for years now and especially since counter-revolutionary froces brought about the recent eclipse of world socialism, waited for Communists and leftists here to speak Gandhi's language of March 1922.

This is not a summary survey of Gandhi's life and work which cannot be reviewed in a cursory fashion. It is my intention only to draw attention to some essential lessons we can draw from Gandhi's life. Released for health reasons in 1924, Gandhi went straight from

jail to Maulana Muhammed Ali's home in Delhi and began a 21-day fast in expiation of the crime of communal conflict that had broken out. There, at his bedside, was held a unity comference attended not only by national leaders but by such personalities as the Bishop of Calcutta, Dr Foss Wescott, and *The Statesman's* then editor, Arthur Moore.

CONFERENCES

This was the precursor of many unity conferences which unhappily, could not solve basic problems—negotiations for communal agreement reaching typical deadlocks "You are a Jew, you are a Bania", once shrieked Muhammad Ali in Calcutta, 1928 "You compromise with Britain, accepting dominion status instead of independence, but you resist Muslim demands for 33 per cent representation at the Centre" (which ultimately gave rise to the concept once considered fantastic by Muslims themselves, of a separate Pakistan).

Gandhi cannot be altogether exonerated over this development, but fairness demands recognition that, in peculiarly complex circumstances, British guile and Indian debilities combining, Gandhi had tried, in his own way which was often ecentric, even esoteric, to see that the country was not divided. History, however, is "a cruel goddess" and for our defaults and deformations, we have had a pay too heavy a price. One thinks of the words of the Urdu poet Meer *Dil dhai-ke kaba banaya, to kya kiya, to kya kiya?* ("You have broken hearts to build a Kaba O what have you done, what have you done?"

Old times had better be in their shelves, protected by moth balls, and not brought out to talk nostalgically about the light of other days. Thus, even with a sense of futility about things as they are and as they threaten to be in these affluence-aiming, exploitation-oriented, consumption-crazy days, one's thoughts rush back to *Tees January* 1948. "Both England and the town-dwellers in India will have to answer, if there is a God above, for this crime against humanity, which is perhaps unparalleled in history"—this was what Gandhi told the court trying him in March 1922. I sigh, poor man, for comparable modern pronouncement from those who care for "the wretched of the earth"

The Sunday Statesman 30.1.2000

American Trauma—I

Time To Recall Words of Martin Luther King

Years ago, in the days, as it were, before the Flood, in the ancien regime before World War II, Rudyard Kipling, then poet-laureate and first British recipient of the Nobel Prize for literature, once found himself in a contrite mood to write; "Far called our navies melt away/ On dune and head land sinks the fire/Lo, all our pomp of yesterday is one with Nineveh and Tyre/Lord God of Hosts, oh, spare us yet/ Lest we forget, last we forget!"

This was not very typical of Kipling who sang haughtily of the glores of Empire, of "the lesser breed without the law" (like poor us in India) who were—how picturesque!—"the white man's burden" The sight of British troops in India would make him ecstatic; "Proud in their mien, defiance in their eye/We see the lords of human kind pass by!" Kipling did not live to see the nemesis, the retreat from the world scene, by no means complete yet, of that ugly phenomenon, white supremacism, but after all, being a poet, he had some inkling of the future.

SYMPATHY

There can be no doubt of the world's sympathy for sorely stricken United States of America over the infamous, if also technologically super-ingenious and at the same time fanatically motivated, assault at about the same time on New York City's World Trade Center and Washington's famous landmark, the Pentagon, strident symbols, as it were, of the "military-industrial complex" that runs America and as much else of the world as it can. The damage to the Pentagon, physically speaking, is not beyond repair but New York's proud showpiece, the massive 110-floor pile with its twintower, ungainly but stupefying, has been razed to the ground.

That such an amazing operation, designed, coordinated and executed with extra-ordinary expertise, attention to detail and almost unerring efficiency on the part of some highly trained people ready

and willing to die inevitably, in the process, has meant not only enormous sorrow but a sheer shock to which no adequate adjective can be found. It has hurt, irreparably, the 'United States' pride in herself, pride earned through historical trials—pride, particularly and currently, as the dominant, unipolar superpower on earth.

The US President, whatever his mettle, is during the tenure of his office the world's most powerful single person. That involves certain primary responsibilities which appear to be arrogantly flouted as the present incumbent outsoars his father and predecessor in office who, some 10 years ago, at least consulted the international community and wangled broad agreement for the most pitiless pulverising action against an identified state, Iraq which still suffers cruelty for dire delinquencies. The junior Bush, forgetting the moral imperatives of his elevated stature, does not hesitate angrily to spout "war, war, war" and in what may be called Old Testament fashion call for vengeance, naming specially the prime target of his inflamed ire a notorious incendiary terrorist sheltered in Afghanistan where US partronage and unstinted suport via loyal Pakistan has installed and till now sustained an odious fanatic set-up.

POWER

The Taliban was rewarded earlier for helping the United States destroy the republic (1979-89) installed after the Saur (Aprill) revolution that had allied with the then USSR and upset the balance of power in a region, strategically vital, in what the British Labour Minister Bevin said in the late '40s was "the middle of the earth" It is no surprise that the most gratuitously voluble echo of President Bush's anger (behind which at least there is legitimate anguish and a certain amount of grievous provocation) comes from Britain's Prime Minister Tony Blair. Both are top figure in today's world scene, such as it is, and know very well that there happens to be nuclear arms capability, modest but murderous enough, in at least three countries of the region.

There is no lack of sinister, not just stupid, leaders, and who know what abomination might follow even unintended, berserk blackguardries? For Bush, with Blair at his tail, mouthing the slogan of "war" implies that sense and sensibility, let alone statesmanship,

is almost *nonest.*

It so happens that as I write, I receive from a friend the 10-year-old text of Mother Teresa's open letter to then US President Bush, Sr, and the Iraqi President Saddam Hussein, besseeching both to stop the abominably merciless fighting and to "build peace" By another coincidence my own son gives me a copy of the late Martin Luther King's unforgettable speech "I Have A Dream" at the Lincoln Memorial in Washington, DC on the centenary (28 August 1963) of the Emancipation Proclamation that was "a beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice" That hope still remains unfulfilled though a lot of ground has been covered.

PROMISE

That great Christial (and near Gandhian) reminded his countrymen of the glorious promise of the American Revolution (1776) and the Declaration of Independence (1783) guaranteed to all men who were "born equal", the right to "life liberty and the pursuit of happiness" America, he said, has "defaulted on this promissory note", awaiting to be redeemed as and "when all of God's children will be able to sing with a new meaning "My country," tis of thee/Sweet land of liberty/ Of thee I sing./ Land where my fathers died/ Land of the pilgrims' pride/ From every mountain side/ Let freedom ring!"

I fear I am being naive to the point perhaps of ridicule. But I do not mind, I am reconciled to having to speak a language which is almost discarded.

The Statesman 1.10.2001

American Trauma--II

Let Us Proceed With Civilised Humility

I wish to the Devil I had not lived to see this time when "wealth accumulates and men decay" and things happen that indicate that hopes for the future, once dearly held, are almost doomed. I see around me, even in this long-deprived land of ours, a sort of spirit that says, some-what pathetically in our conditions "Earn! Earn! Earn! Then spend, spend, spend. Give the tired nerves no rest, the fagged and jaded brain no repose, the weary heart no peace. Look not above, where stars glisten in the sky. Look only below where you have paved the green earth with burning gold!"

This is rhetoric with a vengeance, I laugh as I say it to myself, but the words (how learnt years ago I cannot be sure) have stuck in my memory and often recur as I watch a world where "liberty, equality and fraternity" are myths, where man's right to "life, liberty and the pursuit of happiness" is an empty ejaculation, where socialism is in eclipse so that a modern reader of Bertanand Russell's "Roads to Freedom Socialism, Anarchism, Syndicalism" (c 1925) will hardly believe his final expectation that the acquisitive, exploitative society "will die, burnt in the fire of its own hot passions and out of its ashes will rise a new world with the light of the morning in its eyes" O tempore... O mores!

KEEP THE PEACE

Leaving aside this digression, I rejoice that in spite of the dubious glories of "globalisation" (and its accoutrements) overshadowing everything, the unfortunate (and I trust, only passing) bellicosity in President Bush's "Delenda est Carthago" (Carthage must be destroyed) speech before the US Congress and elsewhere does not appear to be widely shared. The Supreme Head of the the Catholic Church, Pope John Paul II has felt it necessary to tell urbi et orbi (Rome, the eternal city, and the world) "With all my heart I beg

God to keep the peace," perhaps his immediate predecessor John XXII would have phrased it differently, giving mankind also a role in the matter. I see the report of a Swiss opinion poll in 31 countries (excluding Russia, China, Egypt, Vietnam, Cuba, India etc) which showed that a majority favoured the Bush stance only in the United States and Israel, while the rest by majority wanted peace efforts at once, 46 per cent even in the United States rejecting bellicose attitudes.

In *The Statesman* (Calcutta, 24 September) there is a remarkable survey (ND Batra, "Cyberage") which notes that the Bin Laden fixation ("Dead or alive", reward of 25 million dollars for information, etc) is decried and this Indo-American academician forcefully notes that "the bloody carnage" of 11 September that caused such hideous damage could not have been planned and executed by one ferocious fanatic and his mates "without the power and resources of a multitude of strategists and financiers living in sanctuaries not only in Pakistan, Afghanistan and the Arab world, but also in open and secular societies in Wesern Europe, Canada, the USA and not the least, India" Why he stresses "India" seems obscure, but he adds "Would Laden's 'elimination' eradicate terrorist cells, for example, in Egypt, Germany, Britain or India, countries very friendly with the USA?"

ENLIST HUMANITY

The evaluation may not be correct and Professor Batra may be wrong. But there can be no doubt that, especially since Hiroshima and Nagasaki (1945) and American "doings" in Korea, Vietnam, Cuba, Libya, a whole bunch of African countries, the Caribbean, Bosnia, Iraq (1991) and elsewhere let alone its blatant assumption of being the "world gendarme" (without accountability), its outstretched ring of "bases" on foreign soil (Diego Garcia, etc), its despatch of the Seventh Fleet (1971) to brow-beat India and Bangladesh in the latter's freedom struggle (the list is endless)—the United States, wittingly and unwittingly, has often not scrupled to outrage the world's conscience and flunt its unassailable material strength. This has earned near-universal opprobrium which, in spite of the US's unipolar dominance has created a crisis. In spite of blemishes, however, today's

world is not like Britain (1856) on the eve of the crimean War when crowds sang in London "We don't want to fight/ But by Jingo, if we do/ We've got the men, we've got the ships, we've got the money too!"

Away then with "vengeance is mine" and all Old Testament wrath! And on with bona fide international cooperation and also national endeavour not only to root out the evil of global terrorism but to repair (as Americans will, rapidly) the damage so diabolically inflicted on the US economy, to repair also the inevitably consequential damage to the world economy with its socio-political concomitants and enlist, through the United Nations and cognate agencies, all humanity, to the extent we can, for tasks ahead. Even countries known to be the US's bitterest enemies have expressed sympathy in her distress and assured cooperation in combating and rooting out the evil of insensate terrorism.

WHAT RAMAINS ?

I remember how in 1924 (when the US in disgust and dismay over the October Revolution, refused even to recognise the USSR) Stalin, delivering speeches included in "Fundamentals of Leninism", had not shrunk from saying that socialist ardour needed "American efficiency" to achieve success. Why can't there be true world cooperation in ridding our planet of the odious evils besetting us all? Let us all proceed, with civilised humility, not—even on the part of the mighty US—the sort of wrathful hauteur we have seen. For myself, anyway, I rejoice that even to revolutionaries—as the Very Rev Hewlett Johnson, Dean of Canterbury, in his "the Socialist Sixth of the Earth" (1936) averred "love is the fulfilling of the Law"

It is love that makes the world go round, and whatever the hurdles, ever will, "Now remains Faith, Hope, Love, these three; and the greatest of these is love" (St Paul to Corinthians, I 13).

The Statesman 2.10.2001

Remembering Jawaharlal and Indira

Life has a certain resilence, So that hardly any one, not even the great ones of creation, are missed for very long after their death. But as November comes along, the month when Jawaharlal Nehru was born on the 14th in 1889 and Indira Gandhi on the 19th in 1917didn't the father once tell his daughter to note the Symbolism, through entirely accidental, for her being born just after the "ten days that shook the world" in shape of the world's first socialist revolution? It is only right to reflect on their life and work. Unless one chooses not only to be a Partisan which, in essence, one has to be-but also petty and Peevish, it is not possible to Pool-Pool Jawahar- lal's legacy, for he was in some way, as an Arab dignitary said at his death in 1964, "the seneptor of the ethics fo much of our time and our world." This is a legacy that shadows not withstanding, remains luminous. In Indira's case also, even her wrost critics must concede that whatever obloquies be heaped on certain phases of her career and however controversial the ultimate assessment of her at her best and one should be judged at one's best— There was a lustre to her life, her courage and her character which especially shone out as she died a martyr on October 31 last year.

There are occasions when Personal recollections can not be avoided, and I recall first time I met Jawaharlal face to face in a few comrades in October 1936. We heard him them resolve the dichotomy, in many minds, between the strugle for freedom and the strugle for Soialism, the latter of which, some felt, could wait till after freedom was won. "We have to stretch ourselves out", he said, "and fight for the two lodoos together, and in course of that effort the question of which we grab first will settle itself." I know of no more homely. Yet clear and categoric, for-mulations on the link between, libcration and socialism.

The second time I talked to him was in early 1942 when, after a nearly two year stint in Jail, he came to Calcutta. Along with my then inseparables, Jyoti Basu ans Snehangshu Acharya, I met him to discuss the then recently set up movement of the friends of the

Soviet Union (FSU) in Dr. B.C.Roy's House. At 4. P.M., when he were to see him, his Secretary upadhyay took in the Rev. Leonard Sehiff (whom I knew well), where upon an inp in me made me write a note stating cooly that if the foreigner had preference because of the colour of his skin we were ready to clear off. This brought the great man out at once, laughing of course but apologising for the mistake and with a typically fond gesture whisking us together into his room.

The third time, to be followed by memberless times, was on the floor of the Lok Sabha in May 1952 when Feroze Gandhi took him acrose the chamber to meet some of us. I remember the first debate on the President's address, during which, in a fit of pharase-mongering I had pilfered a Trotsky quotation to say that the Prime Minister had "lost his place in history for the sake of a tinsel Portfolio." There upon, replying to the debate, he played for a while with the word 'tinsel' and averred that he cared not so much for "a place in history" as for a place in the hearts of his people through service in their cause. It was a delight indeed even to be floored in such civilised debate.

One could, in Parliament then, without disrespect but drastically say, as I once did, that the Prime Minister did not deserve to be the leader of the House. Since he could not sheel his Partisanship. In a mellower, if also impishly malicious, mood I have referred also to Jawaharlal as one who orchestrated platitudes and sought vainly to specialise in ommiscience, "even describing him once as "a minor Poet who has missed his vocation." It used to perturb some people, his Parlamentary Minister Satyanaryan Sinha often suggesting plaintively that the great man should not be heart that way; but I know for a fact that Jawaharlal never minded, rather he enjoyed sophisticated, if also stern, verbal sallies.

This is far from being an easay at appraisement of Jawaharlal; but while one cannot be sure of what the youth of today feel about him, hardly anyone of our generation (and those a great deal younger) can deny the impact he had no us and on his times. "Out of place everywhere, at home nowhere" during his young years, he was drawn by the Gandhi majic into the struggle, identifying himself to the extent he could with the masses of his people, "hungering and thirsting for

freedom." "Yet able always to be" "world's kin," coordinating India's liberation with the advance of freedom forces everywhere. It was no surprise that in February 1929 a secret Government circular freared "young leaders, notably Pandit Jawaharlal Nehru and Babu Subhas Chandra Bose" adding further. "There is a tendency for Political and communist revolutionaries to join hands and Pandit Jawaharlal, and extreme nationalist, who is at the same time genuinely attracted by some of the communist doctrines, stands almost at the meeting Point."

Imperialism's fear and frenzy over the likely convergence of the forces of freedom and of Socialism found Pathetic expression in J. Coatman's official report, "India in 1932" "Pandit Nehru has now one secret ambitio, which is to rival Lenin or Stalin in the history of communism." (1) This was bilge, of course, but if one person in the national leadership can be named who put Socialism in the map of our Polities, it was Jawaharlal. If one leader is to be singled out who linked the Indian struggle with world developments, whose concern for planning indicated anxiety over the condition of the people, whose identification of imperialism and facism" as the twin enemies (Pace his Lacknow Congress Speech 1936) presaged our Post-independence role in world affairs, it was Jawaharlal. His shining secularism once drew from Sardar Patel a humorous gibe that Jawaharlal was "the only nationalist Muslim he knew." His worry not only for India's but the world's woes made the Sardar Quip once. "Indonesia? Ah! where is Indonesia? Better ask Jawaharlal.

On April 1, 1928, Gandhiji wrote to Jawaharlal "I am quite of your opinion that some day we will have to have a movement without the rich and without the vocal educated class. But the time for that is not yet." That time never came for eighter of them, not even in 1945-46 when perhaps a last effort could have been made to win freedom for an undivided India. The fault, however, vests not in Gandhi and in Jawaharlal but in all the rest of us together and in our historical predicament where those of us who are communist still remain little more, nationally, than that Jawaharlal called us a ginger group."

Let there be no cheep satisfaction drawn from tannts about Jawaharlal's indecisions, his inability to make up his mind about the

Price fo fundamental socio-economic change, his declared belief that "there is no grave mistake than to lap the abyss in two jumps" and yet his commitment to unmitigated gradulism, his failure, thus as an epoch-maker, a failure, that is to say, in he sterner tests of history. Far rather let us remember his having been, with his frailties, and frustrations, a gem of a man who loved India and envisged her "Tryst with destiny," who was the first spokesman of Asian and African fellow sufferers under imperialism determined" no longer to be petitioners before the chanclleries of the west," who pioneered polices of friendship with socialist countries as indispensable to India's global role, whose place in history, thus, is not only that of a hero of India's liberation but a Prime influence in the contemporary world's tortured advance towards freedom and peace and hapiness.

It is agony still to think of that vile day last year (Oct-31) when, in her own backyard and in the presence of her aides, Indira Gandhi was gunned down by her own bodygurard. It is even greater agony-for one must go back to the elements (Panchabhoot) and "death will come when it will come"—that treasonable and fiendish forces at home and abroad, sustaine shamelessly by neo-imperialists who have never forgiven India her independence still pursue their malevolence without being brunded as they should be by our cruelty injured people.

The Indira murder trial proceeds fesultorily-no wonder since, as Shakespear said long ago, "the law is an ass." Little, if anything, is being done to reveal and revile "the foreign hand" about which Indira, when alive, often warned her people ("the greatest threat ever," she said on June 12, 1984.) and which was answered with wicked cartoons in the media ridiculing the accusation.

Only for a while did such ugly lampooning stop, but the disgusting trend only a little veiled, continues. Even as the Punjab elections took place, tactical considerations. perhaps insuperable, demanded that there should be no mention of Indira's martyrdom while nobody, it seems, could stop noising about of the theme that Indira's killer was 'Shaheed-e-Azam.

At the moment of her death, in harness into the last, fulfilling her own prophecy that she would give her life and the last drop of her blood to her country, Indira left, as it were, an intimation or her

immortality, and the people's emotion indicated her indentification with them, the only sure criterion of the quality of a national leader. The immediate Political beneficiaries where her party (and also her own Progeny) but ever since the event an earnest effort had gone on to shift India away from what might be termed the Jawaharlal-India legacy. The stance, for instance, that Indira took when accused of "tilting" towards the Soviet Union—when she retorted that her country stood "erect" but knew how to choose her friends. Due not has not yet been taken of her repeated averment that "the greatest threat ever" was "attempts by some foreign countries to destabilise India."

With characteristic crudity, the New York Times once wrote of Indira's metamorphosis "from a China doll into an iron lady," but perhaps in time perceptive studies will appear of her evolution from a lonely, fastidious, often unhappy, perhaps in wordly seething, personality into what she later proved to be.

"That woman", was the ejaculation about her of Yahya khan (or was it Ayub Khan?) but more precipient was the french reaction some years ago-"Quelle femme" (what a woman!"). She began her brobation in high of ice as a sensitive, often shy and indraw personality, but learning the rather rude "trade" of Prime Minister she achieved the dignity and grace and equiposi-even a sort of serenity in spite of occasional lapses into fretflness and folly-which she never lost in the most exacting of or deals. She will be faulted badly, no doubt, for a kind of Authoritarian Predilection and for such errors as the imposition of Emergency (1975), but history will note that she was one who could talk back with proude courage to the great ones of the world and also touch a chord in the humblest Indian heart.

When she died the whole wide world felt diminished, and India's sense of the loss of a fitful but dearly beloved daughter will not pale easily.

The first censure motion (1966) Indira faced as Prime as Minister in Perliament was in my name. There were countless occasions when we exchanged hard words in debate-I a great deal more than she died, and as she said once, if she was half as stern in language as I had been I would have "a fit" However in spite of a certain mutual

impatience, I had developed for her a kind of real fondness. "I talk often as a Dutch Uncle, " I would say "but I pat you on the back whenever you are a good girl" These things come back as I see before me now her letter-one of her last-dated February 9, 1984. "...Thank you for your 'Pat on the back' though I wonder if a hand can reach my back in the midst of the present conserted shower of brickabats. .I wish others had the same appreciation. People ignore the difficulties of today's would and the great care and determination needed to fight the forces of neoimperialism, which are fast growing all around us and I am afraid our country also..."

In umpteen places I have referred to Indria's Prebisch Lectures in Belgrade (June 1983) denouncing "the new type of surrogate colonialism" which she said the world will not tolerate. She told me more than once of pressures on her, similar to pressures on the 'frontline' African States, the anger and antagonism of vested 'Western' interests. American Reporters like William Hersch and Jack Anderson have written about the "controlled fury" with which she would U.S. insinuations, ever upholding the honour of her India.

She had many faults, doubtless; she delighted in her leading fellowers being what I wrote once in 1972-"minions." This bad authoritarian streak remains inscribed even in her party's nomenclature. But frail and lovely, she had in her the wherewithal keeping under her thumb (as she told me around 1976) formidable cabined ministers "two hundred Percent against" her. And covering up nearly all her faults was her felling for her country—didn't she note in one of the last freagments of jotings.

"A poet has written... 'How can I feel humble with the wealth of you beside me' I can say the same of India. I cannot understand how any one can be an Indian and not be proud—the richness and infinite variety of out composite heritage; the magnificence of the people's spirit, equal to any disaster or burden, firm in their faith, gay spontaneously even in poverty and hardship."

This was indeed Jawaharlal's daughter speaking—proud of herself (which every worth wile Person needs to be) Proud of her family (which she often was to excess), but proudest of all of her India. Not everything, of course, but much indeed can be forgiven her. How, in any cases, can one expect perfection in human behaviour and

achievement? Perfection also, like life in heaven, is terminal and dull.

Long ago, in November 1973, writing in Modern Review under the Psendonym 'chanakya,' Jawaharlal had warned that "a little twist" might turn him into a "dictator," the makings of which he carried in himself and tried to guard against. Accustomed to adulation, Indira thought, wrongly, that she just could not be affected by it. Few things are more Perilous than to have a leader supposedly gifted with charisma and sure of unquestioning obedience. Rajiv, as Indira's successor, heads the government and also an enoromous, country wide organisation long lacking facilities for democratic functioning.

This unfettered Power is a dangerous phenmenon, accentuated by the currently fashionable allergy to principle and reliance on pragmatism (even in "Ideologically' oriented Political circles) and the "management" of Politico-economic issues for a conducted leap-foogging, as it were, into the 21st century. Here is peril which can be averted if only the best in the legacy of Jawaharlal and of Indira is reflected thoughtfully in the performance of our national and international tasks.

Amrita Bazar Patrika 17th Nov. '85

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীহুমায়ুন কবির-এর সম্পাদনায় 'একশো একটি' রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদের যে সংকলন গ্রন্থ বের হয় (প্রকাশক মুম্বাই-এর এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলি-১৯৬৬) সেখানে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নীচের কবিতাগুলি অনুবাদ করেন। তাঁর রবীন্দ্রানুরাগ ও সংস্কৃতিকর্মের বহুমাত্রিকতার অন্যতম চিহ্ন হিসেবে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সঙ্গের এই অনুবাদ কবিতাগুলি প্রকাশিত হল।—*সম্পাদক*

THE FOUNTAIN AWAKES

How is it that this morning the sun's rays enter my very heart!
How comes it that early bird-song pierces today the cavern's gloom!
I do not know why, but after so very long my soul is awake.

My whole being surges and the waters break their bonds.—
The heart's pain, and its passion, I can no longer hold in leash!

The mountain shivers in every pore and rock on rock rolls down.
The water foams and fumes and in pent-up anger roars.
Like mad, it moves in boisterous endless rings, rushes blindly
at the dungeon-door it cannot see but wants to break!

Why is God so stony?
Why these barriers all around?
Awake today, my heart, and win fulfilment.
Break, break into bits the boulders in the way!
Let blow rain on blow as wave rumbles after wave!

When the soul is aglow, who cares for this rampart of gloom or
the hurdle of stone?
What in the world is there to fear when the waters of desire
overflow its shores?
I'll break this prison-house of stone and flood the world with the
waters of compassion!
I'll pour myself out in mad fervid songs, flashing the bounty
of my hair and weaving bouquets of bloom.
I'll float in the air my rainbow wings and drain my heart to
print a smile on the fleeting sunbeam.

I'll rush from peak to peak, and sweep from hill to hill, and
laugh and chant and clap to my own measure.
I have so much to say and to sing,—my heart so crowded
with desire and bliss.

I know not what happened today, but my heart is awake and
from afar I hear the ocean's roll.
Why around me this dark prison cell?
I'll rain blow on blow and break, break, break its walls for the
bird-song is in my ears and the sunshine in my eyes!

1883 [নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত সঙ্গীত, ১৮৮৩]

TWO BIRDS

There was a bird in a cage of gold,
another free in the woods.
One knoweth not what whim of God
brought the two together of a day.
'O my friend in the cage,' said the bird from the woods,
'Let's together fly away to the woods'.
'Let us live quietly in the cage'
rejoined the bird in the cage.

'Oh no', said the bird from the woods,
'those fetters I'll never wear!'
'Alas', the other replied,
'I know not my way out in the woods.'

The bird from the woods sat on a bough,
and sang all the wild songs it knew.
The other said all it had learnt by rote,
the languages they spoke were different.
'Sing a song of the woods, my friend in the cage',
the bird from the woods was pleading;
'Learn a cage-song, please, my love from the woods',
was the other's importuning.

'Oh no', said the bird from the woods,
'I want no tutored rhyme',
'Alas', the other rejoined,
'I know no song of the woods!'

'The sky is blue', said the bird from the woods,
'and there is never an end to it'
'Look, how neat this cage is', the other replied,
'how secure on all four sides!'
'Why not let us go', said the bird from the woods,
'and lose ourselves among the clouds?'
'Why not' said the other 'lock ourselves safe
in a corner of our own love-nest?'

'Oh no', said the bird from the woods,
'Where then shall I have room to fly?'
'Alas', the cage-bird sighed,
'where does one perch in the clouds?'

So it happened the birds loved each other,
but closer they could never get.
Across bars of the cage their beaks would meet
and also their silent stare.
Each failed to sense the other's state
nor why they differed so—
Lonely, they beat their wings
and plaintively called one to the other.

'Oh no', said the bird from the woods,
'the cage door might shut me in'.
'Alas', the cage-bird moaned,
'I haven't the strength to fly!'

July, *1892* [দুই পাখি, *সোনার তরী*, আষাঢ় ১২৯৯]

BRAHMAN

It was evening, the sun had just set and on the *Saraswati's* banks the forest shadows had darkened. To the silent *ashram* returned the children of the sages, on their heads small loads of sacrificial log collected in nearby woods. Called back from daylong pasture, the *ashram* cattle browsed calmly, tired, yet their eyes tranquil with content. A knot of young people, freshly bathed, sat in the open space before the hut, circling round Gautam, their *guru.* The darkness was lit by the embers of the sacrificial fire. Above, in the heaven's immensity, a great peace ruled sunk in thought. The stars in rows stood quiet and curious like expectant pupils. Silence broke, as Gautam's voice rang softly 'Listen carefully my children, for I shall tell you of Brahman, the knowledge of Reality.'

It was then that a young lad came into the compound, holding in both hands a casket of flowers and fruit. He placed it devoutly at the sage's lotus feet, and bowing profoundly, spoke in ambrosial voice that the cuckoo could envy 'Sire, I am *Satyakama*, from Kurukshetra. Desirous of initiation at your hands, I wish to learn the truth about *Brahman.*'

The great sage smiled. 'May your path be smooth', he said, his voice full of the quietude of compassion, 'Tell me your clan, my child, for Brahmins alone have the right to such study.' Slowly, the lad made reply 'I do not, sire, know my clan; let me ask mother and I'll tell you tomorrow.'

Bowing again at the sage's feet, the boy walked back along the dark forest paths, crossing on foot the thin opaque and restful Saraswati—back to his mother's cottage by the sand, where the sleeping harnet ended.

The evening lamp flickered dimly, as his mother Javala stood by the door, anxiously awaiting her child's return. She drew him to her and kissed his head, murmuring words of benediction. 'Tell me, mother,' he asked 'What is my father's name? and our clan? To the sage Gautam I went and begged initiation as his pupil. Only Brahmins he said had the right. What is my clan, mother?'

Her face lowered, his mother softly said, 'When I was young

and very poor, I served many masters and you came into my lap. You are the son of Javala who had no husband. You are my child, but your clan I know not.'

Morning came. Dawn, fresh and benign, wakened the tree-tops. The sage's disciples matched the young light's dewy rediance, emitting as it were the luminousness of virtue cleansed in the tears of devotion. Straight from morning ablutions, their matted hair still dripping, they sat around Gautam in the shade of the aged banyan, Gautam whose presence was an effulgence of beauteous purity. Birds and honey bees and the running stream made a concord of sound, grave and sweet, as many young throats chanted Vedic verse.

Slowly came Satyakama, bowing low at the sage's feet, and sat, without a word, his large eyes unclouded. The sage gave him his blessings and asked 'What is your clan, my serence and comely child?' 'Sire', said the boy, his head upraised, 'I do not know, but I asked my mother. She said she did not know either, for she had served many masters, and I was born in the lap of Javala who had no husband.'

The strange tidings stunned all. Like bees scattered by a blow on a honey-hive, they hummed in agitation. Some laughed in derision, some cursed the arrogance of the shameless outcaste. Only Gautam rose, his arms open. Hugging the boy to his heart, he said 'You are not beyond the pale, my child. You're the best of Brahmins for you are born to Truth!'

[ব্রাহ্মণ, *চিত্রা*, ফাল্গুন ১৩০১]

BAD TIMES

Though evening comes with slow weary steps
and all song is stilled at a hint,
though the endless skies stretch, lonely,
and weariness descends on every limb,
though a great fear counts its silent beads,
and the face of the horizon is veiled,
Yet, O bird, mine bird,
do not, sightless, furl your wings!

Here isn't the hum of murmuring woods,
but the sea-swell roaring with the serpent's rage.
Here isn't a bower tinted with *Kunda* blossom,
but the restless surge of loud, rollicking foam!
O where is the coast where flowers and twigs entangle?
O where is the nest, the sheltering bough?
Yet, O bird, mine bird,
do not, sightless, furl your wings!

Still stretches ahead the lengthening night,
and the sun sleeps in the distant sunset hill,
Stockstill and with bated breath the world
keeps lonely vigil as the moments glide.
There, in the far sky, floats a pale moon,
sickle-thin, swimming out of the deeps of gloom.
O bird, mine bird,
do not, sightless, furl your wings!

High in the sky the stars stare down,
fingers outstretched, their glances backoning.
Far below, in a hundred waves,
Death rushes in tumult, heedless and grave.
'Come, O come!' call anxious voices,
from far away, heavy with pity and pleading.
O bird, mine bird,

do not, sightless, furl your wings!

No, there's neither fear nor the binding fancies of love,
there is no hope, for hope is plain deceit,
there isn't the wangle of words and vain crying,
there isn't home nor floral bedecking.
Only these wings are there and the sky's boundless realms
dawn-abandoned, hued with deep gloom—
O bird, mine bird,
Do not, sightless, furl your wings!

['দুঃসময়', *কল্পনা*, বৈশাখ ১৩০৪]

THE LORD'S DEBT

Apace went news from village to village, *Maitra Mahashay** was on pilgrimage bent to where the Ganga merges into the sea. Quickly enough there gathered around him company, young and old. At the river ghat two country boats lay ready.

'Let me come with you, *Thakur,** prayed Mokshada, a young widow, pining for piety. Her eyes piteous and pleading, she would listen to no reason and take no refusal. 'But there is no room!' said Maitra, 'I cling to your feet', she replied in tears, 'I will find room in some corner.'

Won over by pity, the Brahmin asked still in doubt 'Haven't you a small child? Where will he stay?'

'O Rakhal?', the woman answered, 'he'll be with his aunt, the one who brought him up. I was long ill and Annada fed him and her own child at her breast. Ever since, he prefers his aunt to me and when he is naughty and I punish him, why, his aunt takes his side and hides him in her lap. He'll be happier, *Thakur,* with her than with me.'

The Brahmin agreed and soon enough Mokshada was ready. With her little packing done, she bowed at her elders' feet and took sad leave of her friends.

At the ghat, who would she see but her Rakhal? He had slipped from home early and sat silent and unworried in the boat.

'You here'? his mother asked, and heard the answer, 'Why, yes, I'm going to the sea'.

'You are, are you?' she shouted, 'come down at once, you bandit-child!'

Again he said, his firm eyes wide open, 'I'm going to the sea, mother!'

He clung to the boat's side as his mother tried to drag him down. The Brahmin, moved by pity, smiled and said 'Let be, let him stay'

'All right', the mother suddenly blurted, 'I'll leave you in the bottom of the sea!'

As she heard her own words, arrows of remorse bit at her heart, *Narayan!* Narayan!', she muttered, invoking her god and took the child in her arms, caressing him fondly.

In a quiet voice, Maitra whispered, 'What madness possessed you that you spoke such evil words?'

News travelled soon of Rakhal going with the pilgrims. His aunt came rushing to the *ghat* urging him to stay.

'I'll be back soon, auntie,' Rakhal smiled at her, 'but I must really go to the sea'!

'My Rakhal is so naughty and I only can manage him, and he's never been away from me, *Thakur'* Annada pleaded. 'Don't take him, please; let me have him back'.

Rakhal would not bend and said, 'I tell you, auntie, I'll go now and come back soon'.

In affectionate tones the Brahmin said, 'Don't you fear for Rakhal! I shall be there and there's no worry. The winter days are here, the rivers and streams are clam, the roads are safe and crowds are going. Barely two months shall we need to go there and return. Your Rakhal will be safe with us'.

At the auspicious moment, invoking *Durga's** name, the boat moved off. On the ghat stood the village women, crying as they bade farewell. On the *Choorni's* bank the village looked tearful, bathed in *Hemant's*† morning dew.

The fair over, the pilgrim groups started homeword. The old boat, tied again at the ghat, awaited the afternoon tide.

All wonder spent, Rakhal was famishing for home and his aunt's caress, his mind numbed by the ceaseless sight of unending waters. Waters that were dark and sleek and crooked and cruel, and like serpents lolled out hungry tongues. Wicked and deceitful waters that raised a million hoods and roared and moaned everlastingly, mouth watering, as they yearned to devour Earth's children.

O Earth our loving mother, dumb but protective, you are hoary with age and tolerant of all truancies, our cradle of joy, soft-bosomed. How your unseen arms, O charming mother, draw us all the time, mightily, to your quiet, horizon-spanning heart!

The restive boy, his patience ended, asked again and again 'When will flowtide come, *Thakur?'*

Animation suddenly shot through the tranquil waters. The river swelled, as if with tidings of hope. The boat turned right about, its

ropes shivered and groaned. The triumphant sea marched up the river with the waves' thundering music. The tide had come and the boatmen, bowing before God, steered quickly northwards.

'When shall we reach home?' asked Rakhal, nestling up to the Brahim.

Two leagues ahead, the sun not yet set, the north wind freshened. Sandbanks blocked *Roopnarain's* mouth and the river narrowed. There began tumult heady and strong, between the rowdy north wind and the oncoming tide.

The pilgrims cried aloud, 'Draw the boat ashore!' Ashore, but where was the shore?

All around were the frenzied waves tossing in dread dance, beating time with a million hands, mocking the heavens in foam-speckled wrath. Far away showed the dim line of the distant forest. On all sides rose the greedy and angry waves like fierce proud rebels against the tranquil sunset.

The boat refused to obey the helm and span round and round like a restless foolish drunkard. The bitter wind mingled with the cold sweat of fear to make all tremble as on the day of doom.

Some had lost speech. Others shouted hoarsely or wept as they called on their kin. Face shrunken and pale, Maitra sat with eyes shut and muttered his prayers. Rakhal, in a cold tremor, hid his face in his mother's breast.

The boatman, desperate, suddenly called out, "One in this boat has cheated the Lord, has offered Him a gift but has not kept his word : That explains this untimely storm and unruly waves. He must carry out his pledge. I warn you, you cannot flout an angry God!"

The pilgrims threw overboard whatever they had,—money and clothes and all, but to no avail. The waters again rushed fiercely on the boat.

'Listen before it is too late', the boatman cried again. 'Who is it is taking back what belongs to the God?'

Suddenly the Brahmin rose and pointed to Mokshada, 'There's the woman who offered her child to God and is taking him back.'

Hearts merciless with fear, the pilgrims cried with one voice, throw him overboard.

'Save him, O save him', cried Mokshada, clasping Rakhal to her breast, 'Save him, *Thakur,* in the name of God save him.'

The Brahmin shouted back angrily, "Am I his protector? You are his mother and yet in anger you offered him to God, and now I am to save him! You must pay God's debt and keep your vow or else all these people will drown."

'I am a poor foolish woman', Mokshada wailed, 'Do you, my Lord, accept as truth what I said in sudden anger, you who are the Lord of the inmost heart? Did you not know how vain were my words? Did you only hear the word of my mouth but not of my heart?'

Even as she cried, the boatmen and the pilgrims tore Rakhal from her arms and threw him into the raging river. With set jaw and closed eyes, Maitra turned his face away, covering his ears with his hands.

"Aunt, O aunt" screamed Rakhal and suddenly Maitra felt lightning lash his heart. A hundred scorpions bit him as the helpless infant's last cry pierced into his ears like an arrow of fire.

'Hold! Hold!' the Brahmin shouted as his eyes rested for a moment on Mokshada who had fainted at his feet.

For a second he saw the child's terror-stricken eyes as with a last piteous cry for its aunt it disappeared in the boiling waves. Two tiny fists desperately clutched at the sky and then were lost.

'I'll bring you back', cried the Brahmin, and plunged headlong into the river.

October, 1898

* 'Mahashay' and 'Thakur' are terms indicating respect.
* Durga—name of a goddess widely worshipped by Hindus.
† Hemanta—Late autumn.

['দেবতার গ্রাস' কার্তিক ১৩০৪, 'কথা']

BEHOLDEN

"Forget you? Never!" I had said when, on tear's brink, your eyes, wordless, held my face.

Forgive me if I have forgotten.

Years have gone since that day's caress.

Many a spring has passed in between, its *madhavi* blooming in bunches and fading off again, and multitudes of days have come and gone, weighed by the tired slumber that dove-song brings at noon.

Your dark eyes with shy and shrinking glances had scrolled in my soul the first epistle of love.

Over the signature of your heart has passed the brush of time, fitful with the light and shade of passing hours.

Many an evening has painted on it the molten gold of oblivion, many a night has covered it over with its alphabet of dreams in a maze of unclear lines!

Like a lad who hath no care, each moment is busy, always and meanderingly, drawing memory's lines on the canvas of the mind, weaving a web of forgetfulness.

If in today's spring-time I have forgotten the voice of an earlier *Phalgoon,* forgive me.

If, unnoticed, the flame has gone out of my lamp of pain, forgive me.

Yet this I know, that it was only because you came that my life was filled with a harvest of songs, a harvest that yet knows no end.

The light in your eyes stole out of sunbeams the secret in their core and made music of it all.

Your touch is no longer with me, but in my being you've left a touch-stone that again and again fills with sweetness the picture of our world,—

Fills, without cause, the bowl of joy out of which I might drink.

Forgive me then if I have forgotten.

Do I not know that you had called me once to your heart?

I can pardon my fate for all the sorrow and sadness stacked into my days.

From my parched lips Fate has snatched the cup, it has piled deception, with a smirk broken faith, drowned a full boat within sight of the shore.

All these I forgive.

No longer with me, you're farther than far away.

The vermilion wiped off your hair's parting has left the very evening desolate.

Alone, I dwell in a house bereft of beauty.

All this I know, but most of all I know that one day you and I were together.

['কৃতজ্ঞ', নভেম্বর ১৯২৪, পূরবী]

QUESTION

From age to age, O God, you have sent your apostles to this pitiless world : And they preached their gospel 'Forgive all trespasses, love all, and banish hate from all hearts.' They claim our homage, time will not forget them, and yet, my regard unavailing, I must turn them back.

Have I not seen stealthy malice, in the night's deceitful shadow, hurl death at the helpless? Have I not seen Justice mourn, wordless and desolate, when the strong flaunt their unchecked crimes? Have I not seen youth, in agony, rush madly to break their head against the baffling cruelty of stone?

Today I am throttled, my flute has lost its music. *Amavasya's** gloom has smothered my world in a nightmare. And so, in tears, I ask 'Have you foregiven them who poison your air and blot out your light? Have you blessed them with your love?'

* *Amavasya* the moon's darkest phase.

[প্রশ্ন, পৌষ ১৩৩৮, *পরিশেষ*]

THEY WORK

Lazily, floating on time's stream my mind gazes into infinity. And traversing through space I see myriad pictures drawn in light and shade.

Aeon on aeon, in the lengthening past have marched masses of men proudly, with victory's arrogant speed.

Here came Pathans, empire-hungry, and then the Mughals, waving storms of dust and flags of triumph.

I look, today, into the alleys of space. They have vanished without a trace, but from age to age sunrise and sunset have reddened the speckless blue.

Again, under that sky, have come marching columns of the mighty British, along iron-bound roads and in chariots spouting fire, scattering the flames of their force.

I know that the flow of time will sweep away their empire's enveloping nets, and the armies, bearers of its burden, will leave not a trace in the path of the stars.

I turn my eyes on this earth, our earth, and see multitudes moving with vibrant voices along many roads and in many groups, from age to age, working to meet daily needs of men who live and die.

Through eternity they pull the oars, hold the helm. In field after field, they sow and cut the corn. They work in town and country.

Royal sceptres break, War-drums cease, Victory towers gape, stupidly, self-forgetful. Bloodstained arms and blood-shot eyes are lost in children's tales.

The people work. In every country, go where you will. In Anga, in Banga, in Kalinga's seas and river-*ghats,* in Punjab, Bombay, and Gujrat.

The hum and the roar of their toil link nights and days, made vibrant by work. Sorrows and joys, from day to day, orchestrate life's great music.

Empires by the hundred collapse and on their ruins the people work.

[ওরা কাজ করে, ফাল্গুন ১৩৪৭, *আরোগ্য*]

চিঠিপত্র

CONFIDENTIAL & PERSONAL
NO. 447-PMO/57

New Delhi
June 9, 1957

My Dear Hiren,

I have had your letter with me for some time. If you found it a little difficult to write it, I find it no easier to reply to it. But I went to tell you that I liked reading it and it led me to a chain of thoughts and emotions. Where they lead to, I do not quite know. Thoughts have a way of going in to unexpected channels.

You are a senssitive person and you must pay the price for that, as all of us do. I suppose I am also to some extent sensitive, though life hardens one.

You ask me about your writing about Ganhiji. I think you should do so. Indeed, I would like you to do so. I do not think I could attempt any kind of a long account or appraisal of Gandhiji's work. I have occasionally referred to him, in speech and writing, but such references have been brief. I have often been asked to write about him and I have consistently avoided doing so, except for brief messages of no importance.

I find that whenever I think of him, I get emotionally worked up, and that is no mood for proper writing. If I was a poet, which I am not, perhaps that mood might help.

You are also an emotional person, but if you feel the urge to write about him, you should certainly give in to that urge. It sometimes comes to me as a bit of a shock how far the present generation has moved away from Gandhiji's day and how little most of us understands him or can enter into the spirit f the twenties or the thirties. Even those who swear by Gandhi's and are supposed to be his fervent followers and disciplis, appear to me to have learnt literally some small part of his mesage and missed he spirit. How much more so those who did not come ino intimate contact with him?

Sometimes I have looked into his own writings or his letters to me. They have carried me back to another world and I have realised how fa we had moved away from it. Of course, we had

to move, because the world moves and things are not what they were. Sometimes indeed I have read my own old letters to him and these have also produced strange sensations.

Has anybody in India ever written what might be called a good biography? I do not know of any such book. Usually such books are records of somebody's public activities and full of eulogy. A few criticise biterly. Neither appears to approach in the proper frame of mind or with requisite abiliy.

You accuse me of limiting myself to being merely the Congress Party leader. It is difficult for me to judge myself or my activities. Perhaps you are right to some extent, but I do not myself understand what people mean by saying that I should leave party and become, what is called, a national leader. Does that not ultimately mean starting a new party and be limited by that? We have had many great men in the past who, rebelling against the caste system or something else, ended merely by starting a new sampradaya. To the multitude of our gods and goddesses and of our sects, they added a few more.

Jayaprakash Narayan has frequently summoned me to this national leadership, that is to get together men of goodwill from all groups and parties and march ahead. Exactly where one is going to march to and in what manner and by what methods is not made clear. It appears to be thought that if people of good will just got together in a room, all would be well. As Jayaprakash, for whom I have always had a good deal of affection, is entirely opposed to both mydomestic and foreign policies, I do not quite know how both of us together will chalk out a common path. It that is so between us two, what of a larger crowd?

We are all, I suppose, rather lonely persons, sometimes doubting what we ourselves say or do. Anyhow, I am going abroad in a few days. I shall certainly visit Norway, though I fear there will be no time to go to the fjords. I visited these Norwegian fjords in 1910 just after I had taken my Degreeat Cambridge. That was, I suppose, before you werr born.

Write to me when you have the urge to do so

Yours as ever,
Jawaharlal Nehru

Dilip Kumar Roy

ওঁ

১৭.৩.৭৩

HARI KRISHNA MADIR
INDIRA NILOY
POONA 16
PHONE POONA 57387

প্রিয়বরেষু

আপনার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। আমি ভেবেছিলাম হয়ত বইটা ছুঁয়েই রেখে দেবেন তাকে তুলে বা বিলিয়ে দেবেন। আপনি দরদী তাই আমার এ-অত্যাচারী উপহার সইতে পারলেন। আজই সকালে আপনার গুণগান করছিলাম যে, আপনি ভূমা-কে মানেন ও "নাল্পে সুখমস্তি" উদ্ধৃত করে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তাই আপনার বস্তুবাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে মানতেই হবে। নীরেনের মধ্যেও ছিল। আশ্চর্য এই যে আমার আস্তিক বন্ধুদের মধ্যেও আমি এত ভালো খুব কম বন্ধুকেই দেখেছিলাম যেমন দেখেছিলাম নীরেনকে। আপনিও আমার স্নেহের পরিধির মধ্যে পড়েন সেজন্য আমি নিজেই খুশী—সে মতামত নিয়ে কথা নয় কথাটা স্নেহপ্রীতি শুভেচ্ছা নিয়ে। কবি...একটি শ্লোক আমার মনে গেঁথে আছে

"When the spirit wakens — অন্তরতম যখন জাগে—সে
If will not hour less — হয়না কো কণ্ডু স্বল্পসুখী
Than the while of life — গাঢ় কোমলতা আকিঞ্চনেই
For hits tenderness." — হয় যে সে যারা বিষমুখী

আমি যেখানেই গেছি বন্ধু পাকড়েছি—আপনি তাদের একজন। আশা করি আপনার প্রতি আমার প্রীতির মূল বিচ্ছিন্ন হবে না শেষ ডাক আসা পর্যন্ত—যার বড় বেশি দেরি নেই। একটা মস্ত পরীক্ষা সামনে'। মন বিষণ্ণ, কিন্তু ফেল করব না মনে হয়। আপনিও সেই আশীর্বাদই করবেন, কেমন?

সম্প্রতি ম্যাকমিলান আমাদের স্মৃতিকথা নিয়েছে, বোধহয় এপ্রিলে বেরুবে। ওরা লিখেছে জর্মন ভাষায়ও বইটি ছাপা হবে বোধহয় অদূর ভবিষ্যতে। এ-অবস্থায় কূলে এসে নৌকাডুবি হবে না আশা করি। এ-বইটি ভারতবর্ষে কাটবে কি না জানি না তবে ওদেশে ইতিমধ্যেই সাড়া পড়েছে—ডক্টর স্পীফেনবার্গ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।

আপনার মূল্যবান্ সময় আর নেব না। বেশি অত্যাচার করলে টান সইবে না ভয় হয়।

আমার বইটির জ্যাকেটের ভিতর দিকে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ ছাপা হয়নি। তাই পাঠালাম। আপনার শরীর ভালো যাচ্ছিল না শুনেছিলাম। আশা করি সেরে উঠেছেন। আপনার মতো বলিষ্ঠমনাদের...দমাবে আপনাদের? আমরা প্রার্থনাপন্থী তাই সময় সময় দুর্বল মনে করি আত্মবিশ্বাসকে। তবে কাটিয়েও উঠি ঠাকুরের কৃপায়। এ-যাত্রাও উঠব ভরসা রাখি ঃ "নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।" প্রীতি শুভেচ্ছা ধন্যবাদ পাঠাই। স্পীফেনবার্গের ভূমিকার একটি কপিও পাঠালাম। ...ও কামাথকে দেখাবেন যদি সুবিধা হয়। না, ...না। আমার বড় বেশি প্রশংসা আছে। বিজ্ঞপ্তি ভালো নয়। ইতি ভবদীয় প্রীতি-ঋণী দিলীপ।

Oxford 29 aug.

স্নেহের হীরেন,

গত সপ্তাহে তোমার চিঠি পেয়েছি। আশা করছি যে ক্রমশঃ মন বসে যাচ্ছে দেশে। না বসলেই বা উপায় কি। শুনলাম যে কাপূরের সঙ্গে দুজনে একটা বাড়ী নিয়েছ। এতে ভালই হ'ল। এটা কটা মাস ওখানে কাটিয়ে দিয়ে পরে আইন ব্যবসায়ের জন্য যখন কলকাতায় ফিরবে তখন নানা কাজে মন ব্যস্ত থাকবে। সুতরাং এদেশের অভাব তখন অত অনুভব করতে সময় পাবে না। এবং তাতে ভালই হ'বে।

একরকম মানুষ আছে (তুমি ও আমি হচ্ছি সেইরকম) যারা Unreal ; অর্থাৎ যাদের মন real affairs, real work ইত্যাদি বাস্তব পৃথিবী থেকে খালি সরে এসে নিজের মধ্যে গুটিয়ে ঢুকে থাকতে চায়—অনেকটা কুকুর যেমন নোংরা ও অন্ধকার গর্ত্তে পায়ের তলায় মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। ঐ সব লোক যে পরিমাণে পৃথিবীর বাস্তবতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে সেই পরিমাণে তারা নিজেদের মনে মনে নানাপ্রকার আকাশ কুসুম রচনা করে : 'আমি এই চাই", "আমি এই নই", "আমি এ হ'তে পারতাম" ইত্যাদি। বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে হ'লে যে পরিমাণ কার্য্যক্ষমতা, অধ্যবসায়, লড়বার ক্ষমতা ইত্যাদি দরকার হয় এ' সব লোকের সেগুলি নাই। কারণ বাস্তব সর্ব্বদাই সর্ব্বদেশে কর্কশ, কঠিন ও দুর্দ্ধর্ষ, এবং তার সঙ্গে লড়াই ক'রে তাকে জিতে নিজের উৎকর্ষসাধন ও অস্তিত্ব স্থাপনই হচ্ছে পৃথিবীর বড় লোকদের কাজ ও বরাবর তাঁরা তাই করে এসেছেন। ভারতবর্ষে আমরা চিরকালই বাস্তবকে বেশ সহজেই এড়িয়ে চলে এসেছি—যুগ যুগ ধ'রে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরুদ্ধ ক'রে, চিন্তাশীল মনকে ('rational mind) নিবিয়ে দিয়ে, বেশ সুখসাধ্য ও আরামপ্রদ স্বপ্নরাজ্যে মজাসে বিলাস ক'রে এসেছি—তা সে স্বপ্নরাজ্য তথাকথিত ধর্ম্মই হোক্ বা কলা-কবিতা-সাহিত্যই হোক্ বা বিজ্ঞান ইত্যাদিই হোক। সকল বিষয়েই আমরা স্বপ্নের সহজ পথ অবলম্বন করেচি, বাস্তবের কঠিন পথ থেকে পলায়ন দিয়েচি। এবং এই পলায়নের জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাক্, ঐটেকেই নানাভাবে নানারসে নানা ঢং-এ বড় করেচি ও হেলেদুলে কোমর বেকিয়ে ভূমানন্দে মাতুয়ারা হ'য়ে নানাপ্রকার পাগলাম ও মাতলাম করেচি। যথা রবি ঠাকুরের "art", "Gandhism" কীর্ত্তন, গোপালভাব, ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, তপোবন, আশ্রম, ও আত্মাপ্রবণতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের মনে পৃথিবীর অন্য জাতের সঙ্গে তুলনায় বেশী সহজে ছায়া পড়ে। সূর্য্যের আলো আমাদের মন থেকে প্রায় সর্বদাই স'রে থাকে। আমাদের হৃদাকাশে সতত গোধুলি। (আবার নিজেদের দেশী গোধূলির অন্ধকার, ছায়া, অবসাদ, ধুলা, ধোঁয়া, মশকজাল, ড্রেনগন্ধ ও জাগ্রতস্বপ্ন আমাদের পুরো মাতালতা দেয় না ব'লে আমরা বিদেশ থেকে Celtic twilight ইত্যাদি নানাপ্রকার কাল্পনিক গোধুলি আমদানি ক'রে থাকি—যেন দেশী Unreal এ নেশা পূরো জমবে না ব'লে doubly unreal বিদেশী-স্বপ্নমদ চাই)—আমরা কোনো জিনিস চোখে দেখি না, কানে শুনি না, ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ বা মনদ্বারা অনুভব করি না—কেবলমাত্র চক্ষু

কপালে তুলে বোম ভোলানাথ হ'য়ে তথাকথিত হৃদয়ের রসে ডুবে ছানাবড়া হ'য়ে থাকি। অনন্তে বুঁদ হ'য়ে যাই, কল্পিত স্বপ্নরাজ্যে রঙীন ও সূক্ষ্ম পাখা মেলে সুখে সন্তরণ দি। যেমন আয়েসী রবীন্দ্রনাথ নানাপ্রকার সহজ স্বপ্নে, সহজ সুরে, সহজ ভাব ভাষায় সর্ব্বদাই নিজেকে নানাভাবে সুড়সুড়ি দিয়ে সারা অঙ্গে সুখের কাঁটা তুলেচেন। বা ধর্ম্ম ও রাজতন্ত্র বিলাসী গান্ধী কখনো নেংটী প'রে কখনো উপবাসদ্বারা নাসিকান্তপ্রাপ্তজীবিত হ'য়ে, কখনো সাধুগিরির ঢং ফলিয়ে—ইত্যাদি নানাভাবে self-dramatisation ও exhibritionism-এর চূড়ান্ত করচেন।

যে দুটী ইংরাজী বাক্য এখন হঠাৎ এসে পড়ল—self dramatisation ও exhibitionism—এ'দুটীই আমাদের রোগের গোড়া। যাদের বাস্তবের, Realityর সঙ্গে যোগ নাই তারা নানাপ্রকারে নানা কাল্পনিকের সাহায্যে নিজেদের ঐভাবে জাহির ক'রে থাকে। এবং যেহেতু বাস্তব থেকে সত্য খুঁড়ে, ভেঙ্গে, লড়াই ক'রে বের করবার মত ক্ষমতা তাদের নেই, তারা সেইজন্য অবাস্তবের মায়াজালে নিজেদের ঘিরে রাখতে চায় এবং সেইজন্যেই আমাদের দেশে হৃদয়, স্বপ্ন (rather স্বপন), ভাব, দশা, সমাধি ইত্যাদি মনহীন, প্রাণহীন জড়ত্বের এত আদর হয়েচে।

সুতরা হে নবীন, তুমি মন থেকে স্বপ্ন বিসর্জ্জন দাও ও সবল হস্তে তোমায় মনে এতকাল ধ'রে যে কুয়াসা ও ধোঁয়া ও মাকড়সার জাল জমেচে সেগুলি দূর কর। এদেশে প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে খালি ঘরের মধ্যে কুঁনোব্যাং হ'য়ে রইলে—বাস্তবের সঙ্গে এতটুকুও পরিচয় করলে না—দূর থেকে মেয়ের শুভ্র স্কন্ধ বা সুন্দর চুল দেখে কৃত্রিম তুষ্টির সৃজন ক'রে নিজের মনপ্রাণকে পদে পদে ঠকালে। কিন্তু আর তা কোরো না। তোমার মনে যে স্বভাবজাত মাকড়শাটী সর্ব্বদাই নানাপ্রকার স্বপ্ন ও কৃত্রিমতা ও মিথ্যার জাল বুনে থাকে তা এখনো বুনচে সেটীকে বধ কর। দিনের আলোতে চোখ মেলে কাজ করতে সুরু কর। বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত ও লড়াই-এর ভিতর দিয়ে নিজেকে জাহির ও পূর্ণ কর। লেখ, পড়, বক্তৃতা দাও, সভাসমিতি কর, যে সব ভাল জিনিস তোমার ভেতর গজ গজ করচে সেগুলোকে জাহির কর। নিজের সঙ্গে আর ন্যাকামি কোরো না। আমাকে দেখে বোঝ তার ফল কি।

রাধাকৃষ্ণননের পায়ে গড় জানাবে। কাপূরকে নমস্কার।

জ্যো।

শ্রী

A/6 ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস
কলকাতা 700054
7 জুলাই 1998

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ডাকে দেওয়া চিঠিটা শেষ পর্যন্ত আপনার হাতে পৌঁছবে কি না, এ নিয়ে একটু সংশয় ছিল। কেননা রাস্তার নাম লিখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার পরবর্তী চিঠিটি পেয়ে নিশ্চিন্ত লাগছে।

প্রণব আপনাকে আমার কোনো কোনো বই পড়িয়েছে, আপনি সময় করে পড়েছেন, সে-বিষয়ে ওর কাছে নানা কথা লিখেছেন, এমনকী বইয়ের মধ্যেও কোথাও কোথাও পার্শ্বিক মন্তব্য করেছেন, এতে যে আমার কতদূর সম্মানিত লাগছে তা বলবার নয়। আজকাল কম লিখতে পারি, কিন্তু পারি যদি কখনো তো আপনার এইসব কথা আমাকে নিশ্চিতভাবেই প্রেরণা জোগাবে।

একটা প্রসঙ্গে ছোটো একটা অনুযোগ তুলেছেন কুণ্ঠিতভাবে, হয়তো ভেবেছেন আমাকে কষ্ট দেওয়া হবে। মতবৈষম্য বা চিন্তাবৈষম্য কোথাও কোথাও তো ঘটতেই পারে, সেটা জানতে পারলে আমি আহত হব কেন? তবে বিশেষ যে চিন্তাবৈষম্য বা বোধবৈষম্যের উল্লেখ করেছেন আপনি, সেখানে আমাদের বিষমতা হয়তো খুব বেশি নয়। মনে হচ্ছে আমার ধারণাটা খুব স্পষ্ট করে আমি প্রকাশ করতে পারিনি।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় নারীর প্রভাবপ্রতিপত্তি লক্ষ করা আমাদের কারো কারো 'ফিক্সেশন' হয়ে উঠেছে বলে আপনি ভাবছেন, ভাবছেন যে সেই চিরন্তন eternal tringle-এর তত্ত্ব দিয়েই তাঁর জীবনকে আর রচনাকে আমরা বুঝতে চাইছি। প্রসঙ্গত সেখানে কেতকী কুশারী ডাইসনের কথাও উল্লেখ করেছেন প্রণবের কাছে লেখা চিঠিতে।

কেতকীর এবং আরো কারো কারো এই 'ফিক্সেশন' কিছুটা তৈরি হয়েছে বলে আমারও মনে হয়। আমি কিন্তু নানা সময়ে কথা বলতে চেয়েছি তার বিরুদ্ধেই। কিন্তু বিরুদ্ধে বলবার জন্য কখনো কখনো তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আর বিচারবিবরণকে সবিস্তারে হয়তো বলতে হয়েছে পূর্বপক্ষকে উপস্থাপন করবার গরজে। আমার মনে হয়, 'কবির অভিপ্রায়' নামে আমার বইটির প্রথম অধ্যায়ের 2/3/4 অংশকটি থেকেই আপনার মনে হয়েছে কেতকী আর আমি হয়তো একরকমই ভাবছি প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম অংশটি কিন্তু শুরুই হয়েছে এই বাক্য দিয়ে 'কিন্তু সেটাই কি সত্য জানা হবে?' এই শেষ অংশেই আমার বক্তব্য জানাতে গিয়ে পরে লিখেছি করির 'বলবার মুহূর্তে সমকালীন জীবনতথ্যের সঙ্গে মিশে যায় কত বহুকালীন অনুভব-অভিজ্ঞতার রেশ, মুহূর্তটাকে ছুঁয়ে থেকে পুঞ্জে পুঞ্জে ভরে আসা কত অজস্র মুহূর্তের টান, তার কি কোনো হিসেব আছে?' লিখেছি 'রক্তকরবী লিখবার মুহূর্তে সদ্যযুবতী রাণু অধিকারীর ক্ষিপ্র চলাচল, তাঁর সরল এবং অদম্য দিনযাপন, সুসামাজিকতার সমস্ত জাল, তার বাধা আর

নিয়মতন্ত্র ভেঙে দিয়ে কবির একলা-জীবনের উষরতার মধ্যে তাঁর নবীন এক সঞ্চার নিয়ে আসা : নিছক তথ্য হিসেবে এর কোনো দাম নেই তা নয়। কিন্তু সে-তথ্যকে প্রধান করে তুললে তাকে কি বলা যাবে সেই মহানাটকের অভিপ্রায়, যা আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের বহুবিচিত্র জটিল অভিজ্ঞতাকে একই সঙ্গে ধরে রেখেছে বলে দেখতে পাই?' ইত্যাদি। ব্যক্তিগণ্ডির বিচ্ছিন্ন তথ্য দিয়ে সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি যে অসংগত, সেইটেই কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল।

অবশ্য, বক্তব্য নিশ্চয় স্পষ্ট হয়নি। তা নইলে আপনার এই ধারণা হবে কেন।

'কবির অভিপ্রায়' বইখানির প্রায় কুড়ি বছর আগে 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' নামে আরেকটা বই লিখতে হয়েছিল, তার ভূমিকাতে এই কথাটা একবার মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে নারীপ্রসঙ্গে ব্যক্তিনারীতে খুঁজতে গিয়ে আমাদের পাঠ অনেক সময়ে খণ্ডীকৃত হয়ে যায়। প্রণবের কাছে জেনেছি যে 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' আপনাকে ও পড়ায়নি। বইটির নতুন এক সংস্করণ সদ্য ছাপা হয়েছে, এই সুযোগে তার একটি কপি আপনার কাছে পাঠাই। 'বিজয়ার অলিন্দে' শীর্ষক এর ভূমিকাংশটি যদি একবার পড়েন, আমার ভালো লাগবে। মতে হয়তো এখানেও সম্পূর্ণ মিলবে না, তবে নারীপ্রসঙ্গটি নিয়ে আমি কীভাবে ভেবেছি তার একটা আভাস এখানে আছে।

'কবির অভিপ্রায়' ফুরিয়ে গেছে, নতুন ছাপার কাজ শুরু হবে কিছুদিনের মধ্যে। বেরোলে সেটাও পাঠিয়ে দেব আপনাকে।

আপনি এখনও অনেক পড়েন, ভালোবেসে পড়েন, তাই বই পাঠাবার এই ধৃষ্টতা করছি।

অধীর চক্রবর্তী নামে ইতিহাসের (পরে প্রাচীন ইতিহাসের) এক ছাত্রের কথা আপনার মনে আছে কি না জানি না। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে সে আপনার নিকটছাত্র ছিল 1949-51 সালে, এম.এ.দেয় 1953-তে। তারপর দীর্ঘকাল সরকারি কলেজের অধ্যাপনা আর অধ্যক্ষতা করেছে, বছর চারেক আগে মারা গেছে হঠাৎ।

আমি সেই অধীরের সহপাঠী, স্কুলের। স্কুল ছাড়ার পর দুজন দুই কলেজের ছাত্র হয়ে যাই। ও পড়ে ইতিহাস, আমি পড়ি বাংলা।

এতগুলি খবর বললাম এইজন্যে যে সর্বার্থেই আমি আপনার ছাত্রতুল্য। তাই, ভবিষ্যতে যদি কিছু লেখেন আমায়, 'তুমি' বলেই লিখবেন।

আমার প্রণতি জানবেন।

স্নেহার্থী

শঙ্খ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
৫-বি ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোড
কলকাতা-২৯
১৫।৬।২০০০

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার চিঠি মনের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি। কিছুতেই কাগজে কলম ছোঁয়ানোর সাহস হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি আমার গুরুমশাই ছিলেন ব'লে নয়—আমার চল্লিশ বছরের পার্টি জীবনেও আপনি ছিলেন আমার গুরুজন।

ভেবেছিলাম চিঠির বদলে নিজে গিয়ে সামনে হাজির হব। বাধ সেধেছে আমার কান। কানে যন্ত্র লাগিয়েও কিছু শুনতে পাই না। কেবল চোখের দেখায় মন ভরে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার লেখার প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য খুবই ন্যায্য। আসলে তত্ত্বে আমার মন বসে না। সব কিছুতেই একটা উড়ু-উড়ু ভাব। দিন আনি দিন খাই করতে গিয়ে।

পত্রপাঠ শুরু করেছিলাম লিখতে। কিন্তু শেষ করতে পারিনি। ফরমায়েশি লেখার চাপে লেখায় বাধা পড়েছিল। খুব যত্ন ক'রে রেখে দেওয়ার ফলে আপনার লেখা চিঠিটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এদিকে মরমে মরে যাচ্ছিলাম উত্তর দিতে না পারার জন্যে।

আমার এখনকার অবস্থা কাউকে ব'লে বোঝাতে পারব না। একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথের দশা। হাতের কাছের জিনিসও নেড়ে চেড়ে দেখা কিংবা উঠে কোনো বইপত্র খোঁজা—নিজে কিছু করার ক্ষমতা নেই। অথচ এ নিয়ে কাঁদুনি গাইতেও লজ্জা করে। যাই হোক, এ বিষয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

আমার সবচেয়ে বড় আপশোস, আপনি হয়ত আমাকে খুব অকৃতজ্ঞ ভাবছেন।

আপনি নিজগুণে মাপ করে দিলেও আপনার কাছে আমার ঋণ এ জীবনে শোধ হওয়ার নয়। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সঙ্কলন থেকে তার শুরু।

বাবা ছিলেন আবগারি দারোগা। জীবনে এক পয়সা ঘুষ নেননি। যৌথপরিবারে অভাবে মানুষ হলেও বাবার সততার জন্যে মনে মনে গর্ব বোধ করেছি ব'লে কোনো দুঃখই গায়ে লাগেনি। ফ্রি অর হাফ-ফ্রিতে পড়েছি। বই পড়েছি চেয়ে চিন্তে। ফলে, সেভাবে জ্ঞান অর্জন হয়নি। বারো বছর বয়সে টাইফয়েডে গানের গলা, চোখের দূরদৃষ্টি আর স্মৃতিশক্তি হারাই। জীবনে যেটুকু পড়েছি, তাও মনে রাখতে পারিনি। ফলে, চিরকাল হাতুড়ে হয়েই থেকে যেতে হল।

একবারই আপনার কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সি জেলে। কিন্তু কাছে ঘেঁষার সাহস হয়নি। শুধু আপনি নন, কোনো নেতারই।

খুব ইচ্ছে করে, আপনার কাছে যেতে। তাছাড়া, আপনি ছাড়াও, ও বাড়িতে আমার আরও চেনা মানুষ আছেন। কিন্তু একবর্ণ শুনতে পাই না ব'লে যেতে গিয়েও পিছিয়ে যাই।

এতটা লিখে ফেলার পর হঠাৎ ছেলেবেলায় পরীক্ষায় বসার কথা মনে পড়ল। এই বয়সেও

স্বপ্ন দেখে বুক ধড়াস ধড়াস করে। দেখতে পাই, পরীক্ষায় ডাহা ফেল করে চোখের জল ফেলছি।

অবশ্য গুরুজনদের কাছে সে কথা চেপে যেতে হয়।

সশ্রদ্ধ প্রণাম। সবাইকে ভালবাসা।

সুভাষ

জ. চিঠিটা আমার এক মেয়ের হাত দিয়ে পাঠালাম। কণিকা ঠাকুর। পাথুরিঘাটার ঠাকুরবংশে জন্ম। বিবাহসূত্রে এখন কণিকা হোসেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ২১.৩.২০০০ তারিখের চিঠি আজ পয়লা জ্যৈষ্ঠ, ১৫ মে তারিখে পেলাম, আমার প্রকাশকের মাধ্যমে। অশেষ ধন্যবাদ আপনার চিঠি ও আমার বই সম্পর্কে সহৃদয় মন্তব্যের জন্য।

আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু দু'বার দেখা হয়েছে—একবার আপনার বাড়িতে সোমেশ বাবু'র কল্যাণে, তারও আগে কলকাতার বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির প্রদত্ত সম্মাননা অনুষ্ঠানে—যেখানে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু এবং জনৈক তামিল কবির সঙ্গে আমিও মঞ্চে ছিলাম। এতদিন পর অবশ্য আপনার মনে থাকার কথা নয়। আর আমারও ভারি বদ অভ্যাস, ব্যস্ততার কারণে চিঠির যোগাযোগটা রাখতে না পারা।

আপনি ঠিকই ধরেছেন, আপনার প্রয়াত বন্ধু আইয়ুব সাহেবের বিশ্ববোধের সঙ্গে আমার ধারণার মিল নেই, থাকার কথাও নয়। যেমন তাঁর দর্শনচিন্তায় আলোকিত ইতিহাস চেতনার সঙ্গে আপনার ডায়ালেক্‌টিক্‌স সমৃদ্ধ ইতিহাস-নিরীক্ষার মিল হয়তো সামান্যই। আর আপনার কাব্যবোধ যথেষ্ট বলেই না আধুনিক কবিতার অমন সুচয়িত একটি সংকলন প্রকাশ একদা সম্ভব হয়েছিল।

আমি আপনার সঙ্গে একশ ভাগ একমত যে সম্প্রতি দুই বাংলাতেই জীবনানন্দের রচনা (কবিতা, উপন্যাস দুইই) নিয়ে "বহ্বাড়ম্বরের বহর" অবিশ্বাস্য। এক ধরনের ঘোর, বলা যায় জীবনানন্দ নিয়ে আকুলি-বিকুলি বাঙালি পাঠক সমাজকে পেয়ে বসেছে; স্বচ্ছভাবনার ঘটেছে নির্বাসন। আপনি ঠিকই বলেছেন গত এক শতকের বাংলা কবিতার যথাযথ বিশ্লেষী মূল্যায়ন গভীরভাবে হয়নি, যদিও হাজার বছরের কবিতার (চর্যাপদ থেকে ধরে) ঐতিহ্য নিয়ে আমরা ঠিকই খুবই গর্ব অনুভব করি। কথাও বলি সে অনুপাতে।

সম্প্রতি আমার একটি বই বেরিয়েছে বাংলাদেশ ও তার রাজনীতি বিষয়ে। বইটা পাঠালাম। জানিনা চোখের অসুবিধার জন্য পড়তে পারবেন কিনা। কয়েকমাস পরে বের হবে রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধের একটি সংকলন। আমাদের একটি রবীন্দ্রচর্চা ট্রাস্ট সংগঠন আছে, বছর বারো বয়স, তারই একটি পরিচিতপত্রও পাঠালাম। বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রচর্চার এই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান, বাকি সব গানের সংগঠন। সত্যি দেশ-দুনিয়ার হালচাল আমাদের জন্যও বড় যন্ত্রণার। স্বাধীনতাযুদ্ধে মানুষের চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার কোনো মিল নেই। ভবিষ্যত কাল বর্তমান পরাশক্তির একাধিপত্যের মধ্যে কতটা ঐ ঘাটতিপূরণ করতে পারবে বলা কঠিন। না-পারাটাই মনে হচ্ছে দুর্বল দুনিয়ার ভবিতব্য।

সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এটাই একমাত্র কামনা।

আহমদ রফিক

১২/২ সিদ্ধেশ্বরী রোড,
ঢাকা ১২১৭।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Bhattacharya

163 New Campus
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067
Phone 665913

৩/১১/০১

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ১৫ তারিখের পত্রের জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করি। পড়ে মনে হ'ল যে বর্তমানে আমার কি বক্তব্য আপনার অবগতির জন্য জানানো প্রয়োজন কেননা আপনার মতামত (বিপরীত হোক্ বা না হোক) মূল্যবান করে করি—তাই 'দেশ' পত্রিকায় কি লিখেছিলাম তার প্রতিলিপি পাঠালাম। বিশ্বভারতীর হাতে অনন্তকাল স্বত্বাধিকার থাকুক এ কথা আমি বলিনি। কেবল বলেছিলাম যে রবীন্দ্ররচনা ও সংগীতাদির শুদ্ধতা ও অখণ্ডতা যেন বাজারের দুর্নীতি থেকে রক্ষা পায় এই চেতনা জনমানসে জাগরিত হোক্। না হলে গণেশ জিতবে, সরস্বতী'র হার হবে।

(২) গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ-এর মধ্যে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এবং প্রকাশ্যে প্রবন্ধাদিতে মতবিরোধ বিষয়ে কিছু কাজ করেছিলাম শান্তিনিকেতনে থাকতে, ভাইস্চ্যান্সলর-গিরির বিড়ম্বনা থেকে মাঝে-মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। বইটি আপনার হাতে পৌঁছায়নি বলছেন, এখনই পাঠালাম ডাকযোগে।

(৩) Computer-এ লিখেছিলাম চোখ প্রায় অকেজো হয়েছিল বলে। কিন্তু তাছাড়াও আমি চিরকাল laxinization of Indian Script-এর পক্ষে, একটা সমিতিও ছিল আমাদের যাতে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, আমার বাবা নির্মল ভট্টাচার্য ইত্যাদি ছিলেন। বৃথা চেষ্টা হয়েছিল, এখন এটা আমার একটা খেয়ালিপনা মাত্র।

নমস্কারান্তে।
সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

পুনশ্চ দিল্লীর বাইরে ছিলাম বলে উত্তর দিতে দেরী হয়েছে।

28th July, 1982

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার ৬ই তারিখের চিঠির জবাব দিতে অনেক দেরি করে ফেললুম—নানান্ ঝঞ্ঝাট। তার মধ্যে সব থেকে এখন কষ্টকর হচ্ছে—লোকজনের! উনি এতো অসহায় হয়ে পড়েছেন যে ওঁকে সব সময়েই ধরে তুলতে হয়, বসিয়ে দিতে হয়। স্নান খাওয়া সবই করিয়ে দিতে হয়। আর লম্বা লোক তো আমি একা পারি না, একজন না ধরলে পড়ে যাবেন ভয় করে। মানে, আমি সমেত পড়ে যাবেন, তখন তো আরো কেলেঙ্কারি হবে—এই ভয় সদাই। ডাক্তার বারবার করে বলেছেন, পড়ে যেন না যান। তাই পুরোনো লোক আদতেই "মোর পুরাতন ভৃত্য" কে জোর করেই এনেছি ফিরে। সে বাড়ীর অন্য লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছিলো। ওদেরও তো মনুষ্যত্ব আছে—তারই টানেই বোধহয় এক দিন, ওঁকে দেখতে এসেছিলো। উনি দেখেই চিনেছেন, আর হেসেছেন। আমি তখনই (on the spur of the moment যাকে বলে) বলে ফেলেছিলুম—"আনন্দ, তুমি যেখানেই কাজ করছো, ছেড়ে দিয়ে 'বাবু'র কাছে ফিরে এসো। আমি তোমাকে বেশী মাইনে দেবো, পুষিয়ে দেবো।" ও আমার কথা রেখে ফিরে এসেছে, কিন্তু যেহেতু ওকে বেশী মাইনে দিচ্ছি অন্য একজন রাঁধুনী আছে (refugee) তার বেশ গাত্রদাহ! সেই খুব অশান্তি করছে—নানা অসুবিধা সৃষ্টি করছে, থেকে থেকে বাড়ী যাচ্ছে, কামাই করে—আমি আনন্দর সাহায্য পাই না। আনন্দ আমাদের বাড়ী ৩০ বছরের বেশী কাজ করছে। আমাদের পুরোনো ঠাকুর (আপনি তো তাকে দেখেছিলেন—সে মারা গেছে) এনেছিলো। তখন ও ছোটো ১২-১৩ বছরের ছেলে ছিলো—সব কাজ জানে, রান্না খুব ভালো করে। আর মুখটি বুজে। সেটা যে আমাদের রাঁধুনীটির (অত্যন্ত মুখরা সে—কাজের লোক বটে—তাই পপামীরা তাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু ওরা তো আর তার দিনের বেলার চেঁচামেচি বকাবকির কথা জানতে পারে না!) সহ্য হয় না—নানা রকমের অসুবিধা সৃষ্টি করে!! আমার তাই কিছুই সুবিধে হচ্ছে না। খুব খাটুনী-কষ্টকর ও ভয়েরও বটে! ওর বন্ধু, Percy Marshall-এর স্ত্রী april Edinburgh থেকে Propolis বলে একটা be-hive jelly পাঠিয়েছেন—আগেও ওষুধ বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন—সেটা খাইয়ে শরীরটা একটু ভালো হয়েছিলো ক'দিন। তাই আবার পাঠিয়েছে £2.1od. ডাক খরচা করে!! April অনেক bee-hives করে। সেই propolis alchol বা vodka তে মিশিয়ে দিলে dissolve করে যায়। এখানে alcohol বা vodka আমি কোথায় পাবো? তবু আমাদের একটি banker বন্ধু alcohol জোগাড় করে দিয়েছেন। সেটা তৈরী করে আবার খাওয়াচ্ছি। ভাগ্যটা আমারই খারাপ—আগে এ ওষুধটা পেলে হয়তো অনেকটা ক্ষতিই arrest করা যেতো—এখন অসুখটা এতো বেশী এগিয়ে গেছে যে পুরো সারানো শক্ত—কিন্তু definitely ভালো আছেন। বইগুলি ওঁর কটা, ছবির বই ক'টা পাশে রেখে দিয়েছি—খুলে দেখেন, সারাদিনই ওগুলি দেখেন। কি বোঝেন জানি না, তবু তো দেখেন—ক'দিন আগে কিছু করতেন না—আমার এ টুকুতেই আনন্দ! গত ১৮ই জুলাই, ওঁর ৭৩ বছরের জন্মদিন পার হলো। ১৯০৯-এ জন্ম। সিদ্ধেশ্বর সেন অনেকগুলি লাল গোলাপ এনেছিলেন, আর সুলেখা সেন

অনেক সন্দেশ এনেছিলেন। গোলাপ ও সন্দেশ তো খুব ভালোবাসেন, আপনি জানেন। আমরা রোজ বাড়ীতে সন্দেশ করে খাওয়াই—দোকানের কিনি না, যদি বাসি হয়, সে ভয়ে। এমনিতে আর সবদিক থেকে ভালো, খালি কথা একদম বলেন না! বিভা কেমন আছে? এখানে সারা আষাঢ়টা যা কষ্টে গেছে, এবার শ্রাবণের ধারা নেমে যেন বাঁচিয়েছে আমাদের—রেশনের চালই ৩্ টাকার উপর দাম হয়েছে, কিলোতে! আশাকরি আপনি ভালো আছেন। আমার কতগুলি ছোট ছোট ফোঁড়া খুব ভোগাচ্ছে, একটা সারছে তো আরো দু'তিনটে হচ্ছে। অনেক কপালে দুর্ভোগ আছে, দেখছি! বিভাকে আমার কথা বললেন—একা বসে থাকি যখন খুব ভাবি ওর কথা। আমার ভালবাসা জানাচ্ছি বলবেন। আপনি আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি

আপনাদের প্রণতি

পুঃ আপনাকে একটা খবর জানানো হয়নি—পপা মীরারা Candaর যাচ্ছে Sept এ, এক বছরের জন্য, Post doctoral Followship পেয়েছে। কিন্তু Govt. অনেক ঝামেলা করছে bond দিতে হবে—এই সব বলছে—কি হবে শেষ পর্যন্ত জানি না। নাতনীরা থাকবে।

10.9.78

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার চিঠিখানি যখন আসে তখন ওঁর আবার খুব অসুখ করেছিলো—প্রচণ্ড কাশির সঙ্গে হাঁপানীর টান। খুব bronchitis—আমি একটু ঘাবড়েই গেছিলুম, কোনো cough mixture-এ সারছিলো না। Sedative-এ অল্প আরাম। শেষে, কলকাতা থেকে একটা mixture পপারা পাঠালো। আর জ্বর হলে আর বেশীদিন continue করলে একটা ওষুধ লিখে দিলেন ওঁর রিপন কলেজের 'ছাত্র-ডাক্তার'। Anti-biotic Ledermycin। সেটা খাইয়ে এখন খানিকটা ভালো আছেন, কিন্তু খুব দুর্বল, ও complete briain-fag—চিঠি দেখেই বুঝতে পারবেন। শরীরটা একদম ভেঙে গেছে—সেই ৭৫-এর accident-এর পর দেখছি কিছুতেই আর উন্নতি হচ্ছে না। গতবার আমরা যখন কলকাতা গেছিলুম, Feb-March 78-এ, তখন expert ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলেছেন—eschemia of the brain–আর দু'বার এরকম bronchial troubles-এর পর আমার মনে হচ্চে না সেটার কিছু arrested হয়েছে। বরং বেড়েই গেছে—যদিও নিয়মিত ওষুধ খাইয়ে যাচ্ছি। এমনিতে এখন ভালো আছেন। কিন্তু হাতে ব্যথা, hernia কাটাটায় continuous ব্যথা, (75-এ এখানে সজত বোসের বাড়ীর caretaker এর অসভ্যতায় যে accident টা হয়েছিলো। তারই effect এ)-সমস্ত শরীরের set-back টা সেই accident থেকেই। তার আগে বেশ ভালো ছিলেন এখানে। লেখা কিছুই হচ্ছে না, জানি না ডাক্তাররা অন্য কিছু করে সারাতে পারবেন কিনা। খুব চুপচাপ থাকেন। এখানে তো strain কিছু নেই—আমি তাই মেনে নিয়ে আছি। Nov-এ কলকাতা যাবার কথা আছে—কতদিন থাকবেন—ডাক্তাররা dictate করবেন। আশা করি বিভা এখন ভালো আছে, ও রিনি লামু ভালো। ছেলে মেয়েরা ছুটিতে আসে। —অন্য আত্মীয় বন্ধুরাও আসেন। আপনি মাঝে মাঝে চিঠি লিখলে খুশি হন।

ইতি

আপনাদের প্রণতি দে

Rikhia, Deoghar,
S.P.
Bihar, PIN 814112

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার [illegible] পত্র পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আপনিও [illegible] খুব খুশি করেছেন। আপনার প্রীতি [illegible]। আপনি [illegible] করেছেন। তাই না? [illegible] পাঠিয়ে দিয়েছি, [illegible] দীর্ঘকাল আপনি [illegible] পাঠিয়ে দেবেন। তাই না? আপনার [illegible] ভালো আছেন, নিশ্চয়।

চিঠি দিন

কলকাতা
১৪।১১।৯৫

প্রিয় হীরেনবাবু,

আপনার ১০।১০।৯৫-এর চিঠি আমি কাল রাত্রে অর্থাৎ ১৩।১১।৯৫ তারিখে পেলাম। বুঝুন কি রকম রাজত্ব! ম্যালেরিয়ায় লোক মরতে আরম্ভ করার পর আজ মহাকরণে রাজ্য, কেন্দ্র, কলকাতা করপোরেশন, পুলিশ, মিলিটারী—সকলের সমবেত আলোচনা ও পরামর্শ চলবে। পরে ঘণ্টা কে বাঁধবে তা নিয়ে তর্কাতর্কি এবং জনসভা মহামিছিল হবে। সর্বত্রই এই অবস্থা। আর ছমাস পরে নির্ব্বাচন তাই মনে রেখে সকলেই সব ব্যবস্থা নিচ্ছেন—দক্ষিণ. বাম। যাই হোক, সি পি আই-এর খবর আমি জানি না। দিল্লি পার্টি কংগ্রেসে আমায় আমন্ত্রণ জানান হয়নি। আপনাকে তবু আমন্ত্রণ জানিয়েছিল?

আপনার 'চিঠির' সংবাদ এখন বাসী হয়ে গেছে। তাই জানতে চাই না। আপনার খবর পত্রিকা ও টিভির মারফৎ পাই। মনে হয় ভালই আছেন। দৈনিক কালান্তরে একদিন আপনার প্রশস্তি দেখে ভাল লাগল। তবুও তো তারা মনে রেখেছে!

আর বেশী বাড়াব না। তবে আমি আরও ঐ চারজনের গোঁড়া ভক্ত হয়ে পড়ছি। তাঁরা বিজ্ঞানী ছিলেন, তারই আলোকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রূপরেখা এঁকেছিলেন। আজকার নবায়ন, শিল্পায়ন গণতন্ত্রীকরণ আমি ঠিক মানি না। আর ৮৭ বছর হল, নতুন কিছু শিখবার প্রবৃত্তিও নেই।

যাই হোক্, চিঠিটা কবে পাবেন বলতে পারি না। এখনই ডাকে দিচ্ছি।

আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নেবেন।

ইতি
রণেন সেন

মনজুরুল আহসান খান
৩২/১ চামেলীবাগ
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
২৭.০৫.২০০১

কমরেড হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় কমরেড,

আপনার স্বহস্তে এবং সুন্দর হরফে লেখা চিঠি পেয়ে আমার কি যে অনুভূতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। আমাকে লেখা আপনার এই চিঠিটা আমার জীবনের একটা বড় পুরষ্কার। সেদিন হঠাৎ করেই আপনার বাড়ীতে গিয়ে আপনার সাথে কথা বলে মনটা কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল অনেক দিনের চেনা। মনে হয় এই সম্পর্কটাকেই কমরেড শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। আসলে আপনাকে অনেকদিন ধরে চিনতাম লেখার মাধ্যমে। আরও অবাক লাগে ভাবতে সেই পাকিস্তান আমলে ৬০-এর দশক থেকে আত্মগোপন অবস্থায় পার্টির সাথে জড়িত। কিন্তু কেউ তেমন করে আপনার লেখার কথা, বইয়ের কথা বলে নি। আমি নিজেই আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। আপনার লেখা পড়ে ইতিহাসের সমাজের আমাদের লড়াই সংগ্রামের ব্যাপারে বহু জমে থাকা প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে তার বাস্তবতা, তার বিকাশ ও দ্বান্দ্বিকতা, তার শ্রেণী ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য, মনস্তত্ব আবেগকে, তার সাফল্য ব্যার্থতা স্বপ্নকে এমন নিপুণভাবে কেউ তুলে ধরতে পেরেছে কিনা আমার জানা নেই। তবে খুব অবাক লাগে যখন দেখি ভারতে কি বাংলাদেশে আপনার বইয়ের প্রচার নেই বললেই চলে। অথচ এটা খুব প্রয়োজন। ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানার জন্য। তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। পার্টি করতে গিয়ে, আমাদের রাজনীতি এগিয়ে নিতে আমাদের বারবার ইতিহাসের মুখোমুখি হতে হয়। বুর্জোয়া প্রচারণা ও ইতিহাস বিকৃতির বিপরীতে সঠিক ইতিহাস তুলে না ধরলে আমরা বর্তমানের সাথে অতীতকে যুক্ত করতে পারি না। আজকের সঙ্কট সমস্যা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সেগুলির অতীত উৎসকে বোঝা খুবই জরুরী। বাংলাদেশে বিপ্লব সম্পর্কে আমার ভাবনাগুলির ব্যাপারে আমি আপনার কাছে গভীরভাবে ঋণী। আপনার লেখা, আপনার তথ্য, আপনার বিশ্লেষণ আমাকে সাহস জোগায় অনেক অপ্রচলিত কথা লিখতে। এবং লিখতে গিয়ে দেখছি প্রচুর সাড়া মিলছে। আপনার অনুমতি না নিয়েই আপনার লেখাগুলি আমি অনুবাদ করে ছাপবার কথা ভাবছি। ইতমধ্যে একজনকে Was India's Partition Unavoidable? বইটি দিয়েছি। Partition রদ করার ভাবনা থেকে নয়। কিভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতার ফলে "inverted desperation" হয় সেটা তুলে ধরতে। আমার সহকর্মীদের বইগুলি পড়াচ্ছি। ওরা অনেকে আপনাকে বামফ্রন্ট সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেখেছে TV তে। আপনার সাথে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হয়। আমার স্ত্রী আপনাকে তার গানের ক্যাসেট দিয়ে আসতে পারে নি সেজন্য তাঁর অনুতাপের শেষ নেই। বড় ইচ্ছে করে আপনাকে ঢাকায় নিয়ে আসতে। আপনার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে সাহস পাই না। আপনার 'বাগান'টা যদি দেখে যেতে পারতেন। "...ইস চমন আবাদ রহে!" ভাল থাকবেন।

আপনার স্নেহের
মনজুর

সমরেশ বসু

Samaresh Basu

12, Circus Range
Calcutta-700019
Tel. ++-5116
7.3.86

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গতকাল শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আপনার চিঠিটি পেলুম। আমারও ইতিমধ্যে মনে হয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা ও কথা হলে ভালো হয়। জানবেন, আপনার প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা কোনো কারণেই নষ্ট হবার নয়। চিনুদাকেও আমি অশেষ শ্রদ্ধা করি। আপনাদের দু'জনের সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। মাঝখানে বেশ ভুগে উঠলুম। এখনও কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হচ্ছে। তবে আগের তুলনায়, অনেকটা শিথিল। একটু আধটুর চেয়েও বেশি, শান্তিনিকেতন পর্যন্ত ঘুরে এলুম। এক সপ্তাহের নিবিড় বিশ্রাম।

আপনি যদি পাটনা কংগ্রেস থেকে ফিরে, আমার সঙ্গে একটু টেলিফোনে যোগাযোগ করেন, এবং 'চিনুদা'র আপত্তি না থাকে, তবে আমার এখানেই আমরা বসতে পারি। সুনীলকে (গঙ্গোপাধ্যায়) আমি নিশ্চয় বলবো। আসবে কি না, জেনে নিয়ে আপনাকে জানাবো। মার্চের শেষে হলেই ভালো হয়। কারণ 2nd April আমি সম্ভবতঃ দিল্লী যেতে পারি।

আপনার ও চিনুদার প্রত্যাশায় রইলুম। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন।

ইতি
সমরেশ বসু

SIR VITHALDASCHAMBERS,
16, APOLLO STREET, FORT,
BOMBAY.

September 16, 1971.

My Dear Hiren,
Please excuse this dictated letter.

I thank you for your kind letter of the 7th instant and extend to you my most sincere apologies for not writing to you earlier.

I am most greatful to you for the affectionnate sentiments you have expressed about our victory and my indirect share in it. I am as happy and proud of what our cricketers have done in England and West Indies as you are, Hiren. Although the major portions of your time are directed to politics I know from my personal experience that you are a sportsman at heart and want that everything in life should be managed in a clean manner and with a sporting outlook. When you were in the All-India Council of Sports I often said to myself that you would make an excellent organiser of sports in the country because you had no personal axe to grind and had a positive outlook. That was, however, not to be and the loss of sports was the gain of politics.

God has been extremely good to me, Hiren, and I have got much more than I ever deserved. I did my work with a clean pair of hands and clear conscience but even then did not know that my efforts would be rewarded to such an extent. Those who wanted me out of the Selection Committee at the time I got Ajit Wadekar appinted captain now want me in it. However, God had given me the gift of knowing when to get away and so I have decided to stick to my original intention of retiring. Besides, my health would not permit my taking over anything which puts strain on me.

You have also been very kind to me in what you have mentioned about the post-victory statement I have made. They all come straight from the heart and are sincere. If you are not an early sleeper, why not hear every Monday night my programme of the 3-R Society—Society for Reconstructive Surgery, Rehabilitation and Research for

Leprosy and Burns. It comes over Vivid Bharati at 10.30 p.m. The idea is to convey the message of leprosy to every home where cricket is listened and enjoyed. There will be only three minutes of leprosy and 11 minutes of cillcket in that talk. I somehow have a feeling that you might enjoy.

Many good friends like you have suggested to me that I should write a book. I somehow do not feel like it, Hiren, and my work is not confined to cricket only but other fields of life also. Hence it would not give a complete picture of me. I would, therefore, leave it to those who know about my cricket and about my work to remember me in their hearts after I am gone. I would love to meet you again and have a long chat about cricket. Is htere any likelihood of your coming to Bombay? You have my promise that when I next come to Delhi I will not return to Bombay without meeting you.

Is there anything I can do for you in Bombay? Please do not hesitate to utilize my services. They will always be at your disposal.

With warm personal regards,

Yours as ever,
Vijoy

Mr. Hiren Mukerjee, M.P.,
21, Rakabganj Road,
New Delhi-1.

SATYAJIT RAY

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠিটা বেশ কিছুদিন হল পেয়েছি—clippings সমেত। বিদেশ থেকে এসে এমন চিঠির স্তূপের সামনে পড়তে হয়েছিল যে হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। সেক্রেটারি রাখিনি কোনদিন। তাই সব চিঠির জবাব নিজেকেই দিতে হয়—এমন কি টাইপ করা চিঠি পর্যন্ত। দশ বছর বিজ্ঞাপনের আপিসে কাজ করে কেটা আপিস-ভীতি হয়ে গিয়েছিল; সেক্রেটারি রাখলে বাড়িতে একটা আপিস-আপিস ভাব এসে পড়বে তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে এসেছি। ফলে চিঠি কিছুদিন না উত্তর দেওয়া অবস্থায় পড়ে থাকে। যাদের দোষ সয়না তাদেরই। আগে জবাব দিতে হয়। আর যারা সহৃদয়, যারা বললে বুঝবেন, তাদের জবাবে মাঝে মাঝে দোষ হয়ে যায়।

আপনার লেখাটা আগেই পড়েছিলাম। কারণ brocher একটি কপি আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আপনি যেভাবে আমাকে প্রথম থেকেই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, এবং এখনো দিয়ে থাকেন। তার জন্য আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে—একথা হয়ত আমি আগেই বলেছি—আমার লেখা আপনার ভালো লাগে জেনে আমি সত্যিই আনন্দ পাই। কারণ আমি নিজে লিখে আনন্দ পাই। শেষ জীবনটা লিখেই কাটাতে হবে এটাও বেশ বুঝতে পারছি। ফিল্মের কাজে এখন অনাবিল আনন্দ নেই। বিশেষ করে একটা ছোট করে যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার সামনে পড়তে হয়—যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সদ্‌গতি—সেটা ঝেড়ে ফেলার অভ্যাস সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়নি এখনো। সদ্‌গতি আমার নিকৃষ্ট ছবি এমন মন্তব্যও পড়তে হয়েছে দিল্লী-বোম্বাইয়ের কাগজে। আমার ধারণা ছবিটা দেখলে আপনার ভালোই লাগত। তবে সেটি না দেখাই ভালো। আপনি কলকাতায় এলে house এ দেখানোর ব্যবস্থা করা কঠিন নয়। সেই সঙ্গে ??? 'পিকু' ছবিটাও দেখাতে পাই আপনাকে।

আমার ছেলে এখন ফটিকচাঁদ কাজ করছে। তার কাজ শেষ হলে পরে নভেম্বরে ঘরে-বাইরের কাজ শুরু করব।

আপনার তরী হতে তীর অতি উপভোগ্য বই হয়েছে। গাল-ভরা নামের ইংরিজি বইটি। হাতে আসেনি এখনো। এলে অবশ্যই পড়ব। আমার ছেলেবেলার স্মৃতি 'যখন ছোট ছিলাম' কি চোখে পড়েছে? ছোটদের জন্য লেখা সহজ। সরল বই। চোখে না পড়লি জানাবেন। আপনাকে এক কপি পাঠিয়ে দেব।

লোডশেডিং পোল্যুশন, পাতাল রেল, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে আছি এখনো। মুশকিল এই যে এখানে ছাড়া কোথাও কাজ করার কথা ভাবতে পারি না। তবে ছবিকরার কাজের অবস্থা আদৌ ভালো না। দিনদিন নতুন সমস্যা, নতুন অন্তরায় দেখা দিচ্ছে। তাই শেষ পর্যন্ত লেখার উপরেই ভরসা।

আপনি আপনার disfustingly ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকুন আরো অনেকদিন এটাই

আমরা চাই।

অমিয়বাবুর সঙ্গে মাসে-দুমাসে একবার দেখা হয়। আমার খবর যে পাই না তা নয়। তবে দেখা হয়নি বহুকাল।

আমরা মোটামুটি ভালোই।

আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

সত্যজিৎ

১৭।৬।৮২

১/১০ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কঃ ২৬
১২।১০।৭১

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিটি পেয়ে খুশি লাগল, যেমন বরাবর লাগে, মৈত্রীর উত্তাপে; এবারে অহম্-বোধও তৃপ্ত হল—বই বিষয়ে লিখছেন বলে। নামকরণ ঃ পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয় ঃ বেশ ভালোই মনে হয় তো, একটু ভারি কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? স্রোত চলে সূর্য জ্বলে ঃ 'Presumptions হবে' কেন: তবে হয়তো কম ভারি। প্রথমটিই আমার মনে হচ্ছে শোভন হবে।

কিন্তু লিখতে শঙ্কা ও সংকোচ দমন করা দরকার। কারণ আপনার ঐ অতীত ও বর্তমান ভ্রমণটা অনেকের ভালো লাগবে এবং লাভও হবে কমবেশি। কনক্রিট ও কনসেপটুয়াল দুইই হবে—যদি স্রোত ছেড়ে দেন। প্রথমটাতে সংকোচ বাধা দয়ে। (বক্তৃতা দিচ্ছি তো? এদিকে নিজে স্মৃতিচারণ মুখে করলেও লিখতে পারি না নিজে! কিন্তু অসামাজিক কবিতা লেখকের ক্ষেত্রে যুক্তি থাকুক বা না থাকুক; যিনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভারতবর্ষে প্রকাশ্য সভায় ময়দানে কত লোককে মাতিয়ে রাখছেন, তাঁর পক্ষে এই ইনছিবিণ্ন্ দমন করা উচিত আর সম্ভবত বোধ হয়—কারণ ঐ সভাবক্তৃতায় তাঁর ইনহিবিশন তো দায়িত্বের চাপে ডেকেছে। এই লেখটাও তো দায়িত্ব। একবার আরম্ভ করে দিন, তারপরে বাঁধ খুলে স্রোত চবলে সূর্যও জ্বলে থাকবে। ??? কিনা? নিশ্চয়ই, এ বিশ্বাস আমার নিশ্চিত এবং ধারণা তা আরো অনেকেরই। কবে পড়ব?

বিভাব শরীর বিষরা খবরে মন খারাপ প্রণতির ও আমার। ডাক্তাররা কি বলেন? বিভা নিজে কি ভাবেন? আমার চিঠি লিখতে বসতে ও লিখতে অনেক দেরি হল। শারীরিক কারণে। গরমে ঠাণ্ডা লেগে বয়িষ্ণু দেহমনে (প্রতিবেশী বাংলার ব্যাপারে কয়েকমাস ধরে অধিকতর কাবু মনে ও সুতরাং দেহে—her body thought কথাটা পুরুষ হলেও আমি সারাজীবন হাড় হাড়ে বুঝি। তার ওপরে তো আমাদের স্বদেশ বাংলাও আছে—less spectacular, more serdid রূপে।) অসুখ করল। বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে—কার্ডিওগ্রাফটা শুধু বাকি। ভালোই আছি সে হিসেবে। বাড়িতে ও বাইরে স্থানাভাব, চুপচাপ থাকার অভাব তো থাকবেই, সেটা মানবার ও মানিয়া নেবার চেষ্টা তো ক'রেই যাই। আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লেখা হ'য়ে গেছে। এই খবরটা পত্রান্তরে জানার ইচ্ছা প্রবল।

আপনার বিষ্ণু

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন
১৬.১১.৯৪

পরমশ্রদ্ধেয়,

উত্থক প্রকাশণীর 'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর' পুস্তিকাখানি সমীর রায়চৌধুরী প্রকাশকের তরফ থেকে আমাকে এক কপি দিয়ে গেছেন। উৎসর্গপত্রে তিনি অনুজের মধ্যে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন দেখে আমি বিস্ময়ে এবং আনন্দে অভিভূত। গণশক্তি, পরিচয়, দেশ, এমন কি Statesman-এও আপনার সাম্প্রতিক রচনাগুলি দেখে আপন ভাবনায় বেশ কিছুটা শক্তি পাই। তবে আমরা ত অতীত; ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলি নবীন প্রজন্মই তাদের মত করে সফল করবে। মার্ক্সীয় দর্শন যে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছিলেন, সেগুলি এ উঠে যায়নি; বরং অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়েই চলেছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান যা জীব বিজ্ঞানকে নানা কৌশলে ধনতন্ত্র মনুষ্যেতর জীবসৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা একটা মারাত্মক আকার ধারণ করার আগেই, আশা করি, আমরা সুস্থ জীবন বোধ ফিরে পাব। এবং সেটা হবে বিশ্বব্যাপী এবং যুগপৎ। আর তা যদি হয়, মনুষ্যপ্রজাতি বাধ্য হবে তার ষড়রিপুকে পরিহার করতে। আমাদের দেশে যে পার্টিকে গড়তে আপনাদের মত বর্ষীয়ান্‌রা একদিন সর্বলোভ ত্যাগ করেছিলেন; আজ সেই পার্টির আকর্ষণে মধুপায়ীদের সমারোহ। গ্রামে গঞ্জে শহরে একই দৃশ্য। কেউ কেউ বিচলিত; তাঁরা কিন্তু চালনা শক্তিহীন। আমি বহুদিন থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেই। কিন্তু সমাজতন্ত্রের ভাবনাগুলি ত ছাড়তে পারিনি। আমাদের যৌবনে সমাজতন্ত্রের যে মহান্ অভ্যুদয় দেখেছি, শোষিতের ক্রন্দনে ক্রোধে এবং সংগ্রমে তা আবার ফিরে আসবেই এই বিশ্বাস দুর্বল হলে বিড়ম্বিত এবং বিপর্যস্ত বোধ করি। যখন আপনারা অভিজ্ঞাতা এবং প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন এবং প্রয়োজনীয়তার আশ্বাস দেন, তখন আনন্দিত হই। বিশ্বাস এবং স্বপ্ন মনে চেপে বসে; মার্ক্স্-এঙ্গেল্‌স্ যে স্বপ্ন মনে চেপে বসে; মার্ক্স্-এঙ্গেল্‌স্ যে স্বপ্ন সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর আগে দেখেছিলেন। আমি শিল্পকর্ম করি। আমার concept-একটাই—'ক্ষত'। আমার বক্তব্য—সমাজজীবনে এত বিলাস ব্যসনের মধ্যে একটা লোকও নিরাশ্রয় থাকবে কেন, অভুক্ত থাকবে কেন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে যখন পানীয় জলের প্রচণ্ড অভাব, কলকাতায় তখন দিনরাত্রির ক্রিকেটের মেলা; বিস্মিত হই এবং হইও না যখন দেখি, গ্রামের এই অভাবী লোকগুলিও সমান উৎসাহে হাততালি দেয় এবং বাজি পোড়ায়। ধর্মের পরিবর্তে দূরদর্শন আজ জনতার আফিমে পরিণত হচ্ছে।

আপনার স্নেহের প্রকাশে অভিভূত হয়ে অনেক বাচালতা করলাম; আপনি ক্ষমা করবেন। আপনার সংগ্রামী এবং দীর্ঘজীবন কামনা করে চিঠি শেষ করছি।

প্রীত্যর্থী
সোমনাথ হোর ২৭/১২

সপ্তপর্ণী 16 F
58/1 বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলকাতা-৭০০০১৯
31.11.2000

স্নেহের সুভাষ,

বারবার ভেবেছি তোমাকে লিখ্‌ব। কিন্তু বাধা পড়েছে আর ভেবেছি কেমন করে গুছিয়ে অনেক দিনের জমে থাকা অনেক কথা গুছিয়ে লিখে উঠতে পারব কি? প্রশ্নের জবাব অবশ্য এই যে তেমন লেখা আমার পক্ষে সাধ্য নয়। তাছাড়া গত বারো-তেরো বছর ধরে রাজ্যের বিরক্তি আর বিচলিতি মনের মধ্যে বাসা বেঁধে এমন বিপত্তি ঘটিয়েছে যে যা লিখতে চাই তা আমার অসাধ্য। খটোমটো হয়ে গেল কথাটা, 'পোষাকী' বলে সন্দেহ কেউ করলে আশ্চর্য হব না। কিন্তু লিখে ফেলেছি। সাম্‌নেই প্রণব বসে আছে। এভাবে লিখ্‌তেও আমি অভ্যস্ত—কিন্তু বাস্তবিকই তোমাকে যে সব কথা বলে যেতে চাই তা বলে ওঠা সম্ভব নয়। ভরসা এই যে তুমি কবি। তৃতীয় নেত্র একটা তোমার আছে, তুমি অনুমান করে নিতে পারবে।

খেই হারিয়ে যাচ্ছে। তবে তুমি কয়েকটা বই পাঠিয়েছো—সেজন্য ধন্যবাদটাই দিই নি এতক্ষণ। সে চেষ্টা করব না, তোমার লেখার যে গুণ গোটা দেশকে কত আনন্দ দিয়েছে, তা নিয়ে বাক্‌বিস্তার এই অতিবৃদ্ধ না হয় না-ই করল। তবে পড়েছি আর মাঝে মাঝে প্রত্যাশা পরিতুষ্ট না হলেও খুশি হয়েছি। একই সঙ্গে বিব্রত ও আনন্দিত হয়েছি যে তুমি কোথায় যেন লিখেছ যে আমার কাছ থেকে কিছু 'অনুপ্রেরণা' তোমার মনের ভাণ্ডারে মজুদ হয়েছে। না, সুভাষ, আমার বেশ মনে আছে তুমি যখন MA পড়ছ, তখন Marxist Philosophy পড়াতে গিয়ে কী প্রচণ্ড ফাঁকিই দিয়েছিলাম। যা তোমার মতো বুদ্ধিমানের কাছে নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। তাছাড়া আমার এই দীর্ঘ পরমায়ু জুড়ে যে ক্রমান্বিত ব্যর্থতার ফিরিস্তি আমাকে অবসন্ন করে রেখেছে, তা থেকে কারও কোনো 'অনুপ্রেরণা' নিশ্চয়ই মেলে না। থাক্‌ এ নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা জুড়ে দেবার আশঙ্কাকে ঠেলে ফেলি।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তোমার সাহিত্য আকাদেমি ভাষণ কিন্তু আমাকে একটু হতাশ করেছে। কেমন যেন মনে হয়েছে গতানুগতিক। তোমার মতো ছেলে, বাঙালি ছেলে, যে দেশবিদেশের মানুষের কাছ থেকে আদর পেয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য, তার চোখে রবীন্দ্রনাথের মহিমা (কণ্টকিত কালিমা সত্ত্বেও) অবাঙালি পাঠকদের কাছে তুমি পৌঁছাতে পারতে তা যেন করোনি। কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল—তবুও প্রত্যাশা আমার অতুষ্ট।

আমার 'বদ অভ্যাস' বেরিয়ে আসছে—ধানাই-পানাই লিখে চলেছি। বাঁচোয়া এই যে বাস্তবিকই 'জাত-লিখিয়ে' তো আমি নই—'মুফৎ'-সে একটা 'খ্যাতি' একটু আধটু রটেছে—ব্যস!

তোমার কাছ থেকে আমার মূল প্রত্যাশা আজও—হয়তো ভবিষ্যতে (আমি থাকি বা না থাকি) সে প্রত্যাশা তুমি মেটাবে। 'কম্যুনিজ্‌ম্‌' বস্তুটি আমাদের টেনেছিল। একেবারে সর্বতোভাবে মনুষ্যজীবন বদ্‌লাবার একটা জগৎজোড়া আয়োজনে মিলেছি সবাই। কম্যুনিজ্‌মে বিশ্বাস দাবি করে "un oui trop massif et charnel" ("এমন একটি 'Yes' [হাঁ] যা সুগভীর আর প্রদেয় থেকে উৎসারিত")—এক বিরাট ফরাসী বিদ্বানের এই কথা। এই পথে আসার স্বপ্ন ও বাস্তব প্রয়াস—এটা বোধহয় আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে সুকঠোর "যুক্ত', যার যোগ্যতা সহজসাধ্য নয়। দোষে গুণে "real exiting socialism" একটু তার আস্বাদ দিয়েছে, যাকে অস্বীকার করতে আমি অপারগ। তোমার কাছ থেকে আমার মনের ও মর্মের জিজ্ঞাসা ('জ্ঞাতুম্‌ ইচ্ছা)—তা কেমন করে পূরণ হবে?

আর কেন কথা বাড়াই। বিষ্ণুবাবুকে মনে পড়ছে। তুমি বুঝবে ভালো থেকো। ভালোবাসা জেনো। তোমার

শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায় হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সপ্তপর্ণী 16 F
কলকাতা-৭০০০১৯
1.4.2002

স্নেহাস্পদেষু,

সুভাষ, শারীরিক ও মানসিকভাবে ২০০২ 'কথঞ্চিৎ' ক্লিষ্ট হয়েও তোমাকে লিখছি আবার তোমার যে অত্যন্ত মূল্যবান বইটা আমাকে 'উৎসর্গ' (!) করেছো সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন পড়তে লিখতে একটু 'কষ্ট' হতে আরম্ভ করেছে। দেখি কোথায় দাঁড়ায়। তোমারও কম বয়সে কানটা গেছে—'আমারও প্রায় তার কাছাকাছি। তবে 'এককান কাটা'র মতো সসংকোচে আর মানসিকভাবে অপ্রতিভ হয়ে 'বিরাজ' করছি। একবার এক মহাপুরুষকে বলেছিলাম যখন কানে কম শুনতে শুরু করি। 'I am getting deaf and when I am dumb, it will be beat tude"। পার্লামেন্টে বিবাহ বিষয়ক আইন পাশ করা ব্যপদেশে আওড়াই বইয়ে পড়া কথা; "The ideal marriage is between a dumb wife and a deaf husband"—এখানে কোনো ব্যক্তিগত ইশারা নেই। বিশ্বাস কোরো। এখনও আমার রুচিবোধ সম্ভবত হারাই নি।

আসল বক্তব্য ভুলে যাচ্ছিলাম। তোমার বইটা বাংলা আকাদেমি বার করলে তাদের গর্ববোধের অবকাশ মিল্‌ত। কেমন করে কত দিনের কত গভীর পরিশ্রম ও চিন্তার ফল তোমার এ বই—ভেবে অবাক হই। তোমার কলমে ফুলচন্দন পড়ুক—এটা বলছি সারা দেশ জানে তোমার লেখার জাদু।

শেষ করি এই বুড়ো বয়সের বাকবাহুল্যের প্রদর্শনী। ভালো থেকো সবাই—এবং তোমার লেখা বেরোতে থাকুক।

একটাই দুঃখ যা না স্বীকার করলে নিজেকে অসৎ বলে আবার ধিক্কার দিতে হবে। কত ভালো হত, যদি তোমাকে "The god that Failed"—বিঘোষকদের সান্নিধ্যে তোমাকে না দেখতাম। ভুল বুঝবে না জানি বলেই সাহস পেলাম।

নিত্যশুভেষী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায়
কবিকুলরত্নেষু

ব্যক্তিগত

স্নেহের সুচিত্রা,

তুমি একটু অবাক হবে। হঠাৎ আমার চিঠি পেয়ে। লিখ্‌ছি Sudden impulse-এ।

মাঝে কাগজে কোথায় দেখলাম তোমার বয়স পঁচাত্তর হয়েছে। আমি তো প্রথমটা অবাক্ হলাম, তুমি বয়সে এত বড়ো হয়ে গিয়েছ! তা অবশ্য হবে—সবাইয়েরি বয়স বাড়ে, আমার তো বয়সের 'গাছপাথর' নেই। কদিন বাদে বিরানব্বই পার হব! একেবারে যে বহাল তবিয়তে আছি তা নয়। তবু দিনযাপনের গ্লানি কাটাতে একটু-আধটু কাজও করে যেতে পারছি।

সে কথা যাক্। তুমি শতায়ুষ্মতী হয়ে গৌড়জনকে আনন্দ দিতে থাকো। এতদিন যা দিয়েছো তা তো অমূল্য। মনে পড়ছে South-East Asian Youth সম্মেলন ১৯৪৬ (?) -এ বালিগঞ্জে তোমার গান "সার্থক জনম আমার"—তোমার এ গান গোটা দেশ শুধু নয়, দুনিয়ার সম্পদ! বেঁচে থাকো আর গান গেয়ে চলো। ভালো থেকো।

শুভার্থী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুঃ—প্রণব বিশ্বাস নানা কারণে এখন আমার খুব কাছের মানুষ। তার হাত দিয়ে পাঠালাম।

শ্রীঅরুণ মিত্র
কবিবরেষু
প্রিয়বরেষু

প্রণব-এর কাছে শুনলাম এই মাসে কোনোদিন আপনি 'নব্বই পেরিয়ে' ক্লাব-এ প্রবেশাধিকার অর্জন করছেন। একজন পূর্বসুরী (!) হিসাবে অভ্যর্থনা জানাই।

এ ক্লাব-এর সভ্যদের মেয়াদ খুবই অনিশ্চিত, তবু যতদিন চলে ততদিন আটক থাকতেই হয়। বহুবিধ যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়। তবু মনুষ্য জীবন তো মহার্ঘ। বেঁচে থাকাটাই একটা 'কীর্তি'।

কি যে লিখছি জানি না, ?? ?? চিন্তে টানা লিয়ে চলেছে—প্রণব 'সাক্ষী' রয়েছে তার সাম্‌নেই লিখছি।

গত বছর শিশির মঞ্চ-এর সভায় যা বলেছিলাম তা আপনার মনে না থাকলেও আমার মনে আছে। আমরা উভয়েই চাইব এবং চাই যে জীবনান্ত (যা ত্বরান্বিত হলেই ভালো) পর্যন্ত যেন সাময়িকভাবে একেবারে 'পঙ্গু' না হয়ে পড়ি, কিছু পরিমাণে 'সক্ষম' থাকি!

আপনি কবি, অর্থাৎ 'দ্রষ্টা'। ত্রিনেত্রের অধিকারী। আপনার কাছে দেশের ও দশের প্রত্যাশা অনেক। শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন। দেশবাসীর জীবনে কল্যাণ সাধনব্রতে লেগে থাকুন।

আপনার
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

9 5 -83

Dear Hirenbabu,

Thanks so much for your delightful letter I liked the particulars on Athens

This is my first real visit to Greece I have once spent the night in Athens in the old days when planes did not fly at night So I could play a brief but memorable visit to the Acropolis

Indira Gandhi

গ্রন্থপঞ্জি

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থপঞ্জি

গৌতম নিয়োগী সংকলিত

[এই গ্রন্থপঞ্জি বা বিব্‌লিওগ্র্যাফিটি পূর্ণাঙ্গ এমন কোনও দাবি বর্তমান সংকলকের নেই; অন্তত প্রবন্ধের তালিকা যে ভীষণভাবে অসম্পূর্ণ তা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া দরকার। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জীবনে যত গ্রন্থ-প্রবন্ধ-সমালোচনা ইত্যাদি বাংলা ও ইংরেজিতে লিখেছেন তার পূর্ণাঙ্গপঞ্জি একজনের পক্ষে করা কঠিন; বস্তুত এ কাজ একটা 'টিম্' দীর্ঘকাল ধরে করলে সার্থক হতে পারে। গ্রন্থপঞ্জি বা সম্পাদনা কী করে করতে হয়, তার পদ্ধতি ও প্রকরণ কেমন, এ বিষয়ে কিংবদন্তী-প্রতিম প্রয়াত রবীন্দ্রচর্চা বিশারদ পুলিনবিহারী সেনের পদপ্রান্তে বসে কাজ শেখার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম বলেই নিজের ঘাটতি নিজেই বুঝতে পারি। তবু এই সংকলনের ব্যক্তিগত অক্ষমতার ত্রুটি কিছুটা মেটানো গেছে বহু ব্যক্তির সহৃদয় আনুকূল্য এবং সানুগ্রহ সহযোগিতায়। এদের মধ্যে স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথের নাম সবার আগে করতে হয় কারণ যখনই যে প্রশ্ন মনে এসেছে তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছি। 'কোরক' পত্রিকার 'হীরেন মুখার্জী সংখ্যা'য় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ পাঁচ সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'শঙ্কা সংকট প্রত্যয়' শীর্ষক সম্মাননা-গ্রন্থে গ্রন্থতালিকা দেওয়া আছে, যদিও কোনওটি সম্পূর্ণ নয় এবং বহু ভ্রান্তি আছে। এই রচনাপঞ্জি প্রস্তুত করতে নানা গ্রন্থাগারের সাহায্যও নিতে হয়েছে এবং যথাসম্ভব চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু বইয়ের প্রথম সংস্করণ দেখার সুযোগ পাইনি। তবু সযত্ন প্রয়াস নিয়েছি প্রথম সংস্করণ দেখা, ক্ষেত্রবিশেষে নানা সংস্করণের মধ্যে পাঠভেদ জানার। গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রকাশের কালানুক্রম রক্ষা করা হয়েছে। এ কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাঁরই পুত্রবধূ মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়। স্বতন্ত্রভাবে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জানানো স্থানাভাবে সম্ভব না হলেও প্রণব বিশ্বাস এবং কমল সমাজদ্বার, এই দুই বন্ধুর কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হবে। —গৌ. নি]

(ক) বাংলা বই

১. *ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ*
প্রথম প্রকাশ/১৯৪৩/কলকাতা
প্রথম সংস্করণ/সমবায় পাবলিশার্স/৩৩/২ শশিভূষণ দে স্ট্রিট/কলকাতা থেকে মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত/পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস/৪৭ মধু রায় লেন/কলকাতা থেকে গোপালচন্দ্র বসাক কর্তৃক মুদ্রিত।
আজ ও আগামীকাল সিরিজ/পৃ. ৮+১৫৭/মূল্য দুই টাকা
উৎসর্গ 'মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের করকমলে।

ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

> "এই বই-এর প্রবন্ধগুলির প্রায় প্রত্যেকটি কোন-না-কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। এগুলির মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, তা সহজেই পাঠকের চোখে পড়বে আশাকরি। মার্কসবাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলিত না হলে সমাজের ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা যে দূর হতে পারে না, তা ক্রমেই অনেকে বুঝছেন। মার্কর্সবাদ আয়ত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছি বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। এই বই-এ যে তাই অনেক ত্রুটী রয়ে গেছে, তা আমি বিশেষ করেই জানি।"

মূল সংস্করণে বারোটি মৌলিক প্রবন্ধ সংকলিত। বারোটি রচনার সূচি :

ভারতের জাতীয়তার স্বপ্ন ; ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্কস ; ভারতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য ; ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য দেশের দুর্গতি ও কর্তাদের কৈফিয়ৎ ; ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ; অস্ট্রো-মার্কসিজমের বিড়ম্বনা ; মানুষ খুনের ব্যবসা ; রুশ বিপ্লব ও লেনিন ; সোভিয়েট ইতিহাসের একটি অধ্যায় ; সোভিয়েট রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান ; সোভিয়েত রাষ্ট্র। মূল লেখাগুলি 'পরিচয়', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'সোভিয়েট দেশ', 'মন্দিরা' প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৫-এ বের হয়। তাতে মূল বারোটি প্রবন্ধের সঙ্গে 'ইতিহাস' নামে সোভিয়েত ঐতিহাসিক এস এন চাক্রভস্কির রচনার অনুবাদ যুক্ত হয়। 'ভারতবর্ষ ও মার্কর্সবাদ' গ্রন্থের আটটি রচনা (সব নয়) হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (সম্পাদক : প্রণব বিশ্বাস) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৪০৫ সাল) সংকলিত হয়েছে।

২. *ভারতের জাতীয় আন্দোলন*

প্রথম প্রকাশ/১৯৪৩/কলকাতা

ন্যাশানাল বুক এজেন্সি/১২ কলেজ স্কোয়ার/কলকাতা-১২

এই পুস্তিকাটি লেখকের সুপরিচিত ইংরেজি গ্রন্থ *India's Struggle For Freedom*-এর বাংলা নয়। ইংরেজি বইটি *India Struggles For Freedom* শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ। এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে হীরেন্দ্রনাথ এক চিঠিতে প্রণব বিশ্বাসকে জানিয়েছেন (দ্র. নির্বাচিত প্রবন্ধ, ১ম, পৃ. ৩০৯) :

> 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' ১৯৪৩ সালে পার্টির পক্ষ থেকে, প্রখর রাজনৈতিক বাতাবরণের তাগিদে লেখা প্রায় তাৎক্ষণিক রচনা। নিজের লেখা পুরো পড়ার ধৈর্য নেই, তবু চোখ বুলিয়ে দেখলাম স্মরণীয় তেমন কিছু নেই।

৩. *হিন্দু ও মুসলিম*

প্রথম প্রকাশ/এপ্রিল ১৯৫৫/কলকাতা

ন্যাশানাল বুক এজেন্সি/১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে সুরেন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। গণশক্তি প্রেস/৮ই ডেকার্স লেন/কলকাতা-১ থেকে কালীপদ চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

পৃ. ৬+৫১

'প্রকাশকের কথা' অংশে আছে

> 'হিন্দু ও মুসলিম' মাসিক 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করছি। 'পরিচয়'-এ প্রথম লেখাটা বার হওয়ার পরে (শ্রাবণ, ১৩৫৩) অনেক জায়গা হতেই অনুরোধ আসে যে লেখাটাকে পুস্তিকার আকারে বার করা হোক। নানা কারণে তা হ'য়ে ওঠেনি। তারপরে, ফাল্গুনের (১৩৫০) 'পরিচয়'-এ আগেকার লেখার পরিপূরক হিসাবে আরো একটি লেখা বার হয়েছে। এই দুটি লেখাই একত্রে এই পুস্তিকার ছাপা হলো।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ইতিহাসের কৃতী ছাত্র, যশস্বী অধ্যাপক এবং সক্রিয় সমাজকর্মী হীরেন্দ্রনাথ বরাবরই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন। 'হিন্দু ও মুসলিম' পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধটি 'পরিচয়' শ্রাবণ ১৩৫৩ অর্থাৎ ১৯৪৬-এর আগস্টে কিন্তু 'The Great Calcutta Killing' (দ্য স্টেটস্‌ম্যানের ভাষা) আগে লেখা। আর দ্বিতীয় রচনাটি 'পরিচয়' ফাল্গুন ১৩৪৩ অর্থাৎ ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে অর্থাৎ ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে লেখা। লেখকের অসাম্প্রদায়িক ঐক্যপ্রয়াসী লেখা আমরা পরেও পাই। উল্লেখ্য বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় জুন, ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিন্দু মুসলমান কী জয়'।

৪. *মার্কসবাদের অ আ ক খ*

প্রথম প্রকাশ/এপ্রিল ১৯৫৫/কলকাতা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি/১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে সুরেন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত গণশক্তি প্রিন্টার্স/৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট/কলকাতা-১৬ থেকে সুনীল কুন্দগামী কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দেড় টাকা।

পৃ. ৬+১৩৮

গ্রন্থে মোট সাতটি রচনা, সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। সেগুলির শিরোনাম যথাক্রমে

'সব লাল হো জায়েগা' ; স্বপ্ন থেকে বাস্তব ; নাই অন্যপথ ; ইতিহাসের গতি ; শোষণ ও শাসন ; মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি ; দিন আগত ঐ।

গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জিকা দেওয়া আছে। 'ভূমিকা'য় লেখক জানিয়েছিলেন

> "যথা সম্ভব সহজ ভাষায় এবং অল্প কথায় মার্কসবাদের মূলনীতি ব্যাখ্যার একটা চেষ্টা করছি। আশা আছে যে এটা পড়ে পাঠকদের মনে মার্কসবাদের গভীর অনুশীলন সম্বন্ধে আগ্রহ জাগবে। আরও আশা আছে যে শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় কিংবা নিছক জ্ঞানের অভাবে মার্কসবাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত ভুল ধারণা বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, সেগুলো দূর করতে এই রচনা কিছুটা সাহায্য করবে।"

৫. *গ্রীসের পুরাকাহিনী*

প্রথম সংস্করণ দেখার সুযোগ হয়নি। সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি।

২য় সংস্করণ/কলকাতা/১৯৮২

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ/আর্য ম্যানসন/নবম তল/৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার/

কলকাতা-১৩ থেকে মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক দিব্যেন্দু হোতা কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রেস এজেন্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড/২ বিধান সরণি/কলকাতা-৬ থেকে এস. কে. শীল কর্তৃক মুদ্রিত

প্রচ্ছদ প্রশান্ত হাজরা

মূল্য ১৪ টাকা

পৃ. XVI+২১৬+গ্রন্থপঞ্জী

২য় মুদ্রণ/জুলাই ১৯৮৯

মোট আঠারোটি অধ্যায়ে প্রাচীন গ্রিসের ইতিহাস লিখেছেন লেখক। 'মুখবন্ধ' লিখতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন "গ্রীসের পুরাকাহিনী সম্বন্ধে ঐ স্বল্পায়তন গ্রন্থ পাঠক সাধারণের কাছে আদৃত হলে রচনা প্রচেষ্টা সার্থক হবে। শোনা যায় যে নিতান্ত পরীক্ষার প্ররোচনায় ছাত্রেরা বিনা আর কেউ গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ রাখেন না। এ ধারণা যথার্থ না হওয়ারই সম্ভাবনা ; সভ্যতার ভাণ্ডারে প্রাচীন গ্রীকদের ভাস্বর অবদান বিষয়ে আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই অবহিত মনে করা বোধহয় ভুল হবে না। বর্তমান গ্রন্থে ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও রচনা যাতে জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই সহায়তা করতে পারে তার চেষ্টা করা হয়েছে।"

৬. *চক্ষুষা কাণঃ*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ (১৯৫৬)

বাক্/১০ চৌরঙ্গী/কলকাতা-৬ থেকে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : তিন টাকা।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ যামিনী রায়।

ভূমিকা চার পৃষ্ঠা। পৃ ১৪+১৬০

উৎসর্গ "স্বদেশের প্রতি একান্ত মমতা যাঁকে অভিমানভরে ত্রিশবৎসরাধিক কাল প্রবাসী করে রেখেছে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি কিছুকাল বাংলার অধ্যাপক ছিলেন, সাহিত্য বিষয়ে যাঁর গবেষণা বিদেশে বিদ্বজ্জনের প্রকৃত সমাদর পেয়েছে, সেই ঋজুচিত্ত স্নেহশীল, জ্ঞানব্রতী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের করকমলে।" চক্ষুষা কাণঃ বইতে পনেরোটি মৌলিক প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল দুটি অনুবাদ প্রবন্ধ—কার্ল-মার্ক্স-এর রচনার তর্জমা 'ধনিকের আবির্ভাব' ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্-এর প্রবন্ধের তর্জমা 'শিল্পে বস্তুনিষ্ঠা'।

মৌলিক রচনার সূচি

চক্ষুষা কাণঃ; স্বপ্ন থেকে বাস্তব; আধুনিক বাংলা কবিতা ; বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে ; আমাদের ইতিহাস; প্যারিস ১৯৪৪; প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ ; কয়েকটি সোভিয়েট বই ; 'ভারত আবিষ্কার' আন্তর্জাতিক ও বিশ্ববিরাজ ; 'বাঙালীর ইতিহাস' ফুটবল প্রসঙ্গে কেরলে কয়েকদিন; মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; 'সাহিত্যপত্র' ও স্বদেশজিজ্ঞাসা।

গ্রন্থটির অনুবাদ রচনা দুটি বাদে বাকি অংশ নির্বাচিত প্রবন্ধের, ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত (পৃ. ৭৯-২১২)। প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে পূর্বোক্ত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' রচনাটি আবু

সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র দ্বিতীয় ভূমিকা। আধুনিক বাংলা কবিতা বইটি প্রকাশ করেছিলেন 'কবিতা ভবন', ২০২ রাসবিহারী এভেনিউ, কলকাতা-২৯ থেকে বুদ্ধদেব বসু ১৩৪৬-এর শ্রাবণে। প্রচ্ছদ যামিনী রায়-কৃত। উৎসর্গ 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরণীয়েষু।' 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে' প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল নাভানা প্রকাশন সংস্থা থেকে 'বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা' বেরুবার (১৯৫৫) পর। লেখক বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে পরে আরও দু'বার অন্তত লিখেছেন।

অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, হীরেন্দ্রনাথের 'মার্কসবাদের অ আ ক খ' বইটির 'স্বপ্ন থেকে বাস্তব' রচনাটি 'চক্ষুষা কাণঃ' বইতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৭. *ভারতবর্ষের ইতিহাস*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১ম খণ্ড/১৯৫৮/২য় খণ্ড/১৯৫৮

অখণ্ড সংস্করণ/১৯৮৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ/৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার/কলকাতা-১২ থেকে মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত/

নবজীবন প্রেস/১৬৬ গ্রে স্ট্রিট/কলকাতা-৬ কালীচরণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত

২য় সংস্করণ/কলকাতা/১৯৮৬/পুনর্মুদ্রণ ১৯৯০

মূল্য ৩০ টাকা

পৃ. ৩৪+৬০২

'ভূমিকা'য় লেখক জানিয়েছেন

"প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখা হলেও এই ইতিহাস সাধারণ পাঠকেরও মনোরঞ্জন করতে পারবে আশা করছি।

মোটামুটি ১৫২৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস এখানে বিবৃত হয়েছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তী ধারা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা অবশ্য করা গিয়েছে, কিন্তু দেশের একান্ত আধুনিক বিবরণকে এখনও সাংবাদিকতার পরিচ্ছদ ছাড়িয়ে ইতিহাসের আকারে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

লেখকের 'আজীবন বন্ধু' অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাদর প্ররোচনায় বইটি লিখিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ সংস্করণ প্রকাশের সময় (১৯৮৬) হীরেন্দ্রনাথ বইটির এক নতুন 'মুখবন্ধ' লিখে দেন, যা তাঁর ইতিহাস দর্শন বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান।

৮. *অল্পে সুখ নেই*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১ জানুয়ারি/১৯৬৪

মিত্রালয়/১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে সত্যশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

রূপনন্দা প্রেস/১৩৮/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড/কলকাতা থেকে প্রাণগোপাল গোস্বামী কর্তৃক মুদ্রিত।

পৃ. ৬+১৩১

মূল্য চার টাকা

উৎসর্গ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর করকমলে।

৬ পৃষ্ঠার মুখবন্ধটি লেখক লিখে ফেলেন ১৯৬৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির সংসদ ভবনে বসে। 'মুখবন্ধ'-এর এক জায়গায় লেখক মন্তব্য করছেন

> "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'—আমাদের এই ঋষিবাক্য যদি কাল মার্কসের জানা থাকত তা হলে হয়তো একেই তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নীতিসূত্র মনে করতেন। মার্কসবাদকে নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় কথার কচকচি আর কাজের ক্ষেত্রে গণ্ডগোল এমন হয়েছিল যে উত্যক্ত হয়ে তিনি একবার বলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি নিজে মার্কসবাদী নই।" কিন্তু তাঁরই ন্যস্ত উত্তরাধিকার ব্যবহার করে লেনিন ইতিহাসে নবযুগের সৃষ্টি প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছিলেন—যে সমাজবাদ 'আকালস্থঃ নিরলম্ব বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ' অবস্থায় কবিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল তা যেন হল ইতিহাসের নব সব্যসাচী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে তার বিপুল উন্মেষ আমরা দেখতে পেয়েছি। একই সঙ্গে দেখেছি বহুবিধ প্রাপ্তি আর অপকর্ম আর বিড়ম্বনা, যা সমাজবাদের ভাতিকেও অনেকের চক্ষে মলিন করে থাকতে পারে। কিন্তু সমসাময়িক জগতে সমাজের নবরূপায়ণ আজ সম্ভাবনার ক্ষেত্র অতিক্রম করে বাস্তবে পরিণতির দিকে অগ্রসর যে হচ্ছে তা প্রশ্নাতীত। এখনো অবশ্য অন্ধকার বহুস্থলেই দূর হয়নি। এখনো অজস্র বাধা রয়েছে পথে।"

'অল্পে সুখ নেই' গ্রন্থ লেখকের মোট বারোটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার সূচি : ভারতের সংহতি; মহাবীর ও বুদ্ধ, মুসলমান শাসনকালের গুরুত্ব; যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব; সাহিত্যে শাসন; গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে; রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ; কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথ; সার্বভৌম কবি; ইন্দ্রপাত; ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল; অল্পে সুখ নেই।

'অল্পে সুখ নেই' রচনাটি 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় (১৩৭০) প্রথম বেরিয়েছিল। প্রাসঙ্গিক আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। এই বইতে হীরেন্দ্রনাথের তিনটি রবীন্দ্র-বিষয়ক লেখা স্থান পেয়েছে। যথাক্রমে 'কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথ' (প্রথম প্রকাশ প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যায়। পরে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সংসদ প্রকাশিত রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থেও মুদ্রিত). 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' (প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়', আশ্বিন, ১৩৬৮) এবং 'সার্বভৌম কবি' (প্রথম প্রকাশ গোপাল হালদার সম্পাদিত ও ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রকাশিত রবীন্দ্র শতবার্ষিক প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১) বইতে)। উত্তরকালে 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' নামে যে বই প্রকাশিত হয় (১৯৯৩)। তাতে হীরেন্দ্রনাথ কিন্তু 'সার্বভৌম কবি' রচনাটি অন্তর্ভুক্ত করেননি, যদিও রবীন্দ্র বিষয়ক ভিন্ন দুটি রচনা সেখানে আছে। অন্য প্রবন্ধ গ্রন্থেও যেমন রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধ আছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যাও কিছু কম নয়, যা নানা পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় কথা হলো, 'ভারতের সংহতি' ও 'অল্পে সুখ নেই' রচনা দুটি হীরেন্দ্রনাথের 'চরৈবেতি চরৈবেতি' (১৯৯২) প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যদিও 'ভারতের সংহতি'র নাম সেখানে 'ভারতবর্ষের সংহতি'।

৯. *মার্কসবাদ ও মুক্তমতি*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/আশ্বিন ১৩৭৯ (১৯৭২)

বাক্ সাহিত্য প্রা. লিমিটেড/৩৩ কলেজ রো/কলকাতা-৯ থেকে স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেস/৬ শিবু বিশ্বাস লেন/কলকাতা-৬ থেকে গোপাল ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ কানাই পাল

মূল্য ৮ টাকা। পৃ. ২৩২

উৎসর্গ "অধুনা বিস্মৃতপ্রায় হলেও এ যুগের চিন্তা ও কর্মে যাদের অবদান মহামূল্য। বাংলার প্রগতি প্রকাশে একদা যাঁরা ছিলেন প্রকৃত প্রাজ্ঞ পুরোধা, যাঁদের জীবন ও জনহিতে বিবিধ প্রযত্ন ছিল আত্মচিন্তার সংস্পর্শমুক্ত, সেই তিন বিচিত্র চরিত্রের বাঙালী মনস্বী

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।"

'নির্বাচিত প্রবন্ধ', ২য় খণ্ডে এই বইয়ের তেরোটি রচনা নেওয়া হয়েছে, যদিও মূল সংস্করণে ছিল মোট ১৯টি প্রবন্ধ, যা লেখক লিখেছিলেন ১৯৬৩ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 'রচনাগুলিও নানা বিষয়ের, সে দিকে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি 'মুখবন্ধ'-এ লেখেন

> "বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত আমার কতকগুলি প্রবন্ধ এখানে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে এগুলিকে প্রকাশ করা কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের পরিচয় সন্দেহ নেই। আমার নিজের এ-ব্যাপারে সংকোচ ও শঙ্কা ছিল। এখনও তা কাটেনি। কিন্তু কয়েকজন সুহৃদের আগ্রহে এই প্রকাশনে সম্মতি দিয়েছি। নিজের দায়িত্ব অপর কয়েকজন সহৃদয় সজ্জনের উপর চাপাবার উদ্দেশ্যে একথা বলছি না। এ ব্যাপারে দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আমার; তবে বলছি নিজের মনের দ্বিধা একেবারে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি বলে।
>
> বহু বিষয়ের উত্থাপন প্রবন্ধগুলিতে ঘটেছে। আশা করি পাঠক তার মধ্যে যোগসূত্রের সন্ধানে সহজে পাবেন। ভারতবর্ষের ভূমিতে একান্তভাবে প্রোথিত যার সত্তা, তার পক্ষে মার্কসবাদ কেমন করে 'সর্ব-কর্ম চিন্তা আনন্দ'-এর ভিত্তিস্থল হতে পারে, 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' মন্ত্রের সঠিকতম অন্ত্ররূপে উপলব্ধ হতে পারে, তারই সাক্ষ্য এখানে যদি মেলে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

১০. *তরী হতে তীর*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১৯৭৪

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড/৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে শ্রীদিলীপ বসু কর্তৃক প্রকাশিত বোধি প্রেস/৫ শঙ্কর ঘোষ লেন/কলকাতা-৬ থেকে সিদ্ধার্থ

মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

উৎসর্গ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিত্যস্মরণীয়েষু'

দাম কুড়ি টাকা

পৃ. ১৫৫। উৎসর্গপত্রে 'তদ্বীয় বস্তু, গোবিন্দ, তুভ্যমেব সমর্পয়ে' বাক্যটি উদ্ধৃত।

'ভূমিকা'য় লেখক জানিয়েছেন

> "এই রচনার পরিসমাপ্তি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। যে সুহৃজ্জনের নির্বন্ধাতিশয্যে এ ধরনের লেখায় হাত দিয়েছি, তাঁদের আগ্রহ ভারত ভূখণ্ডে স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা যেন লিখি। পারব কি না বলা সম্ভব নয়—সময় এবং সাধ্যে কুলোবে কিনা জানা নেই, আর আপাতত ভাবি। পাঠক সাধারণের মনে এই রচনার প্রতিক্রিয়া না জেনে কলম গুটিয়ে রাখব। একটানা এতগুলো পাতা লিখে যাওয়ার পর না হয় জিরোলাম।"

১১. *কালোত্তীর্ণ সম্পদ*

প্রথম প্রকাশ/ এপ্রিল/ ১৯৭৬

চলতি দুনিয়া প্রকাশনী/৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সমীক্ষা প্রেস/৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ছয় টাকা

প্রচ্ছদ অজয় গুপ্ত

পৃ. ভূমিকা+৯৯

ভারত-সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধুত্বের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন লেখক।

১২. *স্বদেশ জিজ্ঞাসা*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/এপ্রিল, ১৯৭৬

জয়দীপ পাবলিকেশনস্/২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ এর পক্ষে দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্/২৬ বিধান সরণি/কলকাতা-৬ থেকে নিশিকান্ত হাটই কর্তৃক মুদ্রিত

মূল্য দশ টাকা।

এই বইটি নামে নতুন বই হলেও বস্তুত এটি লেখকের 'চক্ষুষা কাণঃ' গ্রন্থেরই পরিবর্ধিত সংস্করণ। চক্ষুষা কাণঃ (১৯৫৬) গ্রন্থে সঙ্কলিত কোনও প্রবন্ধই এই গ্রন্থে বর্জিত হয়নি। বরং যুক্ত করা হয়েছে বারোটি নতুন রচনা এবং একটি অনুবাদ প্রবন্ধ।

হীরেন্দ্রনাথ 'ভূমিকা'য় লিখেছেন

> "বেশ কিছুকাল আগে 'চক্ষুষা কাণঃ' নাম আমার যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ হয়েছিল, তা বহু দিন দুষ্প্রাপ্য বলে পুনর্মুদ্রণের কথা কেউ কেউ ভেবেছিলেন, প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ বিভিন্ন সাময়িকী থেকে সংগৃহীত বলে হয়তো বর্তমানে অচল মনে করে

সংকোচ বোধ করলেও আমার প্রাক্তন ছাত্র,অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহতিশয্যে বই আবার বার করতে রাজী হয়েছি। নতুন করে ছাপবার অজুহাতকে মজবুত করবার জন্য অন্য কয়েকটি লেখাও খুঁজে পেতে অনিলবাবু জুড়ে দিয়েছেন। প্রতিটি রচনার তারিখও দেখানো হয়েছে, হাতে কালানুক্রমিকতা শুধু নয়, সমসাময়িক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্তিরও একটা সামঞ্জস্য থাকে। ভূমিকা লিখছি সন্তর্পণে, কারণ নিজে এই প্রকাশনের তত্ত্বাবধান করতে পারিনি, সে ভার অনিলবাবুই নিজগুণে তুলে নিয়েছিলেন। বস্তুত এই বই প্রকাশিত হচ্ছে অনিলবাবুরই তাগিদে—যদিও অবশ্য রচনার গুণাগুণের জন্ম পাঠকদের কাছ থেকে দায়িত্ব এককভাবে আমার।"

আরও বলা দরকার 'চক্ষুষা কাণঃ' বইতে যে উৎসর্গপত্র ছিল, তাতেও কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ প্রসঙ্গে লেখক 'ভূমিকা'য় জানিয়েছেন

"চক্ষুষা কাণঃ যাকে উৎসর্গ করেছিলাম, তিনি আর নেই। সম্পূর্ণ একক অবহেলিত অবস্থায় প্রবাসে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। বলা যেতে পারে প্রায় ইচ্ছামৃত্যু—দেশ মায়ের ওপর অভিমান করে যেন দেশের বাইরে জীবনাবসানই ছিল তাঁর কাম্য। উৎসর্গ যে ভাষাতে করেছিলাম, তার কোন অদলবদল করলাম না। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করি না—সুতরাং জানি এতে তাঁর কোনো সান্ত্বনা নেই। তবে আমার মতো ব্যক্তি হয়তো এ থেকে একটু সান্ত্বনা পাব।"

'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' বইতে যে চারটি প্রবন্ধ নতুন যুক্ত হয়েছে সেগুলি হলো : 'মহামতি লেনিন', 'এঙ্গেলস্ স্মরণে', 'ভারত চেতনা, সমাজবাদ ও মানবিকতা' এবং 'সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু'। তাছাড়া অনূদিত রচনা 'ভারতে ইংরাজ শাসন' সংযোজিত। বাকি সব রচনার জন্ম পূর্বোক্ত 'চক্ষুষা কাণঃ' বিষয়ে তথ্য দ্রষ্টব্য।

'চক্ষুষা কাণঃ' নির্বাচিত প্রবন্ধ। প্রথম খণ্ডে এবং 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা'র মাত্র দুটি নির্বাচিত গ্রন্থ : দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত (পৃ. ১১৭-১২৮) 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' বইটির এক সমালোচনা বেরিয়েছিল 'ইতিহাস ও আত্মজিজ্ঞাসা' নামে আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ (১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৬)।

১৩. *বিপ্লবের পরাজয় নেই*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১৯৯০

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড/১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে তিমিরকুমার মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা প্রতাপ সিংহ

দাম ২২ টাকা

পৃ. ৭৯+১৪

বিপ্লবের পরাজয় নেই গ্রন্থে মোট নটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সেগুলির সূচি এরকম :

ইনকিলাব জিন্দাবাদ; মার্কসচিন্তা, গান্ধীজি, ভারতবর্ষ; ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী; সোভিয়েট নব-প্রবোধন-প্রয়াস প্রসঙ্গে; বিপ্লবে সংকটে নয়, চাই সন্ধান,শুদ্ধি সংকল্প;

সংকটেরই কল্পনাতে হ'য়ো না ম্রিয়মান; পেরেস্ত্রৈকার পাঁচ বছর ; নয়া জার্মানী আর দুনিয়ার দুশ্চিন্তা; বিপ্লবের পরাজয় নেই।

প্রবন্ধগুলি নানা পত্রপত্রিকায় আগে প্রকাশিত।

সূচিপত্রের আগে বিষ্ণু দে অনূদিত দুটি কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। একটি 'উত্তর পুরুষকে' বের্টোলট ব্রেখট্-এর রচনার অনুবাদ। অন্যটি 'লেনিনের কবর', ল্যাংস্টন হিউজ-এর বিখ্যাত কবিতার বিষ্ণু দে-কৃত তর্জমা। এই বইয়ের যে 'ভূমিকা' লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। এই বইটির এক দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন বাসব দাশগুপ্ত (দ্র. 'বিপ্লবের পরাজয় নেই', কোরক সাহিত্য পত্রিকা। হীরেন মুখোপাধ্যায়-সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৮-১৩৯)

১৪. *গণনাট্য হিন্দু-মুসলমান সমাজবাদ*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১ মে ১৯৯১

বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন/১৩/১ ক্রীক লেন/কলকাতা-৭০০০১৪-এর পক্ষে সুভাষ নাহারায় কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস/৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি/কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ বাবুল দে

মূল্য পনেরো টাকা

পুস্তিকাটি বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ৪৫ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রকাশিত।

মুখবন্ধ, গণনাট্য কর্মীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ, 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়', ভারতচেতনা সমাজবাদ মানবিকতা এবং সমাজতন্ত্রের জয় অনিবার্য—এই পাঁচটি রচনা পুস্তিকায় আছে। 'মুখবন্ধ'টি হীরেন্দ্রনাথের রচনা (তাং ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১)। গণনাট্য কর্মীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯-এ ১৩/১ ক্রীক লেনের দোতলার হল ঘরে গণনাট্য কর্মীদের সামনে বক্তব্য। ক্যাসেটে-ধৃত। ঈষৎ-সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশিত। ক্যাসেট থেকে অনুলিখন কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হিন্দু মুসলমান কী জয়' 'চতুরঙ্গ', জুন ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত, 'ভারতচেতনা সমাজবাদ মানবিকতা' প্রথম বেরিয়েছিল 'অমৃত' ১৩৭৭ শারদীয়া সংখ্যায় এবং 'সমাজতন্ত্রের জয় অনিবার্য' লেখাটি ইন্ডিয়ান স্কুল অফ সোশাল সায়েন্স কর্তৃক ২৭-২৯ এপ্রিল। রাজ্য যুবকেন্দ্রে (মৌলালি, কলকাতা) 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং ভারতের সাম্প্রতিক সমস্যা' শীর্ষক এক সেমিনারে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত অনুলিখন রতন ভট্টাচার্য।

১৫. *চরৈবেতি চরৈবেতি*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/সেপ্টেম্বর ১৯৯১

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড/১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-৭৩ শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত দি নিউ মণ্ডল প্রিন্টার্স/৪/১ বিডন রো/কলকাতা-৬ থেকে মমতা মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত

প্রচ্ছদ তরুণ বসু

মূল্য পঁচিশ টাকা

পৃ. ১৫৬

মোট ১৩টি প্রবন্ধ এই বইতে সংকলিত। সেগুলির সূচি

ভূমিকা ; চরৈবেতি, চরৈবেতি; কার্ল মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব ; কার্ল মার্কস : ভারতচিন্তা ও ভবিষ্যৎ; ধর্ম ও সমাজবিপ্লব; প্রগতিলেখক সংঘ; স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ; দেশাভিমানী রামমোহন; স্বাধীনতার স্বাদ, সাম্প্রদায়িকতার শান্তি, সংহতির সন্ধান; সংস্কৃতের ভূমিকা বিষয়ে; সাহিত্য, সমাজদায়িত্ব, রুশদির দুর্মতি; কোলকাতা : কিছু ভাবনা; অল্পে সুখ নেই; ভারতবর্ষের সংহতি।

উল্লেখ এই যে 'ভারতে সংহতি' এবং 'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ দুটি হীরেন্দ্রনাথের ''অল্পে সুখ নেই'' (১৯৬৪) প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উৎসর্গ 'কবি-সুহৃৎ বিষ্ণু দে স্মরণে বাংলাদেশের প্রখ্যাত মনীষী সাহিত্য ও সমাজ সত্য সন্ধানে সদা সন্নিবিষ্ট আহমদ শরীফ-এর করকমলে এই রচনাগুচ্ছ সাদরে সমর্পিত হল।' ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন

> বেশ কিছু পুরোনো রচনা সমেত কতকগুলো লেখা একত্র করে এই গ্রন্থাকারে প্রকাশে সম্মতি দিয়েছি কুণ্ঠা নিয়ে।...
>
> আশা করব পাঠক এই প্রবন্ধ সমাবেশে পৌনঃপুনিকতার অপরাধ ক্ষমা করবেন। 'কানু ছাড়া গীত নাই''—তেমনই আমার বলায় এবং লেখায় দেখা যাবে কি-ভাবে আমার সর্বচিন্তা ও কর্মে মার্কসতত্ত্বের অমোঘ প্রভাব অকাট্যরূপে ধরা পড়ব। না হয় একটু মৃদু গর্ব করেই বলি যে দেশাভিমান এবং তারই পরিপূরকরূপে 'ধনতন্ত্রের লজ্জা, বীভৎসা আর অমানুষিকতা'কে (মার্কস্-এরই ব্যবহৃত শব্দগুলি) ধিক্কার ও বিদূরণ-প্রয়াস আমার নিয়ত অন্বিষ্ঠ। বাধাবিপত্তি যতই আসুক, মানব অভ্যুদয়ের জয় হবেই। ব্যর্থতার যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে আমাদের দেশ এবং সর্ববিশ্ব।

'কোরক' সাহিত্য পত্রিকার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় সংখ্যায় 'আমি থাকি বা না থাকি' শিরোনামে এই বইটির সমালোচনা করেছেন (আর একটি বই 'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর' সহ) সৌমিত্র লাহিড়ী। 'বিপ্লবের পরাজয় নেই'-এর ৮টি প্রবন্ধ নির্বাচিত প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৬. *সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১৯৯৩

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড/১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট/কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রচ্ছদ প্রতাপ সিংহ

মূল্য পঞ্চাশ টাকা

পৃ. ১১৮+৮ (রয়াল সাইজ)

এই বইতে মোট ১৭টি প্রবন্ধ সংকলিত। যার মধ্যে কিছু আগেকার বইগুলি থেকে নেওয়া। সূচিপত্র এরকম

রবীন্দ্রনাথ : মার্কসবাদী দৃষ্টিতে; রবীন্দ্রমানসে কালচেতনা ও সমুত্তরণ মহিমা; বাংলা আকাদেমির কাছে প্রত্যাশা ও প্রস্তাব; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে; ধর্ম ও মার্কস চিন্তা প্রসঙ্গে; আধুনিক বাংলা কবিতা; গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে; প্রগতি সাহিত্য শিবির ম্লান কুণ্ঠিত স্তিমিত কেন?; জয় হোক, আমাদের ইতিহাস; ভারত চেতনা সমাজবাদ ও মানবিকতা; বিপ্লব আবেগ ও প্রজ্ঞা; সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ; সত্যজিৎ স্মরণে

উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সমরেশ বসু
তিন কীর্তিধন্যের সদাশয়
সৌহার্দ্য স্মরণে

উল্লেখ্য যে বর্তমান গ্রন্থের 'সার্বভৌম কবি' রচনাটি লেখকের 'অল্পে সুখ নেই' (১৯৬৪), 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ' রচনাটি একই গ্রন্থের, 'আধুনিক বাংলা কবিতা' রচনাটি 'চক্ষুষা কাণঃ' গ্রন্থের (১৯৫৬), 'গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে' রচনাটি 'অল্পে সুখ নেই'-এর 'আমাদের ইতিহাস' রচনাটি 'চক্ষুষা কাণঃ' বইতে আগেই ছাপা হয়েছিল। আবার আমরা দেখিয়েছি যে চক্ষুষা কাণঃ বইটির পরিবর্তিত রূপ 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' বইটি। আরও বলা দরকার যে, বর্তমান বইতে 'বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' রচনাটি 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে' নামে (প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়' পৌষ ১৩৬২ সংখ্যায়) 'চক্ষুষা কাণঃ' বইতে সংকলিত হয়েছিল।

'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' থেকে ছ'টি রচনা প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৩-৩৪৪ গ্রহণ করা হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভাবনার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন শঙ্খ ঘোষ, তাঁর 'সময়ের জলছবি' বইতে, 'মুক্ত আবেগ' রচনায়। সুতরাং 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' হীরেন্দ্রনাথ অন্তত তিন দশক (পঞ্চাশের মাঝামাঝি থেকে নব্বই-এর গোড়ার দিক) ব্যাপী ভাবনা চিন্তার ফসল বলা যেতে পারে।

'ভূমিকা'য় হীরেন্দ্রনাথও স্পষ্ট করে লিখেছেন

পঞ্চাশাধিক বর্ষের ব্যবধানে এবং বিবিধ বিষয়ে ও উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধ সংকলিত হলেও কিছু পরিমাণে কালিক অপ্রাসঙ্গিকতা আর পুনরুক্তির সম্ভাবনা এড়ানো চলে না। এজন্য হয়তো পাঠকদের মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তি দেখা দেবে জেনেই অগ্রিম মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে অন্তত অজুহাত হিসাবে নিবেদন করব—ছোটমুখে বড়ো কথা শোনানো হচ্ছে জেনেও বলব—যে আমার দেশাভিমানী ভারতবর্ষীয় মানসে মার্কসীয় বিশ্ববোধকে সুসমঞ্জসরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে লিপ্ত থেকে যে প্রত্যয় আমাদের মতো অভাজনকেও 'শুধু দিন যাপনের গ্লানি' থেকে অন্তত কিঞ্চিৎ অব্যাহতি দিতে পেরেছে ভাবতে পারা আমার একমাত্র অহংকার। সেই প্রত্যয়ের

পরিচয় অল্পার্থ হলেও এ রচনাপুঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। অনেকেই তো দেখি অধুনা সে প্রত্যয়কে প্রত্যাখ্যান করেছেন অল্পাধিক পরিণামে কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এমনও হতে পারে আমি ভ্রান্ত, আর আঁকড়ে রয়েছি একটা 'গোঁড়ামি'-কে কিন্তু তা আমি অন্তত মানি না।

১৭. *'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা.রাখো ডর?'*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/৩ মে ১৯৯৪

উত্থক প্রকাশনী/৪০ মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড/কলকাতা-৬০ থেকে তপতী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন/কলকাতা-৬ থেকে শ্যামলকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত

প্রচ্ছদ তপন কর

মূল্য চল্লিশ টাকা

পৃ. ভূমিকা+১৬১

পরিবেশক চ্যাটার্জী পালবিশার্স/১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট/কলকাতা-৬

উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' (১৯৪০)-এর অন্তর্গত 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতার অংশ রয়েছে। অতঃপর

শিল্প প্রতিভা ও হৃদয়বত্তায়
প্রোজ্জ্বল অনুজ ত্রয়
সোমনাথ হোর
সিদ্ধেশ্বর সেন
মহাশ্বেতা দেবীর
করকমলে অর্পিত হল

এই বইতে পনেরোটি রচনা সংকলিত। সম্পূর্ণ সূচি এরকম

'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর', স্বদেশিকতা ও কমুনিজম; 'নাই নাই ভয়' 'কিউবার অমৃতমন্ত্র; 'ভারতছাড়ো আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর'; 'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে'; 'ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায় তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়'; পূর্ব জগৎকে জাগাতেই হবে; মস্কো নভেম্বর ১৯৮৭; আফগানিস্তান, সোভিয়েট এশিয়া; নববর্ষ নবশতাব্দী; 'সভ্যতার সংকট' ও জগতের যন্ত্রণা; পাশ্চাত্যের অধঃপাত আর গণতন্ত্রে ভাঁওতা; মার্কস মার্কসবাদ এবং আমরা; স্ট্যালিন, ধর্ম, মার্কসবাদ; নভেম্বর বিপ্লব 'মনুষ্যত্বের পরাভব নেই'।

'ভূমিকা' লিখতে গিয়ে (৬ এপ্রিল ১৯৯৪) হীরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন "বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনে কুণ্ঠা সংবরণ করে এই বইটি ছাপতে দিতে সম্মত হয়েছি। এর দোষগুণের দায়িত্ব অবশ্যই আমার'।

রচনাগুলি নন্দন, পাক্ষিক বসুমতী, শারদীয়া পরিচয়, শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত।

১৮. *পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/১৯৯৭

আজকাল পাবলিশার্স-এর পক্ষে/প্রতাপকুমার রায় কর্তৃক/৯৬ রাজা রামমোহন রায় সরণি/কলকাতা-৭০০০০৯/থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রক ইউনিক কালার প্রিন্টার্স/কলকাতা-৭০০০০৯

মূল্য ২৫

বইটি 'তরী হতে তীর' (১৯৭৪) বইয়ের অংশবিশেষ নিয়ে পুনর্মুদ্রণ বলা যেতে পারে।

১৯. *যুগের যন্ত্রণা প্রত্যয়ের সংকট*

(স্বদেশ স্বকাল সাহিত্য সমাজ বিষয়ক একগুচ্ছ নিবন্ধ)

প্রথম প্রকাশক/কলকাতা/২০ মে ১৯৯৯

প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি/১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড/ কলকাতা-৭০০২০

মুদ্রক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড/১০/বি ক্রীক লেন/ কলকাতা-১৪

প্রচ্ছদ প্রণবেশ মাইতি

দাম ৭০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 'নিবেদন' লিখেছেন। এছাড়া হীরেন্দ্রনাথের মুখবন্ধ ও সূচি ছাড়াও পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬০

উৎসর্গপত্র

স্মরণ

ভারতবর্ষের দুই পুরুষোত্তম

'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

মহাত্মা গান্ধি

'নিত্বীনাম্ ত্বা নিধিতমং হবামহে'

'মুখবন্ধ' লিখতে গিয়ে (এর তারিখ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ অর্থাৎ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ষষ্ঠ দিবসে) হীরেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন

> "বাংলা আকাদেমির মতো সর্ব অর্থে সম্ভ্রান্ত ও সমাদরণীয় সংস্থার পক্ষ থেকে আমার এই প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে। এ হল আমার পক্ষ থেকে এক অপ্রত্যাশিত ও অনুপ্রাণিত সম্মান। ...ভারতবর্ষের খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে পঞ্চাশ বর্ষ পার হওয়ার উপলক্ষে উৎসবাদির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে যে জওয়াহরলাল নেহরু-কথিত 'the glow of freedom' ('মুক্তির দীপ্তি') দেশবাসীর অন্তরে জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়েছে, আন্তর্জাতিক পরিসরে সমাজবাদ সাম্যবাদ নানা পরিস্থিতির চাপে রাহুগ্রস্ত

হওয়ার ফলে দুনিয়া জুড়ে সাধারণ মানুষের মনে নৈরাশ্য এসেছে, জগতের ইতিহাস বুঝি এই বিংশ শতাব্দপূর্তি কালে কতদূর আর কতদিনের জন্য পিছিয়ে নিয়েছে, তা কারও জানা নেই। এমন পরিস্থিতিতে প্রায় অনিবার্যভাবে এসেছে প্রত্যয়ের সংকট, এসেছে দিকভ্রান্তি, এসেছে শুভ কর্মপথে নির্ভয় অগ্রগতিতে বাধাবিঘ্নের কণ্টকরাশি। স্বভাবতই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ আহ্বান; মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোর মতো মহাপাপ যেন আমরা না করি। 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'।"

চারটি ভাগে বিন্যস্ত ক'রে মোট ২২টি প্রবন্ধ এই বইতে সংকলিত। সূচি এরকম

প্রথমপর্বে—'কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম,' 'রবীন্দ্রমানসে কালচেতনা ও সমুত্তরণমহিমা, 'রবীন্দ্রনাথ : রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা'; 'সভ্যতার সংকট ও জগতের যন্ত্রণা'; 'আগে এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র'; 'সাংবাদিকতা, সাহিত্য, স্বদেশমুক্তি'; 'পদ্মানদীর মাঝি' সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে'; 'বাংলা আকাদেমির কাছে প্রত্যাশা।'

দ্বিতীয় পর্বে—'প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে'; 'মানুষ আমরা নহি তো মেঘ'; 'পরাধীনতার অভিশাপ মোচন এখনও হয়নি', 'ইতিহাস এক নিষ্ঠুর দেবতা'; 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়'; 'স্বাধীন ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা'।

তৃতীয় পর্বে—'কমিউনিস্ট ইস্তাহার; মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি; 'ইতিহাসের মহাকাব্য'; 'আফ্রিকা' মুক্তিপথে কাঁটা—আশা ও আকাঙ্ক্ষা'; 'দুনিয়ার দখল নেবে দলিতের দল'।

চতুর্থ পর্বে—'সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান', 'রাধারমণ মিত্র বিস্মৃত অসমান্য মানুষ'; 'আম্বেদকর স্মরণে'; 'আবুল হালিম স্মরণে'।

এর মধ্যে 'রবীন্দ্রমানসে কালচেতনা ও সমুত্তরণ মহিমা' এবং বাংলা আকাদেমির কাছে প্রত্যাশা ও প্রস্তাব' নামে 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' বইতে (১৯৯৩) স্থান পেয়েছিল।

২০. *'আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে'*

প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩

অনুষ্টুপ প্রকাশনী/২ ই নবীন কুণ্ডু লেন/কলকাতা-৯ থেকে অনিল আচার্য কর্তৃক প্রকাশিত

এম ডি গ্রাফিকো/১০/৪ মি মনোহরপুকুর রোড/কলকাতা-৭০০০২৬ থেকে বর্ণবিন্যাস এবং দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রা. লিমিটেড/৭৬ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট/কলকাতা থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

মূল্য ৭০ টাকা

উৎসর্গ 'আমার ছেলে অভিজিৎ-কে'

'যে হয়তো আমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝবে যে আমার অতিদীর্ঘ জীবনব্যাপী বহুবিধ অথচ মূলগতভাবে একনিষ্ঠ ও প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন কর্মব্যাপৃতির আপাত বিচারে সর্বতোব্যর্থতা ছাপিয়ে রয়েছে যুগপৎ বেদনা আর বৈভব, গ্লানিবোধ আর গরিমা, যা নিশ্চিত করেছে জগৎজোড়া কমিউনিস্ট প্রত্যয় যে বিপ্লবের পরাজয় নেই। এই গ্রন্থের কবি-কথিত শিরোনামা শুধু কল্পনা বিলাস নয়।'

প্রসঙ্গত বলা দরকার হীরেন্দ্রনাথ গ্রন্থের শিরোনাম ব্যবহার করেছেন কবি সমর সেনের কবিতার লাইন। গ্রন্থের মধ্যে বারোটি রচনা অন্তর্ভুক্ত। সেগুলির সূচি

'মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি'; 'জগৎ জুড়ে লাল ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে'; 'গণতন্ত্রের সার্থক পরিণতি সাম্যবাদে', 'সাম্যবাদ : স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'; 'সহস্রাব্দ পূর্তি সাম্যবাদ ও ভবিষ্যৎ' 'ভিড় করে আসা কিছু স্মৃতি; 'ভাবনা : দুর্ভাবনা', 'একুশের ভাবনা'; 'চিত্তপ্রসাদ স্মরণে'; '২২শে শ্রাবণ, ১৪০৮'; 'বঙ্কিম গরিমার উত্তরাধিকার'; 'কেন লিখি'।

এর মধ্যে মার্চ, ১৯৯৮-তে লেখা, মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি রচনাটি 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি' নামে পূর্বোল্লিখিত 'যুগের যন্ত্রণা প্রত্যয়ের সংকট' (১৯৯৯) বইতে সংকলিত হয়েছিল। এই বইতে কমিউনিস্ট ইস্তাহার কথাটি শিরোনামে বাদ গেছে।

'আকাশগঙ্গা ও আমাদের পৃথিবী' শিরোনামে 'প্রকাশকের নিবেদন' লিখেছেন অনিল আচার্য। 'ভূমিকা'য় হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন "সম্প্রতি নজর করলাম আমার এক কীর্তিমান লেখক বন্ধু 'ভূমিকা' বা 'মুখবন্ধ' (বা একটু স্মিতহাস্যসহ 'গৌরচন্দ্রিকা') না লিখে 'আত্মপক্ষ' শিরোনামা দিয়েছেন। তাঁর শব্দবোধের একজন গুণগ্রাহী হয়েও কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভেবে দেখি ঠিকই করেছেন। পাঠকদের সামনে কিছু পরিমাণে আসামীর মতোই বিচারের কাঠগঁড়ায় লেখককে থাকতে হয়। যা লিখি তাই হল জবাবদিহি। নিজের কাছে, আর বই ছেপে বের হচ্ছে বলে পাঠক সাধারণের কাছে। সমাজের কাছে।"

(খ) ইংরেজি বই

1. *An Introduction to Socialism*
   Calcutta, N.B.A, 1938, Unfortunately this book could not traced and checked.
2. *China Calling*
   Anti-Fascist Peoples Union, 249 Bowbazar Street, Published by Satyabrata Chatterjee, Calcutta, 1942, pp 88. 12 Annas.
3. *Under Marx's Banner*
   Purabi Publishers, Calcutta, 1944, Rs. 3/- 12 Essays. Published by Girin Chakraborty.
4. *India Struggles For Freedom*
   1st edn, Kutub Mahal, Bombay, 1946. 2nd Edn, entitled *India's Struggle for Freedom*, National Book Agency, Calcutta, 1948; 3rd edn, 1962 Rs. 5/-
5. *Gandhiji A Study*
   National Book Agency 12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta, 1958, pp 215, Rs. 5.50. 2nd rev edn, 1960; 3rd rev. ed, pp 225, Rs. 30\ 4th rev. ed, 1991, Rs. 120/-

6. *Himself a True Poem A Study of Rabindranath Tagore*
   Peoples' Pubslishing House, New Delhi, 1961. 11 Chapters, Rs. 11.50
7. *India and Parliament*
   Peoples Publishing House, New Delhi, 1962 10 Chapters, pp 160.
8. *The Gentle Colossus A Study of Jawaharlal Nehru*
   Published by Tarun Sengupta on behalf of Manisha Granthalaya, Calcutta, 1964 and Printed by P. C. Roy at Sri Gouranga Press. A Paperback edition is published by Jaico, Bombay 1969, Rs. 4.
9. *Remembering Marx*
   Communist Party of India Publication, New Delhi, 1962, Rs. 2/ - from 4/7 Asaf Ali Road, New Delhi. Dedicated to Gangadhar Adhikari.
10. *Time-Tested Treasure Recollections and Reflections on Indo-Soviet Friendship* Allied Publishers, Bombay etc. 1975 pp 63, Rs. 20/-
11. *Bulgaria A Popular Histroy*
    Peoples Publishing House, New Delhi, 1975, pp 122, Rs. 15/-
12. *Bow of Burning Gold A Study of Subhas Chandra Bose*
    Peoples Publishing House, New Delhi, 1977, Reprinted 1993, Rs. 30/-
13. *Potrait of Parliament Reflection and Recollection,* 1952-1977 Vikas Publishing House, New Delhi, 1978, pp 158+index Rs. 35/-; 2nd edn, Basumati Corporation, Calcutta, 1992, including a new 'Foreward'+new chapters. Rs. 65.
14. *Hungary Past and Present*
    Sterling Publishers, New Delhi, 1980, pp 154, Rs. 40/-
15. *Recalling India's Struggle For Freedom*
    Seema Publications, Delhi, 1982 Preface+20 Chapters, Rs. 125/-
16. *Sixty Years of the USSR*
    Soviet Land Bookleets, Information Deptt of the Soviet Embassy, New Delhi, 1982, pp 73, 6 Chapters, Rs. 1/-
17. *The Great Tibetologist Alexander Csome De Koras Hermit Hero From Hungary.*
    Sterling Publishers, Delhi, 1984. Rs. 50/-
18. *Under Communism's Crimson Colours Reflections on Marx-*

ism, India and the World Scene
Peoples Publishing House, New Delhi, 1982, pp 329, Rs. 65/ - (32 Essays).

19. *Dimitrov Titan of Our Time*
Vision Books, New Delhi, pp. 140, Rs. 60/-
20. *In Dimitrov's Footsteps*
Vision Books, New Delhi, 1983. Preface+14 Chapters, pp 135, Rs. 60/-
21. *Marx, Great October, India and the Future*
Allied Publishers, New Delhi, 1984 pp 146, Rs. 35/-
22. *Epic Victory, 1941-45 The Soviet Triumph over Fascism*
Allied Publishers, New Delhi, 1985, pp 106, Rs. 35/-
23. *Was Inida's Partition Unavoidable?*
Manisha Granthalaya, Calcutta, 1987, pp 84. Rs. 18/-. The book came out of lectures at Osmania University, Hyderabad. 7 Essays.
24. *Credo Some Communist Affirmations*
Basumati Corporation, Calcutta, 1993, pp 198. Rs. 65/-
25. *India's Ordeal*
Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd, Calcutta, 2001. Rs. 200/-

N.B Apart from the above-mentioned English Books, the readers should also take note of the book, which I had inadvertently missed out. *The Stalin Legacy. Ivory Flawed but Ivory Still.*

(গ) ইংরেজি পুস্তিকা

1. *The Communal Problem and Freedom Strugle,* 1919-47
Osmania University, Hyderabad, 1973. Grew out of Moulana Abul Kalam Azad Memorial Lectures, given in August, 1973. Price not Stated.
2. *The Indian 'Renaissance' and Rammmohan Roy*
University of Poona, Pune-7 1985. Grew out of A Series of Lectures in Late P.K. Shivalkar Memorial Lectures, pp. 44. Rs. 3.75
3. *Csoma de Koras A Dedicated life*
Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi, 1981. pp 32. Price not stated.

4. *Vivekananda and Indian Freedom*
   The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Calcutta, 1986, pp 40. Rs. 4/-
5. *Communists in Parliament*
   With A.K.Gopalan as co-author. A. CPI publication, New Delhi, 1957.
6. *Socialist Democarcy*
   Navyug Publishers, Delhi, year not mentioned, Rs. 4/-
7. *Proletarian Internationalism*
   A CPI Pubilication, New Delhi, 1978
8. *FSU Beginnigs*
   ISCUS (Indo–Soviet Cultural Society), New Dehil, 1981
9. *Our Freedom Struggle and the Communist Party Some Reflections and Observations.*
   A CPI Publication, New Delhi, 1984, pp 56, Rs. 2/-
10. *The Legacy We Cherish! 60 years of CPI*
    A CPI Publication, New Delhi 1985, pp 38, Rs. 1/-
11. *Seventy Soviet Years A Salute to Great October*
    A CPI Publication, New Delhi, 1987, pp 47, Rs. 2/-
12. *FSU to ISCUS ; Forty years of Indo-Soviet Friendship*
    ISCUS National Council, New Delhi, 1981, Rs. 3/-
13. *Rabindranath Tagore*
    Three Lecutres at Marathwada University, Aurangabad, 1976, Rs. 3/-. Published by the same University of Maharashtra.
14. *Gandhi, Ambedkar and the Extinction of Untouchability*
    Peoples Publishing, New Delhi, 1982, Rs. 8/- Originally given as lectures by the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, pp 55.
15. *Three Decades of Indo-Soviet Amity*
    Navyug Publishers, Delhi, Rs. 1/- Year of publication not mentioned.
16. *From Amir Khusrau to Abul Kalam Azad*
    The Commingling of Cultures in India. The Asiatic Society, Calcutta, 1999, pp 26, Rs. 25/-
17. *Management of Power The Indian Ethos*
    Indian Institute of Management, Calcutta, 1999. Originally given as Sri Aurobindo Memorial Oration, 7 August. 1998.

N. B. There may be, I am sure, some more pamphlets which I have possibly left out I may recall one entitled *Who Fonght For India's Freedom* which is not available to me just now. Moreover, this list of Pamphlets are not arranged chronologically.

(ঘ) বাংলা পুস্তিকা

১. *সর্বহারার শ্রেষ্ঠ নেতা লেনিন*
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৪১

২. *স্বাধীনতার শত্রু জাপান*
কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৪৩

৩. *বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন স্মরণে*
বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা, কলকাতা, ১৯৯২

(ঙ) রচনা সংগ্রহ

১. *নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড*
প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫ (১৯৯৮)
সম্পাদনা প্রণব বিশ্বাস
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি/১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট/কলকাতা-৭৩ থেকে সবিতেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং এস সি অফসেট ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন/কলকাতা-৮৫ থেকে মুদ্রিত
প্রচ্ছদ প্রবীর সেন
মূল্য ১১০ টাকা
লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, মুখবন্ধ, নিবেদন ছাড়া এই খণ্ডে আছে ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ, হিন্দু ও মুসলিম, মার্কসবাদের অ আ ক খ, চক্ষুষা কাণঃ, অল্পে সুখ নেই। গ্রন্থ পরিচয় ও প্রসঙ্গকথা সম্পাদক-কৃত।

২. *নির্বাচিত প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড*
প্রথম প্রকাশ/কলকাতা/মাঘ ১৪০৫ (১৯৯৯)
সম্পাদনা প্রণব বিশ্বাস
মিত্র ও ঘোষ/কলকাতা/কর্তৃক প্রকাশিত ও চয়নিকা প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত
প্রচ্ছদ প্রবীর সেন
মূল ১২৫ টাকা
নিবেদন, মুখবন্ধ ছাড়া রয়েছে মার্কসবাদ ও মুক্তমতি, স্বদেশ জিজ্ঞাসা, বিপ্লবের পরাজয় নেই, চরৈবেতি চরৈবেতি, সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ।

(চ) সম্পাদনা (বাংলা)

১. *প্রগতি*
(সহযোগী সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী)
প্রগতি লেখক সংঘের পক্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৪৪ (১৯৩৭)
উৎসর্গ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরণীয়েষু'
২য় সংস্করণ, উত্থক প্রকাশনী, ৪০ মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড/কলকাতা-৬০/১৯৯১
প্রচ্ছদ সজল রায়/৫০টাকা/পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা।

২. *আধুনিক বাংলা কবিতা*
(সহযোগী সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব)
প্রথম সংস্করণ/কলকাতা/১৯৪০
২য় সংস্করণ/দে'জ পাবলিশিং/কলকাতা/জানুয়ারি, ১৯৯৯
প্রচ্ছদ অজয় গুপ্ত/প্রচ্ছদ যামিনী রায়/১০০ টাকা

৩. *সোভিয়েট দেশ*
(সহযোগী সম্পাদক গোপাল হালদার)
সোভিয়েট সুহৃদ সংঘ, কলকাতা, ১৯৪১

৪. *জাতীয় সঙ্গীত*
ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ, কোলকাতা, ১৯৪৪

(ছ) সম্পাদনা (ইংরেজি)

1. *The Land of Soviets*
(Co-editor Snehanghsu Kanta Acharya)
Friends of Soviet Union, Calcutta, 1941
2. *US A People's History*
Anti-Fascist Writers and Artists, Calcutta, 1943.
3. *Indo-Soviet Souvenir*
Friends of Soveit Union, Calcutta, 1944

(জ) অনুবাদ (বাংলা/ইংরেজি)

1. Six Poems of Rabindranath Tagore
in *One Hundred & One Poem of Tagore,* edited by Humayun Kabir, New Delhi, 1981
2. Tagore's Prose
in *Your Tagore for Today* (translation from Selected Prose),

edited by Hiran Kumar Sanyal, Peoples Publishing House, Bombay, 1945

3. *Formation of Communist Party of India Abroad*
   A from Muzaffor Ahmed's Bengali work, National Book Agency, Calcutta, 1958.
4. *Boatman of Padma*
   Translation of Manik Bandopadhyay's 'Padma Nadir Majhi', Kutub Publishers, Bombay, 1945; Subsequent edition Sahitya Academy & NBT.
5. *Epochs End*
   Transalation of Tarasankar Bandyapadhyay's 'Manvantar, Mitralaya, Calcutta, 1944.
6. *The Land of the Soviets*
   (Ltr. by Hirendranath, along with S.k. Acharya) F. S. U, Calcutta, 1941
7. *Boatman Tarini*
   tr. of Tarasanker Bandyopadhyay's short story in Sahitya Academy's Authology.
8. সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস, ১৯৩৮
   স্তালিন ও অন্যান্য কৃত, বাংলায় প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার অনুবাদ, কলকাতা, ১৯৪৪
9. কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' থেকে কয়েকটি অধ্যায়
10. কার্ল মার্কসের ভারত বিষয়ক নিবন্ধ ১৮৫৩, প্রগতি সংকলন
11. লরেন্স ক্যাসানোভার 'আর্ট অ্যাণ্ড সোশাল লাইফ', কলকাতা, ১৯৪৮
12. স্তালিন, অক্টোবর বিপ্লব

(ঝ) প্রবন্ধ, সমালোচনা, প্রকাশিত বক্তৃতা ইত্যাদি

[এই পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো-ছিটানো প্রবন্ধের তালিকা ভীষণভাবে অসম্পূর্ণ। একসময় এগুলি দেব না-ই ঠিক করেছিলাম কিন্তু কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে যতদূর সম্ভব বাংলা প্রবন্ধের অসম্পূর্ণ তালিকা দিলাম। ইংরেজি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে হাতই দিলাম না। আসলে এই কাজ দু'বছর ধরে এবং একার বদলে একটা 'টিম' নিয়ে করলে সম্পূর্ণ হতে পারে। শুধু পত্রিকাই নয় (যার মধ্যে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, শারদীয়া বা ত্রৈমাসিক আছে), নানা স্মারক গ্রন্থ, স্মরণিকা ইত্যাদিতে তাঁর লেখা বেরিয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ গবেষকদের কথা মাথায় রেখে এই তালিকা দেওয়া হলো, যা অত্যন্ত কম সময়ে করা হয়েছে। —গৌ. নি]

১. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪২

এটি 'পরিচয়' (তখন সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) পত্রিকায় হীরেন্দ্রনাথের প্রথম লেখা বইটি এমিলি বার্নস্ অনূদিত ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্-এর 'অ্যান্টি ড্যুরিং'

২. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪২
৩. 'সংস্কৃতি সংকট' (প্র), 'পরিচয়' ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৩
৪. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৩
৫. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৩
৬. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৩
৭. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড; ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৩
৮. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪
৯. 'চীনের প্রতিরোধ' (প্র), 'পরিচয়' ৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৪
১০. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৫
১১. 'ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম' (প্র), 'পরিচয়', ৮ম বর্ষ, ১ খণ্ড, ১ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৫ (ছাত্রছাত্রী সম্মেলনের ভাষণ)
১২. 'দেশে বিদেশে', (প্র) 'পরিচয়' ৮ম বর্ষ, ১ খণ্ড, ২ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৫
১৩. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৯ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৬
১৪. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬
১৫. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়' ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৬
১৬. পুস্তক সমালোচনা, 'পরিচয়', ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৬
১৭. 'ভারতবর্ষ ও কার্লমার্কস', (প্র) 'পরিচয়', ১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৭
১৮. 'ভারতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য', আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৪১
১৯. 'দেশের দুর্গতি ও কর্তাদের কৈফিয়ৎ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৪০
২০. 'মানুষ খুনের ব্যবসা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৬
২১. 'সোভিয়েট ইতিহাসের একটি অধ্যায়', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ নভেম্বর, ১৯৩৮
২২. 'লেনিন', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারি, ১৯৪০
২৩. 'ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ মে, ১৯৪১
২৪. 'সোভিয়েট রাষ্ট্র' 'সোভিয়েট দেশ', প্রবন্ধ সংকলন ১৯৪১
২৫. 'অস্ট্রোমার্কসিজমের বিড়ম্বনা', 'মন্দিরা', আশ্বিন, ১৩৪৫
২৬. 'হিন্দু ও মুসলিম', 'পরিচয়', শ্রাবণ, ১৩৫৩
২৭. 'হিন্দু ও মুসলিম', 'পরিচয়', ফাল্গুন, ১৩৫৩
২৮. 'ধনিকের আর্বিভাব', (মার্কস-এর অনুবাদ), 'চতুরঙ্গ', পৌষ, ১৩৪৫
২৯. 'শিল্পে বস্তুনিষ্ঠা' (এঙ্গেলস্-এর অনুবাদ), 'সাহিত্যপত্র' মাঘ, ১৩৫৫
৩০. 'চক্ষুষা কাণঃ', 'সাহিত্যপত্র', কার্তিক, ১৩৬০
৩১. 'আধুনিক বাংলা কবিতা' একই নামের বই, সম্পাদনা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও

আবু সয়ীদ আইয়ুব, কলকাতা, ১৩৪৬, জুলাই ১৯৪০; এর দ্বিতীয় ভূমিকা
৩২. 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে', 'পরিচয়', পৌষ, ১৩৬২
৩৩. ঐ, পুনর্মুদ্রিত, 'সাম্প্রত' পত্রিকা, হীরেন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' অংশে কিছু লেখা যুক্ত করেছেন
৩৪. 'বিদায় বিষ্ণু দে', 'পরিচয়' কার্তিক ১৩৮৯
মূল রচনাটি ইংরেজিতে 'নিউ এজ'-এ বেরিয়েছিল। এটি দেবেশ রায়-কৃত অনুবাদ
৩৫. 'চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর মুক্তিস্নান', 'এবং এই সময়', বিষ্ণু দে স্মরণ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৯৬
৩৬. 'আমাদের ইতিহাস', স্বাধীনতা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬০
৩৭. 'প্যারিস ১৯৪৪', পরিচয়, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫১
৩৮. 'প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ', পরিচয়, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৫৭-৫৮
৩৯. 'কয়েকটি সোভিয়েট বই', দিগন্ত পত্রিকা
৪০. 'ভারত আবিষ্কার', দৈনিক স্বাধীনতা
৪১. 'ফুটবল প্রসঙ্গে', দৈনিক স্বাধীনতা
৪২. 'আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববিরাজ', সাহিত্যপত্র, কার্তিক; ১৩৫৭
৪৩. 'বাঙালীর ইতিহাস', সাহিত্যপত্র, শ্রাবণ, ১৩৫৭
৪৪. 'কেরলে কয়েকদিন', সাহিত্যপত্র, বৈশাখ, ১৩৬১
৪৫. 'মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য', সাহিত্যপত্র
৪৬. 'সাহিত্যপত্র' ও স্বদেশজিজ্ঞাসা, সাহিত্যপত্র, শ্রাবণ, ১৩৬১
৪৭. 'যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব', পরিচয়, শারদীয়া ১৩৬৫
৪৮. 'সাহিত্যে শাসন', পরিচয়, আশ্বিন ১৩৬৬
৪৯. 'ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল', 'পরিচয়, মাঘ, ১৩৬৬
৫০. 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ', পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৬৮
৫১. 'ইন্দ্রপাত', সাহিত্যপত্র, ১৩৬৭
৫২. 'অল্পে সুখ নেই', সাহিত্যপত্র, ১৩৭০
৫৩. 'গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে', নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে (১৯৪৮) ভাষণের অনুলিপি
৫৪. 'কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথ', প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬১
৫৫. 'সার্বভৌম কবি', গোপাল হালদার-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' (ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬১) বইয়ের জন্য লেখা।
৫৬. 'কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম,' পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ১২৫ বিশেষ সংখ্যা, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৯৩
৫৭. 'রবীন্দ্রনাথ : রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা'; রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলনের রচনা, ১৯৮৬
৫৮. 'নব্বই পেরিয়ে', কালান্তর, ২৩ নভেম্বর, ১৯৯৭

৫৯. 'উদ্বোধনী ভাষণ'; সার্দ্ধশতবর্ষের আলোকে কমিউনিস্ট ইস্তাহার স্মরণিকা, ষষ্ঠ বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্মেলন, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, ২৮-৩০ মার্চ, ১৯৯৮ রচনার নাম 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার মানব অভ্যুদয়ের তূর্যধ্বনি।
৬০. 'মার্কসবাদ ও মুক্তমতি, পরিচয়, শারদীয়া, ১৩৭০
৬১. 'ভারতবর্ষ ও মানবিকতা', পরিচয়, শারদীয়া, ১৩৭১
৬২. 'বিপ্লব, আবেগ ও প্রজ্ঞা', পরিচয়, শারদীয়া ১৩৭৭
৬৩. 'জওয়াহরলালজী নেহরু, পরিচয়, আষাঢ়, ১৩৭১
৬৪. 'মঙ্গোলিয়ার জনগণরাজ্যে', পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৭২
৬৫. 'যে মস্তকে ভয় নাই লেখা', পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৭৩
৬৬. 'ধর্ম, শুভবুদ্ধি ও মার্কসবাদী সংগ্রাম', মূল্যায়ন, ৭ সংখ্যা, ১৩৭২
৬৭. 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা', মূল্যায়ন, ৩য় সংখ্যা, ১৩৭৫
৬৮. 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং', নতুন পরিবেশ, শারদীয়া ১৩৭৩
৬৯. 'সমাজ শিল্প সাহিত্য', কালান্তর, শারদীয়া, ১৩৭৭
৭০. 'দুর্বল সংশয় হোক অবসান', সপ্তাহ, শারদীয়া, ১৩৭৭
৭১. 'গান্ধীজী', কম্পাস, শারদীয়া, ১৩৭৬
৭২. 'ভারত চেতনা', সমাজবাদ ও মানবিকতা', অমৃত, সাপ্তাহিক, শারদ ১৩৭৭
৭৩. সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু, বেতার জগৎ, শারদীয়া, ১৩৮০
৭৪. 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' কালান্তর, শারদীয়া, ১৯৮৯
৭৫. 'মার্কসচিন্তা, গান্ধীজী, ভারতবর্ষ; ভারত-জি ডি আর মৈত্রী সমিতির পত্রিকা, শারদ সংখ্যা, ১৯৮৭
৭৬. 'ফরাসী বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী', নক্ষত্র, শারদ সংখ্যা, ১৯৮৯
৭৭. 'সোভিয়েট নব প্রবোধন প্রসঙ্গে', দেশ, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
৭৮. 'বিপ্লব সংকট নয়, চাই সন্ধান, শুদ্ধি সংকল্প', চতুরঙ্গ, নভেম্বর, ১৯৮৯
৭৯. 'সংকটেরই কল্পনাতে হ'য়ো না ম্রিয়মান', কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনা, জুন, ১৯৮৯
৮০. 'চরৈবেতি চরৈবেতি', পরিচয়, শারদীয়া, ১৯৮০
৮১. 'প্রগতি লেখক সংঘ স্মৃত্তি সত্তা ভবিষ্যৎ', পরিচয়, শারদীয়া, ১৯৮৬
৮২. 'কার্ল মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব', এক্ষণ, কার্ল মার্ক্স সংখ্যা, ১৯৬৮
৮৩. 'ধর্ম ও সমাজবিপ্লব', দেশ, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৯১
৮৪. 'কলকাতা কিছু ভাবনা', দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮৯
৮৫. 'সংস্কৃতের ভূমিকা বিষয়ে', দেশ ১০ অক্টোবর, ১৯৮৭
৮৬. 'দেশাত্মবোধী রামমোহন', রামমোহন স্মরণ গ্রন্থের লেখা, প্রকাশক রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি
৮৭. 'স্বাধীনতার স্বাদ, সাম্প্রদায়িকতার শান্তি, সংহতির সন্ধান' কালান্তর শারদীয়া, ১৯৮৭
৮৮. 'রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী দৃষ্টিতে', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৮

৮৯. 'রবীন্দ্রমানসে কালচেতনা ও সমুত্তরণ মহিমা', যুগান্তর, শারদ সংকলন, ১৪০৩
৯০. 'বাংলা আকাদেমির কাছে প্রত্যাশা ও প্রস্তাব', বাংলা আকাদেমির পঞ্চম বর্ষপূর্তি ভাবনা, ১৯৯১
৯১. 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', নন্দন
৯২. 'প্রগতি সাহিত্যে শিবির ম্লান, কুণ্ঠিত, স্তিমিত কেন', কালান্তর, শারদীয়া, ১৩৯৫
৯৩. 'সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ', নন্দন
৯৪. 'আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখো ডর', নন্দন, জানুয়ারি, ১৯৯৩
৯৫. স্বাদেশিকতা ও কম্যুনিজম, পাক্ষিক বসুমতী, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
৯৬. 'নাই নাই ভয়' কিউবার অমৃতমন্ত্র, পরিচয়, শারদীয়া, ১৩৯৯
৯৭. 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, নন্দন, শারদীয়া ১৯৯৪
৯৮. 'ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায় তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়', পাক্ষিক বসুমতী, ১ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৯৩
৯৯. পূর্বজগৎকে জাগাতেই হবে, পাক্ষিক বসুমতী, এপ্রিল, ১৯৯১
১০০. মস্কো নভেম্বর ১৯৮৭, পাক্ষিক বসুমতী, ১ মে ১৯৯৩
১০১. আফগানিস্তান 'সোভিয়েত এশিয়া', পাক্ষিক বসুমতী, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯২
১০২. নববর্ষ নব শতাব্দী, পাক্ষিক বসুমতী, ১৬ অক্টোবর ১৯৯৩
১০৩. 'সভ্যতার সংকট' ও জগতের যন্ত্রণা, দেশ, ২ জানুয়ারি ১৯৯০
১০৪. পাশ্চাত্যের অধঃপাত আর গণতন্ত্রের ভাঁওতা, শারদীয়া দৈনিক বসুমতী, ১৯৯১
১০৫. মার্কস, মার্কসবাদ এবং আমরা, নন্দন, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৩
১০৬. স্ট্যালিন, ধর্ম, মার্কসবাদ। পাক্ষিক বসুমতী, ১৯৯৩
১০৭. নভেম্বর বিপ্লব মনুষ্যত্বের পরাভব নেই, পাক্ষিক বসুমতী, নভেম্বর ১৯৯২
১০৮. 'গণনাট্যকর্মীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ' গণনাট্য, ১৯৯০
১০৯. 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়', চতুরঙ্গ, জুন ১৯৯০
১১০. ইতিহাসের মহাকাব্য, ১৯৯১
১১১. 'আফ্রিকা' মুক্তিপথে কাঁটা—আশা ও আকাঙ্ক্ষা
১১২. 'সভ্যতার সংকট' ও জগতের যন্ত্রণা
১১৩. 'আনো এই মরুভূমে প্রত্যয়ের ব্রহ্মপুত্র', কোরক, ১৯৯৬
১১৪. সাংবাদিকতা, সাহিত্য; স্বদেশ মুক্তি ১৯৯৩
১১৫. 'পদ্মানদীর মাঝি সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে'।
১১৬. 'প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে', 'পরিচয়' মাঘ-চৈত্র, ১৪০৩
১১৭. 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ', ১৯৯৭
১১৮. ইনকিলাব জিন্দাবাদ, শারদীয়া কালান্তর, ১৩৯৬
১১৯. 'ইতিহাস এক নিষ্ঠুর দেবতা'
১২০. স্বাধীন ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা

১২০ক. দুনিয়ার দখল নেবে দলিতের দল, ঐকতান
১২১. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান
১২২. রাধারমণ মিত্র : বিস্মৃত অসামান্য মানুষ
১২৩. আম্বেদকর স্মরণে
১২৪. আবুল হালিম স্মরণে, শারদীয়া কালান্তর, ১৪০৫
১২৫. 'জগৎ জুড়ে লাল ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে,' ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেস -এর পূর্বে পার্টির রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকা, ডিসেম্বর ২০০১ লিখিত, প্রকাশ ২০০২
১২৬. গণতন্ত্রের সার্থক পরিণতি সাম্যবাদে ২০০১
১২৭. সাম্যবাদ 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ', কালান্তর শারদীয়া, ২০০০
১২৮. সহস্রাব্দ পূর্তি, সাম্যবাদ ও ভবিষ্যৎ, ১৯৯৯
১২৯. ভিড় করে আসে কিছু স্মৃতি, পরিচয়, সেপ্টেম্বর, ২০০০
১৩০. ভাবনা দুর্ভাবনা, গণশক্তি, শারদীয়া ২০০২
১৩১. একুশের ভাবনা। ফেব্রুয়ারি ২০০০
১৩২. চিত্তপ্রসাদের স্মরণে, চিত্তপ্রসাদ শিরোনামের গ্রন্থের জন্য লেখা, জানুয়ারি ২০০২
১৩৩. ২২শে শ্রাবণ, ১৪০৮, আগস্ট ১৯৯৮
১৩৪. বঙ্কিম-গরিমার উত্তরাধিকার, বঙ্গদর্শন, ১৯৯৮
১৩৫. কেন লিখি? ১৯৯৮
১৩৬. মহাচীনের জয়যাত্রা, 'পরিচয়' মাঘ, ১৩৫৫
১৩৭. ইতিহাসের বিচার, 'পরিচয়', ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬১
১৩৮. তারাশংকরবাবু, 'পরিচয়' বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৫
১৩৯. রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েট দেশ, দৈনিক কালান্তর, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০
১৪০. ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মহানায়ক জর্জি দিমিত্রভ, দৈনিক কালান্তর ১২ জুন, ১৯৮২
১৪১. সোমনাথ লাহিড়ী স্মরণে, দৈনিক কালান্তর ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
১৪২. পার্টি কংগ্রেস সার্থক হোক, দৈনিক কালান্তর, ২৪ মার্চ ২০০২
১৪৩. বুশ ব্লেয়ারের দর্প-দম্ভ-দাপটকে দলন দুনিয়ার দায়, দৈনিক কালান্তর, ৬ এপ্রিল, ২০০৩
১৪৪. মঙ্গলাচরণ চলে গেলেন, দৈনিক কালান্তর, ২৭ এপ্রিল, ২০০৩
১৪৫. দস্যু চূড়ামণি বুশ ব্লেয়ারের দর্প চূর্ণ করুক দুনিয়ার বিবেক, দুনিয়ার জনতা, দৈনিক গণশক্তি, ২৩ মার্চ, ২০০৩
১৪৬. জওয়াহরলাল নেহরু আমার চোখে, 'দেশ', ১২ নভেম্বর ১৯০৮
১৪৭. ধরণী গোস্বামী স্মরণে, ইসকাস পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮
১৪৮. ভারত-সোভিয়েট চুক্তির জয় হোক, ইসকাস পত্রিকা, আগস্ট ১৯৮৪
১৪৯. লেনিন ও ভারতের স্বাধীনতা, 'সোভিয়েট সমীক্ষা', ৪ বর্ষ, ৫৯/২০ ডিসেম্বর, ১৯৬৯
১৫০. একটি স্মরণীয় দিন সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা, 'সোভিয়েট সমীক্ষা', ৯ বর্ষ, ৩৬-

৩৭, ৯ আগস্ট, ১৯৭৪

১৫১. মানুষ কি পিশাচ হতে চলেছে, শারদীয়া কালান্তর ১৪০৯

১৫২. সংসদীয় ব্যবস্থা, সমাজ রূপান্তর, কমিউনিস্ট ভূমিকা, শারদীয়া কালান্তর ১৪০৮

১৫৩. পরাধীনতার অভিশাপ মোচন এখনও দূর হয়নি, শারদীয়া কালান্তর ১৪০৪

১৫৪. জানিয়ে দাও তুমি ভয় পাওনি, শারদীয়া কালান্তর ১৪০২

১৫৫. দেশব্রতী প্রাজ্ঞ প্রগতিপ্রয়াসী ক্ষিতীশপ্রসাদ, শারদীয়া কালান্তর, ১৪০১

১৫৬. দেশব্রতী বিজ্ঞান সাধক মেঘনাদ সাহা, শারদীয়া কালান্তর, ১৪০০

১৫৭. রাহুল সাংকৃত্যায়ন স্মরণে, শারদীয়া কালান্তর ১৩৯৯

১৫৮. আজকের দুনিয়া নিয়ে কিছু ভাবনা, শারদীয়া কালান্তর ১৩৯৮

১৫৯. কবি স্মৃতি লন্ডনে, সাপ্তাহিক কালান্তর ১১ মে, ১৯৬৩

১৬০. মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পঞ্চাশ বছর, সাপ্তাহিক কালান্তর ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৯

১৬১. স্বাধীন মঙ্গোলিয়ার ষাট বছর, সাপ্তাহিক কালান্তর; ৪ এপ্রিল, ১৯৮১

১৬২. রবীন্দ্র মহিমা স্মরণ করে, সাপ্তাহিক কালান্তর, ৯ মে, ১৯৮১

১৬৩. হাভানা অভিমুখে জোট নিরপেক্ষতা সমস্যা ও সম্ভাবনা, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

বিয়োগপঞ্জি

শিশিরকুমার দাস

ভোর হয় হয়। হাইড্রান্টে জল এসেছে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ দিয়ে গুমটি ছেড়ে প্রথম ট্রাম কোমর দোলাতে দোলাতে চলছে। এমনই সময় দক্ষিণ কলকাতার একটি ছাপাখানার গুমোট ঘর থেকে চারটি তরুণ সদ্যছাপা কয়েক কপি বই বুকে চেপে কারামুক্ত কয়েদির মতো দে-ছুট দে-ছুট। তাদের জামায় মলাটের কাঁচা রং লেগে যাচ্ছে। বই ঠিক নয়, একটি বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা। নাম—'একতা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্র। সে বছরের সম্পাদক—আমার সহপাঠী শিশির। শিশিরকুমার দাশ। ওই সকালের দৌড়বাজদের একজন।

সহাধ্যায়ীদের সবাইকে হারিয়ে সে যেমন বি এ ও এম এ পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিল, তেমনি সেই সকালের ছুটন্ত অশ্বদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই জীবনের নশ্বর সড়ক পেরিয়ে কোন অর্ফিয়ুসের বাঁশির সুরে মোহিত হয়ে না-ফেরার দেশে চলে গেল। আর, আজ সকালে যেই সংবাদ প্রতিদিন-এর সাপ্তাহিক কলম গত সাড়ে সাত বছরের মতো নিয়মমাফিক লিখতে বসেছি, সামনে চোখ মেলতেই বইয়ের তাক থেকে তাঁর প্রথম, কৃশ ও লাজুক চেহারার কাব্যগ্রন্থ 'জন্মলগ্ন' একটু উঁকি দিয়ে আমাকে বলে উঠল—'ভালো আছিস, অমিতাভ?' এর পরেও, অন্তত আমার যতটুকু জানা, শিশিরের আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ' ও 'হয়তো দরোজা আছে'। কিন্তু 'জন্মলগ্ন' আমার কাছে শুধু একটি কবিতার বই-ই নয়, কবি শিশিরেরও জন্মলগ্ন। আমরা তখন সবাই ছাত্র। আমাদেরই একজন প্রিয় বন্ধু অনেক কবিতা লিখেছে আর সে-সবের ভেতর থেকে বাছাই করে পুরো একটি গ্রন্থও ছেপে ফেলেছে, এই আনন্দ ও বিস্ময়ের স্বাদই ছিল আলাদা।

একজন কবি লিখেছিলেন—"আমরা তখন সবাই প্রেমিক, সবার বয়স অল্প।" আমাদেরও এরকম একটা জীবন-পর্যায়ে হঠাৎ শিশির এক বিকেলে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকজনের কাছে প্রস্তাব রাখল—সে একটি প্রেমের কবিতা-সংকলন প্রকাশ করতে চায়। প্রশ্ন করা হল—সেখানে কাদের কবিতা থাকবে। শিশির বলল, "যে-সব কবি সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গিয়েছেন বা যাঁরা এখনও ছাত্র, তাঁদের।" প্রস্তাব তো নয়, যেন তপ্ত তাওয়ায় ঘি। সবাই হইহই করে উঠলাম। শিশিরের নেতৃত্বে কবিতা ঝাড়াই-বাছাই শুরু হল। সঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতি-চর্চায় অগ্রণী ব্যক্তিত্ব সুধীর চক্রবর্তী, আমাদেরই আর এক সহপাঠী, তখন বড় বড় কবিতা লিখত। 'কথা বল, কথা বল, বিশ্বরমা উভয়ভারতী'—তার একটি দীর্ঘ কবিতার ওই প্রথম পঙক্তিটি আজও আমার মনে আছে। শিশিরের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি মদত দিয়েছিল সুধীর। মাসদুয়েকের মধ্যেই আমাদের মুখ আলো করে বেরিয়ে গেল ওই প্রেমের কবিতা সংকলন—'অমৃতযন্ত্রণা'।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তখন ছিলেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। বিশাল পণ্ডিত, হৃদয়বান মানুষ, খানিকটা সাত্ত্বিক গোছের। আমাদের প্ররোচনায় দুরুদুরু বুকে শিশির তাঁর হাতে একটি কপি দিয়ে এল। তারপর আর পায় কে? বই পৌঁছে গেল বাংলার অধ্যাপকদের ঘরে প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়দের কাছে। আর কে না জানে, স্নেহ সর্বদাই নিম্নগামী। তা না হলে বিশীমশাইয়ের মতো অমন ডাকসাইটে সাহিত্যিক ও অধ্যাপক কেনই-বা 'অমৃতযন্ত্রণা' প্রকাশের মাসদুয়েক যেতে না যেতেই তখনকার 'চতুরঙ্গ'-র মতো অভিজাত সাহিত্য পত্রিকায় সংকলনটির লাগামছাড়া প্রশংসা করে লিখে ফেললেন পাতা চারেকের একটি নিবন্ধ।

শুধু তাই নয়, এই অধমের একটি চার লাইনের কবিতার প্রথম পঙক্তিটি উল্লেখ করে এমন প্রশংসা-বচন করলেন তাঁর মোহিতলালি ভাষায়,.....'অভিমন্যু এ যৌবন সপ্তরথী চিন্তা দিয়ে ঘেরা'—এই ছত্রে এ যুগের যৌবনের একটি বিশেষ রূপ প্রকাশিত। সেই রূপটিকে স্বীকার না করিয়া লইলে এ যুগের নবীন কবিদের কাব্য বোধহয় বুঝিয়া ওঠা সম্ভব নয়। ...তরুণ কবি সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভিমুন্য, উত্তরা তাঁহার মানসপ্রতিমা, প্রেম কাব্য সেই অন্তিম মুহূর্তের অভিজ্ঞতা। সম্প্রতিকালে লিখিত নবীন কবিদের প্রেমের কবিতা পড়িয়া একটি অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় একজন নবীন কবির কাব্যে ঐ ছত্রটি পাইলাম, মনে মনে বলিলাম যাঁহাদের ব্যথা তাঁহারাই ভাষা দিয়াছেন, আমার দায় অনেক কমিয়া গেল।" বলা বাহুল্য, তাঁর ওই লেখায় আমার কবিতাটি উপলক্ষ ছিল মাত্র, আসলে আমাদের সময়ের গোটা কবিকুলের অনুভূতিকেই তিনি স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। আর সবার আগে শিশিরের নাম তো বলতেই হয়, কারণ সে-ই উদ্যোগী হয়ে কবিদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রণয়-গাথাগুলিতে এক বহুবর্ণ ফুলের তোড়ায় বেঁধেছিল।

নির্দিষ্ট বছর পরীক্ষা না দিয়ে পরের বার এম. এ পাশ করে আমি চলে গেলাম ধানবাদের সদ্য গড়ে ওঠা একটি কলেজে পড়াতে, আর, আমার সহাধ্যায়ীরা মুঠো খোলা খইয়ের মতো সঙ্ঘ ভেঙে যে-যার মতো ছড়িয়ে পড়ল এখানে-ওখানে। তবে, বাংলায় আগেকার কৃতী ছাত্রদের ফলাফলের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে শিশির সোজা চলে গেল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকি ও এশীয় বিদ্যাচর্চার অধ্যাপনা করতে। ওই মহার্ঘ সংবাদটি শুনে তাঁর প্রতিটি সহপাঠী বন্ধুর বুক ফুলে সেদিন দশহাত হয়ে গিয়েছিল, এ-আবেগটুকু এই বয়সেও আমি প্রকাশ করা সঙ্গত বলেই বোধ করি। মার্কিন দেশে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুকাল ভাষাবিজ্ঞানের পাঠও নিয়েছিল শিশির।

না, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার সেরা ছাত্র শিশিরকে কলকাতা কোনওদিনই অধ্যাপক হিসাবে পায়নি। কেন, সেই বিড়ম্বনাময় প্রশ্নটির উত্থাপন করে লাভ নেই, কারণ, শিশিরও আর আমাদের মধ্যে নেই। সে আজীবন তাঁর পঠনপাঠনচর্চা ও কর্মকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কে, যেখানে আধুনিক ভাষা বিভাগে অধ্যাপনার সূত্রে সে ভারতবিদিত হয়ে ওঠে। থাকত প্রবীণ রোডে অধ্যাপক কোয়ার্টারে, শেষদিকে নতুন বাড়ি করে ওই দিল্লিতেই অন্য অঞ্চলে উঠে যায়। দিল্লিবাসী শিশির বহুবার কলকাতায় এসেছে।

অনেক সেমিনারে খালি ওকে দেখতে এবং ওর আলোচনা শুনতে গিয়ে হাজির হয়েছি। কাজে-অকাজে দিল্লিতে গিয়ে বারদুয়েক শিশিরের কোয়ার্টারেও জমিয়ে আড্ডা মেরেছি। শেরপা-র দক্ষতায় ছোট থেকে মেজো, মেজো থেকে বড় শৃঙ্গ জয় করে খ্যাতির চুড়োয় উঠে যাওয়া শিশিরের মধ্যে কিন্তু পরিচয়ের প্রথম পর্বের মতো শেষেও আচরণে কোনও আড় পাইনি। আদ্যন্ত বিনয়ী ও মার্জিত এই মানুষটি খোলস ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসত তার সাবেক বন্ধুদের সামনে, প্রশ্রয়লালিত-আতিথ্য দিত।

অথচ, এক নীতিদীর্ঘ জীবনে কী-ই না করে গিয়েছে শিশির, ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। ইংরেজিতে চারটি গবেষণাগ্রন্থ বেরিয়েছে তার—"The Shadow of the Cross', 'Western Sailors', 'Eastern Seas' এবং "Pundits and Munshis'। উইলিয়াম কেরি থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : প্রথম পর্বের বাংলা গদ্য নিয়ে গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি পায় শিশির। বাংলা ছোটগল্পের উপর আলোচক হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি. ফিল খেতায় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপরে তার একটি অনবদ্য গ্রন্থপাঠের সুযোগ পাই—'An Artist in Chains'। আর এসবেরই পাশাপাশি সর্বভারতীয় সাহিত্যের মহাকাব্যপ্রতিম ইতিহাস সে লিখে গিয়েছে। সাহিত্য অকাদেমি থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'English writings of Rabindranath Tagore'-এর মতো, আমাদের সবার পক্ষে জরুরি একটি গ্রন্থ।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ যে-রসিকতা করে লিখেছিলেন, সেই "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত", তা কখনওই কব্জা করতে পারেনি আমাদের শিশিরকে। উল্লিখিত যাবতীয় মহান প্রয়াসের পাশাপাশি সে সাবলীল ঝরনাকলমে লিখে গিয়েছে শিশু ও কিশোরদের জন্য একটির পর একটি চমৎকার বই, একটির পর একটি নাটক ও অনুবাদ-নাটক। তার তিনটি নাটক—'আকবর-বীরবল', 'বাঘ' আর 'সোক্রাতেসের জবানবন্দী' নাট্যরসিকদের রীতিমতো প্রশংসা অর্জন করেছিল।

সৃজন থেকে গবেষণা—এই বিস্তৃত, আয়তনবান প্রান্তরে সারাজীবন ভ্রাম্যমাণ শিশির সাড়ে তিন হাত দেহ একজন্মে অনেক শিশিরকে সংলগ্ন করেছিল, যাদের মধ্যে বস্তুত কোনও ব্যবধান বা দূরত্ব ছিল না। আমার দেখা অসংখ্য মানুষের ভিড়ে ওই এক এবং একক শিশিরকে শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় স্মরণ করতে পেরে বহুকাল পর ভাল লাগছে, বড্ড ভাল লাগছে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

স্মৃতির সূত্রে ধনঞ্জয় দাস

মিহির সেন

কবি, প্রাবন্ধিক, রাজনৈতিক কর্মী ধনঞ্জয় দাসের জন্ম ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ অধুনা বাংলাদেশ খুলনার কালিকাপুর গ্রামে। মৃত্যু কলকাতার নিজস্ব আবাসে—৫ মে ২০০৩-এ। আনুপাতিক বয়স বিচারে তাই এই মৃত্যুকে অকালপ্রয়াণ বলা যায় না। অবশ্য যে কোনও মানুষ স্মরণযোগ্যতা অর্জন করে বয়স নয়, তার সারা জীবনের অবদান দিয়ে।

সেদিক দিয়ে এক কর্মময়, বর্ণময় জীবনযাপন করে গেছে ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৪৮ সাল নাগাত। দু'জনই তখন কলেজের ছাত্র। দু'জনই দেশ বিভাগের বেদনা নিয়ে ভেসে এসেছি, ঠাঁই নিয়েছি কলকাতায়। একজন দিনাজপুর থেকে, অন্যজন খুলনা।

সেই থেকে আজীবন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রাজনীতি, সাহিত্যের সহমর্মী, সহযাত্রী হিসেবে। পারিবারিক সূত্রেও। সেও তো কম সময় নয়। অর্ধ-শতাব্দীর বেশি। ধনঞ্জয় প্রসঙ্গে কিছু লিখতে গেলে তাই ব্যক্তিগত এলোমেলো টুকরো স্মৃতি মূল্যায়নের ধারাবাহিকতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ধনঞ্জয় একই সঙ্গে ছিল অনমনীয় রাজনৈতিক কর্মী, অনলস সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক, পরিশ্রমী সংগঠক।

মার্কসবাদে দীক্ষা ছাত্র-জীবনেই। খুলনার দৌলতপুর কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের একজন সক্রিয় সংগঠক ছিল। প্রথম কারাবাসের অভিজ্ঞতাও সেই পর্বেই। ১৯৪৫ সালে বন্দী আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদের মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার অপ্‌রাধে। তারপর একাধিকবার।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিল ১৯৪৮ সালে। পরের বছরই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল। কেননা কমিউনিস্ট পার্টি তখন 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' ঘোষণা করে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছে। অনেক কমরেডের সঙ্গে ধনঞ্জয়ও গ্রেপ্তার হল। প্রেসিডেন্সী জেলে থাকতে হল বিনা বিচারের বন্দী হিসেবে। দেশের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ও বাংলায় তখন মুসলিম লীগ সরকার। সেখানেও আবার কারাবন্দী হতে হল কয়েক মাসের জন্য। ১৯৫১ সালে আমাদেরই প্রকাশিতব্য একটি পত্রিকার টাকা সংগ্রহের জন্য খুলনায় গিয়েছিল। পুরোনো নথিপত্রের সূত্রে আবার গ্রেপ্তার। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী, খুলনার জেলে নিরাপত্তা বন্দী হিসেবে কাটাতে হল।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে

প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অবাক হয়ে দেখেছি ধনঞ্জয় কী গভীর নিষ্ঠা আর দৃঢ়তার সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রেই সমান সক্রিয়।

সাহিত্যচর্চার শুরু কবিতা দিয়ে। প্রগতিশীল নামা খ্যাত পত্র-পত্রিকা বা লিটল ম্যাগাজিনে নিয়মিত কবিতা লিখত। কবি হিসেবে খ্যাতিও অর্জন করেছিল। ওর তিনটি কবিতা-গ্রন্থ-সরসন্ধান, পালাতে পারি না, নির্বাচিত কবিতা পাঠক সমালোচকদের স্বীকৃতিও লাভ করেছিল।

একই সঙ্গে গদ্য বা প্রবন্ধ রচনাতেও ওর দক্ষতার প্রমাণ—মণীন্দ্র রায়, কবি ও কবি-ব্যক্তিত্ব, রাধারমণ মিত্র: অবিস্মরণীয় এক ব্যক্তিত্ব। গবেষণাসমৃদ্ধ রচনা—ভারতের জাদুঘরে, প্রোগেসিভ কালচারাল মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, টেরাকোট্টা অব পাঁচমুড়া প্রাইমেরি ইনভেস্টিগেশন এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

সম্পাদনার ক্ষেত্রেও ওর নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। আমি ও ধনঞ্জয় যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছিলাম—কবিতা-সংকলন মহাচীন ও গল্প সংকলন প্রতিবাদের গল্প। এ ছাড়াও নানা ধরনের পত্রিকা বা গ্রন্থ সম্পাদনার সঙ্গে নানা সময়ে যুক্ত থেকেছে। ওর নিজস্ব সম্পাদনায় প্রকাশিত—মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, বস্তুবাদী সাহিত্য-বিচার ও অন্যমত আর বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, মার্কসবাদী সাহিত্য শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে যে এক অপরিহার্য আকর-গ্রন্থ হয়ে থাকবে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পরিচয় পত্রিকার একজন সক্রিয়কর্মী হিসেবে যোগদান করেছিল ১৯৪৯ সালে। কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও গল্পকার সুশীল জানা তখন পরিচয়ের দায়িত্বে। সেই থেকে আমৃত্যু পরিচয়-পরিবারের একজন ছিল। ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এ পরিচয়ে গর্বিত ছিল চিরদিন।

একই সঙ্গে সাংবাদিকতাও করেছে কিছুদিন। 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকায়।

পার্টির প্রত্যক্ষ কাজ ছাড়াও নানা সংগঠনের সঙ্গেও নানা সময়ে যুক্ত ছিল। প্রগতি লেখক সংঘ, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি, জাতীয় সংহতি পরিষদ, শিল্পীচিত্র, সাহিত্য সমরায় ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানে ওর ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে ধনঞ্জয়কে দু'বার মানসিক আঘাত পেতে দেখেছি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি খণ্ডিত হবার সময়, আর সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর। মনে মনে এতে বিপর্যস্ত হয়েছে কিন্তু আদর্শচ্যুত হতে দেখিনি। ও থেকে গিয়েছিল সি. পি. আই-তেই। আজীবন সেই পার্টির সদস্যপদ বজিয়ে রেখেছে।

নিজের আদর্শের ক্ষেত্রে ধনঞ্জয় ছিল অনমনীয়। চিরদিনই স্পষ্টবক্তা। মাঝেমাঝে রূঢ়-ভাষীও মনে হয়েছে। সতর্ক করলেও শুনত না। পরে বুঝেছিলাম, নিজের আদর্শের প্রতি তীব্র ভালবাসাই এর কারণ।

বিপরীতে ছিল অসাধারণ বন্ধুবৎসল। বন্ধুদের আপদে-বিপদে সবসময় পাশে আছে। বন্ধুদের সাফল্যে খুশি হতে দেখেছি। বিচ্যুতিতে বেদনার্ত।

বাইরের এই বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেও পারিবারিক কর্তব্যের ক্ষেত্রেও ছিল সতত সজাগ। মাঝে মাঝে দেখে অবাক হতাম।

ধনঞ্জয়ের একটি কবিতার কিছু অংশ সেদিন নজরে পড়ল।—'আমার বুকের গভীরে/কিছু ছাই-চাপা আগুন/এখনও লুকিয়ে রেখেছি/তোমরা নেবে ভাই?/তাপটা যাই যাই করছে/আইনের আড়ালে পড়ন্ত সূর্যের মত।'

মানুষকে ভালবেসে, জীবনকে ভালবেসে জীবনের এই উত্তাপ বজিয়ে রেখেই বিদায় নিয়েছে ধনঞ্জয়। শুধু তাই নয়, প্রবল প্রত্যাশায় সেই উত্তাপ পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যেতে চেয়েছে। এ তো সহযাত্রী আমাদেরও গর্ব।

তাই ধনঞ্জয়ের মৃত্যুতে শোক নয়, ওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৪র্থ তল) কলিকাতা-৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

ক) এইচ. এম. টি./মহিন্দর/এসকটস/মিৎসুবিশি ট্রাকটরস/সোনালিকা।

খ) ক্যামকো/মিৎসুবিশি/শ্রাচী/খাজানা/ভি. এস. টি. ডি. আই-১৩০ পাওয়ার টিলারস্।

গ) "সুজলা" ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট।

ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।

ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামতি করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং—২২২০-২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস

২৪ পরগণা (দক্ষিণ)	ঃ ১৪, নিউ তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮
২৪ পরগণা (উত্তর)	ঃ ২৭নং যশোর রোড, বারাসাত
হুগলী	ঃ সাহাপুর তারকেশ্বর/আরামবাগ/চুঁচুড়া/পুরশুরা
বর্ধমান	ঃ ৫নং রামলাল বোস লেন, রাধানগর পাড়া, ষ্টেশন রোড, বর্ধমান
বাঁকুড়া	ঃ জল সম্পদ ভবন (এগ্রি ইরিগেশন ক্যান্টিন হল) (কেন্দুয়া ডিহি)
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট)	ঃ ডাক বাংলো রোড, শরৎ পল্লী
মেদিনীপুর (ইষ্ট)	ঃ চৌধুরী কুটির, বহরগ্রাম, পোঃ—পাঁশকুড়া
বীরভূম	ঃ অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং (এগ্রি ইরিগেশন) পোঃ-বড়বাগান, সিউড়ি
মালদা	ঃ মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ	ঃ ৪৬/১, কৃষ্ণনাথ রোড, প্রথম তল, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি	ঃ রুম নং-২, প্রশাসনিক ভবন, ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রাজাবাড়ি গ্যারেজ, পোঃ এন্ড ডিষ্ট্রিক্ট—জলপাইগুড়ি
শিলিগুড়ি	ঃ বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি
কুচবিহার	ঃ এন. এন. রোড, কোচবিহার
পুরুলিয়া	ঃ বেলগুমা, এগ্রি ইরিগেশন কলোনি
নদীয়া	ঃ ৫/২, অনন্তহরি মিত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
উত্তর দিনাজপুর	ঃ রায়গঞ্জ, সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স
দক্ষিণ দিনাজপুর	ঃ বালুরঘাট (ঘটকালি রোড)